হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

ত্রয়োবিংশবর্ষ।

১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

স্বত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স দ্বারা

প্রকাশিত।

1916.

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

জন্মভূমির ত্রয়োবিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

সন ১৩২২ সাল।

(উ)

(এ)

(ক)

(গ)

(চ)

(জ)

(ত)

(দ)

(ধ)

(ন)

(প)

(ব)

(শ)

(স)

(হ)

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

ত্রয়োবিংশবর্ষ।

১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

স্বত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স দ্বারা

প্রকাশিত।

1916.

বার্ষিক মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵৹ ছয় আনা।

Printed by Narendra Nath D[illegible]ta.

at the Janma-Bhumi Press.

39 Manick Bose's Ghat Street.

জন্মভূমির ত্রয়োবিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

সন ১৩২২ সাল।

(উ)

(এ)

(ক)

(গ)

(চ)

(জ)

(শ)

(স)

(হ)



তিন বৎসর দুই মাস বয়সের—

শিশু মাষ্টার মদন।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

বর্ষবৃদ্ধি।

কালের বিচিত্র গতি।—সংসারে কাহাকেও হাসাইয়া, কাহাকেও কাঁদাইয়া, ১৩২১ সাল,—কালের অতীত অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে। আমরা এক্ষণে ১৩২২ সালে প্রবেশ লাভ করিয়াছি। এই নববর্ষে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার করুণায় এবং বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকপাঠিকাগণের বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকা দ্বাবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসরকাল "জন্মভূমি" আপন ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা সনাতন ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও সাহিত্যের প্রচার করিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা যেরূপ গুরুজনের আশীর্ব্বাদ, বন্ধু বান্ধবগণের সহানুভূতি, গুণগ্রাহি—হিতৈষী মহানুভবগণের সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছি,—ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবৎ-কৃপায় তাহাতে বঞ্চিত না হই, ইহাই সর্ব্বমঙ্গলময়-পরমপিতা-পরাৎপর পরমেশ্বরের শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতে কৃধি।

হে মিত্রদেব, হে বরুণদেব, আপনারা আমাদের মঙ্গল করুন। হে পথ্যেরেবি রেবতি! আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। ইন্দ্র এবং অগ্নি আমাদের মঙ্গল করুন। হে অদিতি দেবি! আপনি আমাদের মঙ্গল করুন।

সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা, সর্ব্বজ্ঞানদাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিয়া, আমাদের সকল শুভ সঙ্কল্পের সহায়তা করুন।

বাণী বন্দনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ,

(বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে,
"মেরি গোল্ড ক্লবের" সদস্যগণ কর্ত্তৃক গীত।)

(আজি), এসেছি, আজি মিলেছি আজি এসেছি মিলেছি,
মাগো! তব যতেক সন্তান;
(আজি), মোদের যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমারে করিতে সব দান।
(আজি), তুলিয়া হৃদয় হ'তে ভকতি কুসুম ভার,
মালিকা তোমার পদে দিব মাতা উপহার।
তোমার চরণ ধরি, সকলে অঞ্জলি করি,
কর মাগো আশীষ প্রদান।
(আজি), হৃদয়ের সব আশা, জীবনের সব তৃষা,
করিতেছে তোমার সন্ধান।
ঐ ভেসে আসে চিরাদৃত দরশন-সৌরভ,
ভেসে আসে উজ্জ্বল কবিকুল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি ইতিহাস ঋজুভাষী,
ভেসে আসে নবীন বিজ্ঞান।
(আজি), বিজয় চাঁদের আলো, হরের প্রসাদ ভাল,
এ মিলন স্বরগ সমান।

(আজি), সকল সেবক মিলে তোমায় পূজিতে চায়,
তোমার চরণ ধূলি ললাটে মাখিতে চায়,
তোমার আসন তলে,   শরণ লভিবে বলে,
করিয়াছে জীবনের ধ্যান।
(আজি), সব ভাষা সব বাক্   তোমার মহিমা গা'ক্,
হোক্ সেই—চির বর্দ্ধমান।

মধুপূর্ণিমা ১৩২১ সাল।
"দীনধাম" কলিকাতা।

মাষ্টার মদন।

সর্ব্বজন সুপরিচিত শিশু গায়ক "মাষ্টার মদনের" নাম নিশ্চয়ই আপনারা সকলে শুনিয়াছেন। তাই আজ আপনাদের তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি;—কারণ "মদন" বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর আদরের নিধি। এমন হয় নাই, বুঝি বা এমন হইবে না। কি জানি কোন সঙ্গীতাচার্য্য মহাপুরুষ মদনমোহনরূপে বাঙ্গালীর মনোমোহন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এমন না হইলে কি মদনমোহন মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়াই শিশু-কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে কেবল বাঙ্গালীকে কেন সমস্ত ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিতে পারিত? মদনমোহন জগতে অতুল্য। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির মধ্যে তাহার তুল্য জাতিস্মর, সঙ্গীতনিপুণ শিশু আর নাই—একথা পৃথিবীর যাবতীয় বিখ্যাত সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে।

"মাষ্টার মদনের" পূর্ণ নাম শ্রীমান্ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় ১২৪, ১২৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কলা সরস্বতীর প্রিয় বরপুত্র আমাদের "মাষ্টার মদন" শুভ ১০ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩১২ সাল, সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় তাঁহার পিতৃভবনে জন্ম গ্রহণ করে। "মদনের" বয়স যখন এক বৎসর মাত্র, তখনও সেই প্লেগের সময়ের শ্রীহরি নামের স্রোত চলিতেছিল। পাড়ার ছেলেরা সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে

বাহির হইলেই "মদন" হাত বাড়াইয়া সেই দিকে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিত, এবং লইয়া গেলে অন্যান্য শিশুর মত ভয় না পাইয়া একমনে হাসিতে হাসিতে প্রাণের আবেগে শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিত।

মদন দুগ্ধ পান করিতে না চাহিলে কেহ যদি হারমোনিয়ম্ বা অন্য কোন বাদ্য যন্ত্র বাজাইতেন, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিত। কিন্তু তখনও কেহ স্বপ্নেও জানিত না যে, পরে এই "মদন" জগৎ বিখ্যাত আমাদের "মাষ্টার মদন" হইবে। একদিন বৈকালে বসন্ত বাবু তেতলায় কে গান করিতেছে শুনিতে পাইলেন। সেই দিন কচি কচি ছেলেরা ব্যতীত বাড়ীর সকলেই কালীঘাটে ৺কালী দর্শনে গিয়াছিল। বসন্ত বাবু তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন—"বাড়ীতে কেউ নাই, তেতলায় কে গান করে, দেখে আয় তো!" ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বড় বাবু! মদন বসে সঙ্কীর্ত্তনের গান গাইছে।" উপরে বসিয়া আকাশে ঘুড়ির দিকে চাহিয়া "মদন" সঙ্কীর্ত্তনের —

হরি বড় অসময় তাই দয়াময়
তোমারে পড়েছে মনে।
তুমি অনাথের নাথ, ওহে দীননাথ,
অধমে রেখো চরণে—(দেখো ভুল নাক।)

এই গান খানি অস্পষ্টভাবে সুর তাল লয় বজায় রাখিয়া গাহিতেছে। বসন্ত বাবু চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ "মদনকে" কোলে করিয়া আনিয়া হারমোনিয়মের সহিত গাওয়া দেখিলেন যে প্রতি পরদায় হারমোনিয়মের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া ঠিক গাহিয়া গেল। ইহাই "মাষ্টার মদনের" প্রথম গান। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর নয় মাস মাত্র। এই দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থা হইতেই "মদনের" এমনই আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, বাড়ীতে কখনও গান বাজনা হইলে মদন পাঁচ সাত বার গান খানি শুনিলেই উহা কলোগ্রাফের ন্যায় অবিকল নকল করিয়া আধ আধ স্বরে গাহিতে পারিত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা ও নিকটস্থ ছাত্র নিবাস হইতে ছাত্রেরা দলে দলে বসন্ত বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন।

এই প্রকারে কয় মাস কাটিয়া যাইবার পর গত ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে মহানবমী পূজার দিন বসন্ত বাবুর পরম আত্মীয় শিবপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে তিনি সপরিবারে ও মদনকে লইয়া নিমন্ত্রণ যান। নিমন্ত্রণ গিয়া দেখিলেন যে, পূজার শেষ দিন বলিয়া



অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রকাশের প্রারম্ভে—

অশ্বপৃষ্ঠে মাষ্টার মদন।

সেখানে অনেক খ্যাতনামা গায়কের সমাবেশ হইয়াছে। "মদন" সেখানে গিয়া লাল নীল দেশলাই জ্বালিবার জন্যই ব্যস্ত। এমন সময়ে চৌধুরীমহাশয় বলিলেন,—"শুনলুম্ মদন নাকি গান গাহিতে শিখেছে?" বসন্ত বাবু বলিলেন,—"হাঁ দাদা বেশ গান গায়।" ইহা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় ঠাট্টা করিয়া মদনকে গান গাহিতে বলিলে, বসন্ত বাবু হারমোনিয়ম লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং মদন "নিপট কপট তুয়া শ্যাম"—এই গান খানি এমনওস্তাদির সহিত গাহিল যে, এই গান শেষ হইতে না হইতেই পূজার দালানের সকলে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মদনকে কোলে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। তখন "মদনের" বয়স তিন বৎসর দুই মাস মাত্র। এবং সাধারণের সম্মুখে মদনের এই প্রথম গাওনা। পাঠক হারমনিয়মের পাশে উপবিষ্ট তাহার সেই সময়ের চিত্রখানি দেখুন। দেশপূজ্য সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মদনের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া মদনকে মালা পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি যেমন মাতৃ স্তন্য, ত্যাগ করিয়া অবধি সজ্জনগণের চিত্তবিনোদন করিতেছ, ভগবান যেন তোমাকে তেমনই চিরসুখী চিরহাস্যময় ও চিরজীবি করেন।" ইংরাজী—১৯০৮ সালের ১০ই অক্টোবরের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ্" সংবাদ পত্রে "মদনের" এই আশ্চর্য্য গুণের কথা প্রকাশ হইবার পরেই নানা স্থান হইতে নানা প্রকারের লোক দলে দলে "মদনের" গান শুনিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে একদিন সকালে বসন্ত বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় চারি খানি মটরগাড়ী ভর্ত্তি সাহেব ও মেম সাহেবকে লইয়া পাড়ার একটী ভদ্র লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এই সাহেবেরা হচ্ছেন আমেরিকান টুরিষ্ট, মদনকে দেখিবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া বাড়ী খুঁজিতেছিলেন, তাই আমি ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।" বসন্ত বাবু আগন্তুক ভদ্রলোকগণকে অতি যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে "মদনকে" আনিয়া দেখাইলেন। তাঁহারা সকলেই হাসিয়া উঠিয়া উপহাস করিয়া বসন্ত বাবুকে বলিলেন—"Really is this the boy?" বসন্ত বাবু "yes" বলিলে তাঁহারা "Impossible Babu" বলিয়া উঠিলেন। তখন বসন্তবাবু হারমোনিয়মটী আনাইয়া সাহেবদের বলিলেন,—"Well everything will come out now." ইঁহাদের মধ্যে ৩।৪ জন বেশ ভাল রকম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা জানিতেন। তারপর বসন্ত বাবু হারমোনিয়ম বাজাইলে "মদনের" গান শুনিয়া সকলেই "মাষ্টার মদনের" দিকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাকাইতে লাগিলেন।

তাঁহারাই ইউরোপ ও আমেরিকায় "মাষ্টার মদনের" কথা প্রচার করেন। সেই সময় হইতে "মাষ্টার মদনের" খ্যাতি দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

"মাষ্টার মদনের" বয়স যখন তিন বৎসর পাঁচ মাস মাত্র, তখন সে একদিন পিতার কোলে চড়িয়া একটা বড় মজ্‌লিসে গান গাহিতে যায়। তথায় রাজা মহারাজা হইতে সহরের বিখ্যাত নর্ত্তকী গহরজানও উপস্থিত ছিলেন। অতটুকু ছেলে গান গাহিবে শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বসন্ত বাবু বরং সেই মজ্‌লিসের বড় বড় লোকেদের দেখিয়া কিছু থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু "মাষ্টার মদন" নির্ভীক চিত্তে সেই আসরে বসিয়া উপস্থিত ভদ্রলোক-দিগকে তাহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট গলার কয়েকটা শক্ত শক্ত সুর তান-লয়যুক্ত গান শুনাইল। গান শুনিয়া সকলে আবাক হইয়া গেলেন। গহরজান বলিল,—"হ্যাম্ তাজ্জব বান গোই।" যখন মদনের বয়স চারি বৎসর মাত্র,—হাতে খড়ি হয় নাই,—তখন সে আশিটী গান মুখস্থ করিয়াছিল এবং সকল গান গুলিই একটী অক্ষরও ভুল না করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের সুর-তাল বা লয় ঘটিত সমস্ত খোঁচ খাঁচ বজায় রাখিয়া এমন নিপুণ ভাবে সকলের মনোমত ধরণে গাহিত যে, বড় বড় ওস্তাদেরা পর্য্যন্ত তাহার কোন ভুল ধরা দূরে থাক, অবাক হইয়া যান। তাঁহাদের বরং কখন কখন তাল কাটিয়া যায়, সুরের এদিক ওদিক হয়, কিন্তু "মাষ্টার মদনের" বড় ক্রটী ঘটে না। অনেক লোক সমস্ত জীবনে যাহা না শিখিতে পারে, বাক্‌বাদিনীর বর পুত্র "মাষ্টার মদন" এত অল্প বয়সে তাহা নিখুঁত ভাবে শিখিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পিতা হারমোনিয়াম বাজান, একজন ভাল "তালিম" বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করিতে থাকেন, আর সে ধ্বনীধর (ফনোগ্রাফ) যন্ত্রের ন্যায় নিখুঁত ভাবে হাত দিয়া তাল নির্দ্দেশ করিতে করিতে গান গায়। এখন সে প্রায় তিন চারি শত গান শিখিয়াছে। এই গান গুলি কেহ তাহাকে যত্ন করিয়া শিখায় নাই, সে শুনিয়াই শিখিয়াছে। তা ছাড়া শুনা যায় যে, মদন ঠাকুরমার নিকট হইতে শুনিয়া মহাভারত ও রামায়ণ আগা গোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর ও বড় বড় পণ্ডিতেরা মদনকে প্রশ্ন করিয়া ঠকাইতে পারেন নাই, তখন তাহার বয়স ৫ বৎসর মাত্র, কাঠের ঘোড়ায় উপবিষ্ট তাহার ফটোগ্রাফ দেখুন,- সুতরাং এই অদ্ভুত শিশুর যেমন মেধা শক্তি, তেমনই স্মরণ শক্তি—দুইই বিস্ময়কারী। মহামান্য বড়লাট, ছোটলাট বাহাদুর সকলেই মাষ্টার মদনের গান শুনিয়া বিস্মিত হইয়া-ছেন। বড় বড় মহারাজা-রাজা তাহার গান শুনিতে ব্যাকুল—কারণ একটি বই

দুইটি মদন নাই, ঋষি মুনির কল্পনাতে একটি বই দুইটি মদনের উদ্ভব সম্ভব পর হয় নাই। মদনমোহনের মুখে মদনমোহনের গুণ কীর্ত্তন শুনিতে সকলের বাসনা। "মাষ্টার মদন" এত সোনার ও রূপার মেডেল পাইয়াছে যে, সব গুলি এক সঙ্গে পরিতে পারে না। বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মতিথি উৎসবে হাই-কোর্টের চিফজাষ্টিস্ সার লরেন্স জেন্‌কিন্‌স্ বলেন যে, "আমার বড় ইচ্ছা যে তোমার সোণার বুকে আমি একটা সোণার মেডেল ঝুলাইয়া দিই, কিন্তু আর মেডেল দিবার যায়গা আছে বলে বোধ হয় না।"

ইউরোপেও মদনের গান শুনিবার জন্য লালায়িত। বড় বড় সাহেবরা তাহাকে লইয়া যাইতে কত চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুখ্যাতি ও গৌরবের কথা এই যে, সে দীন দুঃখীদিগকে সাহায্য করিতে কয়েকবার মদন গান শুনাইয়া বিস্তর টাকা উপায় করিয়া বিতরণ করিয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব প্রতিভা সম্পন্ন শ্রীমান্ মদনের আমরা দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রলেপ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিরত্ন।

যাহা শরীরে মর্দ্দন বা লেপন করা যায়, অথবা যাহা দ্বারা শরীর আবৃত করা যায়, তাহাকে লেপ বা প্রলেপ বলে। মানুষ গর্ত্তশয্যা হইতে আমরণ প্রলেপের অধীন। জঠরে অবস্থান করে, জরায়ু অর্থাৎ গর্ত্তবরক চর্ম্মবেষ্টনী প্রথম প্রলেপ, মাতৃ-দেহ দ্বিতীয় প্রলেপ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অঙ্গরক্ষক, তৈল-মর্দ্দন ও গৃহ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রলেপের মধ্যে মানুষকে অবস্থান করিতে হয়। প্রলেপ ব্যতীত মানুষ বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না। প্রলেপের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বাহিরে জল, বায়ু ও তাপের প্রভাব হইতে শরীরকে রক্ষা করা যে বায়ু, অগ্নি ও জল জীব জন্তুর প্রাণ, সেই বায়ু, অগ্নি ও জলই আবার জীব জন্তুর প্রাণ নাশক। বায়ু, অগ্নি ও জলের প্রভাবেই তাহারা বাঁচে, মরে ও বিকৃত হয়। ভ্রূণ গর্ত্তশয্যায় তরল রক্তপিণ্ডের আকারে অবস্থান করে, তজ্জন্য সেই পিণ্ডের আবরক বেষ্টনীর প্রয়োজন, ইহাকে জরায়ু বলে, জরায়ু মাতৃ দেহে আবৃত থাকে, পরে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে বহির্জগতের বায়ু, তাপ ও শৈত্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গরক্ষক ও তৈল মর্দ্দন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অঙ্গরক্ষকে বা লেপ তোষকে যেমন শৈত্য ও তাপ নিবারণ করে, তদ্রূপ তৈল

কেবল শরীরস্থ বায়ু ও তাপের প্রশমন করে না, বহির্জগতের বায়ু ও তাপের প্রভাবকেও পরাভব করে,—স্মরণ করা উচিত, দেহের বায়ু ও তাপ বহির্জগতের বায়ু ও তাপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বহির্জগৎ হইতেই প্রাণি জগতের সৃষ্টি হয়। তৈল মর্দ্দনের গুণ অসংখ্য। তৈল মর্দ্দনে দেহের বায়ুর শোষণ ও পিত্তের দহনগুণ প্রশমিত হয়, শরীর দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু হয়, সুতরাং বহির্জগতের প্রবল বাতাতপের ঘাত প্রতিঘাত সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। বহির্জগতের বাতাতপ প্রবল এবং মানবদেহের বাতাতপ দুর্ব্বল, দুর্ব্বল বলিয়া প্রবলের ঘাত প্রতিঘাত তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে সহিতে হয়, কিন্তু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার শক্তি না থাকিলে প্রবলের হস্তে তাহার পরাভব বা মৃত্যু ঘটে। দেহস্থ বাতাতপের পরাভবে রোগের সৃষ্টি হয়। দেখা গিয়াছে, যাঁহারা তৈল মর্দ্দন প্রত্যহ করেন, তাঁহারা নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন না। পরন্তু সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতে সমর্থ হন। তৈল মর্দ্দন-শ্রেষ্ঠ প্রলেপ, আধুনিক সাবান প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রলেপ।

যে বস্তুর যতটুকু পরমায়ু, সেই পরমায়ু অতীত হইলেই তাহার মৃত্যু লক্ষণ উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তাহার দেহ পচে, গলে, এই পচন, গলন ও দহন প্রভৃতি কার্য্যের মূলে বায়ু, অগ্নি ও জল বিদ্যমান।

ফলের আয়ু পরিপক্কতা পর্য্যন্ত, ফল পরিপক্ক হইলেই বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়। জীব জন্তুর আয়ু মৃত্যু পর্য্যন্ত, মৃত্যু হইলেই দেহ বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বিকৃতি হইতে মানুষ বিজ্ঞান বলে মৃতদেহ, মৎস্য ফল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি বহুকাল যাবৎ রক্ষা করিতে পারে। মৎস্য বরফ চাপা দিয়া রাখিলে বা তৈল সিক্ত করিলে পচে না। ফল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য তৈল বা চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিলে টাট্‌কা থাকে। মৃত দেহ তৈল কুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে অবিকৃত থাকে। স্নেহ পদার্থের গুণ অসীম। রামায়ণে দেখিতে পাই দশরথ রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার মৃত দেহ ভরতের আগমন পর্য্যন্ত তৈলকুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, প্রাচীনেরা এ সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আমরা আয়ুর্ব্বেদ মতে যে সকল প্রলেপ ব্যবস্থা করি, তাহা স্থানিক। কোন স্থান সীমাবদ্ধভাবে ফুলিয়া উঠিলে, দোষ-বিশেষে বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্ম নাশক প্রলেপের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার উদ্দেশ্য দেহস্থ বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা করা। প্রলেপ দ্বারা যেমন ত্বকের ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হয়, তদ্রূপ বহির্জগতের বাতাতপের ঘাত প্রতিঘাত ও নিবারিত হইয়া থাকে।



পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক নরনারীর সুপরিচিত, প্রতিভার পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ অসংখ্য পদকাদি শোভিত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত দ্বাদশ বর্ষের বালক—

মাষ্টার মদন।

অষ্টাবক্র সংহিতা।

সূচনা।

অষ্টাবক্র সংহিতা সংস্কৃত শাস্ত্র-ভাণ্ডারের এক অতি অমূল্য রত্ন। আর্য্য মহাপুরুষেরা বহু পরিশ্রমে সংসারের যে নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যে তত্ত্ব সভ্যতম দেশসকলে এখনও তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই চরম জ্ঞানযোগের কথা ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। মহর্ষি অষ্টাবক্র উপদেষ্টা গুরু এবং রাজর্ষি জনক ইহার শ্রোতা। জনক রাজা সংসারে থাকিয়াও সিদ্ধ এবং জীবন্মুক্ত। কথিত আছে, ইনি শুকদেবকেও নির্লিপ্ততায় পরাজিত করিয়াছিলেন। এতাদৃশ রাজর্ষি, সংক্ষেপে মুক্তিপথ জিজ্ঞাসু হইয়া, মহামুনি অষ্টাবক্রের নিকট যোগের সার রাজ যোগের উপদেশ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। এই সংহিতা সেই জ্ঞানোপদেশ মাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটি কথা আছে। কথাটি কিছু গুরুতর। যোগ কাহাকে বলে এবং যোগের উদ্দেশ্য কি এসকল প্রশ্ন এখানে উত্থাপনের আবশ্যকতা নাই। যিনি জ্ঞানযোগের সার সংহিতা পাঠ করিবেন, তাঁহার নিকট সে কথা অনাবশ্যক। জ্ঞানযোগ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাও সর্ব্বসম্মত। কিন্তু এই জ্ঞানযোগের অধিকারী কে? আপামর সাধারণ সকলেই কি এই জ্ঞানযোগের অধিকারী? সকলেই কি অন্য কোনও প্রকার ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান না করিয়াও, কেবল বিশ্ব আত্মময়, সংসার আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে, ইত্যাদি কল্পনার অভ্যাস করত জ্ঞানী হইতে পারে? অথবা যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার ও ধ্যান-ধারণাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করত চিত্ত স্থির হইলে জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়? ইহা বিষম সমস্যা। এবিষয়ে যুক্তি একাকী কোন কার্য্যেরই নহে। কারণ যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অনায়ত্ত, যাহার সদুপদেষ্টাও দুর্লভ, সাধারণের সামান্য যুক্তি সে

পাওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য। প্রথমেই এই অষ্টাবক্র সংহিতায় কতদূর বুঝিতে পারা যায় দেখা যাউক।

অষ্টাবক্র সংহিতা দেখিলেই বোধ হয় যে, কোনও রূপ ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই, মনে মনে অপরোক্ষ ভাবে অহং ব্রহ্ম জ্ঞান হইলেই হইল।

পতঞ্জলি বলেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" : "অভ্যাস—বৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ প্রমাণ বিপর্য্যয়াদি চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধই যোগ; এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহার নিরোধ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ." —"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" অর্থাৎ চিত্ত স্থির করিবার জন্য যে যত্ন তাহাকেই অভ্যাস বলে, এবং যাহা কিছু দেখা যায়, বা শুনা যায়—প্রকৃত প্রস্তাবে, যাহা কিছু ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়, তাহা হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখিয়া আত্মবশ করার নামই বৈরাগ্য। গীতায়ও বলেন, "চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া আত্মবশ করিবে।" ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে চিত্তকে ভোগবাসনা হইতে নিবৃত্ত করার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই জ্ঞানযোগ সাধন। ইহা অবশ্য একদিনে সম্পন্ন হয় না। কোনও সিদ্ধিই সাধনা ব্যতীত হয় না। তবে যে যেমন সিদ্ধি, তাহার জন্য তেমনই সাধনার প্রয়োজন। দুই দিন কি চারি দিন চেষ্টা করিয়াই যদি অকৃত কার্য্য হইয়া বলা যায়, যে "এ কার্য্য আমার দ্বারা সিদ্ধ হইবে না;" তাহা হইলে প্রায় কোনও বিষয়েই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যেমন বিদ্যালাভের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে করিতে তবে কালে পণ্ডিত হইতে পারা যায়, তদ্রূপ যোগসাধনও বহুকালের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় সফল হইতে পারে। বিদ্যালাভ করিতে হইলে যেমন প্রথমেই বৃহৎ সাহিত্য বা বিজ্ঞান গ্রন্থ দেখিয়া অসাধ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে কিছুই হয় না, যোগ সাধনও তদ্রূপ একেবারে অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে না। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, "মন যে চঞ্চল, এবং তাহার নিগ্রহ করা কঠিন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহা নিগৃহীত হইতে পারে।" যাহা আজ বড়ই কঠিন, একমাস চেষ্টার পর তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ, ক্রমে আরও সহজ হইয়া অবশেষে বিশেষরূপে সাধ্য হইয়া উঠিবে। চিত্ত আজন্ম সহস্র বার সহস্র দিকে ধাবিত হইতেছে এবং তাহা সংস্কারগত হইয়াছে; কিন্তু মনে মনে বিচার করতঃ বিষয় মাত্রের অসারতা উপলব্ধি করিয়া চিত্তকে সে সকল হইতে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়া দেখ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই

চিত্ত অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিবে এবং প্রথমে চিত্তকে বিষয় বিরত করিতে যত কষ্ট হইয়াছিল, তত কষ্ট আর হয় না, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে। ইহাই জ্ঞান যোগের সাধন।

এক্ষণে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের কথা হইতেছে। এই সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য কথনই নহে। যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে "যেমন মত্ত হস্তী জীর্ণ গৃহ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি বিরহিত জীর্ণ দেহে হঠযোগ সাধন করিতে গেলে তাহা নিষ্ফল হয়, অপিচ, তাহা দেহনাশেরই কারণ হইয়া থাকে।" তাহা হইলেত প্রায় কাহারই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন হয় না। সংসারে বালব্রহ্মচারী কয় জন আছে? ভগবদ্গীতায় বলিতেছেন, "বালকেরাই সাংখ্য (জ্ঞানযোগ) ও যোগকে (ক্রিয়াযোগ) পৃথক্ বলেন, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। কারণ, একটি সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে, উভয়েরই ফল (সিদ্ধি) লাভ হয়। সাংখ্যযোগে যে স্থান লাভ করা যায়, অষ্টাঙ্গযোগ সাধনেও সেই স্থান প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।" অতএব জ্ঞানযোগ, যোগ সাধনের প্রক্রিয়ান্তর মাত্র; ইহার সাধনে হঠযোগের সহায়তার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। আর এক কথা, ইহার সাধনকালে দেহ নষ্ট হইলে যতদূর উন্নতি হইয়াছে, জন্মান্তরে ততদূর অগ্রসর হইয়া থাকা যায়। সুকৃত মাত্রেই নষ্ট হয় না। একথাও গীতায় দেখিতে পাই।

অতঃপর ভক্তি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়াই গ্রন্থারম্ভ করা যাইবে। ভক্তি জ্ঞানযোগের প্রধান সহায়। ভক্ত যত শীঘ্র সংসারের অসারতা উপলব্ধি করতঃ চিত্ত স্থির করিতে পারিবে, অপর কাহারও তত সহজে হইবে না। ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া, তাহার বুদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি পরিচালিত করিবেন। এ বিষয় গীতাতে স্পষ্ট লেখা আছে। ভক্তের বিনাশ নাই, একথা ভগবদুক্তি।

মন মাঝি হাল ঠিক রাখিয়া ভক্তি স্রোতে তরী ছাড়িয়া দিলে যথাকালে উহা আপনিই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়, তাহার উপর জ্ঞানের পাল তুলিয়া দিতে পারিলে অতি শীঘ্র এবং অনায়াসে পৌছান যায়। হঠযোগী দাঁড় টানিতে টানিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া কত কালে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে?

জনক উবাচ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।

বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেৎ স্বংব্রূহি মে প্রভো ॥১॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।

ক্ষমার্জবদয়াতোষংসত্যং পীযুষবদ্ভজ ॥ ২ ॥

রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্রকে প্রশ্ন করিতেছেন ;—

হে প্রভো ! কিরূপে জ্ঞান লাভ করা যায়, মুক্তিই বা কিরূপে হয়, এবং বৈরাগ্যই বা কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১।

তদুত্তরে অষ্টাবক্র নিম্নলিখিত ষোড়শ শ্লোকে উপদেশ দিতেছেন।—

হেবৎস ! যদি তুমি মুক্তি কামনা কর, তবে বিষয় সমূহকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ কর, এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া সন্তোষ ও সত্যকে অমৃত তুল্য ভজনা কর।—এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে বিষয় কি ? (বি+সিনোতি ইতি বিষয়ঃ) যাহা বিশিষ্টরূপে বদ্ধ করে, অর্থাৎ যাহা সংসার বন্ধন কারণ। বিষয়ভোগের বাসনাই সংসার বন্ধন কারণ। যাহা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য, যাহার সহিত কেবল ইন্দ্রিয় মাত্রের সম্বন্ধ, তাহাই বিষয়। সুদৃশ্য বস্তু চক্ষুর বিষয়, সুশ্রাব্য স্বর কর্ণের বিষয়, ইত্যাদি। তাহা হইলে, দেহধারী জীব কেমন করিয়া বিষয় ত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারে ? ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের নিত্য সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় থাকিতে সে সম্বন্ধ যাইবার নয়। চক্ষু চাহিয়া থাকিলে সুদৃশ্য বা কুদৃশ্য সকলকেই দেখিতে হইবে। সুতরাং চক্ষু থাকিতে দর্শনেন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় অপরিহার্য্য। অতএব এস্থলে বিষয় ত্যাগ অর্থে—বিষয়-ভোগ-বাসনা ত্যাগ বুঝিতে হইবে। অষ্টাবক্র সংহিতায় এরূপ অন্তর্ভূত অন্যার্থ বোধক শব্দ-প্রয়োগ পরে আরও দেখা যাইবে। বিষয় উপ-ভোগের যে বাসনা, তাহাই বন্ধনের—হেতু, নচেৎ সহস্র সহস্র বিষয় চারিদিকে রহিয়াছে, তাহা যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে আসুক বা না আসুক, তাহাতে যদি হেয়োপাদেয়তা না থাকে, উদাসীন ভাবে থাকিয়া তাহা ইন্দ্রিয় মাত্রের দ্বারা ভোগ করা যায়, তাহা হইলে বিষয় ভোগ হয় না। চঞ্চল মন, যে যে বিষয় ভোগের জন্য ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিবে। ইহাই বৈরাগ্য। উপাদেয় বিষয় ভোগে তৃপ্তি বা হেয় বিষয় ভোগে বিরক্তিরূপ দ্বন্দ্বভাব পরিত্যাগ করতঃ উদাসীন ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ

ন পৃথ্বীন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ২॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥

আপনা হইতেই আসিবে। কেহ কোনও রূপ অন্যায় করিলে, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি কেন তাহাতে লিপ্ত হইব? সত্য ও সরলতা ভিন্ন মিথ্যা ও কপটতায় আমার প্রয়োজন কি?" সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতং "। আমরা এখন সত্য হারাইয়াছি, সুতরাং ধর্ম্মও হারাইয়াছি। পাতঞ্জল বলেন, "সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলা শ্রয়ত্বং" অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিবে তাহার ফল লাভ হইবে। ইহা যোগ বিভূতি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য; কিন্তু এজন্য সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা নয়; সত্য ধর্ম্মের জন্য। ধর্ম্ম অর্থাৎ অবলম্বনীয়। ইহা মনুষ্যের অবশ্য অবলম্বনীয়। সুতরাং এসকলকে অমৃতবৎ মনে করিতে হইবে। ১।

তুমি পৃথিবী নও, জল নও, অগ্নি নও, বায়ু নও, অথবা আকাশ নহ। মুক্তি লাভের জন্য আত্মাকে এই সকলের সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ জানিবে।— অর্থাৎ এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে আত্মাভিমান অকর্ত্তব্য। আত্মা দ্রষ্টাস্বরূপ চৈতন্য এবং এ দেহ ভোগায়তন মাত্র। জীব যেরূপ বাসনা করে, তাহা ভোগের জন্য অনুরূপ দেহকে অবশ হইয়াই আশ্রয় করিতে হয়। যদি দেহের অনুরূপ ভোগের প্রয়োজন না থাকিত,তবে দেহও থাকিত না, অথবা অন্যরূপ ভোগ করিবার আবশ্যকতা থাকিলে, দেহও তদনুরূপ হইত। সুতরাং দেহে আত্মাভিমান কিরূপে হইতে পারে? এই আত্মাভিমানই ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে জীবকে পৃথক্ করিয়াছে। যখন মূলা প্রকৃতি শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইল, তখন তিনি আত্মাভিমানের দোষ দেখিয়াই বলিয়াছিলেন "ছি ছি মানের লাগি শ্যাম বঁধুরে হারায়েছিলাম।" ২।

অতএব—যদি দেহকে পৃথক্ করতঃ চিৎমাত্রে অবস্থিত হইতে পার, তবে এখনই সুখী, শান্ত, ও বন্ধন মুক্ত হইবে।—এস্থলেও আবার সেইরূপ অর্থান্তর প্রযুক্ত হইয়াছে। দেহকে কি ত্যাগ করা যায়। জীবন থাকিতে দেহ অপরিহার্য্য। দেহে আত্মজ্ঞান ত্যাগ করাই দেহকে পৃথক্ করা, এবং তাহা হইলেই ক্লেশ নিবৃত্তি, শান্তি, এবং মুক্তি হয়। পাতঞ্জল বলেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ। তন্মধ্যে অবিদ্যাই অপর কয়েকটির আশ্রয়

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষিগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥ ৪॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা॥ ৫॥
একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্॥ ৬॥
অহং কর্ত্তেত্যহংমান-মহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥ ৭॥

স্বরূপ। অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর এবং অনাত্ম বিষয়ে নিত্য, শুচি, সুখকর, ও আত্মখ্যাতির নাম অবিদ্যা। যাহার দেহে আত্মাভিমান নাই, সুতরাং যে ভোগে নিস্পৃহ, তাহার নিকট এ বিপরীত জ্ঞান কেন থাকিবে? সুতরাং সে শান্তি স্বতঃই লাভ করে ও মুক্ত হয়। ৩।

তুমি বিপ্রাদি বর্ণ নও, আশ্রমী নও, চক্ষুগোচরও নও; তুমি নিঃসঙ্গ, নিরাকার, বিশ্বসাক্ষী, অতএব সুখী হও।—বিপ্রাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের, এবং গার্হস্থ্যাদি আশ্রমান্তর্গত নহ, অর্থাৎ উপাধিবিহীন। ইহা জানিলেই ক্লেশ থাকে না। পাতঞ্জল মতে ক্লেশ ও কর্ম্মবিপাক-বর্জ্জিত পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। তুমি চিন্মাত্র, অর্থাৎ ঈশ্বর স্বরূপ। উপাধি জ্ঞান না থাকিলেই আত্মোপলব্ধি হয়, সুতরাং ক্লেশ থাকে না। ৪।

হে বিভু! ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, এ সকল মনের, তোমার নহে; তুমি কিছু কর না, কিছু ভোগ কর না, সর্ব্বদা মুক্ত। বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন সর্ব্ব কার্য্যের কর্ত্তা, এবং ভোক্তা; আত্মা নির্লিপ্ত। ৫।

তুমি এক, সকল বিষয়ের সাক্ষী, সর্ব্বদা মুক্ত; তুমি যে দ্রষ্টাকে অন্যরূপ দেখিতেছ, ইহাই তোমার বন্ধন।—আত্মা পূর্ণ, অখণ্ড এবং সাক্ষী। মায়া কর্তৃক উপহিত হইয়া সোপাধিক দেহে আত্মজ্ঞানই বন্ধন। ৬।

'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কাররূপ কৃষ্ণসর্প কর্তৃক দংশিত হইয়াছ, 'আমি কর্ত্তা নহি' এই বিশ্বাসরূপ অমৃতপান করিয়া সুখী হও।—এই বিশ্বাস দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয়ই পরমানন্দ দায়ক। ৭।

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জু সর্পবৎ।
আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখীভব ॥ ৯ ॥
মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥১০॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥১১॥
কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥১২॥

আমি এক, বিশুদ্ধ, ও জ্ঞান স্বরূপ, এই নিশ্চয় রূপ অগ্নিদ্বারা অজ্ঞানরূপ কাননকে দগ্ধ করতঃ শোক শূন্য ও সুখী হও। ৮।

যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ যাহাকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া মনে হইতেছে, তুমি সেই আনন্দ স্বরূপ, পরমানন্দময়, এবং জ্ঞানময়, অতএব সুখী হও। ৯।

মুক্তাভিমানী মুক্ত, এবং বদ্ধাভিমানীই বদ্ধ। "যাহার যেরূপ মতি তাহার সেইরূপ গতি হয়," এই যে কিংবদন্তী আছে, তাহা সত্য।—উপরোক্ত কিংবদন্তীটি সাধারণতঃ এই ভাবে প্রযুক্ত হয় যে, যে, যে প্রকৃতির লোক, তাহার সেইরূপ গতি হয়, অর্থাৎ ভাল লোকের ভাল হয়, মন্দ লোকের মন্দ হয়; কিন্তু অষ্টাবক্র এখানে উহা অন্য ভাবে প্রয়োগ করিলেও প্রয়োগটি অতি সুন্দর হইয়াছে। মনে মনে যে আপনাকে যেরূপ ভাবে, সে তাহাই হয়। একথা আপাততঃ সর্ব্বত্র প্রযুয্য না হইলেও, বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটা যে ঠিক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাসনাই সংসার, আমি যে এই দেহ পাইয়াছি, যে দেহে আত্মাভিমান করিতেছি, তাহাত আমারই বাসনাসম্ভাত। ভোগবাসনা না থাকিলে, ভোগায়তন দেহ হইত না। দেহে আত্মজ্ঞান না থাকিলেই ভোগবাসনা বর্জ্জিত হইয়া মুক্তি লাভ হইবে। ১০।

আত্মা, দ্রষ্টা স্বরূপ, সর্ব্বভূত ব্যাপী, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, মুক্ত, ক্রিয়ারহিত নিঃসঙ্গ, স্পৃহাশূন্য, ও শান্ত; কেবল ভ্রমবশতঃই সংসারীবৎ প্রতীয়মান হন।—ভ্রান্তিবশতঃই লোকে আত্মার স্বরূপ জানিতে পারে না। ১১।

আত্মাকে কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ জানিবে। ভ্রম দূর হইলে জানিতে পারিবে, যে এই সমস্ত বাহ্যভাব আন্তরিক ভাবের আভাস মাত্র।—কূট অর্থাৎ স্বর্ণকারের

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহংজ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৩॥
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥১৪॥
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥১৫॥
নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥১৬॥
ইত্যুপদেশষোড়শকম্।

নাই, তাহার উপরেই স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহারই উপর গঠিত হইয়া আকারান্তর গ্রহণ করে, অথচ কুট সমভাবেই অবস্থিত থাকে। আত্মাও তদ্রূপ এক অপরিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থিত চিৎস্বরূপ। মনোগত ভাব অর্থাৎ বাসনাদিই এই সংসারের প্রবর্ত্তক; বিশ্বসংসার চিৎঘনাবস্থা মাত্র। ১২।

হে বৎস! তুমি দেহাভিমানরূপ রজ্জু দ্বারা চির বদ্ধ রহিয়াছ; "আমি জ্ঞানময়," এই জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা উক্ত বন্ধন ছেদন করতঃ সুখী হও।—তোমারই বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানতাই তোমাকে বদ্ধ রাখিয়াছে, তাহাকে দূর কর, মুক্ত হইবে। ১৩।

তুমি নিঃসঙ্গ, ক্রিয়া বিহীন, স্বপ্রকাশ ও নিরঞ্জন; তুমি যে সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ, ইহাই তোমার বন্ধন।—তুমিত শুদ্ধমুক্ত, তবে সমাধির অনুষ্ঠান কেন? যেহেতু তুমি মনে মনে আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছ, তজ্জন্যই সেই বন্ধন ছেদন জন্য সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ মাত্র। যেমন স্বপ্নে লোকে আপনাকে দস্যুকরকবলিত মনে করিয়া মুক্ত হইবার জন্য কত চেষ্টা করে, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেই সমস্ত ক্লেশ ও মুক্তির চেষ্টা দূর হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইলেই সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়। ১৪।

এই বিশ্ব তোমা দ্বারাই ব্যাপ্ত, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাতেই প্রোত। তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ, ক্ষুদ্রাশয় অবলম্বন করিও না।—আত্মা এক সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ব্রহ্মের সহিত নিয়ত লীন, তাহাতে ব্যষ্টিভাব কল্পনা করাতেই আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করা হয়। ১৫।

তুমি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, নির্ভয়, শান্তচিত্ত, অগাধ বুদ্ধি, অক্ষুব্ধ ও চিন্মাত্র, এইরূপ ভাবনা যুক্ত হও।—এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সংস্কারবশে তদ্রূপই হইবে, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিবে। ১৬।

ভাঙ্গা-কেনেস্তারা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়।

সে একটা ভাঙ্গা কেনেস্তারার টিন্ রেলিংএর আলসার উপর থাকিত। তাহাতে একটা সন্ধ্যামালতীর গাছ ছিল। একদিন হাওয়ায় কেনেস্তারাটী নিচের উঠানে পড়িয়া গেল। তাহার ভিতরের সমস্ত মাটী বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সে অবস্থায় কতদিন ছিল জানিনা। আমার সহিত তাহার যেদিন সাক্ষাৎ হইল—দেখিলাম, সে শূন্যগর্ভ টোল খাওয়া অবস্থায় উঠানের এক কোণে পড়িয়া আছে।

এখন আমার একটু পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন। আমার জন্মটা গণ্ডযোগে—আমি জন্মিয়াই সপ্তাহের মধ্যে মাতাকে শেষ করিলাম,—পিতাও সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সকলের অযত্ন, সকলের অশ্রদ্ধার মধ্যে আমার স্নেহশীলা সদ্য পুত্রশোকাতুরা বিধবা পিসীমা সযত্নে বক্ষে আমাকে টানিয়া লইলেন। সেই হইতে তাঁহাকেই মা বলিয়া জানি। পিতার সহিতও আমার বড় একটা সম্বন্ধ রহিল না। আমি আমার পিসীমার সহিত তাঁহার স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমার ঠিক মনে নাই, আমি আসিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলেন।

পিসীই একমাত্র সংসারের কর্ত্রী। তাঁহার কিছু বিষয়ও আছে। এই সম্পত্তির মালিক তাহার স্বামীর ভাগিনেয় দ্বয়। তাহাদিগের সঙ্গে পিসীর আদৌ সদ্ভাব ছিল না। তাহার কারণ আমি যাহা বুঝিয়াছি—আমার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহই তাহাদের একমাত্র বিরক্তির কারণ।

তাহাতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। তাহাদের সহস্রোমুখী হিংসা, কুটিল কৌশল পিসীমার স্নেহের অভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া আসিতে পারিত না। বেশ সুখেই আমার বাল্য জীবন যাইতেছিল।

ক্রমশঃ বড় হইলাম। অত্যন্ত স্নেহে যাহা হয়, আমারও তাহাই ঘটিল। আমি দারুণ অভিমানী ও মহা মূর্খ হইয়া উঠিলাম। নির্গুণের তিন গুণ—ক্রোধ-তেমনি রূঢ়ভাষী। স্পষ্ট কথার শক্ত ঘায়ে কেহই আমার নিকটে ঘেঁসিত না। তবে স্বার্থ অন্বেষনির কথা অন্যরূপ। তাহারা ঘা খাইয়াও কাজ বাগাইতে ছাড়িত না। আমি তাহাদের জন্য মাথা কুটীয়া মরিলাম—কিন্তু কেহই আপনার হইল না।

পূর্ব্বে অল্প টাকায় হাত খরচ চলিত। ক্রমশঃই পিসীমার অগাধ স্নেহে হাত দরাজ হইয়া পড়িতে লাগিল। কিসে খরচ হয়, নিজেই হিসাব করিয়া পাই না। কিন্তু টাকার অভাব সর্ব্বদাই। কাজেই পিসীমাকেও উত্তরোত্তর অধিক জ্বালাতন করিতে লাগিলাম। পিসীমাও খুব মুক্ত হস্ত। সঞ্চয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তাঁহার অনেকগুলি প্রতিপাল্য। ক্রমশঃ প্রতিপাল্যের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আয় বাড়িল না। বরং উদার হৃদয় সরলা রমণীকে তাহার কর্ম্মচারীরা ঠকাইয়া ঠকাইয়া অতিরিক্ত উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কাহারও কাহারও চোঁয়া ঢেকুর উঠিল—উদ্গার হইল। তথাপি অবিশ্রান্ত ভোজনে বিরাম নাই। পিসীমা সব জানিতেন—সব শুনিতেন, কিন্তু তাঁহার শাসনের শক্তি ছিল না—বা তিনি তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার সম্পত্তি একরূপ সাধারণের লুটের ধন হইয়া উঠিল। দেখিবার শুনিবার কেহই নাই—যাহার যাহা খুসী করিতে লাগিল। কেহ কাহারও কথা শোনে না। কেহ কাহারও অধীন নয়। একজন আগন্তুক আসিলে—সম্মান হয় না—আহার হইল কি না, জিজ্ঞাসা করে না। যে যাহার নিজের ধান্ধায় ঘুরিতে লাগিল।

এই দারুণ উচ্ছৃঙ্খল ও অনটনের মধ্যে আমিও অদম্য তেজে সময় অসময়ে অর্থের তাগিদ করিতে লাগিলাম। শান্তস্বভাবা স্বল্পভাষিণী রমণী ক্রমশঃই অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার জুলুমের কিন্তু বিরাম নাই। টাকা টাকা, কেবল টাকা। টাকা ভিন্ন পিসীর সহিত আমার আর অন্য কোন কথাই হয় না। বাহিক তাহা নিতান্ত স্বার্থ পরের মতই দেখা যাইত। কিন্তু আমি অন্তরে অন্তরে পিসীকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিতাম,—যতখানি ভাল বাসিতাম, বুঝি এত শ্রদ্ধা এত ভালবাসা আজ এই প্রৌঢ় প্রান্তে দাঁড়াইয়াও কাহারও প্রতি অর্পণ করিতে পারি নাই।

আমি পিসীর পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়া তুলিতে পারিতাম—পিসীর একটু অসুখ হইলে জগৎ অন্ধকার দেখিতাম। একদিন পিসী মুখ ভারি করিয়া কথা বলিলে সমস্ত বুকটায় সাগর তরঙ্গ উঠিত। কিন্তু যাহা হউক, আমার এ মনের ভাব বাহিরের কোনও ব্যবহারে প্রকাশ হইত কি না, আমি তাহা জানিতাম না। সামান্য বিষয়েই পিসীকে কঠোর কথা শুনাইতাম। তাঁহার চক্ষে জল পড়িত। আমি বিজয়ী বীরের মত ক্ষণিক উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মানসিক কি যন্ত্রণা ভোগ করিতাম, তাহা বুঝাইবার ভাষা ও শক্তি আমার নাই। তাঁহার একটু ব্যথা একটু দুঃখে আমি যতটা কাতর হইতাম, জগতের আর কিছু-

তেই আত্মাকে তেমন কাতর করিতে পারিত না। তথাপি আমি রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতাম। কেন করিতাম জানি না। সেটা আমার নিতান্ত অভ্যাস-গত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি কিছুতেই ভাষাকে সংযত ও মধুর করিতে পারিতাম না। সঙ্গে অভিমানও তেমনি প্রবল ছিল। আমি একটু অশ্রদ্ধা একটু অবহেলা সহ্য করিতে পারিতাম না।

পয়সা আমি দুই হাতে উড়াইতাম, গেরোবাজ পায়রা, ঘুড়ী, লাটাই, ভেড়ার লড়াই, হাজার হাজার টাকা বাজি বিনা কষ্টের পয়সা বিনা কষ্টে দুই হস্তে বিলাইতে লাগিলাম। ভবিষ্যতের সঞ্চয় এক পয়সাও হইল না। পিসী চোক বুজিলে কি হইবে, একবারও ভাবিবার সময় হইল না।

এই দারুণ অপব্যয়ে একটা লাভ হইয়াছিল। আমার পিসীর ভাগিনেয় যাঁরা আমার প্রতি যতটা উগ্র হইতে পারিতেন, আমার ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া সে আনন্দে তাহারা কতকটা আমার প্রতি কৃপাবান ছিলেন।

লেখা পড়ার চেষ্টা পিসী করিয়াছিলেন। ত্রিশ টাকা বেতনের একজন মাষ্টারও ছিল। Hare School এর বেঞ্চে শোভা বর্দ্ধনও অনেক দিন করিয়া ছিলাম। বাহ্যিক আকারে প্রকারে বেশ তৈয়ারী হইলাম। কিন্তু ফোর্থ ক্লাসের উপর আর ডিঙ্গাইতে পারিলাম না। তখন আমার বিবাহ হইল।

বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে সন্তানেরদল দেখা দিতে লাগিল, কিন্তু মতির বিন্দু-মাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। যেমন দুই হাতে টাকা উড়াইতে ছিলাম, তেমনি উড়াইতে লাগিলাম।

নিত্য নূতন খেয়াল। খেয়ালেরও কোন স্থিরতা ছিল না। মধ্যে মধ্যে পিসী ভবিষ্যতের কথা তুলিতেন—আমি তাহাতে রাগ করিতাম, আমি তাঁহার পয়সা খরচ করি, আমি তাঁহার প্রতিপাল্য তাহাই তিনি যেন আমায় কৌশলে বার বার শোনান্। তাঁহার সকল হিত বাক্যই আমার নিকট বড় কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পিসীর একসঙ্গে দুই দশ হাজার টাকা ঢালিয়া দিবার সামর্থ্য ছিল না। তাঁহার খরচও যথেষ্ট। তথাপি তিনি আমাকে যাহা দিতেন, তাহা আমি সঞ্চয় করিলে একটা বড় ধনী হইতে পারিতাম। কিন্তু সে বাঞ্ছা আমার এক-দিনও হইল না ঠিক একথা যে একবারও মনে হইত না, তাহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। কখনও কখনও ইদানী এক একবার ভবিষ্যৎ ভাবিতাম অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতাম, কিন্তু সে ক্ষণিক—আমার উচ্ছৃঙ্খল বায়ের

শতছিদ্র শতমুখী হইয়া ছড়াইয়া পড়িত। আমি তাহার কোন্ মুখই অবরোধের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে পারিতাম না।

শেষে একরূপ মরিয়া হইয়া পড়িলাম। সকলেরই তাহাই হয় যখন মানুষ আর কোন পথ পায়না তখন মানুষ দারুণ অদৃষ্ট বাদী হইয়া পড়ে।

আমিও তাহাই হইলাম। যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে। ভাবিয়া কি হইবে? মধ্যে একবার রাগ করিয়া অদৃষ্ট ফিরাইবার জন্য—যাহা আজকাল বঙ্গের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে—ব্যবসা—যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের মত সকলেরই অধিকার—আমিও সেই অধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ব্যবসায় যে শিক্ষার কিছু আছে, তাহা আমার ধারণাতেই আসিল না। জিনিস আনিব বেঁচিব। লাভ হইবে মোট কথা। ইহার আর শিক্ষা কি? কেহ লোকসান করিয়া বেচে না। আমিও বেচিব না। ব্যবসা করিবার জন্য পিসীর নিকট দশ হাজার টাকার দাবি করিয়া বসিলাম। টাকা কোথা হইতে দেবে আমি জানি না। কিন্তু তবু টাকা চাই।

রূঢ় কটু কথা বলিতে ছাড়িলাম না। পিসীর শেষ সম্বল কয়েক খানি গহনা বেচিয়া আমাকে আট হাজার টাকা দিলেন। আট হাজার টাকা আট মাসও গেল না,—বরং মহাজনের দুই আড়াই হাজার টাকা মাথায় করিয়া ব্যবসা ছাড়িয়া আসিলাম। অবশ্য এ টাকাও পিসীকেই পরিশোধ করিতে হইল।

তাহার পর যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। যাহা পাই, তাহাই খরচ করি। ব্যাঙ্কের খাতায় ৮৮৷৩ পাইয়ের বেশী একক্রান্তিও আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে সঞ্চয় করিতে পারিলাম না।

পিসী কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য উদ্যোগী হইতে বলেন, আমি তাহাতে রাগ করি—কঠোর কথা বলি, কিন্তু কাজের বেলা এক পাও নড়ি না।

উপর্য্যুপরি তিনটী মেয়ে। বড়টীর বিবাহ না দিলেই নয়। তাহার পরটীকেও একরূপ দিদির সঙ্গে দিলেও চলে। আমার কিন্তু এখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, আমি যে এখন ঘোর অদৃষ্টবাদী।

নিজের মেয়ের বিবাহের চেষ্টা নিজে করি না। কি যে কাজ, তাহাও জানিনা। খাই—দাই—ঘুরিয়া বেড়াই। থিয়েটার, বায়স্কোপ, বন্ধুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করি; আবার তাঁহাদের পাল্টা ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আজকাল ধর্ম্ম যেমন একটা তোলা পোষাক হইয়াছে, সকলেরই চাই।

লইলে ভদ্র সমাজে মেশা চলে না। আমিও পরমহংসদেবের, বিবেকানন্দের উৎসবে, তিথি পূজায় সঙ্কীর্ত্তনে লুচি পরিবেশনের ঝুড়ি বগলে করি। ভক্ত বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে শত প্রকার চেষ্টা, কিন্তু মনে প্রাণে ভক্তি শ্রদ্ধার বিন্দু আছে কি না জানিনা।

লোকের কাছে বাহবা লইবার জন্ত আমার সব। তোমরা রাগ করিও না। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, আজকাল অনেকেই আমার দাদা ভাই।

পিসী বকেন—পরিবার বকেন। কন্তার বিবাহের জন্ত, পিসীর নিদ্রা হয় না। আমার তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই। একটা তমাচ্ছন্ন বিভোর জীবন লইয়া আমি সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছি। কুল নাই—কিনারা নাই—ভবিষ্যতের চিন্তাও নাই।

বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। ভাঙ্গা কেনেস্তারার টিন-টার কথা বলা হইল না।

উঠানে পিসীর কতকগুলি পুরাতন কেনেস্তারার টিনে তুলসী গাছ ছিল। রোজ পিসী তাহাতে জল দিতেন। গাছ গুলি নধর,—সুন্দর—গাঢ় সবুজ। পিসিমার আমার বয়স হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিত্য কর্ত্তব্য ভুলিতেন না।

একদিন দেখি সেই ভাঙ্গা কেনেস্তারার টিনটাকে কুড়াইয়া আনিয়া তুলসী গাছ গুলির কাছে রাখিয়া দিয়াছেন। আমি লাথি মারিয়া টিনটা দুরে ফেলিয়া দিলাম। কেন দিলাম, আমি তাহা ভাল জানি না। পরদিন দেখি আবার টিনটা পূর্ব্বস্থানে রহিয়াছে—আবার সেটা লাথি দিয়া পাইখানার ভাঙ্গা প্রাচী-রের বগলে ছুঁড়িয়া দিলাম। সেখানে উনানের ছাই ফেলা হইত।

অনেকদিন টিনটা আর চোখেও পড়ে নাই। বোধ হয় সেদিকে আমার খেয়ালও ছিলনা। আমি যেমন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম, তেমনই জীবন কাটিতে-ছিল। মধ্যে মধ্যে পিসীমা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে ও কন্তার বিবাহের তাগাদা নিয়ম মতই করিতেছিলেন। আমি তাহাতে কর্ণ পাতই করিতাম না।

আবার সেদিন টিনটার উপর নজর পড়িল। দেখি টিনটা ঠিক তুলসী গাছের পাশেই রহিয়াছে। আবার কেমন খেয়াল হইল, আবার টিনটাকে লাথি মারিয়া দুরে ফেলিয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বারান্দা দিয়া নীচে নামিবার সময় দেখি,—পিসী উঠানে দাঁড়াইয়া বড় বকাবকি করিতেছেন। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। শুনি-

ফুটো কেনেস্তারার টিনটা। পিসীর তার উপর এত যত্ন কেন? আমি বারাণ্ডা হইতে ঝুঁকিয়া বলিলাম, "বকৃছ, কেন—ভাঙ্গা টিনটা আমি ফেলে দিয়াছি।" পিসী বলিলেন, "তাই বল—তুই নইলে আর ওটাকে ফেল্‌বে কে?" আমি বলিলাম, "ভাঙ্গা টিনটা দিয়ে কি হবে তোমার?" পিসী বলিলেন, "যাকে রাখ সেই রাখে। টিনটা ফেলে দিবারই বা কি দরকার বাপু, থাকলে আর একটা তুলসী গাছ পোতা যাবে।" আমি বল্‌লাম, "তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ভাঙ্গা টীন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ। দরকার, হয় টব আনালেই পারো। মিছামিছি কতক-গুলো আবর্জ্জনা জড় করা।" আমি নীচে নামিয়া গেলাম।

মাথার উপর কন্যাদায়—আমার কোন চিন্তা নাই। পিসী আছেন বিবাহ দিবেন। আমি কেন ভেবে মাথা খারাপ করি। কিন্তু সেদিন পিসীর একটু অসুখ করিয়াছিল। অল্প করে, দুই একবার পিত্ত বমিও হইয়াছিল। আমি বড়ই ব্যস্ত হইলাম—ডাক্তার আনিতে চাহিলাম। পিসী দিলেন না।

সন্ধ্যার সময় পিসীর নিকট বসিয়া আছি। অসুখ করিলে পিসী বড় কথা কহিতেন না। আমি চুপ করিয়া শিয়রে বসিয়া বসিয়া মাথায় হাওয়া করিতে-ছিলাম। নিকটে কেহই ছিলনা। সমস্ত ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা আমাকে যেন ঘিরিয়া ধরিল। ঘরের আলো আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। তাইত! পিসী চোক বুজিলে আমার কি হইবে? আমার যে এক পয়সাও সঞ্চয় নাই। সুসময়ে অবহেলা করিয়াছি বলিয়া মনে কত অনুতাপ হইতে লাগিল। পিসী ভাল হইয়া উঠিলে এখন হইতে সঞ্চয়ী হইব, প্রতিজ্ঞা করিলাম। আর এক পয়সাও বাজে খরচ করিব না। যত শীঘ্র পারি কন্যার বিবাহেরও চেষ্টা করিব। নিজের ভবিষ্যৎ যত ভাবিতে লাগিলাম, ততই অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—মস্তিষ্ক শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলাম। ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিল।

পিসী একবার চোক চাহিলেন। অতি করুণ স্নেহ পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই শুগে বাছা—আমি এখন ভাল আছি।" আমারও ঘরে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ত এখন কোন কষ্ট হ'চ্ছে না?" পিসী বলিলেন, "আমি বেশ আছি। তুই শুগে যা নইলে অসুখ কোর্‌বে।" আমার একটু রাত্রি জাগরণও আমার স্নেহময়ী পিসীমার সহ্য হইত না। আমি ধীরে ধীরে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া

বাঁচিলাম। কিন্তু মনের অস্বচ্ছন্দতা দূর হইল না। পিসীর অভাবে কি হইবে? সেই নিদারুণ ভবিষ্যৎ চিত্র আমার সমস্ত মস্তিষ্কে তোলপাড় করিয়া দিতেছিল।

শয্যায় আসিয়া শুইলাম ভাল নিদ্রা হইল না। কেবল ভবিষ্যৎ চিন্তা সে কি ভয়ানক মানসিক দুশ্চিন্তা। পাশে আমার স্ত্রী কন্যারা শুইয়াছিল। তাহাদের নিদ্রার শান্তির নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, আমি তাহাতে আরও অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এই দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছিল জানি না। দারুণ মানসিক অবসাদে বোধ হয় একটু তন্দ্রার মত হইয়াছিল—হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি শয্যায় উঠিয়া বসিয়া উৎকর্ণ ভাবে পুনরায় শব্দ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আবার সেই শব্দ। ভাঙ্গা কেনেস্তারার টিন বাজাইলে যেমন শব্দ হয় এ তেমনি শব্দ। শব্দটা যেন বাড়ীর উঠান হইতে আসিতেছে।

শব্দটা যেন বড় ব্যগ্র, বড় আকুল। যেন একটা গভীর আহ্বান। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি ছুটিয়া বারান্দার দিকে গেলাম। আবার,—আবার সেই শব্দ এবার যেন বড় দুর্ব্বল বড় ক্ষীণ। আমি দ্রুত উঠানে নামিলাম, তখন ভোর হইয়াছে। অস্পষ্ট আলোকে সবই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দেখিলাম তুলসী তলাতে কি একটা সাদা পদার্থ পড়িয়া আছে! কেমন একটা ভয় হইল। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আবার সেই শব্দ, বড় অস্পষ্ট বড় আগ্রহ পূর্ণ। আমি অগ্রবর্ত্তী হইলাম। দেখি পিসীমা তুলসী তলায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার হাতের পাশেই সেই ভাঙ্গা কেনেস্তারার টিন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার মাথাটী কোলের উপর তুলিয়া লইলাম।

ক্ষীণকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন,—"এই তুলসীতলার নীচে"—আমি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলাম—পিসীমা। ধীরে ধীরে তাহার কম্পিত কর আমার মস্তক স্পর্শ করিল। বুঝিলাম এই তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ। অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আবার ডাকিলাম—পিসীমা! তাঁহার উজ্জ্বল বিস্ফারিত চক্ষু চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অবশেষে আমার মুখের উপর স্থাপিত হইল। আমার মনে হইল, চিরতৃষ্ণা-তৃপ্ত করিয়া পিসীমা আমাকেই শেষ দেখা দেখিতেছেন। প্রভাতের প্রস্ফুটিত আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সে চক্ষু চিরনিদ্রায় নিমীলিত হইল। প্রভাত পবনে অন্তিম শ্বাস মিশাইল।

তারপর ?—তারপর পিসীমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার প্রোথিত অর্থ পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট চিত্রকর আনাইয়া তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছি।

যে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের জন্য পিসীমার মনে ব্যথা দিয়াছিলাম, তাহাও এখন সংযত হইয়াছে; সংসারের নানা কাজে নানা চিন্তায় এখন ঘুরিতেছি, যে, পিসীমার স্থাপিত কেনেস্তারার তুলসীগাছকে একদিন আবর্জ্জনা মনে করিতাম, অন্তিমকালে তাহার প্রতি পিসীমার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া আমি আজ তাহাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছি। সহধর্ম্মিনী মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, আমি তখন তাঁহাকে সেই তুলসী তলায় আনিয়া উভয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করি। সময়ে সময়ে সংসারে বজ্রকঠোর মূর্ত্তি যখনই আমাকে কঠোর করিয়া তুলে, পিসীমার সেই অন্তিম চক্ষু দুইটি আমার মনে পড়ে, আমি যেন কেমন আত্মহারা হইয়া যাই, কাহারও উপর আর আমার রাগ দ্বেষ থাকে না।

আর একটা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—সেই আমার নিত্য পদলাঞ্ছিত টিনের ভাঙ্গা কেনেস্তারাটি,—অন্তিম সময়ে আমাকে দেখিবার জন্য পিসীমা যাহা ব্যাকুলভাবে বাজাইয়াছিলেন, সেটিকে আমি অতি যত্নে মখমল মুড়িয়া রাখিয়াছি। আমার স্ত্রীর সোণারূপার অনেক অলঙ্কার, অনেক তৈজসাদি প্রস্তুত করাইয়াছেন, কিন্তু সেই ভাঙ্গা কেনেস্তারাটির মত মূল্যবান সম্পত্তি আমার সংসারে আর নাই।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়।

জয় জয় পরমেশ পতিত-পাবন
পাপী তাপী ভয়হারী শান্তি-নিকেতন।
মহিমার মহাসিন্ধু, দীননাথ দীনবন্ধু,
অনাদি অনন্ত রূপ নিত্য নিরঞ্জন।
কিবা জলে কিবা স্থলে কি কান্তারে শূন্য তলে—
তোমার মহিমা রাশি নেহারে নয়ন।
প্রেমসিন্ধু তব নাম, স্মরণে পূরিত কাম—
রোগ শোক দুঃখ ভয় ত্বরিত বারণ।
জ্যোতির্ম্ময় মহাজ্যোতি প্রণবে পরমা স্থিতি
পবিত্রতা পুণ্যধাম সত্য সনাতন ॥

বহুমূত্র তথ্য ও চিকিৎসা।*

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু

(আই, এস, ও এম, বি,এফ্, সি, এস্, মহোদয়ের ইংরাজি

প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা

অনুবাদিত।)

বিগত ছয় বৎসর কাল মধ্যে আমি ৩২৫টী বহুমূত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ও ৪৮৩ জনের মূত্র পরীক্ষা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আমি তদনুসারেই আমার মন্তব্যের অবতারণা করিব। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই ব্যাধির যেরূপ লক্ষণাদি দৃষ্টি হইয়া থাকে, ভারতের পরিদৃষ্ট লক্ষণাদি অনেক বিষয়ে তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ভারতবাসীর আচার ব্যবহার, বসবাস-প্রণালী, আহার-বিহার একরূপ, বিদেশীয়গণের অন্যরূপ। তাহা হইলেও আশা করা যায় যে, ভারতীয় বহুমূত্রের প্রকৃতি-আলোচনা বিদেশীয়গণের নিকটেও হৃদয়গ্রাহিণী হইবে। বহুমূত্ররোগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতটুকু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে,—বলিয়াই আমি এই বিদ্বৎ সমিতির সমীপে বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

নিদান তত্ত্ব।

(১) বয়স।—আমি যতগুলি রোগী দেখিয়াছি, তন্মধ্যে সকলেরই বয়স ৪০ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত। এই বয়সেই ভারতবাসী ঐ রোগে প্রথম আক্রান্ত হয়। ৪০ বৎসরের নীচে এই রোগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, ৩০ বৎসর বয়স্কের এই ব্যাধি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না;—কচিৎ দুই একটি দেখা যায়। আমি যতগুলি এই রোগী দেখিয়াছি, তন্মধ্যে যাঁহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তিনি বঙ্গদেশের একজন উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। বয়স অষ্টাদশ বৎসর; তাঁহার পীড়া অতি কঠিন হইয়াছিল। অল্পবয়স্কদিগের এই ব্যাধি সাধারণতঃ কঠিনই হইয়া থাকে। এই পীড়ায় মূত্রের সহিত শর্করা নিঃসৃত হইয়া থাকে। পথ্য বিচার, ঔষধাদি, বা স্থান

---

*বর্ত্তমান প্রবন্ধ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লবে পঠিত হয়, স্যর আর, হ্যাভ্লক্ চার্লস্ এম্, ডি, এফ্, আর, সি, এস্ মহোদয়ের পরামর্শে এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ লিখিত হয়। বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জুলাই মাসের শেষ অধিবেশনে ইহা পঠিত হইয়াছিল।

পরিবর্ত্তন—কোন কিছুতেই তাঁহার শর্করা নিঃস্রাব বন্ধ হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলার ভূতপূর্ব্ব সিভিল্ সার্জ্জন ডাঃ ইউ, এন, সেন মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি ছয় বৎসর বয়স্ক একটি বালকের মূত্র মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা ধরিয়াছেন। এই বালকটী অধিক মাত্রায় প্রসাব করিত ও প্রস্রাবান্তে ভয়ানকরূপ পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়িত। ইহাতেই তাহার পিতা মাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পীড়া হইয়াছে। বালকের পিতা বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন; পিতামহও ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বংশে উপদংশও ছিল। বালক স্বয়ং ও সহজাত উপদংশে ভুগিতেছিল। চিকিৎসায় প্রায় এক মাসের মধ্যে তাহার শর্করা-নিঃস্রাব বন্ধ হয়। অস্লার্ বলেন যে, এই ব্যারাম বাল্যাবস্থায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি এক বৎসরের ন্যূন বয়স্কদিগেরও এই পীড়া দেখিয়াছেন। ষ্টার্ণ্ বলেন যে, তিনি ছয়টী শিশুর এই ব্যারাম দেখিয়াছেন। তাহাদের বয়স এক বৎসরেরও কম। ফ্লেচার্ বলেন যে, তিনি ২২ বৎসর কাল সেণ্ট্ বার্থলোমিউস্ হাস্পাতালে চিকিৎসা করেন। ঐ সময় ৫০৬ টী বহুমূত্র রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে আইসে। তন্মধ্যে ২৭ জনের অর্থাৎ শতকরা ৫·৪ টীর বয়স ৩ হইতে ১৬ মধ্যে। কলিকাতার ডাঃ বি, বি, ঘোষ দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক দুইটী বাঙ্গালী শিশুর প্রস্রাবে বহুল পরিমাণে শর্করা পাইয়াছিলেন। এই শিশু দুইটী পৈত্তিক দোষে যকৃতে সৌত্রিক-পদার্থ সঞ্চার রোগে (cirrhosis) ভুগিতেছিল। প্রাগুক্ত রোগের কতকগুলিকে খাদ্যজ-শর্করা নিঃস্রাব (alimentary glycosuria) বলা যাইতে পারে। উহা ঠিক বহুমূত্র নহে।

ইউরোপের ন্যায় এখানেও প্রকৃত বহুমূত্র অল্পবয়স্কদিগের হইলে সাংঘাতিক ও অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। একটি স্থলে দেখিয়াছি, এই পীড়া মাত্র ৪ মাস ছিল; পীড়া অতীব কঠিন; রোগীর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে অসাড় নিদ্রা দেখা দিয়াছিল। রোগীটি বাঙ্গালী, বয়স ২৮ বৎসর। রোগী যতই অল্প বয়স্ক হয়, এই পীড়া ততই কঠিনমূর্ত্তি ধারণ করে। এতদবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা, দ্রুত ক্ষয়, গাত্র-দাহ ও বহুমূত্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের পীড়ায় এই সব লক্ষণ তত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। বহুমূত্র পীড়ায় তরুণ বয়স্কদিগের শরীর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভগ্ন হইয়া পড়ে। এরূপ বয়স্ক ব্যক্তির পীড়া প্রকাশ পাইবার সময় হইতে দশ বৎসরের মধ্যেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। প্রবীণ বয়সে অনেকদিন যাবৎ এই পীড়ায় কোন শারীরিক

লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। এই বয়সের অনেক রোগীই স্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ-জীবন ভোগ করিয়া থাকেন, অথচ শেষ জীবনে প্রায় ১৫ বা ২০ বৎসর যাবৎ তাঁহাদের প্রস্রাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা নিঃসৃত হয়।

(২) স্ত্রী পুরুষ।—এই পীড়া স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষেরই অধিক হইয়া থাকে। আমি ৩২৫ জন বহুমূত্র রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিয়াছি। ইহার মধ্যে ১৪ জনের অর্থাৎ শতকরা ৪-৩ জনের মূত্র স্ত্রীলোকের তন্মধ্যে ৭ জন বঙ্গদেশের হিন্দু মহিলা, একজন অন্য প্রদেশের হিন্দু স্ত্রী, ৩ জন যবনী, ১ জন ফিরিঙ্গীরমণী ও ২ জন জার্ম্মেনী নারী। বহু ব্যক্তি বহুমূত্র রোগীর শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। আমার সহিত তাঁহাদের অনেকেই একমত। এই সমিতির সুশিক্ষিত সভাপতি বহুমূত্র পীড়া সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেস দ্বারা প্রচারিত করেন। ডাঃ আর, সি, দত্ত এফ্, সি, এস্, মহোদয় বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যে বিশ্লেষণ তালিকা বাহির করেন, তাহা ঐ প্রবন্ধের সহিত পরিশিষ্টরূপে সংযুক্ত হয়। উপরোক্ত তালিকায় ২৫০ জন রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ; উহার মধ্যে একটি মাত্রও স্ত্রী-রোগী নহে। উক্ত কংগ্রেসে কাশ্মীরের চীফ্ মেডিকেল অফিসার ডাঃ এ, মিত্র মহোদয়ের বিবরণও প্রচার করেন। এতদুপলক্ষে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দ্বিশত রোগীর তথ্য প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যেও স্ত্রী রোগীর উল্লেখ নাই। ভারতীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীবৃন্দের মধ্যেই এই পীড়া অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। জন্ হপ্‌কিন্স্ হাস্পাতালের বাৎসরিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, তত্রত্য মোট ১৫৬জন বহুমূত্র রোগীর মধ্যে ৬১ জন স্ত্রীলোক অর্থাৎ এখানে স্ত্রী রোগীর সংখ্যা শতকরা ৩৯·১ জন।

ভারতীয় বিবরণীতে ও ভারতীয় অভিজ্ঞতায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী রোগীর সংখ্যা কম দৃষ্ট হইলেও আমি মনে করি যে, আমার প্রদত্ত হিসাব (অর্থাৎ শতকরা ৪·৩) প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক নহে। এমত একটি ব্যাপার আছে, যাহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। ব্যাপারটী এই:—ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা বিশেষ শারীরিক যাতনা ব্যতীত স্ব স্ব পীড়া প্রকাশ করেন না। ইহাঁরা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; এই কারণে প্রস্রাব ও প্রসব সম্বন্ধীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসুখ বিসুখ ইহাঁরা বিশেষ ভাবে গোপন করেন, কিছুতেই আত্মীয় পুরুষবর্গকে উহা জানিতে দেন না। পরীক্ষার সময়ে স্ত্রীলোকের প্রস্রাব যে কম মিলে, ইহাও তাহার একটি কারণ সন্দেহ নাই।

প্রাগুক্ত ১৪ জন স্ত্রী রোগীর মধ্যে ১১ জন হিন্দু ও মুসলমানী। এই ১১ জনের মধ্যে প্রায় সকলেই সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী ভুক্তা। কয়েকজন মহারাণী ও রাণী; বাকীগুলি সকলেই জমিদার বংশোদ্ভুতা, কেবল একজন নহে। এই শেষোক্ত রমণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বঙ্গমহিলা, ইহাঁর স্বামী একজন বহুমুত্র রোগী। আর্ম্মেণী মহিলাদ্বয়ও উচ্চ সামাজিক গৌরবে গৌরবান্বিতা। ইহাঁদের এক জনের স্বামীও বহুমুত্র রোগাক্রান্ত।

একজন ভারতীয় চিকিৎসক বলেন যে, হিন্দু বিধবাগণের বহুমুত্র পীড়া হয় না; কেননা তাঁহাদের পক্ষে নিরামিষাহার ব্যবস্থিত থাকায়, তাঁহারা প্রধানতঃ শ্বেতসার যুক্ত আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি কয়েকজন হিন্দু বিধবার মুত্রে শর্করা নিঃস্রাব লক্ষ্য করিয়াছি।

(৩) সামাজিক স্থান ও পেসা।—ভারতের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা সম্পত্তিশালী বহুমুত্র পীড়া তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে বিরাজমান। একথাটী ভারত ও বিলাত সকল স্থানের ডাক্তারেই স্বীকার করেন। ভন্ নুরডেন্ বলেন,—"লণ্ডন ও বার্লিন উভয় স্থানের বাৎসরিক হিসাবেই দেখা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর দশ হাজার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বহুমুত্র পীড়ার যে সংখ্যা, নিম্ন শ্রেণীর লক্ষ ব্যক্তির মধ্যেও তত দৃষ্ট হয় না।" ইংলণ্ডের ভদ্র সমাজে যেরূপ বাত ব্যাধি দৃষ্ট হয়, ভারতের সম্ভ্রান্ত সমাজে সেইরূপ বহুমুত্র পীড়া দেখা যায়। দুইটী পীড়াই যেন একই কারণে ঘটিয়া থাকে। কারণটী—আহার্য্যের সুচারু পরিপাকাভাব। বিলাতের ভদ্র সম্প্রদায় যবক্ষারজান বহুল দ্রব্য আহার করায়, তাঁহাদের রক্তে বাত-সুলভ মুত্রজাম্লের সঞ্চার হয় এবং ভারতের ধনীগণ শ্বেতসারযুক্ত দ্রব্য (carbo hydrates) আহার্য্যরূপে ব্যবহার করায়, ইহাঁদের রক্তে বহুমুত্র-জনক শর্করা জমিতে থাকে। সত্য বটে,—কখন কখন এই পীড়া কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যেও দেখা যায়; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতীব অল্প। অলস জমিদারগণ ও মধ্য শ্রেণীর ধনী ব্যক্তিরাই এই পীড়ায় দারুণ কষ্ট পাইয়া থাকেন। উহা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি স্বরূপ। আমাদিগের অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এই পীড়ার প্রভাবে হয় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, নয় তরুণ বয়সেই ইহ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই পীড়া বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও ধনাঢ্য উকীলগণের মধ্যে প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার এ, মিত্র যতগুলি বিবরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে শতকরা ২১টী উকীল বা আইন আলোচনাকারী।

এরূপ হইবার কারণ কি ? তাহা সহজেই বুঝা যায়। শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী-গণকে বহিঃপ্রদেশে বিস্তর কাজ করিতে হয়,—বলিয়া তাঁহারা অধিকতর পরিশ্রমী। কার্য্যানুরোধে তাঁহাদিগকে অধিক সময় মুক্ত বায়ুতে থাকিতে হয়; বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণকে সেরূপ হয় না। বঙ্গদেশের প্রথা এই যে, এখানকার ভদ্রবংশীয়গণ একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর আর শারীরিক ব্যায়াম করিতে চান না। বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীও এই বিধির অন্তর্ভুক্ত, এই কর্ম্মচারীগণের একটি বসিয়া থাকা অভ্যাস গঠিত হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, ইহাঁদিগকে প্রায়ই জনাকীর্ণ আদালতগৃহে বসিয়া গুরুতর মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয়। ইহাঁরা তৈলাক্ত ও শ্বেতসার যুক্ত গুরুপাক দ্রব্যও আকণ্ঠ উদরস্থ করেন। এই সব কারণেই ভারতের সরকারি কর্ম্মচারীবৃন্দের মূল্যবান জীবন-ব্যাধি-ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ডাঃ মিত্র বহুমূত্র পীড়ার যে, বিবরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে শতকরা ১·৫ জন বসিয়া থাকা অভ্যাসে অভ্যস্ত ভারতীয় কেরাণী। ভারতে শতকরা ৪৫ জন কোন কাজ কর্ম্ম করেন না। ভারতে এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা ভূস্বামী। উহাঁরা অলস জীবনের জন্য প্রখ্যাত।

(৪) কৌলিক গুণাধিকার।—বহুমূত্র পীড়া যে, কখন কখন বংশগতভাবে দেখা দেয়, তাহা সমুদয় ভারতীয় চিকিৎসকগণই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই পীড়া ৩ পুরুষ ধরিয়া বহিয়া আসিতেছে, আমি এরূপ কয়েকটী স্থল দেখিয়াছি। ডাঃ সেনও তদীয় বিবরণীর ৬৫ পৃষ্ঠায় ঐরূপ ভাবের একটী কথা বলিয়াছেন। একটী পরিবারে, পিতামহ শেষ জীবনে ১৫ বা ২০ বৎসর কাল মৃদুবীর্য্য বহুমূত্র ব্যারামে ভুগিয়া ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন; তাঁহার পুত্র ৪৫ বৎসর বয়সে এই পীড়ায় আক্রান্ত হন। এখন ইহাঁর বয়স ৫৫ বৎসর। ইহাঁর পীড়ার প্রকোপও মৃদু। ইহাঁর পুত্রও পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন। এই পুত্রের বয়স যখন ২৬ বৎসর, তখনই তাঁহার প্রস্রাবে শর্করা নিঃস্রাব দেখা দেয়। দৈনিক স্রাবের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। ইহাঁর পীড়া ৩ বৎসর হইল হইয়াছে; মূত্রে অংগুলালিক পদার্থ পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। প্রাগুক্ত তিনটী রোগীর মধ্যে পিতামহ একজন উকীল ছিলেন। পুত্র ও পৌত্র দুই জনও ঐ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত। কলিকাতার ডাঃ এস্, বি, ঘোষ মহাশয়, আমাকে একটি বিবরণ দিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে, পীড়াটি একটি পরিবারের মধ্যে ৩ পুরুষ ধরিয়া সংক্রামিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে, পিতামহ একজন স্কুলের শিক্ষক; তিনি কয়েক বৎসর

রক্তস্রাব হওয়ায় ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র একজন বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারী; তাঁহার পীড়া গুরুতর ও অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে পৃষ্ঠব্রণে মারা যান। তাঁহার স্ত্রীও এই পীড়ায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যারও ২৫ বৎসর বয়সে এই পীড়া দেখা দেয়। এই কন্যার কয়েকটী সন্তান হইয়াছে। প্রতি আউন্সে (অর্দ্ধ ছটাকে) ইহাঁর ২৪ গ্রেণ করিয়া শর্করা নিঃসৃত হইতেছে।

আমি এমত বিস্তর স্থল দেখিয়াছি, যেখানে এই পীড়া দুই পুরুষ ধরিয়া হইতেছে। বহুমূত্র রোগাক্রান্ত পিতামাতার সন্তানগণেও এই রোগ সংক্রামিত হয়, তাহাও দেখিয়াছি। দুই পুরুষ ব্যাপী যে পীড়া দেখিয়াছি, তাহা তৃতীয় পুরুষে হইবার মত এখনও বিকসিত হয় নাই। ডাঃ মিত্র বহুমূত্র পীড়ার যে, দুইশত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অতীব মূল্যবান। তিনি বলেন যে, ঐ সব স্থলে শতকরা ৪৭৫টী রোগ বংশগত ভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অস্লার্ বলেন, ইউরোপে যে, বহুমূত্র ব্যারাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৌলিক। একই পরিবারের মধ্যে এই ব্যাধি বিস্তর হইয়াছে, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ সেখানে লিপিবদ্ধ আছে। নিউনিন্ বলেন, তিনি ২০১ জন বহুমূত্র রোগীর মধ্যে ৩৫ জনের পীড়া কৌলিক দেখিয়াছেন।

বহুমূত্র পীড়া বংশগত, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে আরও প্রমাণের আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে যে, এই পীড়া ২।৩ পুরুষ ধরিয়া হইয়া থাকে। একই পরিবারের মধ্যে অনেকগুলি লোকের হয়। যখন এতটা জানিতে পারা গিয়াছে, তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত গবেষণার প্রয়োজন।

(২) অমিতাচার।—অমিতাচার ভারতীয় বহুমূত্র পীড়ার কারণ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। আমি যতগুলি বহুমূত্র রোগী মূত্র পরীক্ষা করিয়াছি, তন্মধ্যে অধিকাংশই মিতাচারী, ডাঃ মিত্রের হিসাব তালিকাও আমারই কথার সমর্থন করে। তাঁহার প্রদত্ত দুইশত রোগীর বিবরণে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৪.৫ জন একেবারেই মদ্য মাংস ব্যবহার করে না, ৫৩.৫ জন মিতাচারী ও শতকরা মাত্র ২ জন অমিতাচারী।

(৩) জাতি।—ভারতীয় জাতি সমূহের মধ্যে হিন্দুরাই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমি যে ৩২৫টী রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যবর্ত্তী শতকরা হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বঙ্গদেশবাসী হিন্দু	৬৪.৬২
অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু	১২.৩০

মুসলমান		...	...	...	৮'৫০
ইউরোপবাসী		...	...	...	৫'৫৪
ইহুদী ও আর্ম্মেণী		...	...	...	৪'০০
ফিরিঙ্গী	...	...	...	...	২'৪৭
জৈন	...	...	...	...	২'১৫
খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী		...	...	...	০'৬২
পার্শী	...	...	...	...	০'৩০

ভূতপূর্ব্ব ডাঃ আর্, সি, দত্ত, এফ্, সি, এস্, মহোদয়, ২৫০টী বহুমূত্র রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিয়া যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে শতকরা হিসাব এইরূপ :—হিন্দু ৯২'৪, জন মুসলমান ০'৮ জন ইউরোপবাসী ও ফিরিঙ্গী ৬'৪ জন।

ডাঃ এ, মিত্র সমগ্র ভারতের হিসাব দিতে যাইয়া ২০০টী বহুমূত্র রোগের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শতকরা হিসাব এইরূপ :—হিন্দু ৬৫, মুসলমান ১৭, ইউরোপবাসী ৯'৫, ফিরিঙ্গী ২'৫ ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী ৩'০০ জন।

ভারতে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা বেশী ; এরূপ বিবেচনা করিলেও হিন্দুর পীড়া উহাদের সংখ্যার অনুপাতের অপেক্ষা অনেক অধিক। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন :—শুধু বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের মোটামুটী অনুপাত ২'১। কিন্তু আমি পীড়ার যে, হিসাব দিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর বহুমূত্র পীড়া ৮ গুণ অধিক। ডাঃ মিত্রের হিসাবানুসারে দেখা যায়, হিন্দুর পীড়া প্রায় ৪ গুণ অধিক। ডাঃ আর, সি, দত্ত, যে, হিসাব দিয়াছেন, আমার মতে উহা হিন্দুর পক্ষে খুব বেশী ও মুসলমানের পক্ষে খুব কম বলিয়া দেখান হইয়াছে।

যদি একথাও স্বীকার করা যায় যে, প্রাগুক্ত হিসাবে ভুল ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই বহুমূত্র রোগে অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটাই ভারতের প্রধান জাতি। উহাঁদের মধ্যে যে, বহুমূত্র ব্যারাম এত বেশী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উহাঁদের খাদ্যে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ও শর্করা বিদ্যমান থাকে, উহাঁরা সাধারণতঃ মাংসাহার করেন না, শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। ইহা ছাড়া, উহাদের অনেককেই অত্যধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়,—উহাঁদের অনেকে দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

ইংরাজ গ্রন্থকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, এই পীড়া হিব্রু জাতির মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় ; কাফ্রীদের মধ্যে খুব কম।

জৈনরা একেবারেই মৎস্য মাংস আহার করেন না বলিয়া কোন কোন ডাক্তার বলেন যে, সম্ভবতঃ উহাদের এই পীড়া হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে যে, হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, জৈন রোগী শতকরা ২'১৫ জন।

(৭) উদ্বেগ ও মানসিক আঘাত :—

যে সকল কার্য্যে স্নায়ুর উপর অত্যধিক চাপ পড়ে ও যাঁহাতে নিরন্তর চিত্ত বৈকল্য ঘটায় সেই সব কার্য্যে বা বিষয়ে এই পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিস্তর স্থলে দেখা গিয়াছে যে, পরিবারের মধ্যে মৃত্যু হওয়ায় বা কোন একটা ব্যবসায়ে বিফল মনোরথ হওয়ায়, কাহারও মনে দারুণ আঘাত লাগিল। সেই আঘাতের ফলে এই ব্যাধি তীব্র মূর্ত্তিতে দেখা দিল।

(৮) পথ্য।—শ্বেতসার ও শর্করাধিক্যযুক্ত আহারে যে, এই পীড়া জন্মিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকেই একমাত্র কারণ বলা যায় না। বালক বালিকারা খুব বেশী পরিমাণে নানা আকারে শর্করা খাইয়া থাকে; অথচ উহাদের এই পীড়া অতি অল্পই হইয়া থাকে। ভারতীয় কৃষিজীবিগণও শ্রমজীবিরা অত্যধিক শ্বেতসার প্রধান খাদ্য আহার করিয়া থাকে। কিন্তু বহুমূত্র ব্যারাম উহাদের মধ্যেও বিরল, ইহারাও বালক-বালিকারা সর্ব্বক্ষণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা করায়, উহারা যে, শর্করা আহার করিয়া থাকে তাহার পরিপাক হইয়া যায়। সেই কারণেই ঐ শর্করা উহাদের মূত্র-মধ্য দিয়া নিঃসৃত হয় না। আহার্য্যের গুণাপেক্ষা পরিমাণই শর্করা নিঃস্রাবের জন্য অধিকতর দায়ী। সকলেই অবগত আছেন যে যাঁহারা বাল্যকালে বিখ্যাত ভোক্তা থাকেন, তাঁহারাই শেষ জীবনে এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সাধারণতঃ অজীর্ণ, অম্ল, পেটফাঁপা, বুক-জ্বালা ইত্যাদি হইয়া থাকে। তত্রাচ ইহারা গুরুপক দ্রব্য আহারে বিরত হন না। ঐরূপ অজীর্ণ প্রভৃতির পরিণামই বহুমূত্র। ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে যে, এত বেশী বহুমূত্র রোগ হইয়া থাকে তাহার কারণ তাঁহারা অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার ও চর্ব্বি আহার করিয়া থাকেন, ব্যায়াম করেন না ও অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করেন। ঐ কয়টী কারণের সমবায়েই তাঁহাদের ব্যারামের উৎপত্তি হয়।

(৯) সংস্পর্শ :—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই পীড়ায় ভুগিতেছেন, আমি এরূপ কতিপয় স্থল দেখিয়াছি। এই পীড়া সংক্রামক, তাহা স্মিট্ই (Schmidt) প্রথমে স্থির করেন। তিনি ২৩২০টী রোগীর মধ্যে ২৬টীতে অর্থাৎ শতকরা ১'১২টী রোগ সংস্পর্শজ বলিয়া জানিতে পারেন। আমি যতগুলি এই রোগী

দেখিয়াছি, তন্মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই পীড়া স্বামীতেই প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু স্বামীতে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীতে ইহা ছিল কিনা, কিম্বা স্বামী স্ত্রী একই সময়ে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হন কিনা? তাহা বলা অসম্ভব। বহুমূত্র পীড়া যে সংক্রামক, এ কথার বেশ ভাল প্রমাণ নাই। স্বামী স্ত্রী সম্ভবতঃ একই কারণে এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

(১০) মৈথুনাধিক্য।—অতি মাত্রায় রতি-ক্রিয়া, বিশেষতঃ তরুণ বয়সে বা শেষ বয়সে মৈথুনাধিক্য বহুমূত্র রোগের উত্তেজক (Predisposing) কারণ। যেখানে বৃদ্ধ ব্যক্তির তরণী ভার্য্যা গ্রহণ সেখানেই স্বামী প্রায়ই বহুমূত্ররোগাক্রান্ত। অনেক চিকিৎসক বলেন যে, বাল্য-বিবাহই ভারতবাসীর বহুমূত্র রোগের অন্যতম কারণ।

ক্রমশঃ।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

প্রথম অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রকাশের কক্ষ। ঊষা ও ক্ষ্যান্ত ঝি।

ঊষা। অত হাস্‌ছিস্ কেন? কি হয়েছে?

ক্ষ্যান্ত। সে আর তোমায় বল্‌ব কি মেজদিদিমণি! তুমি যদি দেখ্‌তে—হাঃ হাঃ—হাঃ

ঊষা। আঃ কি হয়েছে, ছাই বলনা! আবার হাস্‌তে বোস্‌লো।

ক্ষ্যান্ত। সে কথা মনে হলেই যে হাসি পায়,—হাঃ—হাঃ,—হাঃ!—

ঊষা। আবার হাস্‌ছিস্! অমন করিস্ ত সাম্‌নে থেকে দূর হ।

ক্ষ্যান্ত। রাগ কর্‌ছ কেন মেজদিদিমনি! তোমার শাশুড়ী ননদের কথা মনে হচ্চে, আর হাসি চাপ্‌তে পার্‌ছি না।

ঊষা। কি কথা?

ক্ষ্যান্ত। মটর গাড়ীর কথা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—তোমার ননদ ছুঁড়ী মটর গাড়ী দেখে তোমার শাশুড়ী মাগীকে বোল্‌ছিল, কলে চলে—হাঃ—হাঃ—হাঃ! বাপের জন্মে কখনও দেখেনি, তাই দুজনে হাঁ করে দেখ্‌ছিলো।

ঊষা। ও কথা যাক, আমার জিনিষ পত্র গুছিয়েছিস্। পাঠানোর কথা কি বল্লে ?

ক্ষ্যান্ত। সে আর বোল্বে কি ? প্রথমে পাঠাবেনা বলে ঝঁ্যাকরে উঠে ছিলো। তারপর যখন শুন্লে বাবু এখানকার হাকিমকে চিঠি দিয়েছেন। তখন ভয়ে জড় সড় হোয়ে গেল। (কমলার প্রবেশ।)

কমলা। বউ ! নাপ্‌তিনী এসেছে, আল্‌তা পোর্‌বে চলো।

ঊষা। ক্ষ্যান্তি বাহিরে যে সব আমার জিনিষ পত্র আছে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে।

কমলা। ক্ষ্যান্তি গুছুবে এখন। তুমি আল্‌তা পোর্‌বে চলো।

ঊষা। দেখ এদের যা জিনিষ একটাও যেন নিয়ে যাস্‌নি।

(বিরক্তি সহকারে কমলার প্রস্থান।)

ক্ষ্যান্ত। ছুঁড়ী যাবার সময়ও জ্বালাতন করতে ছাড়েনা।

(নিস্তারিণীর সহিত কমলার পুনঃ প্রবেশ)

নিস্তা। বউমা ! যাবার সময় আল্‌তা পোরে যেতে হয়। নাপ্‌তিনী বসে আছে। আল্‌তা পোরে এসে জিনিষ গুছিয়ে লও।

ঊষা। ক্ষ্যান্তি বলে দেত। বার বার অমন বিরক্ত করতে হবে না, আমার অত আধিখ্যেতা ভালো লাগে না।

নিস্তা। কমলা তুই এই খানেই নাপ্‌তে বউকে ডেকে নিয়ে আয়।

[কমলার প্রস্থান।]

বউমা অত অবুঝ হচ্ছ কেন মা ! আল্‌তা না পোরে কি কোথাও যেতে আছে ! তাহলে যে প্রকাশের অকল্যাণ হবে।

[নাপ্‌তিনীর সহিত কমলার প্রবেশ।]

নিস্তা। নাপ্‌তে বউ, বৌমা জিনিষ পত্র গুছুচ্ছে তুই এইখানেই তাড়াতাড়ি তাকে আল্‌তা পরিয়ে দে।

নাপ্‌তিনী। দিচ্ছি মা। [ঊষার পায়ের কাছে বসিয়া] বউ দিদি তুমি একটু বস আমি এখনি পরিয়ে দিচ্ছি। [ঊষা আল্‌তা পরিতে বসিল।]

নিস্তা। আচ্ছা নাপ্‌তে বৌ তুই এইবার যা।

(নাপ্তে বৌএর প্রস্থান।)

দেখ্‌লে মা আল্‌তা পোরে পা দুখানি কেমন মানাচ্ছে। কমলা সিঁদুরের কৌটাটা দেতো।

(কমলা নিস্তারিনীর হস্তে সিঁদুরের কৌটা দিল। নিস্তারিনী তাহা হইতে

সিন্দুর লইয়া পরাইয়া দিল। উষা কোন কথা বলিল না, আপন মনে বাক্স গুছাইতে লাগিল।)

কমলা। মাকে একটা পেন্নাম্ অবধি কর্‌লে না বউ!

ক্ষ্যান্তি। মুখ ফুটে বোল্‌ছে পেরন্নাম কর্ মেজদিদিমণি।

(উষা তাচ্ছিল্য সহকারে নিস্তারিনীকে প্রণাম করিল।)

নিস্তা। বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো। এঁওরাণী, ভাগ্যি মানী হয়ে সুখে ঘর কন্না কর। মা দুর্গা তোমার সুমতি দিন।(উষার মুখচুম্বন করিল।)

ক্ষ্যান্তি। মা ঠাকরুণ পেরন্নাম হই। (ক্ষ্যান্তি প্রণাম করার ভাণ করিল)

নিস্তা। কে? ক্ষ্যান্তি। বেঁচে থাক, অরুণ্যের গতর হোক।

ক্ষ্যান্তি। (ব্যঙ্গস্বরে কমলার প্রতি) তোমারও পেরন্নাম হই গো দিদিমণি!

(প্রণাম করিবার ছলে বসিয়া পড়িল।)

কমলা। যাবার সময়ও মাগী—

নিস্তারিনী। কমলা আয় আমরা যাই। [কমলা ও নিস্তারিনীর প্রস্থান।]

ক্ষ্যান্ত। ছিনে জোঁক! ঘর থেকে নড়তে চায় না।

উষা। তাড়া তাড়ি নে! সব গুছুনো হ'লো?

ক্ষ্যান্ত। হাঁ, সব ঠিক হয়েছে। এদের জিনিষ গুলো তা হলে এদের এই ভাঙ্গা পেঁটরার উপর রেখে দি।

উষা। তাই দে, যাবার সময় বলে যাস্ এইখানে এদের জিনিষ রইল।

ক্ষ্যান্ত। (কতকগুলি বেণারসী ও সিল্কের কাপড় ও জামা লইয়া) তুলে বাগ দিতে পরে এই সব জিনিষ দিয়ে আবার আধিখ্যেতা।

(কাপড়গুলি একটা পুরাণ তোরঙ্গের উপর ফেলিয়া দিল।)

(প্রকাশের প্রবেশ।)

প্রকাশ। (ক্ষ্যান্তির প্রতি) তুই এখন এখান থেকে যা।

(উষার দিকে চাহিয়া কোন ইঙ্গিত না পাইয়া ক্ষ্যান্তির প্রস্থান।)

প্রকাশ। উষা, তুমি এখনি যাবে?

(উষা কোন উত্তর দিল না, বাক্সর নিকট জিনিষপত্র গোছানর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

প্রকাশ। চুপ করে রয়েছ কেন? (উষার নিকটে যাইয়া) বল, শীগ্‌গীর আবার এখানে আস্‌বে!

(উষা তবুও নিরুত্তর।)

উষা যাবার সময়ও কি রাগ রাখ্‌বে? সে দিনে রাগে জ্ঞান হারাই, তাই তোমায় যা তা বলেছিলুম। বল সে সব কথা ভুলে যাবে। (উষার হাত ধরিয়া) এখনও চুপ করে রয়েছ কেন? একবার বলো আমার উপর আর রাগ রাখ্‌বে না। আবার আগেকার মতন—

(ক্ষ্যান্তির প্রবেশ।)

ক্ষ্যান্তি। বড় জামাইবাবু গাড়ীতে জিনিষ তুলে দিতে বল্লে।

(দুইটী বাক্স লইয়া ক্ষ্যান্তির প্রস্থান।

প্রকাশ। উষা তোমার উপর রাগ করে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি। বলো আমি যা বলেছিলুম সব ভুলে যাবে! (উষা নিরুত্তর।)

উষা কেন তুমি এখনও রাগ করে রয়েছো। কেন তুমি রাগ করে চলে যাবে? তুমি চলে গেলে, তুমি কাছে না থাক্‌লে, আমি যে বড় ব্যথা পাবো। বলো তুমি রাগ কোর্‌বে না!

(নেপথ্যে ক্ষ্যান্তি "মেজদিমনি গাড়ীতে জিনিষ তুলে দেওয়া হয়েছে।")

উষা। তোমাদের গহণার বাক্স ও জিনিষ পত্র এখানে রইল। দেখে নিয়ো।

(প্রকাশের পানে চাহিয়া প্রস্থান।)

প্রকাশ। চলে গেল! ডাক্‌লেম, কাছে এলো না; ক্ষমা চাইলেম, কথা কইলে না—আপনার মনে সদর্পে চলে গেল। আমাদের দেওয়া জিনিষ অবধি সঙ্গে নিলে না,—ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা কি করেছি যে, সে এমন কর্‌লে? তাকে ত কেউ কষ্ট দেয় নাই, সকলে ত যত্নের আবরণে তাকে আদরে ঘিরে রেখেছিল। তবুও সে কেন এমন কল্লে। ফুলশয্যার রাত্রে যখন উষার সহিত প্রথম দেখা হয়, মনে কত সুখের আশা জেগেছিল। ক্রমে ক্রমে সে আশা বিলীন হয়ে গেল। রমেন কি ঠিক বলেছিল, এ ক্ষণেকের মেঘ, দুদিনের জন্যে ঝড় জল উঠিয়ে আকাশ পরিস্কার করে দিয়ে চলে যাবে। তা কি হবে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মিশ্‌বে কে জানে? (প্রকাশের প্রস্থান।)

—*—

বুবুরাণী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন।

(দুই বৎসরের শিশু কন্যা)

১

আয় বুকে আয়!
বান্ধুলী-অধরে হাসিটি লইয়া—
আয় বুকে আয়।

নন্দন-সুষমা-রাণী।
দগ্ধ ভস্মস্তূপ হৃদয়-শ্মশান
হউক শীতল মোর
আয় বুকে আয়!
স্নেহ-পূত তোর কোমল পরশে
মুছে যাক আঁখি লোর।

আয় বুকে আয়
নন্দন-সুষমা রাণী
বান্ধুলী-অধরে হাসিটি লইয়া—
আয় বুকে আয়!

২

স্বরগ হইতে বিদায়ের দিনে
দেবাঙ্গনা দেছে তোরে—
শচী দেছে তোরে বিদায় চুম্বন
গোলাপ কপোল পরে।
যক্ষরাণী দেছে মরকত মণি—
ও দুটি নয়ন তারা।

অক্ষয় স্নেহের ধারা!
আয় বুকে আয়—
বান্ধুলী-অধরে হাসিটি লইয়া—
আয় বুকে আয়!

৩

চন্দ্রমা দেছে জোছনা লাবণ্য—
সারাটি অঙ্গ ভরি!
মন্দাকিনী দেছে রজত চাঞ্চল্য
নয়নে পড়িছে ঝরি!
উষারাণী দেছে অলক্তক আভা
ও রাঙ্গা চরণ তলে।
কাদম্বিনী দেছে অসিত পরশ—
সঘন চারু কুন্তলে।
নন্দন-সুষমা-রাণী
আয় বুকে আয়—
বান্ধুলী অধরে হাসিটি লইয়া—
আয় বুকে আয়!

সমালোচনা।

সচিত্র মহাযুদ্ধের ইতিহাস।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বসু বি, এ, প্রণীত, কলিকাতা ৩৮।২ নং ভবানীচরণদত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, মূল্য প্রতি খণ্ড ছয় আনা মাত্র।

আমরা এই সচিত্র মহাযুদ্ধের ইতিহাস তিন খণ্ড মাত্র সমালোচনার্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। যুদ্ধের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের আভাস ও ইউরোপের বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের উৎপত্তি এবং তৎপরবর্ত্তি লোমহর্ষণ ঘটনা পরম্পরার সচিত্র বিবরণ এই পুস্তকের প্রতি খণ্ডে সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত হইতেছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ, মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত সুলেখক, বর্ত্তমান সময়োপযোগী সচিত্র মহাযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন

এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতেছে যে, পুস্তকের এক খণ্ডমাত্র পাঠ করিলে পরবর্ত্তী খণ্ড গুলি পাঠ করিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ জন্মে। বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রত্যেক নর নারী এতাদৃশ পুস্তক পাঠে বর্ত্তমান যুদ্ধের অনেক নূতন তত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন সন্দেহ নাই। তিন খণ্ড মাত্র পাঠ করিয়া আমরা বস্তুতই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকার দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এরূপ উপাদেয় গ্রন্থের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন পুস্তক খানি বঙ্গ-ভাষাবিজ্ঞ প্রত্যেক নর নারীর নিকটে সমাদৃত হউক।

রোসেনা—নাটক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু প্রণীত। ৪৪ পৃষ্ঠা নাট-কের দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী ভ্রমসংশোধন! অতএব এরূপ নাটকের অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তবে আমরা নাট্যসাহিত্যে নাট্যকারের ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করি।

কপিলের তেজ।—(পৌরাণিক নাটক।) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, কলিকাতা, ১৭ নং সগর দত্তের লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মই জাতির জীবন। সমাজ ও সাহিত্য তাহার অঙ্গ। নাটক, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি তাহার প্রত্যঙ্গ। সুতরাং জাতির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম প্রবাহিত না হইলে, কোন জাতি কখনও সজীব হইতে পারে না। আমাদের দেশে কিছুদিনের জন্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত নাটক প্রণয়ন বা অভিনয় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন দেখিতেছি অনেক মাননীয় কবিদের কল্যাণে আবার তাহা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে; ইহা আমাদের ভাবী মঙ্গলের সূচনা, সন্দেহ নাই।"

উক্তরূপ আশায় প্রণোদিত হইয়াই নাট্যকার এই "কপিলের তেজ" নাটক খানি রচনা করিয়াছেন। আমরা চিরদিন ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ প্রচারের বড়ই পক্ষ-পক্ষপাতী। মহামুনি কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার বলিয়া খ্যাত, এবং ইনিই সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। সুতরাং "কপিলের তেজ" পুস্তক খানি হস্তগত হওয়াতে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। নাট্যকার অবস্থাপযোগী যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় কবিত্বপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী। আমরা গ্রন্থ-কারকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। এই অসার রঙ্গ-রহস্যপূর্ণ উপন্যাস নাটক প্রভৃতি প্লাবিত বঙ্গসাহিত্য সংসারে অর্থব্যয় ও যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার

করিয়া ধর্ম্মমূলক একখানি নাটক প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা নবীন নাট্যকারের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রকাশ রঙ্গমঞ্চে এরূপ নাটক অভিনয় হইলে রঙ্গমঞ্চেরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

রঘুমণিকৃত সঙ্গীত সারঃ—১৩নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত নীলরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আজ চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার শৈশব অবস্থা। পিতার অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং কথকতা প্রভৃতির আমি কিছুই বুঝিতাম না। একটু বড় হইয়া দেখি, তাঁহার শিষ্য পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত পিতৃদেবের রচিত সঙ্গীত বা পদাবলী জন-সমাজ বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন, কথকগণও আগ্রহের সহিত ঐ পদাবলী গান করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ [illegible]ন। তখন হইতে আমার মনে হয়, পিতার যে সকল পদাবলী অপ্রকাশিত আছে, তাহা প্রকাশ করিলে সঙ্গীতানুরাগিগণ বিশেষতঃ কথকগণের মহৎ উপকার হইতে পারে।" "রঘুমণি কৃত সঙ্গীত সার" গ্রন্থ প্রকাশকের এতৎ গ্রন্থ প্রকাশের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। উত্তম মহৎ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়, এক সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গের একজন অদ্বিতীয় কথক বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন; গ্রন্থকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, "রঘুমণি কৃত সঙ্গীত সার":—পুস্তকে জয়দেবের ছন্দে বিশুদ্ধ রাগরাগিনী সংযুক্ত নানাবিধ সুর সহকারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিবদুর্গা, শ্রীরাম প্রভৃতি দেবদেবী বিষয়ক বহু সুললিত সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে; সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবদ্‌ভক্ত প্রেম পিপাসু—ব্যক্তি মাত্রেই এতৎ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রন্থের প্রত্যেক সঙ্গীতই ভগবদ্‌-প্রেমভক্তি পূর্ণ, সুললিত হৃদয়গ্রাহী, একাগ্রচিত্তে পাঠ করিলে অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ লাভ করা যায়, পুস্তক মধ্যে কোনরূপ সম্প্রদায়িকতার উন্মেষমাত্র নাই। আমরা স্বধর্ম্মানুরাগী ভগবদ্‌ প্রেমানুরক্ত ব্যক্তি মাত্রকেই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

আর্য্য-মহিলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেন বি, এ,।

ভূমিকা।—আমরা সকলেই ভগবৎ সৃষ্ট জীব। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে ভগবান্ আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রথমতঃ প্রস্তুত হইয়া, সময়ে তাঁহার অভিলাষিত কর্ম্ম সম্পাদনে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম। পুণ্যাত্মা মহাপুরুষগণ প্রত্যেকে জীবনের এক একটী বিশেষ কর্ত্তব্য (mission) সম্পাদনের জন্য শরীর পরিগ্রহ করেন। আমরা প্রত্যেকে এক এক জন মহাপুরুষ নহি, সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্যও তাঁহাদিগের হইতে কিছু পৃথক। যাহা মানবের সাধারণ ধর্ম্ম তাহাই প্রত্যেকের সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালনে যেরূপ অক্ষয় ও নির্ম্মল যশঃলাভ করিয়া অশেষ পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারা যায়, সেইরূপ সতত কর্ত্তব্য উপেক্ষিত হইলে নরক-গামী হইতে হয়। যে কর্ত্তব্য পালন করে না, সততই তাহার উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মাচরণ করে—ইহলোকে সে সজ্জনের প্রশংসনীয় হইতে

পারে না; পরলোকেও তাহার অশেষ—অশান্তির হাত হইতে নিস্তার নাই। সমান ধর্ম্মী বন্ধুগণ অধর্ম্মাচারীর মৌখিক সাহায্য এবং খ্যাতিবাদ করিলেও তাঁহারা মনে মনে জানেন যে, ইহাঁর দুষ্কৃতি প্রশংসনীয় হইতে পারে না। মানবগণ সাধারণতঃ রিপুর দাস। এই রিপু গুলির কোনওটী যে দিকে মানবের প্রবৃত্তি চালিত করে—তাহা হইতে নিবৃত্তি হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে নিতান্তই কষ্ট-কর। অধর্ম্মের পথে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উৎপন্ন ঘৃণার পোষণ করিলেও ধর্ম্ম-পথে চলিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও সাধুজনের ইচ্ছা সর্ব্বদা পূর্ণ হয় না। নানা প্রবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাত অতি মহৎ চরিত্রবান্ ব্যক্তিরও বিকৃতি জন্মাইবার সতত চেষ্টা করে—তাঁহাকেও সময়ে সময়ে অধীর হইতে হয়, কিন্তু বিকারের হেতু উপ-স্থিত হইলেও যাঁহার মন বিকার প্রাপ্ত না হয়, তিনিই প্রকৃত ধীর। রিপুর বশী-ভূত না হইয়া যদি রিপুকে বশ করিতে পারা যায়, তবে এই সমস্ত রিপু আবার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া মিত্রভাবে দেহীর জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে পারে। রিপু-জয়ী মানব আপন জীবনের উদ্দেশ্য সহজে নির্ণয় করিতে পারেন। সুতরাং রিপু জয় করা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। রিপু জয় করিয়া পরে আপন জীবনের উদ্দেশ্য সাধন জন্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

স্ত্রী পুরুষের জীবনের লক্ষ্য।—ভগবানের সৃষ্ট জগতে পুরুষ ও স্ত্রীর জীবনের উদ্দেশ্য এক কি না? অথবা এক হইতে পারে কি না? ইহা লইয়া প্রায়ই আলোচনা চলিয়া থাকে। সোজা কথায় এই বুঝা যায় যে, পুরুষের স্বভাব ও নারীর স্বভাব বিভিন্ন মুখী। পুরুষের প্রকৃতিগত যে সব সাধারণ গুণ বা দোষ আছে, নারীর প্রকৃতিতে তাহার কোনটা দেখা যায় বা কোনটা দেখা যায় না। ভগবান্ দুইটী প্রকৃতিকে এরূপ বিভিন্ন ভাবে গঠিত করিয়াছেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য উভয়তঃ এক হইতে পারে না। তবে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা সাধনই মানব জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্য। জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে স্ত্রী পুরুষের ভেদ নাই, এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার পক্ষে কোনও প্রকৃতি প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য থাকিলে কোনও প্রকার স্বভাব হউক না কেন এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আপনার অস্তিত্ব একেবারে হারাইয়া ফেলিতে সে বাধ্য। এই মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ইহার নিকট সকলেই আপন মস্তক অবনত করিবে।

আছেন হিন্দু নারী পুরুষ হইতে—আপনার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সত্বেও কিরূপে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে—অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হিন্দু নারীর যাহা কর্ত্তব্য ক্রমে তাহাই বর্ণিত হইবে।

জীবনের অবস্থা ভেদে কর্ত্তব্যের প্রসার।—মানব জীবনের অবস্থা ভেদে কর্ত্তব্যও ভিন্ন হইয়া যায়। বাল্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত না হইলেও কর্ত্তব্যের মাত্রা আরও বাড়িয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় সামর্থ্য থাকিলে তাহা আরও বাড়িয়া থাকে। ব্রহ্মচারীগণের যাহা কর্ত্তব্য; গৃহস্থগণের তাহা অনুষ্ঠান করিলে সমস্ত ক্ষেত্রে তাহা অন্যায় হয় না; কিন্তু গৃহস্থগণের অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জীবনের গতি যতই বাড়িতে থাকে জীবনের কর্ত্তব্য গণ্ডী ততই ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম জীবনের কর্ত্তব্যের গণ্ডীতেই সঙ্কীর্ণ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা অবস্থা ভেদে সে সঙ্কীর্ণতা ক্রমেই দূরীভূত হয়। প্রত্যেকের জীবন নানা অবস্থা ভেদে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। বর্ত্তমান নিবন্ধের অধ্যায়ে বিকল্পনা নারী জীবনের সাধারণতঃ তিনটী ভাগ যুক্তি সঙ্গত ও নিরাপদ। প্রথম কৌমার্য্য বা অবিবাহিত জীবন,—দ্বিতীয় গার্হস্থ্য বা বিবাহিত জীবন,—তৃতীয় বৈধব্য। একটা বয়সের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া সেই বয়সের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ততদূর নিরাপদ নহে। তাই নারী জীবনের অবস্থা ভেদে উক্ত তিন প্রকার ভেদ করা হইল। ক্রমে তিনটী অধ্যায়ে নারীজীবনের এই ত্রিবিধ অবস্থার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম অধ্যায়।

অবিবাহিত জীবন।

ভগবানের সৃষ্ট জগতের অন্যান্য প্রাণী হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণদ্বারা পৃথক করিয়া ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই গুণরাজির চর্চ্চা দ্বারা (culture) অন্যান্য প্রাণী হইতে আপন বৈষম্য রক্ষা প্রত্যেক মানবের অন্যতম কর্ত্তব্য। মাতা পিতার প্রতি পুত্র কন্যার কর্ত্তব্য আছে, আবার পুত্র কন্যার প্রতিও মাতা পিতার কর্ত্তব্য আছে, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর কর্ত্তব্য আছে, আবার ভগিনীও ভ্রাতার নিকট হইতে অনেক কর্ত্তব্যের দাবী করেন বা

আশা রাখেন, কল্যাণ ভাজনে ও গুরুজনের মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য আছে, আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়ের কর্ত্তব্য আছে, মানব সাধারণের প্রতি প্রত্যেক মানবের —কি পুরুষ কি নারী সকলেরই একটা কর্ত্তব্য আছে। এই সমস্ত কর্ত্তব্যের উপেক্ষা করিলে মানুষ ও পশুর পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। যতদিন মাতৃস্তন্য পান করে : শৃগাল কুকুর ততদিন মাতার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে, নীচ পশুগণ যতদিন স্বাবলম্বী না হয়, ততদিন তাহারা অভিভাবকের অধীনে থাকে, যেদিন হইতে তাহারা নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখে সেদিন হইতে নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের অশোধ্য ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম বলিয়া মনে করে। যদিও কোন কোন পশুর দুই একটি অসাধারণ গুণের কথা শুনিতে পাই, সে পশুগুলি নিশ্চয়ই—পূর্ব্ব জন্মের কোন সঞ্চিত পুণ্যের ফলে জগতের সমক্ষে আপন গুণের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয়, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মানবের সাধারণ গুণরাজি যাহাতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এজন্য পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হয়। একটী বট গাছ যখন ছোট থাকে, ইহার প্রতি শাখা যখন সহজেই নমনীয় থাকে, তখন যে দিকে ইচ্ছা গাছ হেলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ; সেই বৃক্ষের আকাশ স্পর্শ করার পক্ষে ইহাতে কোনও প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, বট গাছ সোজা আকাশের দিকে উচ্চে উঠিবে, মূলে মাটি থাকিলে কোনও বাধা বিপত্তি তাহার সে গতি রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের সদিচ্ছা পুত্র কন্যার উন্নতি ব্যতীত অবনতি সাধন করে না। তাঁহাদের সদিচ্ছা ও শিক্ষা প্রদান গুণে আপন পুত্র কন্যাগণের পক্ষে আপন আপন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অপরিহার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনের প্রবৃত্তি সমূহ যাহাতে কুপথে ধাবিত না হইতে পারে, কুদৃষ্টান্ত হইতে আপন পুত্র কন্যা যাহাতে সতত দূরে থাকে, তৎবিষয়ে প্রত্যেক মাতা পিতার সন্তানের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। সদাসৎ বিবেচনা করিয়া আপন শিশু সন্তানকে সতত সদুপদেশ প্রদান করতঃ সৎপথে চালিত করা প্রত্যেক মাতা পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সমস্ত পরে যথা স্থানে আলোচিত হইবে বর্ত্তমান এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জনক জননী যেরূপ আপনাদের সন্তানকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাও আশা করেন যে, সন্তান তাঁহাদের অবাধ্য না হয়, সন্তান অবাধ্য হইলে সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে।

করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহাদের কৃপায় আমরা এই জগতে আগমন করিয়াছি, যাঁহাদের করুণা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও আমাদের জীবন ধারণের কোনও প্রকার উপায় ছিল না; তাঁহাদের নিকট আমরা কত ঋণী।—

যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভাব নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষ শতৈরপি॥ মনু ২।২২৭

তাঁহাদের কথায় অবাধ্য হইয়া বা অন্য কোনও প্রকারে তাঁহাদের প্রতি অভক্তি করিলে নরকেও আমাদের গতি হয় না। মাতা পিতা দেবতার অংশ বলিয়া সতত পুজনীয়।

————পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্ত্ব——॥ মনু ২।২২৬

মাতা পিতার সর্ব্বদা সন্তোষ উৎপাদন করা আমাদের সতত কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করিলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ আমাদের মনেও একটা সন্তোষের ধারা প্রবাহিত করায়,—একটা অতি মহান্ আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। পিতৃ দেবের প্রীতি সম্পাদন করিলে মানব জীবনের একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আচরণ করা হয়। পিতৃদেবের প্রীতিসম্পাদন মানব জীবনের একটী অন্যতম তপস্যা। এই তপশ্চর্য্যাই অন্যতম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাচরণই স্বর্গের অন্যতম দ্বার। পিতৃ সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণও স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সেবক পুত্রকে সহর্ষে অভিনন্দন করিয়া থাকেন।—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

পিতার ন্যায় অন্যায়, সর্ব্ববিধ আদেশ পালন দ্বারা বা পিতার প্রতি পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য তাহার সর্ব্বথা অনুষ্ঠান করিয়া, যাহাতে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন হয়, এরূপ কার্য্য সকলেরই কর্ত্তব্য। পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তানের দায়িত্ব গুরুতর। পিতার অবাধ্য হইয়া—বিপথে বা কুপথে গমন করিলে সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না। নারী জাতীই Builders of the nation—প্রকৃত জাতি গঠন কর্ত্রী। তাঁহাদের প্রথম হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহাদের দ্বারা ঐ গুরুতর দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইবার আশা পোষণ করা যাইতে পারে। অতএব প্রথম হইতেই তাহাদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। অবিবাহিত কন্যাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা পিতার অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"পিতা রক্ষতি কৌমারে" ইত্যাদি (মনু) কন্যা যতদিন অবিবাহিত

থাকিবেন, ততদিন সর্ব্বতোভাবে পিতার অধীন থাকিবেন। পিতা সর্ব্বদাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এই বিশ্বাসে তাহাদের যেন সর্ব্বদা মনে থাকে, এবং এই বিশ্বাস যেন কখনই তাহাদের কোনও প্রকার অবাধ্যতার চিহ্ন বাড়াইতে না দেয়। অবাধ্যতা অভক্তির চিহ্ন। পিতার প্রতি কোনও রূপ অভক্তি প্রদর্শিত হইলে তাহাতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

পিতার ন্যায় মাতার বাধ্য থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রতিও ভক্তি প্রদর্শন করা কন্যাগণের (পুত্র সন্তানের ন্যায়) মান্য করা কর্ত্তব্য। মাতা—পিতা—পার্থিব দেবতা। তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া তাহাদের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করিতে নাই। মাতা বড়, কি পিতা বড়, একটু বড় হইয়া এইরূপ একটা প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হয়। এবং কে অধিক ভক্তির পাত্র সেই চিন্তা মন আলোড়িত করিয়া থাকে। প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে এবং কেহও কোন কালে এ প্রশ্নের সমাধান করিতেও পারিবেন না। মাতা শ্রেষ্ঠ কি পিতা শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্নের মত বোধ হয় জটিল প্রশ্ন আর নাই। সাধারণতঃ "পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ এ তর্কের দুই দিকেই বলিবার আছে। এ বিরোধ এই বলিয়া মিটানো যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষগণ; কোন কোনও বিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু পুরুষোচিত ওজস্বী পুরুষেরা তাহাতে চিরদিনই শ্রেষ্ঠ থাকিবেন; যাহা কিছু সুকোমল সস্নেহ তাহাতে পুরুষেরা নারীদিগকে কখনই পরাজিত করিতে পারিবেন না।

ক্রমশঃ।

পন্থা-পরীক্ষা।

লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

"সংসারের দুই পন্থা,—যে পন্থায় ইচ্ছা, সেই পন্থায় গমন কর।" এই একটী ধর্ম্মসম্মত—সাধু সম্মত উপদেশ। মায়াময় মহেশ্বর মধ্যে মধ্যে মায়ারূপ ধারণ করিয়া সংসারের দুই একটী প্রাণীকে ছলনা করেন, আমাদের পৌরাণিক ইতিহাসে এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ আছে। জনক জননী উভয়ে হাসিতে হাসিতে করাত ধরিয়া পুত্রমুণ্ডচ্ছেদন করিলেন, অতিথি সেবার্থে সেই শিশুমাংস রন্ধন করিয়া দিলেন, ভোজনের সময় সেই পুত্র আবার সজীব হইয়া কোলে আসিল; বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ ঐরূপে দাতাকর্ণকে ছলনা করিয়াছিলেন।

এতদূর উচ্চ দৃষ্টান্ত অধিক না থাকিলেও তুলনাংশে অনুরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত অল্প নাই। প্রচলিত গল্পাবলীর একটী দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রকটিত হইল।

লক্ষ্মীনারায়ণ একদা বিমানারোহণে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, রথ অন্তরীক্ষে রহিল, মায়াময়ের একটা নূতন মায়াখেলার ইচ্ছা হইল, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের বেশধারণ করিয়া তিনি পৃথিবীতে নামিলেন।

এক নগরে একটী রমণীয় সৌধ;—রাজপ্রাসাদের তুল্য মনোহর;—দ্বারে বিশাল বক্ষা দীর্ঘাকার অস্ত্রধারী প্রহরী। ক্ষীণকায় বৃদ্ধ অতিথি কম্পিত হস্তে একগাছি যষ্টিধারণ করিয়া কুব্জাকারে সেই অট্টালিকার দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন, "স্বস্তি" বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় দিলেন, —"দূরবাসী অতিথি—ক্ষুধার্থ।"

প্রহরীরা প্রভুর আদেশে অতিথি ফকির তাড়াইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, অশ্রাব্য কটু বাক্যপ্রয়োগে ব্রাহ্মণকে বিস্তর গালাগালি দিয়া দলের সর্দ্দার জমাদার সক্রোধে তাঁহাকে তাড়াইবার চেষ্টা পাইল।

"ক্ষুধার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত!"—এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে ব্রাহ্মণ শেষকালে বলিলেন, "একমুষ্টি তণ্ডুল।"

কর্ণে সে কথাটী স্থান না দিয়া সর্দ্দার দ্বারপাল আরও অধিক জোরে গালাগালি দিতে দিতে স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; ব্রাহ্মণও ভিক্ষা না লইয়া ছাড়িবে না, এই পণ করিয়া দাঁড়াইল;—দেউড়ীতে মহা গণ্ডগোল বাধিল।

গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর কর্ত্তা তাড়াতাড়ি সেইখানে আসিয়া হাজির হইলেন, বৃত্তান্ত শুনিয়াই মহা রাগিয়া উঠিলেন, কর্কশ ভাষায় গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিষম উপদ্রব!—বিষম উপদ্রব!—ভণ্ড ভিখারীদের জ্বালায় গৃহস্থ লোকের সংসার করা ভার হয়ে উঠেছে! যা—যা—চোলে যা!—অতিথ!—গৃহস্থের ঘটী বাটী চুরী করবার মতলবে মৌতাতি চোরেরা ভিজে বেড়ালের মত অতিথ সেজে আসে!—যা—যা—চোলে যা!—এটা অতিথশালা নয়—ভেটেরাখানা নয়,—যেখানে তোদের মতলব হাসিল হবার জায়গা, সেইখানে চোলে যা!"

কর্ত্তার হাতে একগাছা সোণা বাঁধা বেতের ছড়ি ছিল, সরোষে সেই ছড়ী ঘুরাইয়া তিনি সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে পঁচাশি সিক্কার ওজনে এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

ঊর্দ্ধদিকে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠে উপবীত জড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ!—তোমার জয় জয়কার হোক!—ধনপুত্রে লক্ষ্মী

লাভ!—ধনপুত্রে লক্ষ্মী লাভ! আরও ধন বাড়ুক—আরও ছেলে বাড়ুক—আরও লক্ষ্মী বাড়ুক!—এই পৃথিবীতে যত রকম ভোগবিলাস আছে, সব তুমি ভোগ কর। আমার ক্ষুধা আমাতেই থাক, আমি চল্লেম্। স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ।"

অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন, সদর দরজা বন্ধ করিয়া, দ্বারপালগণকে নূতন উপদেশ দিয়া, মনের আহ্লাদে বেত্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে কর্ত্তাবাবু বাড়ীর ভিতর গেলেন। ব্রাহ্মণ ওদিকে এক গরীব গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষুধা জানাইয়া, অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন। গৃহস্থেরা ব্রাহ্মণ,—স্ত্রীপুরুষ, একটীমাত্র পুত্র সন্তান, বয়স এই সবে তিন বৎসর,—একখানি মাটির ঘর, চালের সব দিকে খড় নাই, সংসারে কষ্টের এক শেষ। ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন, কি উপায় হয়?—বঞ্চিৎ হইয়া অতিথ ফিরিয়া গেলে সংসার জ্বলিয়া যাইবে, গরীব দম্পতীর এ জ্ঞান বেশ ছিল, সেই জ্ঞানযোগে যথেষ্ট ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বসাইয়া, পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া, গৃহে যাহা কিছু ছিল সংগ্রহপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণী পরমশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরম আদরে ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দিলেন, শিশুটীর জন্য এক পোয়া দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া ছিল, শেষ ভোজনে ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত সেটুকুও বাহির করিয়া দিলেন। চর্ব্ব-চূষ্যপেয় এই ত্রিবিধ ভোগে ব্রাহ্মণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

"আমরা বড় গরীব, আমাদের কিছুই নাই, আশ মিটাইয়া আপনার সেবা করিতে পারিলাম না, এই বড় খেদ রহিয়া গেল।"—ব্রাহ্মণের পদতলে পতিত হইয়া দরিদ্র বিপ্রদম্পতী এইরূপ কাতরতা জানাইয়া অন্তরস্থ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হুঁ!—তিনদিনের মধ্যে তোমার ঐ ছেলেটা মরুক—সব দুঃখ ঘুচিবে।"—ব্রাহ্মণ দম্পতীকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ (?) করিয়াই অতিথি ব্রাহ্মণের দ্রুত প্রস্থান।

অন্তরীক্ষে পুষ্পক রথে লক্ষ্মীদেবী বসিয়াছিলেন, তথা হইতে মায়াময়ের ঐ দুই মায়ার খেলা দেখিলেন; মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা বুঝিতে পারিয়া ও ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! এ তোমার কিরূপ লীলা?—কত রকম লীলাখেলাই যে তুমি জান, ত্রিলোকের লোকে তাহার অণুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না!"

ঠাকুর বলিলেন,—"এই রকম লীলাই জগৎবাসীর শিক্ষার স্থল। দাম্ভিক ধনপতির বাড়ীর দ্বারবানেরা আমাকে কটুবাক্যে গালাগালি দিল, প্রহার করিতে

আসিল, ইহা তাহাদের দোষ নয়;—মনীষের যেমন শিক্ষা তাহাই তাহারা করিয়াছে; তাহাদের এ দোষ অবশ্য ক্ষমার যোগ্য; পাষণ্ড গৃহস্বামী আমাকে বেত্রাঘাত করিয়াছে, মনে মনে আমি হাস্য করিয়াছি; লোকটা বিষয়-মদে মত্ত,—মদের ঘোরে অন্ধ, সে এখন চর্ম্মচক্ষে ভালমন্দ কিছুই দেখিতে পায় না; সেই জন্য আমি তাহার আরও মদ বাড়াইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি; মদের বিষ চরম সীমা স্পর্শ করিলেই অধঃপতন হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইবে, আমার আশীর্ব্বাদের এই ফল। আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দারিদ্র্য-দহনে দগ্ধ হইয়াও যেরূপ আন্তরিক ভক্তিতে আমার সেবা করিয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, পরমার্থ পথে তাহাদের মন অনেকদূর অগ্রসর; তাঁহাদের ভব-বন্ধন মোচন করিয়া দেওয়াই উচিত হইতেছে। বন্ধন মোচনের একটি বাধা মায়ার আকর্ষণ,—আকর্ষণের হেতু ঐ পুত্রটী;—যত অগ্রে মায়ামুক্ত করিয়া শেষে বন্ধনমুক্ত করাই ধর্ম্মানুসারে যুক্তিসঙ্গত; অতএব আমি তাহাদের সেই মায়ার পুতুল পুত্র বিনাশের বর দিয়াছি। মায়ার পুতুল অদৃশ্য হইলে আর তাহার আকর্ষণ থাকিবে না, ধর্ম্মপথগামী পিতা মাতার মন নিরন্তর পরমার্থ পথে ধাবিত হইতে থাকিবে।

এক মনে প্রভুবাক্য শ্রবণ করিয়া জলধিকুমারী কমলাদেবী গলবস্ত্রে প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিলেন, "লীলাময়! মঙ্গলময়! দয়াময়! যে তোমার পাদপদ্মে সেবা করে, ত্রিজগতে সেই পুণ্যাত্মাই ধন্য——তাহারই জীবন সার্থক।

—*—

তৈল ঘৃত।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

তৈল ঘৃত যে কত উপকারী, তাহা এক মুখে বলা যায় না, কিন্তু বর্ত্তমানে তৈল ঘৃতের ব্যবহার এক প্রকার রহিত হইয়াছে। তৈল ঘৃত পান ও মর্দ্দন এক্ষণে অসভ্যতার লক্ষণ। ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

নানা কারণে শরীর সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাত শুক্র ক্ষয় ও নানা প্রকার রোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে কোন কারণেই হউক, শরীরে যে স্নেহ আছে, তাহার অংশ কম পড়িলে, মেসিন ভাল চলে না। শুক্র দেহের স্নেহ, সন্ধিস্থানে যে শ্লেষ্মা থাকে তাহাও স্নেহ। স্নেহ শব্দে তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত পদার্থ কিম্বা বাঙ্গালায় যাহাকে তেল্ তেলে বলে,

তাহা যাহাতে থাকে, সেই পদার্থ; প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে এই পদার্থ আছে, না থাকিলে, দেহরূপ মেসিন কিছুতেই চলিতে পারে না। শরীরের সন্ধি সমূহে শ্লেষণ নামক যে পদার্থ থাকে, তাহাও স্নিগ্ধপদার্থ। এই পদার্থ সন্ধি স্থানে আছে বলিয়া জীব জন্তু হস্ত পদাদি চালনা করিতে পারে। কোন অঙ্গের সন্ধি স্থলের এই স্নেহ বিলুপ্ত হইলে, সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, শুষ্ক হইলে সেই অঙ্গ আর খেলেনা অর্থাৎ চালনা করা যায় না, চালনা করিতে না পারার কারণ আকুঞ্চন ও প্রসারণের অভাব, ইহাকেই বাত বলে। এতদ্ব্যতীত দহন শোষণাদির জন্য শরীরে চর্ব্বির অংশ কম পড়ে, চর্ব্বির ভাগ কম পড়িলে, শরীরে আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না, শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন হয়। যে জন্তুর শরীরে চর্ব্বি যত বেশী, তাহার শরীরে রক্ত এবং বল তত বেশী। যাহার শরীরে চর্ব্বি যত কম, তাহার শরীরে রক্ত এবং বলও তত কম। আবার যাহার শরীরে বল যত বেশী তাহার শ্বাস প্রশ্বাস তত বেশী জোরে অথচ আস্তে আস্তে সম্পন্ন হয়, এবং যাহার শরীরে বল যত কম, তাহার শ্বাস প্রশ্বাস তত কম জোরে অথচ দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইতর প্রাণীর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া দর্শন করিলে, এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণ, শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যখন বাহিরের বায়ু গ্রহণ করা যায়, তখন ফুস্ ফুস্ ফুলিয়া উঠে, সেই চাপে সকল শরীরে বায়ু প্রসারিত হয়। আবার যখন বায়ু ত্যাগ করা যায়, তখন ফুস্ ফুস্ ছোট বা সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ যে কেবল ফুস্ ফুসেরই হয়, তাহা নহে, রস বহা ও রক্ত বহা সমস্ত ধমনীর, তথা সমস্ত অবয়ব ও প্রত্যেক লোম কূপের পর্য্যন্ত হয়। ফলতঃ এই আকুঞ্চন প্রসারণেই দেহ তথা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। ইহা বায়ুর ক্রিয়া। বায়ু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা সর্ব্বদা কম্পিত করিতেছে। এই কম্পন ও কম্পন হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ জলীয় দ্রব্য ও শরীরের স্নেহ পদার্থকে শোষণ করে। এই শোষণ ও দহনের প্রশমনার্থ স্নেহ পদার্থের প্রয়োজন। শোষণ দহনের প্রভাব নিবারণার্থে যেমন বহির্জ্জগতে জলের প্রয়োজন, তদ্রূপ দেহ মধ্যে চর্ব্বি ও শ্লেষ্মার প্রয়োজন। পরন্তু চর্ব্বি বা স্নেহময় পদার্থ না থাকিলে, শরীর আকুঞ্চিত—ও প্রসারিত—হয় না, লোম কূপের ছিদ্র সকল বুজিয়া যায় ও ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কঠিন মল ত্যাগ কালে যে কুন্থনের বেগ দিতে হয়, সেই বেগে

ইহার বিপরীত অবস্থা আকুঞ্চন। যাহার শরীরে এই স্নেহময় পদার্থ যত বেশী আছে, তাহার শরীর তত অধিক চক্‌চকে, তাহার শরীরে আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া তত ভাল হয়, এবং তাহার স্বাস্থ্যও তত ভাল থাকে। এঞ্জিনে মধ্যে মধ্যে তৈল না দিলে, সজ্বর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। গাড়ীর চাকায় তেল না দিলে চাকা ঘুরিতে ঘুরিতে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় এবং গাড়ী জ্বলিয়া উঠে। যেমন গাড়ীর চাকা বা এঞ্জিন শরীরও তদ্রূপ। শরীরে মধ্যে মধ্যে তৈল দিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে যে সকল তৈল ও ঘৃত পান ও মর্দ্দনের ব্যবস্থা আছে, তাহা বহুভেষজপক, সুতরাং অতি উপকারী। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর পাচকাগ্নি এতই নিস্তেজ যে, তৈল ঘৃত অনেক স্থলে পরিপকই হয় না, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ শরীরেই তৈল ঘৃত বেশী উপকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে শরীরও রুক্ষ বুঝিতে হইবে, কারণ রুক্ষ শরীর ব্যতীত মল কদাপি কঠিন হইতে পারে না।

তৈল ঘৃত প্রয়োগের ইহাই প্রশস্ত সময়। এই অবস্থায় তৈল ঘৃত প্রয়োগ করিলে অসাধারণ উপকার হয়। অপান বায়ু ঊর্দ্ধাকর্ষণে ও সঙ্কোচন শক্তিতে গ্রহণী নাড়ী সঙ্কুচিত হইয়া কোষ্ঠ কাঠিন্য জন্মায়, তৈল ঘৃত পানে গ্রহণী নাড়ীর ছিদ্র সকল প্রসারিত ও বায়ুর সঙ্কোচন শক্তির হ্রাস হওয়াতে কোষ্ঠ খোলসা হয়। ইহাকে অপান বায়ুর অনুলোম বা অধোগামিনী ক্রিয়া কহে। তৈল ঘৃত পানে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, মর্দ্দনেও সেই কার্য্য হয়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয়। পাতলা দাস্তে তৈল ঘৃত প্রয়োগ অকর্ত্তব্য। কারণ অল্প আগুণে স্নেহ প্রদান করিলে আগুণ নিবিয়া যায়।

বহুমূত্র তথ্য ও চিকিৎসা।

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু
আই, এস, ও এম, বি, এফ,, সি, এস, মহোদয়ের ইংরাজী
প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা
অনুবাদিত।

লক্ষণ।

এই পীড়া ইউরোপেই হউক আর ভারতেই হউক দুইটী আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে,—তরুণ ও পুরাতন। ভারতে তরুণ বহুমূত্র বড় বেশী দেখা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তরুণ পীড়া অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে রোগীও অল্পদিনেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃদু বীর্য্য পুরাতন বহুমূত্র সাধারণতঃ মধ্য-বয়স্ক ও প্রবীণ বয়স্ক লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রোগীর বিশেষ কষ্ট হয় না, পথ্য বিষয়ে সতর্ক হইলেই সচরাচর পুরাতন বহুমূত্রের উপশম হইয়া থাকে। পুরাতন আকার প্রথম প্রথম ক্ষতিজনক না হইলেও ইহা কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠে ও তখন রোগীকে অভিভূত করিয়া ফেলে। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনে ও পথ্যের সতর্কতায় এই তীব্র মূর্ত্তির পুরাতন বহুমুত্র পীড়ার উপশম হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রায়ই আরোগ্য হয় না।

ইংরাজী পুস্তকে এই পীড়ার যে, সকল লক্ষণ লিপিবদ্ধ আছে; তাহার সহিত ভারতীয় পীড়ার লক্ষণগুলি অবিকলরূপ সামঞ্জস্য হয় না। পীড়ার তীব্রত্ব বিষয়েই পার্থক্য। আমি নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম; উহাতে ভারত ও ইউরোপের বহুমুত্র বিষয়ক পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) পীড়ার আক্রমণ।—সাধারণতঃ এই পীড়া যেন চুপে চুপে আসিয়া আক্রমণ করে। এই পীড়ায় যে ধরিয়াছে, কখন কখন রোগী বহু দিনেও তাহ জানিতে পারে না। মুত্রে পিপিলিকা লাগিয়াছে, ইহা দেখিয়াই রোগীর অনেক সময় প্রথম সন্দেহ হয় যে, হয়তো ব্যারাম হইয়াছে, তখন সে ডাক্তারের নিকটে যায়। তখন প্রস্রাব পরীক্ষা হয় ও শর্করা ধরা পড়ে। অধিকাংশ স্থলেই পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করায় বা প্রস্রাবের বেগ হওয়ায় (বিশেষতঃ রাত্রি কালে) এবং অধিক মাত্রায় প্রস্রাব হওয়ায়, রোগীর চৈতন্য হয়। কোন কোন স্থলে শরীরে অনেকগুলি ফোঁড়া দেখা দেয়, কিম্বা মাথা ঘোরে বা দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়; তখন মুত্র পরীক্ষায় সমধিক মাত্রায় শর্করা-নিঃস্রাব ধরা পড়ে। পুনঃ পুনঃ মুত্র ত্যাগে বা অধিক মাত্রায় প্রস্রাব হওয়ার পর মুখ শুষ্ক হইতে পারে, তৃষ্ণা হইতে পারে, দুর্ব্বলতার অনুভব হইতে পারে। এরূপ স্থলে রোগী শীঘ্রই মারা পড়ে। মানসিক আঘাত লাগিলে এই পীড়ার আকস্মিক আক্রমণ দেখা যায়; এরূপ ক্ষেত্রে যাবতীয় সাংঘাতিক লক্ষণ যুগপৎ আসিয়া উদয় হয়।

(২) পিপাসা।—কেবল পুরাতন আকারের বহুমুত্র পীড়ায় পিপাসা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায় না। এরূপ স্থলে মুত্রের পরিমাণও সচরাচর অত্যধিক হয়

লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়; পিপাসাও অতি তীব্ররূপ হইয়া থাকে। অল্প সময় পর পর রোগী খুব বেশী পরিমাণে জল পান করে।

(৩) মূত্র।—মৃদু পীড়ায় মূত্রাধিক্য একটী প্রধান লক্ষণ নহে। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ প্রস্রাবের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টায় ৫০ হইতে ৭০ আউন্সের মধ্যে। কঠিন অবস্থায় প্রস্রাবের সংখ্যা ও পরিমাণ উভয়েই বৃদ্ধি পায়; তখন স্বাভাবিক অপেক্ষা ৪ হইতে ৬ গুণ পর্য্যন্ত দেখা দেয়। শর্করা মূত্রে দ্রব অবস্থায় থাকে; সুতরাং প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হইলেই যে শর্করার ভাগ কম হইবে, তাহা নহে। বরং প্রস্রাবের পরিমানের সঙ্গে সাধারণতঃ শর্করার পরিমানও বৃদ্ধি হইতে থাকে। যে প্রস্রবের মধ্যে অধিক মাত্রায় শর্করা নিঃসৃত হয়, তাহা বিবর্ণ ও প্রচুর। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে রোগী বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু কোন কোন রোগী আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রস্রাবের পরিমান বেশী হইলে বিরক্তির সঙ্গে বেশ একটু আনন্দও অনুভূত হইয়া থাকে।

যে সকল স্থলে গুরুতর মানসিক আঘাতে এই পীড়া অকস্মাৎ দেখা দেয়, আমি দেখিয়াছি, সেরূপ স্থলে রোগী নিকটাবর্ত্তীস্থানে একটী পাত্র রাখে, নিরন্তর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঐ পাত্রে কয়েকদিন ধরিয়া প্রস্রাব করিতে থাকে এরূপ স্থলে মূত্রের সহিত এত অধিক শর্করা নিঃসৃত হয় যে, সামান্য একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই ঐ মূত্রের ফোঁটা ঘন সরবতের ন্যায় আঠা আঠা হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে রোগী অত্যন্ত অভিভূত হইয়া থাকে, বসিয়া থাকিবার শক্তি টুকুও তাহার থাকে না, দারুণ পিপাসায় রোগী যাতনা পায়। এরূপ ঘটনায় রোগীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা পূর্ব্বে বলা সচরাচর বড়ই কঠিন। কিন্তু এতদবস্থা হইতেও আমি অনেককে বাঁচিতে দেখিয়াছি; দেখিয়াছি, এই তীব্র ভাব কাটিয়া গেল, রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিল, রোগী বেশ-একটু সুস্বাস্থ্যের সহিত কয়েক বৎসর জীবিত থাকিল।

যেখানে উদ্ভিদ্-অম্লজ-ক্ষার নিঃস্রাব (oxaluria) ঘটিয়া থাকে, আমি দেখিয়াছি কেবল সেই স্থানেই পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা হইলেই রোগী বুঝিতে পারে যে, তাহার বহুমূত্র হইয়াছে। মূত্র পরীক্ষা ব্যতীত মনের শান্তি হয় না। উহা হইলে, দিবাভাগেই পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইয়া থাকে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব।—আমি যে সমুদয় রোগী দেখিয়াছি, তন্মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বোচ্চ ১·৪৪; সর্ব্ব নিম্ন ১০০২।

সর্ব্বোচ্চ শতকরা হিসাব ৭। দেখা যায়, প্রস্রাবে যতই অণ্ডনালিক পদার্থের বৃদ্ধি পায়, শর্করার পরিমান ততই হ্রাস পাইতে থাকে। বহুমুত্র রোগীর জ্বর হইলে সাধারণতঃ তাহার মুত্রে শর্করা থাকে না। কয়েকটী স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে যে,—বহুমুত্র রোগীর পৃষ্ঠব্রণ হইলে বিশেষতঃ অস্ত্রোপচারে ঐ ব্রণের পচা দুষিত আবরণ বিদুরিত হইলে পর রোগীর মুত্রান্তর্গত শর্করার পরিমান হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগী এই ব্রণ বিমুক্ত হইবার পরও কিছুদিন তাহার শর্করা নিঃস্রাব এইরূপ কমই থাকে।

যদি মুত্র পরীক্ষার প্রণালী অবগত হইবার ইচ্ছা আপনাদের থাকে, তবে যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, আমার মতে তদনুসারেই উহা শিক্ষা করা আপনাদের কর্ত্তব্য। আমি কয়েকটী দ্রব্যের নাম করিতেছি, সেগুলি প্রস্রাবের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। "ফিলিংস্ সলিউসন্" নামক রাসায়নিক দ্রব্যে ঐ গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে ঐ রাসায়নিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রস্রাব বাহী দ্রব্যগুলি এই:—মূত্রজ অম্ল (Uric acid), মূত্রজ-অম্লজ-ক্ষার (Urates), মুত্রক-ধাতু (Creatinin) ও শর্করাম্ল (Glycuronic acid)। শরীরে ইহাদিগের মাত্রাধিক্য হইলেই ইহারা বাহির হইয়া পড়ে। আবার বহুমুত্রজ শর্করা যোগেও প্রাগুক্ত সলিউসন্ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে; বিশ্লেষণ-ক্রিয়া শর্করা-যোগে হইল কি উপরোক্ত মুত্রজ-অম্ল প্রভৃতির যোগে হইল, এই সন্দেহ দূর করিতে হইলে মাত্র একটী বা দুইটী উপায়ে মুত্র পরীক্ষা না করিয়া অনেকগুলি উপায়ে উহা করাই কর্ত্তব্য। মুত্রের গুণ বা পরিমান ঠিক করিতে হইলে, সাধারণতঃ "লিকুইড পটাস্" নামক দ্রব্যের সহিত উহা ফুটাইলেই হইতে পারে। 'ফিলিংস্ সলিউসন্' নামক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারাও উহা ঠিক করা যায়। যাবতীয় সন্দেহ স্থলে, যখন অল্প অল্প শর্করা চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন "ফিনাইল্ হাইড্রোজিন্" নামক পরীক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই প্রণালীতে প্রস্রাবের মধ্যে কঠিন শর্করা খণ্ডের (oxazone crystal) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চূর্ণজ-ক্ষার oxalate of lime):—আমার প্রদত্ত বিবরণের শতকরা ২৬.৫০ স্থলে মুত্র-তলানির মধ্যে চূর্ণজ-ক্ষার দৃষ্ট হইয়াছিল। এমন অনেক ব্যক্তির বিষয় জানা গিয়াছে, যাহারা উদ্ভিদ্-অম্লজ-ক্ষার-নিঃস্রাব (oxaluria) পীড়ায় ভুগিতে ভুগিতে ক্রমে শেষ বয়সে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্রাবের মধ্যে শর্করা ও চূর্ণজ-ক্ষার একটার পর একটা নিঃসৃত হয়, এরূপ বিস্তর

পরিপাকাভাব জনিত একই পীড়ার দুইটী পৃথক্ লক্ষণ মাত্র।

মুত্রজ-অম্ল।—আমার প্রদত্ত বিবরণের শতকরা ১৪'৭০টী স্থলে মুত্রজ-অম্ল (Uric acid) দেখা গিয়াছে। বহুমুত্র রোগীরা ভ্রম বশতঃ অত্যধিক মাংসাহার করিয়া থাকেন, সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁহাদের অধিকাংশের মুত্র-মধ্যে মুত্রজ-অম্ল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অম্লরসস্রাব (Acetonuria)।—অল্প সংখ্যক বহুমুত্র রোগীর প্রস্রাবের মধ্যে Acetone ও diacetic acid নামক পদার্থ দেখা যায়। যে সকল বহুমুত্রে রোগীর এই রোগ-সুলভ অসাড় ভাব দেখা দিয়া ছিল, আমি প্রায়ই তাহাদের মুত্রমধ্যে ঐ দুইটী দ্রব্য দেখিতে পাই নাই। Acetone বা aceto-acetic acid ইহাদের কোনটীই বহুমুত্রজ অচৈতন্যের (coma) কারণ নহে। যে বিষ উদ্ভূত অসাড়াবস্থার কারণ, তাহার প্রকৃতিও যথার্থরূপ জানা যায় নাই। এক্ষণকার প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কটু-নবনী-গন্ধ বিশিষ্ট, তীব্র, উদ্বায়ী, তৈলাক্ত অম্লরস (oxy-butyric acid) রক্তের সহিত শরীরে সঞ্চারিত হইয়াই ঐ অসাড়তা উৎপাদন করে এবং এই অম্লরসের বিশ্লেষণেই acetone ও aceto-acetic acid নামক অম্লরস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধ লিখিয়া শেষ করিবার পর আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তিন জন প্রবীণ ব্যক্তি বহুমুত্রজ অসাড়তায় প্রাণ হারাইয়াছেন ও ১জন এই অসাড়তাবস্থা হইতে আরোগ্য হইয়াছেন। যে তিন জন মারা গিয়াছেন, তাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া বহুমুত্ররোগে ভুগিতেছিলেন। পীড়া কালে তাঁহাদের দুইজন একাধিক পৃষ্ঠব্রণে ভুগিয়াছিলেন। তিনটী স্থলেই মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে মুত্র পরীক্ষা হয়; তখন আংশিকভাবে অসাড়াবস্থা দেখা দিয়াছে। ঐ তিনটী রোগীর দুইটীর মুত্র মধ্যে acetone ও diacetic acid নামক অম্লের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তির বেলায় সেরূপ হয় নাই। বহুমুত্রজ অসাড়াবস্থা হইতে যিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি একজন বৃদ্ধ। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। তিনি আইন-ব্যবসায়ী; বহুদিন যাবত তিনি এই পীড়ায় ভুগিতেছেন। ইহাঁর অসাড়তাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল,—কিন্তু চিকিৎসায় উহা আরোগ্য হয়। ইহাঁর মুত্র মধ্যে acetone ও diacetic acid নামক অম্লের বিদ্যমানতা স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছে।

ফ্লেচার বলেন, অম্লরসস্রাব (acetonuria) বাল্যাবস্থার বহুমুত্রে প্রায়শঃই দৃষ্ট

গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। ফ্লেচার বলেন, ২৭টী বহুমূত্র রোগী বালকের মধ্যে ২৬টী রোগীর মূত্রে তিনি এই স্রাব দেখিয়াছেন।

(৪) ক্ষুধা।—ইউরোপ অঞ্চলের বহুমূত্র রোগের প্রধান লক্ষণ—প্রবল ক্ষুধা; কিন্তু উহা ভারতীয় রোগে সেরূপ বিবেচিত হয় না। অনেক রোগীর ক্ষুধা বেশী তীব্র বলিয়াই মনে হয় না। যাঁহারা বাল্যাবস্থায় বিখ্যাত ভোক্তা ছিলেন,—এমন বিস্তর ব্যক্তি এই পীড়াগ্রস্ত হইয়াও অধিক ভোজনাভ্যাস টুকু রক্ষা করিয়া চলেন।

(৫) কোষ্ঠ বদ্ধতা।—বহুমূত্র রোগীর সাধারণতঃ গুরুতররূপ কোষ্ঠ বদ্ধতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৬) ক্ষয়।—ভারতীয় বহুমূত্রে অধিকাংশ স্থলে ইহা দেখা যায় না। ভারতে এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, যখনই কোন ব্যক্তি স্থূলকায় হইতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার আত্মীয় স্বজনের সন্দেহ হয় যে, উহার হয়ত শীঘ্রই বহুমূত্র পীড়া হইবে। তাহার নিজেরও ঐরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তরুণ ব্যাধিতে অতি অল্প দিনেই রোগীর দৈহিক ভার কমিয়া যায় ও শরীর শীর্ণ হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে ইহাই প্রধান লক্ষণ। পায়ের ডিম শুষ্ক হইয়া পড়ায় পা দুই খানি অতিশয় রুগ্ন দেখায়। অনেক স্থলেই এই মাংস পেশীর ক্ষয় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

(৭) চর্ম্ম।—ইংরাজি পুস্তকে এই পীড়ায় চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যাইবার কথা খুব দেখা যায়। কিন্তু ভারতে সচরাচর এরূপ ঘটে না। এতদঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই রোগীর গাত্র-চর্ম্ম বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। তবে, কোন কোন রোগীর শীতকালেও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। চর্ম্মের স্বাভাবিক অবস্থা সত্ত্বেও রোগী তীব্র গাত্র জ্বালা অনুভব করিয়া থাকে। গাত্র-জ্বালা রোগীকে বড়ই অধীর করিয়া তুলে ও গাত্রে প্রায়ই ফোঁড়া বিস্ফোটক ও অন্যান্য চর্ম্ম সম্বন্ধীয় পীড়া দেখা দেয়। বহুমূত্রজ চর্ম্মরোগের প্রধান লক্ষণ এই যে উহা বড়ই চুলকাইতে থাকে, শীঘ্র সারিতে চাহে না ও পুনঃ পুনঃ হইবার আশঙ্কা থাকে। এগ্‌জিমা নামক ঘামাচি সদৃশ চর্ম্মরোগই সচরাচর হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। নিরন্তর শর্করাযুক্ত প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ায় গুহ্যদেশের চর্ম্মে সাধারণতঃ জ্বালা বোধ হয়; অনেক সময় ঐ চর্ম্ম ফাটিয়া ফাটিয়া যায়। ঐ কারণেই এগ্‌জিমা নামক চর্ম্মরোগোৎপন্ন কষ্টদায়ক ক্ষত স্ত্রীলোকের শরীরেও

দেখা দেয়। বহুমূত্র-রোগীর সাধারণতঃ ভয়ানক চুলকানি (Pruritis) হইয়া থাকে। বহুমূত্র পীড়ায়-রোগী আহার-জনিত পুষ্টি-লাভে বঞ্চিত হয়। ন্যূনাধিক সমস্ত শরীরটাই ব্যাহত হইয়া পড়ে। ঐ কারণেই চর্ম্মরোগ দেখা দেয়।

(৮) ক্লীবত্ব।—সচরাচর দেখা যায় যে, ভারতীয় বহুমূত্র রোগীর সন্তান-সন্ততি অনেকগুলি। ভারতে ক্লীবত্ব বহুমূত্র রোগের প্রধান লক্ষণ নহে। বহু বৎসর এই পীড়ায় ভুগিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, এমন বিস্তর ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে। অনেকদিন যাবত বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া মারাগিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বেশ সকলও সুস্থ রহিয়াছে, এমত স্থলও দেখা গিয়াছে। বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইলেই স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইবে, এ কথাটী ভারতে বড় খাটে না।

(৯) স্নায়বিক লক্ষণ নিচয়।—বহুমূত্র রোগীদিগের সচরাচর ঘুর্ণিরোগ হইয়া থাকে। এই মাথা ঘোরা দেখিয়াই অনেক সময় বহুমূত্র রোগের খোঁজ হয়।

স্নায়ু-বেদনা (Neuralgia) ও স্নায়ু প্রদাহ (Neuritis) কোন কোন বহুমূত্র রোগীকে বড়ই অভিভূত করিয়া ফেলে। এই দুইটী পীড়া সাধারণতঃ নিম্ন অঙ্গে হইলেও দেহের অন্য স্থানও আক্রমণ করিতে পারে। ক্ষয় রোগে অক্ষি গোলকের বহিরাবরণে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, যাহারা বহুমূত্র রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহাদেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। এবম্প্রকার পরিবর্ত্তন বশতঃই কোন কোন স্থলে বহুমূত্র রোগীর শারীর বিধান-বৈকল্য (Ataxy) ঘটিয়া থাকে; রোগী গাত্রে চিড়িকমারাবৎ ক্ষণস্থায়ী, তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করিয়া থাকে; তাহার মনে হয় যেন শরীর কোন কিছু দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে; ইত্যাদি।

বহুমূত্র রোগীরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে যে, তাহারা অসহ্য গাত্র-জ্বালা অনুভব করে। কোন কোন ডাক্তার বলেন যে, এই গাত্র-জ্বালা স্নায়ু প্রদাহেরই রূপান্তর।

(১০) অচৈতন্যাবস্থা।—বহুমূত্র রোগে জীবনের শেষ যবনিকা-পতন হইবার পূর্ব্বে অনেক স্থলে অচৈতন্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে, এই অবস্থাটী ক্রমশঃ আসিয়া দেখা দেয়; কিয়দ্দিন ধরিয়া অল্প অল্প ভ্রম ও তন্দ্রা হইতে থাকে; তার পর, জড়ভাব; পরিশেষে অচৈতন্যাবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থার পরই মৃত্যু ঘটে। এতদবস্থা কালীন রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে রোগীর প্রস্রাবের মধ্যে Acetic acid ও diacetic acid নামক অম্ল পাওয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ।

আস্থা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নৃপেন্দ্র নাথের সুসজ্জিত বৈঠকখানা। নৃপেন্দ্র ও অন্নদা ডাক্তার।

অন্নদা। অতসীর বের কিছু ঠিক হলো।

নৃপেন। হাঁ, এক রকম ঠিক হয়েছে। বিপিনের শাশুড়ী বিপিনকে দিয়ে অনেক করে ধরেছে, তাই রাজী হয়েছি।

অন্নদা। বিপিন বাবুর শ্বশুর অনেক পয়সা রেখে গেছেন। তা হলেও আপনার মতন বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মতন নয়।

নৃপেন। হাঁ, তবে কি জান, জানা শুনোর মধ্যে কাজে কাজেই রাজী হওয়া গেলো।

(এমন সময় Chiming ঘড়ি বাজিয়া উঠিল)

অন্নদা। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) সুন্দর ঘড়ি তো। এটা কবে আনালেন এ রকম ঘড়ি কখনও দেখিনি।

নৃপেন। তুমি দেখনি? এই মেলে এসেছে। ঐ ঘড়ির ন্যায় একটী জোড়া ডিউক অফ ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ড্রয়িং রুমএ আছে। বাবার আমল থেকে আমরা Benson Brothers এর খদ্দের, তাই আমাকে দশ হাজার টাকায় দিয়েছে।

(ঘনশ্যামের প্রবেশ।)

ঘনশ্যাম। কিহে নৃপেন, আছো কেমন?

নৃপেন। ও ঘনমামা, কবে এলেন?

ঘনশ্যাম। আজ সকালে এসেছি। এসেই শুনলুম দীনদয়ালের সঙ্গে কি এক ঝগড়া বাঁধিয়েছো। তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

নৃপেন। ঝগড়া! কার সঙ্গে ঝগড়া?

অন্নদা। ঘনশ্যাম বাবু আপনি বোলছেন কি? কোথায় রায় সাহেব আর কোথায় সেই ছোটলোক দীনদয়াল বোস। এদের মধ্যে ঝগড়া হতে পারে?

ঘনশ্যাম। বাঃ ডাক্তার বেশ বল্‌ছো। আচ্ছা নেপেন তোমার সামনে অন্নদা তোমার বেইকে ছোটলোক বোল্‌ছে, আর তুমি তাই শুন্‌ছো।

নৃপেন। ডাক্তার ঠিকই বোলেছে। আপনার কথায় ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে উষার বে দিয়ে, নিতান্ত আহাম্মকের কাজ করেছি। তাদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখ্‌তে চাইনা।

ঘনশ্যাম। তুমি দেখ্‌ছি মেজাজ একেবারে গরম করে, বসে আছ। শুনলুম ছ'মাস উষাকে সেখানে পাঠাওনি, পূজার সময় তারা তত্ব পাঠিয়ে ছিলো তাও লও নাই, তাদের লোকজনকে অবধি বাড়ী ঢুকতে দাও না, ব্যাপার খানা কি বলো দেখি? এত মেজাজ গরম কর্‌বার কারণটাই বা কি?

নৃপেন। জানেন তারা উষাকে কত কষ্ট দিয়েছে!

ঘনশ্যাম। না, সেই জন্যেই ত তাদের অপরাধটা কি এত গুরুতর জান্‌বার জন্ত ছুটে তোমার কাছে এলুম।

নৃপেন। কেন আপনি মামির কাছে, শোনেন নি?

ঘনশ্যাম। হাঁ, সব শুনেই ত আরও অবাক হয়ে গেছি। তাদের অপরাধের মধ্যে তোমার মেয়েকে রাধ্‌তে বলে। এইতে এত কাণ্ড করে তুলেছ।

নৃপেন। আমার মেয়ে কুড়ি টাকা মাহিনার কেরাণীর মেয়ের মতন রাধ্‌বে?

ঘনশ্যাম। কেন তোমার মা, মাসি, পিসি, মামি, ঠাকুমা যা করে গেছেন, তোমার মেয়েকে তা করাতে আপত্তিটা কি?

অন্নদা। উনানের তাত, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অপকারক।

ঘনশ্যাম। থাম্‌না ডাক্তার! তুমি আর ফেঁই ধরিয়ে দেও কেন? উনুনের তাত না থাক্‌লে স্বাস্থ্যটা যে, একেবারেই থাকে না। নেপেন দেখ কাজটা ভাল করোনি। বিনা কারণে কুটুম্বের সঙ্গে এ রকম করা তোমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। এখন আমার কথা শোন, এসব ঝগ্‌ড়া ঝাটী মিটিয়ে মেয়েকে সেখানে পাঠিয়ে দাও।

নৃপেন। আপনার কথায় বে দিয়ে ছিলুম বলে, মনে কর্‌বেন না যে, আবার সেই ছোটলোকের বাড়ী মেয়ে পাঠাবো।

ঘনশ্যাম। ছোটলোক ত কোন ছোটলোকমি করেনি। কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ করেছ। যেখানে মেয়ের বে দিয়েছ, সেখানে নরম

হওয়াই ভাল। অন্য কেউ হলে এতদিনে একটা কাণ্ড করে বস্‌ত, দীনদয়াল বোস বড় ভাললোক, তাই চুপ্ করে আছে।

নৃপেন। আপনি তবুও তাকে ভাললোক বল্‌ছেন। জানেন তারা ঊষাকে গাল দিতে এমন কি মার্‌তে অবধি বাকি রাখেনি।

ঘনশ্যাম। ওহে ওসব কথা ছেড়ে দাও। নভেল, টভেল পড়ে আজকালকার মেয়েরা জোনাকি পোকাকে আলেয়া মনে করে মুর্চ্ছা যায়। শাশুড়ী হাত ধরে খেতে বলে, তাইতে তোমার মেয়ে মনে কর্‌লে হাত মুচ্‌ড়ে দিলে আর তুমিও সেই কথা বেদবাক্য বলে ধরে নিয়েছো।

অন্নদা। আমি নিজে একজামিন্ করে দেখ্‌লুম কব্‌জির শির ও হাড়গুলো ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

ঘনশ্যাম। Aqua Lotion দিয়ে বুঝি সেই ভাঙ্গা হাত জোড়া দাও ডাক্তার! নেপেন আমি যা বল্‌ছি তোমার আর তোমার মেয়ের ভালর জন্যই বোল্‌ছি, যা করেছ, করেছ। এখন বেইয়াইয়ের কাছে মাপ চেয়ে এ ঝগ্‌ড়া মিটিয়ে ফেলো।

নৃপেন। ও কথা বল্‌বার জন্য আপনাকে এখানে আস্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল না।

অন্নদা। ঘনশ্যাম বাবু আপনি কি করে রায় সাহেবকে সেই পাজী ছোট লোকের কাছে ক্ষমা চাইতে বল্‌ছেন?

অন্নদা। দেখুন রায় সাহেব, আমার কি অপরাধ!

নৃপেন। মামা মনে রাখ্‌বেন, আমার বাড়ীতে আমার পরিচিত লোকের অপমান সহ্য কর্‌বোনা। আপনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ হতে পারেন, কিন্তু সহিষ্ণুতার সীমা আছে।

ঘনশ্যান। ডাক্তার কিছু মনে করো না। আমি বুড়ো মানুষ তায় মুখফোড় ফস্ করে সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে। আমার কথায় কি রাগ করতে আছে? আর নেপেন তুমি কিছু মনে করোনা। আমার কথা গুলো বিবেচনা করে দেখো আমি কিছু অন্যায় বলি নাই। (দীনদয়ালের প্রবেশ)

দীন। নমস্কার বেয়াই, কেমন আছেন, বাড়ীর সব খবর ভাল? ঘনশ্যাম বাবু নমস্কার, আপনি রয়েছেন, ভালই হয়েছে।

ঘনশ্যাম। কে? দীনদয়াল বাবু। নমস্কার, নমস্কার। বসুন! নেপেন,

নৃপেন। (দীনদয়াল ও ঘনশ্যামের দিকে পিছন ফিরাইয়া, অন্নদার প্রতি) ডাক্তার লেভির পোষাকটা কাকে অর্ডার দি বল দেখি। Ranken আর Horman দুজনেই ধরেছে। ঠাকুরদাদার আমল থেকে Rankenই আমাদের সব কাজ করে থাকে, তবে Horman রা একটা trial দেবার জন্য বড় ধরেছে।

ঘনশ্যাম। নেপেন ও সব কথা এখন থাক। তোমার বেয়াই এসে বসে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ কর।

নৃপেন। আমার অত সময়ও নাই, দরকারও নাই। চলে যেতে বলুন।

ঘনশ্যাম। নেপেন নেপেন বল্‌ছ কি? কি বেয়াই পেয়েছ তা এখনও বুঝতে পারছ না। দীনদয়াল বাবু! আমার অনুরোধ, নেপেনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। (দীনদয়ালের হাত ধরিল)

দীন। ঘনশ্যাম বাবু করেন কি, করেন কি? আমি কি কখনও বেয়াইএর উপর রাগ করতে পারি। বেয়াই যে কেন বউমাকে পাঠাচ্ছেন না বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, আর অনেক দিন বেয়াইএর সঙ্গে দেখা হয়নি তাই একবার এলুম।

নৃপেন। ডাক্তার নূতন ———

ঘনশ্যাম। (নৃপেনের কাছে উঠিয়া গিয়া) নেপেন কি পাগ্‌লামী করছ? বেয়াই নিজে এসে বল্‌ছেন, তার সঙ্গে মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। মিছে কেন একটা মনোমালিন্য করছ।

নৃপেন। মিছে কেন বিরক্ত করছেন। যা বল্‌বার বলে দিয়েছি, আমি সেখানে মেয়েকে পাঠাবো না।

দীন। বেয়াই ও কথা বল্‌লে কি চলে! বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমার বাড়ীতে না থাক্‌লে কোথায় থাক্‌বে?

অন্নদা। রায় সাহেব আজ বাগান যাবে বলেছিলে?

নৃপেন। হাঁ, এই বেলা যাওয়া যাক। কই হ্যায়—

ঘনশ্যাম। নৃপেন তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

(দরোয়ানের প্রবেশ)

দর। হুজুর!

নৃপেন। গাড়ী জোত্‌নে বোলো।

দর। বহুত আচ্ছা! (প্রস্থানোদ্যত)

নৃপেন। আউর দেখো!

দর। হুজুর!

নৃপেন। কাল ফজিলমে যো কালা ঘোড়া জোতাথা ও জোড়ি মাত জোতেগা।

দর। হুজুর!

নৃপেন। আর দুপুরমে জো লালজুড়ি জোতাথা, ওভি নেই মাঙতা।

দর। হুজুর!

নৃপেন। বিহান্‌মে যো সফেত জোড়ি জোতা ওভি দরকার নেই হায়।

দর। হুজুর!

অন্নদা। রায় সাহেব জুড়ির চেয়ে মটর শীগ্‌গীর হবে না?

নৃপেন। হাঁ ঠিক বলেছ। দেখো দরোয়ান!

দর। হুজুর!

নৃপেন। হাওয়াগাড়ী লে আমে বলো?

দর। বহুত আচ্ছা!

(দরোয়ানের প্রস্থান)

ঘনশ্যাম। জেপ্‌লিন টেপ্‌লিন আর কিছু বাকী নেইত। তাহলে এখন আমাদের দিকে একটু সময় দাও।

নৃপেন। আপনাকে কতবার বোল্‌বো। আমি মেয়েকে পাঠাবো না।

ঘনশ্যাম। নেপেন বুড়ো মামার খাতিরে না হয় পাঠাও। ছেলে বেলা কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, আমার কথাটাও কি রাখ্‌বে না?

নৃপেন। আচ্ছা বেশ, আপনি যখন বার বার বোল্‌ছেন পাঠাতে পারি। কিন্তু প্রথমে ওকে Apology কর্‌তে হবে, আর কখন ঊষাকে এরূপ ভাবে কষ্ট দেবে না। তা স্বীকার কর্ত্তে হবে।

দীন। ঘরের বউকে বেয়াই! কেউ কি কখনও কষ্ট দেয়? রান্না বান্না কাজ কর্‌তে বলা কি কষ্ট দেওয়া? মেয়েরা ত রেধে বেড়েই থাকে।

নৃপেন। আমার মত অবস্থার লোকের নয়!

ঘনশ্যাম। নেপেন ওকি একটা কাজের কথা হলো।

নৃপেন। আপনার খাতিরেই এ কথা বললুম, এতে রাজি না হয়, চলে যাক।—চাকর বামুনের মাইনে অবধি আমি দিতে রাজি আছি।

অন্নদা। রায় সাহেব অতি সদাশয়, তাই এতোতেও পাঠাতে চাইছেন।

ঘনশ্যাম। আর কেন বাবা এতক্ষণ বেশ চুপ করে ছিলে। আর থাক্‌তে

না পার, কর্পূর হয়ে উপে যাও। পাড়ার কলেরা হচ্ছে কমে যাবে। নেপেন তুমি পাগলের মতন এ সব কি বলছ! আর কাকে এ কথা বলছো। আবার বলছি, আমার কথা শোনো, তোমার ও রকম করা ভালো দেখায় না।

নৃপেন। মিছে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আপনার খাতিরে ঐ ছোট লোককে এতক্ষণ ঘরে বসতে দিয়েছি। অন্য লোক হলে বাড়ীতে ঢুকতে দিতো না।

দীন। বেয়াই! এতক্ষণ তোমার অপমান নীরবে সহ্য করেছি, কিন্তু তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ। এ ———

ঘনশ্যাম। (দীনদয়ালের হাত ধরিয়া) দীনদয়াল বাবু রাগ করবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। নৃপেন তোমার কি সমস্ত ভদ্রতা লোপ পেয়ে গেছে। Contractor ই কাজ করে, বাড়ীওলা ঠকিয়ে দুটো পয়সা করে, মনে করেছে, তোমার মত বড় লোক কেউ নাই। "বাপ পিতামহর নাম নাই, হীরে জলার নাতি" বেঙের আধুলি হয়ে আজ তুমি যে দীনদয়াল বাবুকে অপমান করেছো, তিনি যে কত মহৎ তা তুমি বুঝতে পার্ব্বে না, কোন মুখে আজ তাকে রাঁধুনি বামুনের মাইনে দিতে চেয়েছ! এখনও বলছি, আমার কথা শোনো। যদি মেয়ের ভাল চাও, দীনদয়াল বাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে তার সঙ্গে মেয়েকে পাঠিয়ে দাও।

নৃপেন। মেয়েকে ভাত দেবার ক্ষমতা আমার আছে। যে আমার চাকর হবার যোগ্য নয়, তার সঙ্গে আমি কুটুম্বিতা রাখতে চাইনা।

দীন। ভালো, আমি আর এখানে সময় নষ্ট করবার দরকার বিবেচনা করি না।

(দীনদয়ালের প্রস্থান)

ঘনশ্যাম। নেপেন কি কল্লি এরপর বুঝতে পার্ব্বি।

(ঘনশ্যামের প্রস্থান)

নৃপেন। চল ডাক্তার আমরাও এইবার যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

———:•:———

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

যখন প্রলয় জলে ভাস্‌ছিল সব, আঁধার চারিদিক্;—
একদিন হঠাৎ আঁধার ঠেলে ফুট্‌লো আলো ঝিক্ মিক্ ঝিক্ ঝিক্!
সোণার ডিম্ব ভাস্‌লো জলে, উঠ্‌লো জ্যোতির ঢেউ,
দেব্‌তা, মানব, দানব তখন ছিল না তো কেউ,
ছিল না তো রবির কিরণ, চাঁদের শীতল কর,
নীল গগনে তারার মালা ভুবন মনোহর,
তাই ভগবান্ ডিম্ব ভেঙ্গে ক'র্লে দু'ভাগ ঠিক্।
এক ভাগেতে আকাশ হ'ল, অন্য ভাগে ধরা,
হ'ল ধরা, নদী গিরিশ্রেণী, বৃক্ষলতায় ভরা,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা উঠ্‌লো আকাশে,
অসংখ্য দেব দানব মানব,—ভুবন-আবাসে
জন্মি' দেখি' বিশ্বশোভা, হাস্‌লো সুখে ফিক্ ফিক্ ফিক্ ফিক্।
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগপুঞ্জে উঠ্‌লো গেয়ে গান,
ফুট্‌লো কত কুসুম রাশি ছড়িয়ে মধুর ঘ্রাণ,
শান্ত ভীষণ পশু কত জুট্‌লো দলে দল,
আনন্দপুর শোভার আগার হ'ল ধরাতল,
মধুর তানে উচ্চারিত হইল সামাথর্ব্ব যজু ঋক্।

———:•:———

৫ জনক উবাচ।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥ ১॥
যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতোমম জগৎ সর্ব্বমথবা চ ন কিঞ্চন॥ ২॥
সশরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে॥ ৩॥
যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্॥ ৪॥
তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্॥ ৫॥

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ প্রাপ্তে জনক, তদভ্যাসে আনন্দ লাভ করতঃ, বলিতেছেন;—আমি নির্ম্মল, শান্ত, জ্ঞান—স্বরূপ, এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। কি আশ্চর্য্য! আমি এতকাল মোহকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম। ১।

আমি, যেমন একাকী এই দেহ প্রকাশ করিতেছি, সমগ্র জগৎ ও সেইরূপ প্রকাশ করিতেছি। সুতরাং এই বিশ্ব আমারই, অথবা আমার কিছুই নহে।—বিশ্ব আত্মময়, সমগ্র বিশ্ব এক আত্মা অথবা আমি; আমি ভিন্ন কিছুই নাই; তাহাতেই আমাতে বা আমার বলা যায়। আবার আমার কিছুই নহে বলিবার হেতু এই যে, আমি সমস্ত হইলে, আমি ভিন্ন আমার বলিবার আর কিছুই নাই। ২।

আমি সম্প্রতি কোনও আশ্চর্য্য কৌশলে শরীর ও বিশ্বে নির্লিপ্ত হইয়া, (অর্থাৎ এ সকল হইতে পৃথক হইয়া) পরমাত্মা দর্শন করিতেছি।—জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মদর্শন হওয়াই উক্ত কৌশল। ৩।

তরঙ্গ ও জল-বুদ্বুদ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৪।

বস্ত্র যেমন সূত্রসমূহ মাত্র হইলেও, বিভিন্ন আখ্যা ধারণ করিয়াছে, বিশ্বও তদ্রূপ আত্মা মাত্র হইলেও, বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। ৫।

যথৈবেক্ষুরসে কৢপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি কৢপ্তং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥ ৬ ॥
আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্‌জ্ঞানাদ্ভাসতে ন হি ॥ ৭ ॥
প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥ ৮ ॥
অহো বিকল্পিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥ ৯ ॥
মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং মষ্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥ ১০ ॥

শর্করা যেমন ইক্ষুরসে নিবিষ্ট এবং ইক্ষুরসও যেমন শর্করাময়, আত্মাও তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত ও ব্রহ্মাণ্ড আত্মাময়। ৬।

আত্মজ্ঞানের অভাবেই বিশ্ব অনুভূত হয়, আত্মজ্ঞান হইলে আর হয় না; যতক্ষণ না রজ্জুকে প্রকৃত রূপে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারা যায়, ততক্ষণই সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, রজ্জুজ্ঞান হইলে আর সর্প বোধে ভ্রম থাকে না।— একেবারে আত্মা ও প্রকৃতি উভয়বিধ জ্ঞান হয় না, একবার রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে, যেমন আর সর্প বলিয়া ভ্রম হয় না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান হইলে, আর সংসার ভ্রম হয় না। ৭।

এই বিশ্ব আমার নিজরূপেরই বিকাশ মাত্র; আমি তদতিরিক্ত আর কিছুই নহি। যখনই বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তখন আমিই প্রকাশিত হই।—বিশ্ব আত্মাময় এবং আত্মাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, আর কিছুই নাই। জগৎ সেই আত্মারই বিকাশ মাত্র। ৮।

যেমন ভ্রমবশতঃ শুক্তিকে রজত, রজ্জুকে ফণী, ও রৌদ্রকে বারি বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ আমিও অজ্ঞানতা বশতঃই বিশ্বরূপে কল্পিত হইতেছি মাত্র। ৯।

যেমন কুম্ভের উৎপত্তি ও পরিণাম মৃত্তিকা, তরঙ্গের জল, ও বলয়াদির স্বর্ণ, তেমনি বিশ্বেরও উৎপত্তি এবং পরিণাম আমি মাত্র;। ১০।

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্য মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥ ১১ ॥
অহো অহং নমো মহ্যম্ একোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্নগন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তিহি মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥ ১৩ ॥
অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাঙ্‌মনসি গোচরম্ ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্।
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫ ॥
দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বম্ একোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত বিশ্বসংসার বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হইবে না, আমি অবিনাশী, আমি অদ্ভুত; আমাকে নমস্কার। ১১।

আমি আশ্চর্য্য! আমাকে নমস্কার! আমি দেহধারী হইয়াও এক বিশ্বব্যাপী। আমি কোথাও যাইব না, কোথা হইতেও আসিব না দেহ অনন্ত অখণ্ড আত্মার অংশ মাত্র। ১২।

আমি আশ্চর্য্য! আমাকে নমস্কার; আমার ন্যায় কৃতীও আর কেহই নাই, কারণ, আমি স্পর্শ না করিয়াও এই বিশ্ব সংসার অনাদি কাল হইতে ধারণ করিয়া আছি। ১৩।

আমার কিছুই নাই, অথবা যাহা কিছু বাক্য ও মনের গোচর, সমস্তই আমার; আমি কি অদ্ভুত! আমাকে নমস্কার। ১৪।

অজ্ঞান বশতঃ, যে আত্মাকে জ্ঞান, জ্ঞেয়, অথবা জ্ঞাতা বলিয়া ভ্রম হয়, আমিই সেই নিরঞ্জন; বাস্তবিক পৃথক্ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কিছুই নাই। ১৫।

দ্বৈত ভাবই ক্লেশের হেতু; পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই মিথ্যা এবং আত্মা জ্ঞানময়, গুণময়, নির্ম্মল ও অদ্বিতীয়, এই জ্ঞান ব্যতীত উক্ত ক্লেশের অন্য প্রতিকার নাই। ১৬।

বোধরূপোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃষতো নিত্যং নির্ব্বিকল্পে স্থিতির্মম॥ ১৭॥
অহো! ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
নমেবন্ধোঽস্তিমোক্ষো বা ভ্রান্তিঃশান্তা নিরাশ্রয়া॥ ১৮॥
সশরীরমিদং বিশ্বংন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধশ্চিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কথং কল্পনাধুনা॥ ১৯॥
শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ॥ ২০॥
অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক রতিং করবাণ্যহম্॥ ২১॥
নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদযজ্জীবিতে স্পৃহা॥ ২২॥

আমি জ্ঞানস্বরূপ, অজ্ঞান বশতঃই বিভিন্ন উপাধি কল্পনা করিয়াছিলাম। নিত্য এইরূপ অনুভব করিতে পারিলেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় অবস্থিত থাকিব। ১৭।

কি আশ্চর্য্য! এই বিশ্ব আমাতেই অবস্থিত (অর্থাৎ কল্পিত মাত্র), অথচ বাস্তবিক আমাতে বিশ্ব নাই; আমার ভ্রম, অবলম্বনাভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, আমি বদ্ধ বা মুক্ত কিছুই নহি।—যেখানে দেহ, মন প্রভৃতি কিছুই নাই, সেখানে ভ্রম কোথায় থাকিবে? । ১৮।

আর আমার কল্পনাই বা থাকিবে কিরূপে? এই দেহ ও বিশ্ব কিছুই নহে, আত্মা বিশুদ্ধ ও চিন্মাত্র ইহা ত স্থির হইয়াছে। ১৯।

দেহ, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মোচন ও ভয়, এ সমুদায়ই কল্পনামাত্র, সুতরাং চিন্ময় আত্মার আর কিছুই কার্য্য নাই।—স্বর্গনরকাদি সমস্ত জ্ঞান দেহাভিমানী দ্বৈত-জ্ঞানযুক্ত মানবেরই থাকে। । ২০।

আমি বহুলোকমধ্যে থাকিয়াও, দ্বিতীয় কিছুই না দেখিতে পাওয়ায়, সমস্ত বিজন কানন-স্বরূপ অনুভব করিতেছি; সুতরাং আমার আর কিসে প্রবৃত্তি হইবে? । ২১।

আমি স্বয়ং দেহ নহি, আমার দেহ নাই, আমি জীব নহি, আমি চৈতন্য,

অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্ত মহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে॥ ২৩॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ॥ ২৪॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥ ২৫॥
ইত্যাত্মানুভবোল্লাসো নাম দ্বিতীয়ং প্রকরণম্॥ ২॥

মাত্র। তবে আমার জীবনে যে আস্থা ছিল, তাহাই আমার বন্ধন। ২২।

আমি (অর্থাৎ আত্মা) অনন্ত মহাসাগরবৎ। এই মহাসাগরে চিত্তরূপ বায়ু উদিত হওয়াতেই, সহসা বিশ্বসংসার রূপ বিচিত্র কল্লোল সমুত্থিত হইয়াছে; আবার সেই বায়ু নিবৃত্ত হইলেই, জীবরূপ দুর্ভাগ্য বণিকের বিশ্ব সংসাররূপ তরী বিনষ্ট হয়; এই মৎস্বরূপ অনন্ত মহাসাগরে জীবসমূহ বীচিবৎ উত্থিত ও বিনষ্ট হইতেছে, খেলিতেছে, এবং প্রকৃতিতেই লীন হইতেছে।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সংসারের সুখ দুঃখাদি মানসিক বিকার মাত্র; আত্মা এক, পূর্ণ, নির্ম্মল, চিন্ময় ও দ্রষ্টা। জীবাত্মা সেই পূর্ণ, অদ্বিতীয় পরমাত্মার অংশ মাত্র। সুতরাং, আমিও যেমন সেই পূর্ণের অবিভক্ত অংশ, ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জীব ও স্থাবর জঙ্গম সকলেই তদ্রূপ। ক্রমাগত এই ভাবনার অভ্যাসে ঐ ভাব সংস্কারগত হইয়া ক্রমে অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই সেই দ্রষ্টৃভাবে অবস্থান হয়। ইহাই আত্মানুভবানন্দ। এই আনন্দ অপেক্ষা পরমানন্দ আর কিছুতেই অনুভূত হয় না। ২৩—২৫।

তৃতীয়-প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
তবাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য কথমর্থার্জ্জনে রতিঃ॥ ১॥
আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতির্বিষয়ভ্রমগোচরে।
শুক্তেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে॥ ২॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি॥ ৩॥
শ্রুত্বাপি শুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্।
উপস্থেঽত্যন্তসংসক্তো মালিন্যমধিগচ্ছতি॥ ৪॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জ্জানত আশ্চর্য্যং মমত্বমনুবর্ত্ততে॥ ৫॥

তুমি তত্ত্বজ্ঞানে (অর্থাৎ জ্ঞান যোগদ্বারা) আত্মাকে এক এবং অবিনশ্বর রূপে জানিতে পারায়, আত্মদর্শী এবং চাপল্য বর্জ্জিত হইয়াও কেন অর্থোপার্জ্জনে বাসনা করিতেছ?—অর্থাদি অনিত্য জানিলে তাহাতে অনুরাগ হওয়া অসম্ভব। ১।

আত্মজ্ঞানের অভাব বশতঃই ভ্রান্তিহেতু পরিদৃশ্যমান বিষয়ে প্রীতি হয়। যেমন শুক্তি বলিয়া না জানিতে পারাতেই রৌপ্যভ্রমে তাহাতে লোভ হইয়া থাকে। ২।

সাগরে তরঙ্গের ন্যায়, যাহাতে এই বিশ্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, আমিই সেই, ইহা জানিয়াও কেন দীনের ন্যায় ধাবিত হইতেছ?—বায়ুবশে সমুদ্রজলের ঊর্দ্ধভাগের কম্পন হেতু তরঙ্গ হয়, উহা জলেরই রূপান্তর মাত্র; তদ্রূপ এই বিশ্বও আত্মারই রূপভেদ মাত্র; আত্মাই বিশ্বরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে; আমি সেই আত্মা, ইহা জানিলে এই বিশ্ব যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহার দীনভাবাপন্ন হইবার হেতু কি থাকে?। ৩।

আত্মা বিশুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ ও অতি সুন্দর, ইহা শুনিয়াও লোকে কাম-পরতন্ত্র হইয়া মলিন ভাবাপন্ন হয়!। ৪।

আত্মা সর্ব্বভূতে এবং ভূতসমূহও আত্মাতেই অবস্থিত, ইহা বিলক্ষণ জানিয়াও,

আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্য্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥ ৬ ॥
উদ্ভূতং জ্ঞানদুর্মিত্রমবধার্য্যাতিদুর্ব্বলঃ।
আশ্চর্য্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ ॥ ৭ ॥
ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥ ৮ ॥

যতি ব্যক্তিরা যে মমত্বের বশ হন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।—আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিও, 'ইহা আমার ইত্যাদি' ভ্রান্ত জ্ঞানে মুগ্ধ হন, ইহাই সংসারে বিচিত্র "ভার্গবতী" মায়া। । ৫ ।

মোক্ষার্থে অবস্থিত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মাবলম্বীও, কামান্ধ হইয়া, কেলিমুগ্ধ ও বিকল হন, ইহাই আশ্চর্য্য। ৬।

জীব শেষ দশায় উপস্থিত হইয়াও এবং জ্ঞানরূপ দুর্মিত্রের উদয় হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া, চিত্তদৌর্ব্বল্য হেতু বিষয় বাসনা করে, ইহাই আশ্চর্য্য।—আসন্নমৃত্যু-কালে চিন্তার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞানকেও অসুখের হেতু মনে হয়। পরোক্ষ-জ্ঞান, বিষয়াশক্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বৃথা বিষয় হইতে আকর্ষণের চেষ্টা করায়, অথচ অপরোক্ষ জ্ঞানাভাবে, চিত্তের অসুস্থতাই হয়; সুতরাং ঐ পরোক্ষ জ্ঞানকে দুর্মিত্র মনে হয়, ও বিষয়বাসনা দুর্ব্বলচিত্ত মানবের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। । ৭ ।

যিনি মোক্ষের কামনা করেন, যাঁহার ইহকাল ও পরকালে আসক্তি নাই; এরূপ সদসদ্বিচারক্ষম ব্যক্তিও মুক্ত হইতে ভীত হন! ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।—অপরোক্ষ জ্ঞানে আত্মানন্দ অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত, সংস্কারাদি বিঘ্ন এক পক্ষে এবং ভোগবাসনা অপর পক্ষে, এতদুভয়ের তাড়নায় জীব ভ্রান্ত হয়। অপরোক্ষ জ্ঞানে আত্মানুভবানন্দ হৃদয়ঙ্গম হইলে চিত্ত স্থির হয়। মুক্তি হইলে সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে, আর কিছুই থাকিবে না, সে অবস্থা কিরূপ, এবং তদবস্থা প্রাপ্তে ফল কি? এইরূপ আশঙ্কাদি মুমুক্ষুরও হৃদয়াধিকার করে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা বলেন "চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল," অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি অপেক্ষা তাঁহার সেবাসুখ ভোগ করা ভাল। । ৮ ।

ধীরস্তু ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্ব্বদা।
আত্মানং কেবলং পশ্যন্ ন তুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ৯ ॥
চেষ্টমানং শরীরং স্বং পশ্যন্নন্যশরীরবৎ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্মহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥
মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকঃ।
অপি সন্নিহিতে মৃত্যৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥ ১১ ॥
নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ১২ ॥
স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্ন কিঞ্চন।
ইদংগ্রাহ্যমিদংত্যাজ্যং সকিংপশ্যতি ধীরধীঃ ॥ ১৩ ॥

ধীর ব্যক্তি, আহারে রত থাকিয়াও অথবা পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও, সমস্ত আত্মময় জানিয়া, সন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হন না। ৯।

উক্ত মহাশয় ব্যক্তি, কার্য্য করিলেও, নিজ শরীরকে অন্যের শরীরস্বরূপ দর্শন করতঃ স্তুতি ও নিন্দাতে কেন ক্ষুব্ধ হইবেন?—সমস্ত এক অখণ্ড, সুতরাং নিজের শরীর যদ্রূপ, পরের শরীরও আত্মজ্ঞের নিকট তদ্রূপ। যে নিন্দা করে, সেও যে, তিনিও সেই, এবং যে শরীরকে নিন্দা করিতেছে, সে শরীরও তাঁহার নহে; দেহাভিমান না থাকায়, নিন্দাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই, স্তুতিতেও আনন্দিত হইবার কারণ নাই। ১০।

এই বিশ্বকে মায়াময় দর্শন করতঃ কৌতুহল শূন্য হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও কেন সন্ত্রস্ত হইবেন?—যিনি সংসারকে মায়াময় দেখিয়াছেন, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল—ভোগায়তন দেহাবসান হইলেই তাঁহার মুক্তি। সুতরাং মৃত্যুতে তাঁহার ভয় কি? ১১।

যে মহাত্মার চিত্ত বিষয়ে নিরাশ হইয়াও স্পৃহাশূন্য হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞান তৃপ্তের সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? ১২।

যে স্থির বুদ্ধি ব্যক্তি সমস্ত দৃশ্য পদার্থ কিছুই নহে এরূপ স্বয়ং অনুভব করিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা গ্রাহ্য ও ইহা ত্যাজ্য কেন দেখিবেন?—পরের মুখে শুনিয়া

এই কি সেই "পুরী"।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়।

এই কি সেই পুরী? মহাপুরাণে পাঠ করিয়াছি, পুরাকালে পবিত্র সূর্য্য-বংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তিন মূর্ত্তি, এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে অষ্টাদশ পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, ভক্তগণ জগতে তোমরাই ধন্য! যে ভক্তির কণা মাত্র পাইলে জীব শিব হইতে পারে, সেই ভক্তিপূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াই ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্ম সমর্পণে আত্মজ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মায়া-মুগ্ধ জীব, যে মমতায় পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, বল দেখি, কি আনন্দে বিভোর হইয়া, কি প্রেমানন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন অষ্টাদশ স্থানে অষ্টাদশ পুত্রকে প্রতীষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে ঘটনা কোথায় হইয়াছিল? পুরীধামে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "সেই কি এই পুরী?"

যে পুরীতে আসিলে জীব মায়া সাগর হইতে ত্রাণ পায়, যে পুরীতে আসিলে জীব অবিদ্যা হস্ত হইতে ত্রাণ পায়, যে পুরীকে লোকে গোলকপুরী, বৈকুণ্ঠপুরী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলেন, এই কি সেই পুরী? আমার চিনিবার শক্তি নাই, দেখিবার শক্তি নাই, আসক্তি বিষয়ানুরক্তি হৃদয় লইয়া পুরীতে প্রবেশ করিয়াছি, মুক্তি-ক্ষেত্র কিরূপে চিনিব? তবে ত্রিধা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পীঠমালা তন্ত্রের একটি শ্লোক ও কূর্ম্ম পুরাণের একটি উপাখ্যান মনে পড়ে, পীঠমালা তন্ত্রে লেখা আছে,—

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজা ক্ষেত্র মুচ্যতে—
বিমলাসা মহাদেবী জগন্নাথ ভৈরব।"

পীঠমালা তন্ত্রের একটি শ্লোকের দ্বারাই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, শিব ক্ষেত্রও বটে, শক্তি ক্ষেত্রও বটে, কূর্ম্মপুরাণে দেখা যায়, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু ক্ষেত্রও বটে। কূর্ম্মপুরাণের মতে—

শ্রীধামে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বিহার করেন, তখন কৃষ্ণকামিনীগণ, বলরাম মাতা রোহিনীকে ব্রজলীলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোহিনী বলিয়াছিলেন যে, "বধূগণ! আমি ব্রজলীলা কীর্ত্তন করিতে পারি, যদি কৃষ্ণ-বলরাম এখানে আসিয়া উপস্থিত না হন, কারণ পুত্রের মধুর লীলা মাতার কীর্ত্তন করা উচিত নয়, তোমরা সুভদ্রাকে দ্বারের প্রহরী রাখ, আমি ব্রজলীলা কীর্ত্তন করি।" মাতার কথায় সুভদ্রা দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু ভগবান

লীলা প্রকপটে যতদূরই থাকুন, কিন্তু যেখানে তাঁর নাম কীর্ত্তন হয়, যেখানে তাঁর লীলা কীর্ত্তন হয়, সেখানে তাঁর আস্তে হবেই হবে, সেই জন্য নারদ সূত্রে ভগবান বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী-তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।" সেই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য সহোদর সঙ্গে শ্যাম সুন্দর সেই স্থানে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু রোহিনী ব্রজলীলা কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ বলরাম আসিয়াছেন, সে সংজ্ঞা নাই, কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রার মাতার লীলা কীর্ত্তনে মহাভাবে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, হস্ত পদাদি লুপ্ত প্রায়; কচ্ছপাকৃতি মাতার লীলা কীর্ত্তন শেষ হইলে ভগবান বলিয়াছিলেন, কালে কোন ভক্ত কর্ত্তৃক আমার এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্কন্দ পুরাণের অন্তঃর্গত উৎকল খণ্ড বলেন, সে স্থান অন্য স্থান নহে লীলাচল, অন্য নাম পুরী। পীঠমালা তন্ত্রে পাইলাম, জগন্নাথ ভৈরব অর্থাৎ মহাদেব। উৎকল খণ্ডে পাইলাম জগন্নাথ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি। ললিত বিস্তার বলেন, শ্রীক্ষেত্র বৌদ্ধ ক্ষেত্র, জগন্নাথ বৌদ্ধমূর্ত্তি, তাহা হইলে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে, শ্রীক্ষেত্র সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় ক্ষেত্র। বৈষ্ণবগণ বলেন, বিষ্ণু ক্ষেত্র, শৈবগণ বলেন, শিবক্ষেত্র, শাক্তগণ বলেন, শক্তিক্ষেত্র। তাই সকলে পবিত্র প্রাণে পবিত্র হৃদয়ে এই শ্রীক্ষেত্র ধামে জাতিকুলের মুখে কাঁটা দিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়। তাই ভাবিতেছি, এই কি সেই পুরী? শুনিয়াছি, একদিন এই পুরীতে ঈশ্বরপুরীর শিষ্য বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ, যিনি গোলকপুরী হইতে আসিয়া নদীয়া পুরীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র একদিন "হা জগবন্ধু,—হা জগবন্ধু",—বলিতে বলিতে বৃন্দাবন হইতে ছুটিয়া এই পুরীতে আসিয়া আত্মজ্ঞানাভিমানি বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে গুরুভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরম বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে পুরীবাসিগণ! এই কি সেই পুরী? তবে আমার প্রেম আসিতেছে না কেন? পরম প্রেমের আধার পরমেশ্বর প্রেমাষ্পদ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কই প্রাণের ধনকে তো প্রাণের ভিতর নিতে পারছিনে; যদি কেহ বলেন, ভক্ত ভিন্ন সে অধিকার কার? সেটী অহঙ্কার সূচক বাক্য দীনেরপক্ষে নয়। যে ধনী সে দ্বারে দ্বারে কাঁদিবে কেন? যে কাঙ্গাল সেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে। আমার ভক্তি নাই, আমি যদি ভক্তি পাই, তবেই বুঝিব সে ভক্তিময় পুরী। অবশ্য স্থানের মাহাত্ম্য আছেই আছে, তাই একবার মনে হইতেছে, এই কি সেই পুরী? তাই আনন্দ বাজারে গেলে মনে হয়, এই সেই আনন্দময় ধাম, এই সেই

সচ্চিদানন্দ ধাম। শ্রীমন্দিরের ঊর্দ্ধভাগে চক্রের ধ্বজা দেখিলে বোধ হয়, যেন ধ্বজা পবন ভরে সঞ্চালিত হইয়া জগন্নাথ দর্শনার্থে পথিকগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে,—আয়! আয়! আর অধিক দূর নাই। দক্ষিণে মহাসিন্ধু, দর্শনে বোধ হয়, সিন্ধু যেন ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। সে ক্রোধ কেন? বোধ হয়, মহাসিন্ধুর হৃদয়ের ধন অনন্ত ভগবান; নীলাচলে অচল হইয়াছেন। তাই তরঙ্গাঘাতে পুরীকে গ্রাস করিবার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। আবার কখন এই ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক হইয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে মহাসিন্ধু তরঙ্গমালা তুলিতেছে, বলিতেছে মূঢ় জীবগণ! দেখ,—দেখ ঐ রূপসিন্ধু সিন্ধুর হৃদয়ধন যার নামের বলে,—ভক্তগণ ভব সিন্ধুকে গোষ্পদে পরিণত করিতে পারে, সিন্ধুকে বিন্দুতে পরিণত করিতে পারে। আমি সামান্য রত্নে রত্নাকর নহি, এই নীলরত্ন আমার হৃদয়ের ধন, তাই আমি রত্নাকর। আবার সিন্ধু দেখিয়া মনে হয়, পুরীর দক্ষিণ দিক বাসি সিন্ধু, পাছে দক্ষিণ দিক হইতে কাল আসিয়া পুরীতে প্রবেশ করে, তাই কালকে তাড়না করিবার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। তাই বলিতেছি যে, পুরীতে আসিলে কালের হাত হইতে পরিত্রাণ পায়, এই কি সেই পুরী? যে পুরীতে আসিলে জীবে কালহরণকে চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পায়, এই কি সেই পুরী?

পুত্র-হারা।

সে যে ছিল অমরার পারিজাত ফুল—
পথহারা হয়ে হায়,
এসেছিল এ ধরায়,
রূপের তুলনা নাই ভুবনে অতুল।
মরি মরি কিবা শোভা,
সকলের মনোলোভা,
নয়নে মাধুরী-মাখা মুখে মৃদু হাসি;—
বিদ্যালয় হ'তে ফিরি,
মা বলে ডাকিল ধীরি—
গায়ে হাত দিয়া দেখি ভরা জ্বর রাশি।
এক মাস রোগে দহি,
কতেক যাতনা সহি—

মোর বক্ষে শেল বিঁধি গেছে পলাইয়ে।
আর ত আসেনা ফিরে,
মা বলে ডাকেনা মোরে,
চিরতর গেছে চলে মায়া কাটাইয়ে।
না চাহিতে দিয়া নিধি,
হরিয়া নিলেন বিধি,
না পারি সহিতে আর এ যাতনা ভার।
আধ স্বরে মা মা বলে—
যেন ডাকে কচি ছেলে,
অমনি মুদিল আঁখি—না মেলিল আর—
চেয়ে ছিল সে আমার—
গাড়ী এক দু'চাকার,
গাড়ী চড়া সাধ তার পারিনি মিটাতে—
সেত ফিরিবে না আর,
গিয়েছে সে পরপার—
স্বপনেও তারে কভু পাইনা দেখিতে।
সেথা নাহি কোন দুখ,
সে যে চির পূর্ণ সুখ,—
সেথা সিংহাসনে বসি দেব জগন্নাথ—
পাতিয়া স্নেহের কোল,
মুখেতে মধুর বোল,
ডাকিলেন স্নেহভরে বাড়াইয়া হাত।

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

জ্ঞান।

মেঘের তারতম্য অনুসারে যেমন সূর্য্য আবরিত হয়েন, মেঘ খুব বেশী হইলে যেমন সূর্য্যকে একেবারে দেখা যায় না, এবং সামান্য হইলে যেমন সূর্য্যের অল্প বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুরূপ সেই কত যুগ-যুগান্তর অনন্ত কর্ম্ম সঞ্চয়-

রূপ অজ্ঞানতা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানটি আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, পক্ষান্তরে আবার এই কর্ম্ম যাহার যতটুকু পরিমাণ ধ্বংস হইয়াছে, সূর্য্যের অল্প বিকাশের ন্যায় জ্ঞানও তাহার ততটুকু পরিমাণে বিকসিত হইয়াছে, এ অবস্থায় জীবের প্রথম কর্ত্তব্য কি ?

এই দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার কোন প্রকার সাধ্যও বুঝি জীবের নাই, তবে জ্ঞান সূর্য্যকে এই কর্ম্ম মেঘ মুক্ত করিবার উপায় কি ? আরও বলা হইয়াছে, যে "অজ্ঞানেঁ না বৃতং জ্ঞানং" জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারাই আবৃত হইয়া থাকে, এক্ষণে জ্ঞান যদি কর্ম্ম জনিত অজ্ঞানের অন্ধ তামসেই আচ্ছন্ন রহিল, তবে সেই জ্ঞানের প্রকাশই বা কিরূপে হইবে ?

প্রথম উত্তর এই যে, সর্ব্বাগ্রে জীবকে সর্ব্বতোভাবে চিত্ত সংযম করিতে হইবে, নতুবা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি হইতে পরিত্রানের দ্বিতীয় কোন উপায়ন্তর নাই, মনকে রাগ দ্বেষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানাবরণ ভেদ হইবে না, শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মসংস্থ হইয়া শাস্ত্র মুখে আত্মার কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার সংশয় দূর করিয়া আত্মার মনন ও সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে অজ্ঞান মেঘ কাটিয়া যাইবে, অজ্ঞানের নাশই কর্ম্মনাশ—অথবা কর্ম্ম ক্ষয়ই জ্ঞানো বিকাশ।

এই যে অপরিহার্য্য দুঃখময় সংসার সাগরে জীব সদা সর্ব্বদা হাবুডুবু খাই-তেছে, ইহাও কি সেই অজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে না ? তারপর দেখ, এই সংসা-রের একমাত্র সার পদার্থ তোমার ঐ দেহ, যাহাকে আমি জ্ঞানে আপনার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি, তাহার কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর আছে কি ? কিন্তু নিশ্চয় জানিও এই দেহ, এই বড় যত্নের শরীর খানি যাহার ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহার কর্ম্ম বন্ধনও শিথিল হইয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষে আবার সংসারই বা কি, তাহার জন্য সংসার ব্যাপার হইতেই পারে না, তাই ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব লাভ না হইলে দেহের ভুল হয় না, নতুবা যে দেহের কথা বলা হইতেছে, ইহাও তো তোমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মাকর্ম্ম জন্য ? এই দেহে এই তোমার ? দেহে এত অনুরাগ কোথা হইতে আইসে ? যখন সাধের দেহ পাইয়া ইহাতে প্রিয়, অপ্রিয় ইষ্ট অনিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মই হইতেছে, এবং বড়ই আসক্তির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মও যখন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন আবার যে, এই আসক্তিময় দেহ পাইব, ইহাতে আর কোন তর্ক আসিতে পারে না, মরণে তোমার এত ভয় কেন ? জান তো যে, একদিন তোমাকে এই প্রিয়জন পূর্ণ

সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এবং পূর্ব্বাপর সকলেই মরিয়াছে, এবং তোমাকেও নিশ্চয়ই মরিতে হইবে, বল দেখি তবে তার জন্ত তোমার এত ভয়-কেন? কাহাকে ছাড়িয়া যাইতে এত ভয় ভয় হয়, কাহার জন্ত, কাহার সুখের জন্ত, দিবানিশি খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছ? কাঁহাকে খাওয়াইতেছ? কাহাকে পরাইতেছ? কাহাকে সুন্দর দেখাইবে বলিয়া গাত্র চর্ম্ম সাবান দিয়া পরিষ্কার কর? তুমি তো কতদিন বলিয়াছ যে, সেই তোমার ভালবাসার পাত্রকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাস, ইহা কি তোমার মিথ্যা কথা নহে? যদি এ কথা সত্য হইত, তবে তাহার মরণে তুমি রহিলে কেন? এখনও তো দেখিতে পাই, সেই রকমই—আহার কর, চাকুরি কর, আমোদ আহ্লাদ কর, তাই বলিতেছিলাম যে, এ সবই তোমার নিজের ঐ আমিত্ব পূর্ণ দেহের জন্ত। তাই এই দেহকে ছাড়িতে তোমার এত ভয়, এত ভাবনা। আপাততঃ দেহ ছাড়া তোমার আর কিছুই নাই, যদি বল দেহ ছাড়া আমার আরও কিছু আছে, তা হ'লে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিব, এই আছে ও নাই এর মাঝামাঝি যে অবস্থা তাহারই নাম এই গোলোক ধাঁ ধাঁ ময় সংসার চক্র। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই অজ্ঞানই সংসার, চক্রের মূল। এই অজ্ঞানতা হইতেই প্রিয় অপ্রিয় ভাল মন্দ ইষ্ট অনিষ্ট ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ কার্য্য চলিতেছে, এই অজ্ঞানতার ধ্বংস না হইলে এই মহা গোলোযোগ পূর্ণ সংসারচক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর কোন উপায় নাই, ইহা বিনা জ্ঞানে নাশ হইবে না, অধ্যাত্ম বিদ্যা এই অজ্ঞান নাশে সমর্থ। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাই অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ, তাই বলিয়া অমানিশার অন্ধকার নাশে সমর্থ হইতে পারে না। বিদ্যা দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হইতে পারে, কর্ম্ম দ্বারা পারে না, অমানিশায় যেমন আলোকের কারণ না হইয়া অন্ধকারেরই কারণ হয়, সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানের নাশ না হইয়া অজ্ঞানের বিস্তৃতিই হইয়া থাকে। অর্থাৎ অজ্ঞানই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই অজ্ঞান। সংসারে যতদিন পর্য্যন্ত আসক্তি থাকিবে, ততদিনই কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে।

এই সংসারাশক্তিই শরীরাশক্তি, এই আসক্তি কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এক্ষণে এই আসক্তির নাশ করিয়া কোন কর্ম্মাবলম্বনে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে, ইহাই না বিচার্য্য? শাস্ত্র প্রথমে বৈদিক কর্ম্মে আস্থা সংস্থাপন করিতে বলিতেছেন। যতদিন এই সংসারাশক্তি থাকিবে, ততদিন সন্ধ্যা পূজা জপ হোম ইত্যাদি করনীয়। এই কর্ম্ম করিতে করিতে ইন্দ্রিয় সুখের জন্ত যে,

সাধারণ কর্ম্ম তাহার গতি ক্রমেই রোধ হইয়া আসিবে, গীতাও বারংবার বলিতেছেন যে, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৈদিক কর্ম্ম দ্বারাই ইন্দ্রিয় সুখ জনিত কর্ম্মের অবস্থা শিথিল করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাও উপযুক্ত গুরু আনুগত্য ব্যতীত হইতে পারে না। যদি প্রাগুক্ত গুরু আনুগত্য না ঘটে, তবে আরও সহজ পথ অন্বেষণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনই গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রথম এবং প্রধান ইঙ্গিত। বাস্তবিক কথাও তাই,—সর্ব্বাগ্রে স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে বিহিত কর্ম্মে না থাকিলে, বেদ বিহিত কর্ম্মে আস্থা সংস্থাপন কোন রূপেই করিতে পারিবে না। গীতা সংসারাশ্রয়ী গৃহিদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যখন আমারই অনুমোদিত তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই শ্রেয় লাভ হইতে পারে না, এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি, গীতা সার্ব্বভৌমিক এবং সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম পুস্তক হইলেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের পক্ষ সমর্থনই গীতার প্রধান লক্ষ্য।

এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাই বেদোক্ত কর্ম্মের সোপান, তারপর এই বৈদিক কর্ম্মের পরই শম দম তিতিক্ষা লাভ হইলেই কর্ম্ম সন্ন্যাস হইবে, এই বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্মারম্ভে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলে কর্ম্মোন্নতির বড়ই সুবিধা হইয়া থাকে, তবেই হইল,—

১। বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্ম।

২। বৈদিক কর্ম্ম।

৩। কর্ম্ম সন্ন্যাস।

এই কর্ম্ম সন্ন্যাস হইলেই অজ্ঞানতা দূর হইয়া আত্মজ্ঞান সূর্য্য প্রকাশ পাইবে, ইহার পরই তত্ত্বমসি।

সেই অখণ্ড চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে আমি বলিয়া জানিবে, ইহারই নাম সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি। সর্ব্বব্যাপী আকাশের মত চৈতন্য বা জ্ঞান সর্ব্বথা পরিব্যাপ্ত আছে, এই চৈতন্যরূপী জ্ঞানাকাশকে অজ্ঞান মেঘরাশীতে ঢাকিয়া দিল, সুতরাং অজ্ঞান বা মায়ারই প্রাধান্য দেখা যাইতে লাগিল; পরিষ্কার জলে ঘোলা জল মিশিয়া যেমন ঘোলা জলই দেখা যায়, তেমনি জ্ঞানে অজ্ঞান মিশিয়া অজ্ঞানেরই উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমি নিশ্চয়ই আছি, এই কথা জ্ঞান বলিলেও যেন এমন কি এক রকম হইয়া গেল, যেন আমি থাকিয়াও নাই। অস্তি নাস্তির মধ্যে—নাস্তিরই উপলব্ধি হইতে লাগিল, বৈদূর্য্যমণির বালকের ন্যায়

সেই অনন্ত চৈতন্যমণির ঝলক উঠিল, কিন্তু কেন? কেন যে জ্ঞানকে অজ্ঞানে ঢাকিল,কেন যে মণির ঝলকের ন্যায় চৈতন্যে ঝলক উঠিল, কেন এমন হইল এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। বাস্তবিক এতাবৎ পৃথিবীর কোন দার্শনিকই এ কথার উত্তর দিতে পারেন নাই। সকল বিচার করিয়া এইখানেই দর্শন শাস্ত্র মূক হইয়াছেন, বিচার করিতে গেলেই প্রথমেই স্বতন্ত্র পরব্রহ্মকে পরতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তা করিতে গেলে কিছুই থাকিবে না, কাহার সাধ্য আছে এবং কেই বা স্বতন্ত্রকে পরতন্ত্র বলিবে। এ কথার একেবারেই উত্তর নাই, তাই গীতা বলিতেছেন, স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারে মণির ঝলকের ন্যায় আপনাআপনি জ্ঞানের উপর অজ্ঞান ভাসিয়া উঠে। ও ভাসিয়া উঠাই নিয়ম—যদি এর বেশী বিচার করিয়া কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "অহং বহুস্যাম" দেখাইতে যাও, তবে আর তাঁহাকে স্বাধীন বলিতে পার না, এই যে মণির ঝলক উঠার কথা বলা যাইতেছে, ইহাই বা কেন হয়? কেনই বা মণি হইতে এ ঝলক উঠিয়া থাকে? তুমি কি বলিবে না যে ঝলক উঠাই মণির স্বভাব। তবে মীমাংসা কোথায়? মীমাংসা নাই, তাই বলা হইয়াছে যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই ইহার কারণ। এই ইচ্ছাশক্তির উপর কোন কথাই চলিতে পারে না।

যেমন জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিল, অমনি অখণ্ড চৈতন্যে খণ্ড অনুভব আসিল, তার পর আমার, তারপর আমি, আসল কথাটা এই যে, এই ভবরঙ্গভূমের যিনি অভিনেতা তিনিই আবার দর্শক, যখন অভিনেতা দর্শক একজন, তখন সে অভিনয়ের বিচারই বা কে করিবে, যেমন আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানকে অজ্ঞান মেঘে ঢাকিয়া দিল, অমনি মন বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে চমকাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার রবে ঘন ঘন গর্জ্জন হইতে লাগিল, এই গর্জ্জনের সহিত তমোভাবের বৃষ্টিধারা বর্ষণ হইতে লাগিল, এ হেন গর্জ্জন বর্ষণের সময় এই ঘোর দুর্য্যোগে সাম্বৎ কোথায় আছে?

অজ্ঞান ভাব পদার্থ অভাব হইলে ইহার কোন প্রকার শক্তি থাকিত না, যখন আবরণ ও বিক্ষেপ দুইটী শক্তি বিদ্যমান আছে, তখন অভাব বলি কিসে, পানা পুষ্করণীর জলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুষ্করণীকেই ঢাকিয়া থাকে, তেমনি অজ্ঞানও তাঁহার সংকল্প হইতে জন্মাইয়া আবার তাঁহাকেই ঢাকিয়া রাখে।

(ক্রমশঃ)



কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

সাকার ও নিরাকার।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

যাহার আকার বা রূপ আছে, তাহা সাকার, যাহার আকার বা রূপ নাই তাহা নিরাকার। যাহার আকার আছে, তাহার রূপও আছে, রূপ না থাকিলে বুঝিতে হইবে, তাহার আকারও নাই। সাকার সরূপ, নিরাকার অরূপ, সাকার সগুণ, নিরাকার নির্গুণ, সাকার সবিকার, নিরাকার নির্ব্বিকার, সাকার সশব্দ, নিরাকার অশব্দ, সাকার স্পর্শগুণাত্মক, নিরাকার অস্পর্শ। জগতের মূল-পদার্থ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ক্ষিতিশব্দে মৃত্তিকা বা পৃথিবী, অপ্ শব্দে জল, তেজ শব্দে সূর্য্য বা অগ্নির তীক্ষ্ণতা, মরুৎ শব্দে বায়ু ও ব্যোম শব্দে আকাশ, শূন্য, খালি স্থান বা ছিদ্র। ক্ষিতির গুণ গন্ধ, অপের গুণ অম্ল-মধুরাদি ছয় রস, তেজের গুণ রূপ, মরুতের গুণ স্পর্শ ও ব্যোমের গুণ শব্দ। এই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের বিরাট অবয়বের মূলে এক একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম তন্মাত্র বা অণু পরমাণু। বিপুলা ক্ষিতির সূক্ষ্মাবয়ব একটি গন্ধ-

তন্মাত্র বা গন্ধাণু, মহান্ সলিলরাশির সূক্ষ্মাবয়ব একটি রসতন্মাত্র বা রসাণু, মহান্ তেজোরাশির সূক্ষ্মাবয়ব একটি রূপতন্মাত্র বা রূপাণু, মহান্ বায়ুরাশির সূক্ষ্মাবয়ব একটি স্পর্শতন্মাত্র বা স্পর্শাণু এবং বিরাটকায় ব্যোমের সূক্ষ্মাবয়ব একটি শব্দতন্মাত্র বা শব্দাণু—

"শব্দতন্মাত্রাদাকাশং স্পর্শতন্মাত্রাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ
রসতন্মাত্রাদাপঃ গন্ধতন্মাত্রাৎ পৃথিবী।"

এবং পঞ্চভ্যঃ পরমাণুভ্যঃ পঞ্চমহাভূতান্যুৎপদ্যন্তে। কারিকারভাষ্য।

শব্দাণু হইতে আকাশ, স্পর্শাণু হইতে বায়ু, রূপাণু হইতে তেজ, রসাণু হইতে জল ও গন্ধাণু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম স্থূলভূত, পঞ্চতন্মাত্র বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূত স্থূল ভূতের গুণ বা সূক্ষ্মাংশ। যেমন পুষ্প ও তাহার গন্ধ পৃথক্ পদার্থ নহে বা গন্ধ পুষ্পেরই সার পদার্থ, তদ্রূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত ও তাহাদের গুণ পৃথক্ পদার্থ নহে। যেমন পুষ্পের গন্ধ পুষ্পের অস্তিত্বের দ্যোতক, তদ্রূপ পঞ্চভূতের গুণ পঞ্চভূতের অস্তিত্বের দ্যোতক। যেমন পুষ্পের গন্ধ পুষ্পাবয়বেরই সার ও অণু পরমাণু, তদ্রূপ পঞ্চভূতের গুণ পঞ্চভূতেরই সার ও অণু পরমাণু। যেমন পুষ্পের গন্ধে পুষ্পের প্রতীতি জন্মে, তদ্রূপ শব্দস্পর্শাদি গুণে আকাশাদির প্রতীতি জন্মে। আমাদিগের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষিত্যাদি পঞ্চ উপাদানে গঠিত, কিন্তু চক্ষুদ্বারা আমরা যে রূপ দর্শন করি, রসনা দ্বারা যে রস আস্বাদন করি, নাসিকা দ্বারা যে গন্ধ আঘ্রাণ করি, ত্বক্ দ্বারা যে স্পর্শ অনুভব করি এবং কর্ণ দ্বারা যে শব্দ শ্রবণ করি, সেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ উক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ উপাদানের গুণ বা সূক্ষ্মাংশ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-তরঙ্গ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়ায়। শব্দ-তরঙ্গ অসংখ্য শব্দতন্মাত্রের, স্পর্শতরঙ্গ অসংখ্য স্পর্শতন্মাত্রের, রূপতরঙ্গ অসংখ্য রূপতন্মাত্রের, রসতরঙ্গ অসংখ্য রসতন্মাত্রের ও গন্ধ-তরঙ্গ অসংখ্য গন্ধ-তন্মাত্রের সমষ্টি। বাহিরের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-তরঙ্গ সর্ব্বদা আমাদিগের কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে আঘাত করে, তজ্জন্য আমাদিগের বহির্জ্জগতের আকাশাদি বিরাটাবয়ব পঞ্চভূতের অনুভূতি ও জ্ঞান জন্মে। শব্দ-তরঙ্গ কর্ণকে, স্পর্শ-তরঙ্গ ত্বগিন্দ্রিয়কে, রূপতরঙ্গ চক্ষুকে, রসতরঙ্গ রসনাকে এবং গন্ধতরঙ্গ নাসিকাকে আঘাত করে, বহির্জ্জগতের

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের গুণের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম দেহ বা গুণের ঘাত প্রতিঘাতে এইরূপে সূক্ষ্ম দেহ বা বহির্জগতের জ্ঞান জন্মে। প্রথমে জগতের মূলপদার্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের গুণের সৃষ্টি, পরে সেই গুণ হইতে ক্ষিত্যাদি স্থূল ভূতের সৃষ্টি ও স্থূল ভূত হইতে স্থূল জীব এবং উদ্ভিদের সৃষ্টি, সুতরাং জীব ও উদ্ভিদ, বস্তুতঃ জগতের সহিত অভিন্ন বা জগতেরই অংশ এবং জগতে যেমন স্থূল পঞ্চভূত ও তাহাদিগের গুণ বিদ্যমান, জীবদেহে এবং উদ্ভিদেও তদ্রূপ স্থূল পঞ্চ-ভূত ও তাহাদিগের গুণ বিদ্যমান। জগতের সমধর্ম্মী পদার্থ দেহে না থাকিলে জীবের পক্ষে বহির্জগতের জ্ঞান লাভ অসম্ভব হইত। ভ্রূণ গর্ভাশয়ে থাকিয়া নাভিনাড়ী দ্বারা মাতৃ-সাহায্যে বাহিরের বায়ু গ্রহণ ও অন্তরের বায়ু বাহিরে পরিত্যাগ করে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার নাভি নাড়ী কর্ত্তন করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ার পর সে নিজে প্রথম বহির্বায়ু গ্রহণ করে, ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, যাহার প্রাণ আছে, সেই কেবল বাহিরের প্রাণ বায়ু গ্রহণে সমর্থ। তদ্রূপ জীবের চক্ষে বাহিরের সূর্য্য ও অগ্নির তেজ, নাসিকায় গন্ধ, ত্বকে স্পর্শ, রসনায় ছয় রস ও কর্ণে শব্দগুণ বিদ্যমান। যেমন অন্তঃপ্রাণের সহিত বহিঃ প্রাণের ঘাত প্রতিঘাতে অন্তঃপ্রাণ চৈতন্য-লাভ করে বা উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্রূপ চক্ষের তেজ সূর্য্য বা অগ্নির তেজের ঘাত প্রতিঘাতে বস্তুজাত দর্শন করে, নাসিকা বাহিরের গন্ধ-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে গন্ধ আঘ্রাণ করে, কর্ণ বাহিরের শব্দ-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে শব্দ শ্রবণ করে ও রসনা বাহিরের রস-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ছয় রসের আস্বাদন করে। বহির্জগতের সহিত জীবদেহের এই ঘাত প্রতিঘাতে জীবদেহ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। উদ্ভিদও এই নিয়মের অধীন। জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদও বহির্জগতের সহিত ঘাত প্রতিঘাতে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এই ঘাত প্রতিঘাতেই জীব ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি, এই ঘাত প্রতিঘাতেই তাহাদিগের ক্ষয় বা মৃত্যু। ফলতঃ জীব ও উদ্ভিদ সর্ব্বদা বহির্জগতের অধীন। বহির্জগৎ হই-তেই তাহাদিগের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি এবং বহির্জগতেই তাহাদিগের লয়। সৃষ্টি বা লয় ঘাতপ্রতিঘাতের অধীন। ঘাত প্রতিঘাত ব্যতীত জন্ম মৃত্যু অসম্ভব। চেতন ও উদ্ভিদের প্রাণ আছে, জন্ম মৃত্যুও আছে, অচেতনের প্রাণ নাই, মৃত্যু —ক্ষয়। জন্ম মৃত্যু বা ক্ষয়ের কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত। যাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে, তাহাকে আকাশাদি পঞ্চভূতের ঘাত প্রতিঘাত সহিতে হইবেই। পরন্তু যাহার শব্দ আছে, সে শব্দেন্দ্রিয়ের, যাহার রস আছে, সে রসনেন্দ্রিয়ের ও যাহার গন্ধ আছে, সে

গন্ধেন্দ্রিয়ের বোধগম্য। যাহার রূপ আছে, তাহার আকারও আছে, সুতরাং সে স্থূল চক্ষেই হউক বা দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণেই হউক অথবা মনশ্চক্ষেই হউক দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রথমে জগতের ক্ষিত্যাদি মূল ভূতের সৃষ্টি, পরে তাহা হইতে জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং জীব ও উদ্ভিদ জগতেরই বিকার বা রূপান্তরিত অবস্থা, সুতরাং জীব ও উদ্ভিদের যে ক্রিয়া, তাহা প্রকৃত পক্ষে জগতেরই ক্রিয়া এবং মৃত দেহ যেমন জগতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার গুণ বা ক্রিয়াও তদ্রূপ জগতে লয়প্রাপ্ত হয়। যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয়। প্রাণিজগৎ যেরূপ ক্রিয়াশীল, বহির্জগৎও তদ্রূপ ক্রিয়াশীল। দেহে যেমন বায়ু না থাকিলে স্পর্শগুণের বিকাশ হয় না এবং স্পর্শগুণ ব্যতীত শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের বিকাশ হয় না। বায়ু আকাশকে স্পর্শ করিলে প্রথমতঃ স্পর্শগুণের, পরে স্পর্শ হইতে শব্দের, শব্দ হইতে রূপের, রূপ হইতে রসের ও রস হইতে গন্ধের বিকাশ হয়। বস্তুতঃ প্রাণী ও উদ্ভিদের যে ক্রিয়া, তাহা জগতেরই ক্রিয়া এবং প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ যেমন সাকার, বহির্জগতের ক্ষিত্যাদিভূতও তদ্রূপ সাকার। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, স্থূল দৃষ্টির গোচর, মরুৎ ও ব্যোম স্থূল দৃষ্টির গোচর নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টির গোচর। যাঁহাদিগের শরীরের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাঁহারা বায়বীয় দেহ ও আকাশ দর্শন করিতে পারেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আকাশ বা ইথার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন, আমাদিগের ঋষিরা আকাশের পরে আরও তিনটি স্তর পৌছিয়া আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যাহা যন্ত্র-সাহায্যে দর্শন করেন, ঋষিরা তাহা মনশ্চক্ষে দর্শন করিতেন। আকাশের পর মন, মনের পর মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব ও বুদ্ধির পর অহঙ্কার, অহঙ্কারের পর মূল প্রকৃতি, মূল প্রকৃতির পর আত্মা। ক্ষিতি হইতে মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত কয়েকটি স্তর, পদার্থ, পদার্থ ভোগ্য, জীবাত্মা ভোক্তা। যেখানে ভোগ্য ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ, সেখানে ক্রিয়া বা আকার না থাকিলে, ভোগ্য ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব ক্ষিতি হইতে মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত কয়েকটি স্তর এবং আত্মা সাকার ও ক্রিয়াশীল। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রিয়া যদি বর্হির্জগতেরই ক্রিয়া হয়, তবে পঞ্চভূতের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা পানাহার আছে কি না? এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন নহে; বায়ুর শোষণ ও তেজের দহন গুণেই জীব ও উদ্ভিদ আহার গ্রহণ ও পরিপাক করে। অতএব পঞ্চভূতের স্থূল দেহ, কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলেও ক্রিয়া আছে। বায়ুর পদ নাই, অথচ গতিশক্তি আছে। সূর্য্যের চক্ষু নাই, অথচ জগৎ আলোকিত করিবার ও দর্শনের শক্তি আছে। রসের

রসনা না থাকিলেও রসন-শক্তি আছে। অন্যথা জীব জন্তুর ঐ সকল শক্তি বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না। অথবা প্রাণি জগৎ ধ্বংস হইলে, তৎসঙ্গে ঐ সকল শক্তিরও ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যখন তাহা হয় না, তখন ঐ সকল শক্তি যে বহির্জগতের, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না।) প্রশ্ন হইতে পারে, জীব জন্তুর যে ক্রিয়া, তাহা যদি বহির্জগতের ক্ষিত্যাদিরই ক্রিয়া হয়, তবে জীব জন্তুর ন্যায় তাহাদিগের মৃত্যু আছে কি না? হাঁ, তাহাদিগেরও মৃত্যু আছে, তবে তাহাদিগের মৃত্যু ও জীব জন্তুর মৃত্যু এক প্রকার নহে এবং তাহাদিগের মৃত্যুকে মৃত্যু না বলিয়া লয় বলা হয়। যেখানে পঞ্চভূতের ঘাত প্রতিঘাত, সেই খানে জন্ম মৃত্যু অবধারিত। ইহাই সাকারের সক্রিয় অবস্থা, তবে প্রভেদ এই—প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু—বহির্জগতের সহিত প্রাণী ও উদ্ভিদের পঞ্চভূতাত্মক দেহের লয় এবং বহির্জগতের ক্ষিত্যাদির মৃত্যু—ক্ষিতির লয় অপে, অপের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় ব্যোমে, ব্যোমের লয় অহঙ্কারে, অহঙ্কারের লয় মহৎ তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্বের লয় মূল প্রকৃতিতে। মূল প্রকৃতি জগৎ প্রসবিনী জগজ্জননী। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগে জগৎ-সৃষ্টি হয়। পুরুষ-জগৎ-পিতা—জগদীশ্বর। ইনিই সগুণ বা সাকার ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর।

প্রকৃতি জগৎ-প্রসূতি বা প্রকৃতি হইতে সমস্ত পদার্থ জাত, তজ্জন্য সমস্ত পদার্থের সাধারণ নাম প্রকৃতি।

"প্রধানং প্রকৃতিঃ শক্তি নিত্যা চাবিকৃতি স্তথা।
এতানি তস্যা নামানি পুরুষং যা সমাশ্রিতা॥"

শক্তি, নিত্যা ও অবিকৃতি প্রকৃতির নামান্তর। প্রকৃতি প্রধান পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়। পুরুষ আত্মা, আত্মার লক্ষণ এই—

"আত্মা জ্যোতি শ্চিদানন্দরূপো নিত্যশ্চ নিস্পৃহঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতে র্যোগাৎ সগুণঃ কুরুতে জগৎ॥"

আত্মা জ্যোতির্ম্ময়, চিন্ময় বা চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দময়, নিস্পৃহ ও নির্গুণ, কিন্তু প্রকৃতির সহযোগে সগুণ বা সক্রিয় হইয়া জগৎ-সৃষ্টি করেন।

জ্যোতির্ম্ময়, চিন্ময় ও আনন্দময় যাঁহার রূপ, তিনি সাকার, তাঁহাকে দর্শন করা যায়। অতএব আত্মা দৃশ্য। আত্মা নিত্য বা অবিনাশী অর্থাৎ জরা-মরণাদি রহিত, বা অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা নিস্পৃহ অর্থাৎ স্পৃহাশূন্য বা আসক্তি-রহিত। স্পৃহা বা আসক্তি, যিনি পূর্ণ, তাঁহার থাকে না। আসক্তি যাহার

আছে, সে অপূর্ণ, জন্ম মরণাদি পরিবর্ত্তন ও ক্ষুৎপিপাসার অধীন। নির্গুণ শব্দে গুণ রহিত, যাহার গুণ থাকে, তাহার ক্রিয়াও থাকে। ক্রিয়া গুণেরই বিকাশাবস্থা। যিনি পূর্ণ, যাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার গুণ বা ক্রিয়াও থাকিতে পারে না। ক্রিয়া অভাব-পূরণের জন্য, কিন্তু যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎপিতা তাঁহার কোন অভাব থাকিতে পারে না। যে অপূর্ণ, সে অভাবগ্রস্ত, সুতরাং ক্ষুৎ পিপাসার তাড়নায় কর্ম্ম করে। জীব অণুব্রহ্ম, সুতরাং ক্ষুৎ পিপাসার অধীন, কিন্তু যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার কিছুরই অভাব থাকিতে পারে না।

মূল প্রকৃতি জগতের একমাত্র উপাদান, কিন্তু মূল প্রকৃতির চৈতন্য বা বিকার নাই। অব্যয় চৈতন্য সংযোগে মূল প্রকৃতিতে অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের বিকার হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

"সত্ত্বংরজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ।
সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদব্যয়াৎ॥
তে গুণাঃ সমাঃ প্রকৃতি রিতীর্যঃ।
তথা সতি ন্যূনাধিকগুণা বিকৃতিঃ॥"

মূল প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ অবস্থান করে, এই তিনটি গুণ পরস্পর বিরোধী, কিন্তু তিন গুণেরসাম্যাবস্থায় বিরুদ্ধ ভাব থাকে না বলিয়া তখন সৃষ্টিও থাকে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যয় চৈতন্য সংযোগে প্রকৃতির এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে ও তাহার ফলে তিনগুণ বৈষম্য ভাবাপন্ন ও পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, সেই বিকারের ফলে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির বিকাশ। প্রকৃতি জড় পদার্থ, কেবল অব্যয় চৈতন্য সংযোগে তিনি জগতের কর্ত্রী; প্রকৃতি স্ত্রী, জীবাত্মা পুরুষ। প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ প্রসব করেন। যেমন স্ত্রীপুরুষের সংযোগে সন্তানোৎপত্তি হয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি ও তদ্রূপ। সৃষ্টি কেবল কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি মাত্র। পুরুষ ইচ্ছাময় বা ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট এবং প্রকৃতি ক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্টা। যেমন নিদ্রাভঙ্গকালে আমাদিগের চেতনবৃত্তি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং নিদ্রাভঙ্গকালে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন নিয়মিত ও সংযত হইয়া অহং ভাবে পরিণত হয়, অহংভাবে পরিণত হইলেই তাহাতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইয়া ক্রিয়ার অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়. প্রবৃত্তি ক্রিয়াভিমুখিনী হইলেই ক্রিয়ার আধার পদার্থের প্রয়োজন হয়, পদার্থ ব্যতীত ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয় না, তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম চৈতন্য নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন ভাবে অবস্থান করেন, পরে সেই নিশ্চেষ্ট

চেতনভাব সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত হইয়া অহং ভাবাপন্ন ও প্রবৃত্তি ক্রিয়াভিমুখিনী হয়' ক্রিয়াভিমুখিনী হইলেই পদার্থের প্রয়োজন হয়, প্রকৃতি সেই পদার্থ। প্রকৃতি আট প্রকার—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি প্রকৃতি। ইহারা মুলপদার্থ, এই মুলপদার্থ হইতেই জগতের সৃষ্টি। এই পদার্থই পুরুষের বা জীবের ভোগ্য, এই পদার্থের ভোগেই তাহার সুখ দুঃখ বোধ এবং পদার্থের আসক্তিতেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তন।

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"

কার্য্যকারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন এবং পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হন। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করেন।

প্রকৃতিই মায়া, জগৎ মায়া রচিত বা পদার্থে গঠিত। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কি জগৎ-স্রষ্টা মায়ার বশীভূত? না, তিনি মায়ার বশবর্ত্তী নহেন। তিনি আসক্তি শূন্য, তাঁহার আসক্তিরহিত ইচ্ছায় পদার্থের সৃষ্টি ও তদ্দ্বারা জগৎ বিরচিত হয়। বালক যেমন ক্রীড়াচ্ছলে কর্ম্ম করে, কিন্তু বস্তুতঃ কর্ম্মে তাহার আসক্তি থাকে না, জগৎ-স্রষ্টার সৃষ্টির ইচ্ছাও তদ্রূপ। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াবত্তা বা কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

প্রভু লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন নাই, লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি হইতেই কর্ত্তৃত্বাদি প্রবর্ত্তিত হয়।

কর্ম্ম কিরূপে নিষ্পন্ন হয়?

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে।

কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মাপেক্ষী এবং কর্ম্ম ফলাপেক্ষী, অতএব কর্ত্তৃত্ব যেখানে কর্ম্ম এবং ফলও সেই খানে, কর্ম্ম করিলেই ফল ছায়ার ন্যায় কর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়, কিন্তু সেই কর্ম্ম বালকের ক্রীড়ার ন্যায় আসক্তিশূন্য হইলে তাহাতে সুখ দুঃখের উদয় হয় না এবং সুফল কুফল প্রসব করে না, তজ্জন্য আত্মা স্বয়ং সাকার হইয়াও ক্রিয়াশীল নহেন, যিনি ক্রিয়াশীল, তিনিই জন্ম মৃত্যুর অধীন। জগতের সৃষ্টি কালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকেন, তাহার ফলে পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির গুণ পুরুষে সংক্রামিত হয়; তজ্জন্য বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুতঃ অকর্ত্তা হইলেও পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের এই ভাব দ্বৈতভাব, এই দ্বৈতভাব হইতেই বহুরূপ বিশিষ্ট বৈচিত্র্য জগতের সৃষ্টি, কিন্তু ইহার মূলে নিরাকার অদ্বৈতভাব, বস্তুতঃ অদ্বৈত বা নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইতেই দ্বৈত বা সাকারের আবির্ভাব এবং সেই দ্বৈত বা সাকারভাব হইতেই জগতের প্রকাশ। এক হইতেই দুই, তিন, চারি, পাঁচ এবং লক্ষ কোটি সংখ্যার প্রকাশ। আত্মা সাকার, সাকারের মূলে নিরাকার, নিরাকার আকাররহিত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। তাঁহার আকার নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, ক্ষয় বা ধ্বংস নাই, তিনি সচ্চিদানন্দময়। তাঁহার চিৎ বা চৈতন্য ভাবই ঘনীভূত হইয়া ইচ্ছা শক্তিতে পরিণত হয়, সেই ইচ্ছাশক্তিই ঘনীভূত হইয়া ক্রিয়াশক্তিতে ও ক্রিয়াশক্তি পদার্থে পরিণত হয় এবং সেই পদার্থে জগতের সৃষ্টি হয়। ইহাই নিরাকার অদ্বৈত ভাব। নিরাকার সচ্চিদানন্দের ইচ্ছাতে জগৎ-সৃষ্টি হয়, কিন্তু তিনি নিজে নিষ্ক্রিয়। সম্রাট কি স্বহস্তে কোন কর্ম্ম করেন? তাঁহার ইচ্ছায়ই রাজ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার, কিন্তু প্রথমতঃ সাকারের সহিত পরিচয় বা সাক্ষাৎকার না ঘটিলে, তদন্তর্গত নিরাকারকে জানা যায় না। তিনি বহুদূরে—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির পর যিনি, তিনিই আত্মা।

ক্ষিতিতে গন্ধেন্দ্রিয়, অপে রসনেন্দ্রিয়, তেজে রূপেন্দ্রিয়, মরুতে ত্বগিন্দ্রিয় ও ব্যোমে শব্দেন্দ্রিয় বিদ্যমান। নিরাকারকে জানিতে হইলে, প্রথমতঃ পঞ্চভূত, পরে মন ও বুদ্ধিতত্ত্বকে জানিতে হইবে, কারণ নিরাকার ঐ সকল তত্ত্বের পর। সাকার

ব্যক্তাবস্থা, সাকার ঘনীভূতাবস্থা, নিরাকার তরলীকৃতাবস্থা। আমরা ঘনীভূত স্থূলপদার্থ, সুতরাং নিরাকার আমাদিগের ঘনীভূত স্থূল দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন। যেমন আমাদিগের মনের ভাব ঘনীভূত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলে স্থূল দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় এবং যাবৎ মনের ভাব কার্য্যে পরিণত না হয়, তাবৎ বাহিরের লোকে তাহা জানিতে পারে না, ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার ভাবও তদ্রূপ। তাঁহার নিরাকার ভাবকে জানিতে হইলে, স্থূল বা ঘনীভূত ভাবের ভিতর দিয়া তরলীকৃত ভাবে পৌঁছিতে হইবে, যেখানে রূপ, গুণ, ক্রিয়া নাই, সুখ দুঃখ নাই, ভোগ্য ভোক্তা নাই, আছে কেবল সৎ, চিৎ, আনন্দ।)

অগ্নি দৃশ্যমান্ স্থূলপদার্থ, অগ্নি তৈজস, তৈজস পদার্থের লক্ষণ এই—

তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষ স্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ।

রূপ, রূপেন্দ্রিয়, বর্ণ, সন্তাপ, দীপ্তিমানতা, পরিপাক শক্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা ও শৌর্য্য, ইহারা তেজের বিকার।

(অগ্নির রূপ বা আকার আছে, তজ্জন্য অগ্নি দৃষ্ট হয়। রূপ বা আকার যাহার নাই, সে দৃশ্যমান নহে। অগ্নিতে তাপ বিদ্যমান, অগ্নিতেও তীক্ষ্ণতা আছে। অগ্নি-ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতান্তর্গত তেজের ঘনীভূত অবস্থা। তেজ সূর্য্যমণ্ডলের শক্তি বা তীক্ষ্ণতা। অগ্নি ও সূর্য্যালোক উভয় অভিন্ন, সমধর্ম্মা। অগ্নির তাপে বস্ত্রাদি দগ্ধ হয়, সূর্য্যোত্তাপে বস্ত্র দগ্ধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যকান্ত মণির সাহায্যে সূর্য্যোত্তাপ ঘনীভূত হইলে, তাহাতে বস্ত্রাদি দগ্ধ হয়, ইহাতে উপলব্ধি হইবে, অগ্নি সূর্য্যোত্তাপেরই ঘনীভূতাবস্থা এবং সূর্য্যোত্তাপ অগ্নির তরলীকৃতাবস্থা অথবা সূর্য্যোত্তাপই ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়। আরও উর্দ্ধস্তরে গিয়া দেখিতে পাই, যে তেজ অগ্নিতে ও সূর্য্যে বিদ্যমান, সেই তেজ প্রত্যেক পদার্থের রূপে, জীবজন্তুর রূপেন্দ্রিয়ে ও বর্ণে বিদ্যমান, অথচ রূপে, রূপেন্দ্রিয়ে ও বর্ণে তাপ বা তীক্ষ্ণতা নাই। ভ্রাজিষ্ণুতা বা পদার্থের প্রকাশমানতায় তাপ বা তীক্ষ্ণতা নাই। ক্রোধে ও শৌর্য্যে তাপ থাকিলেও, তাহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহা সহজে অনুভব করা যায় না। পরিপাক ক্রিয়া যে তেজের দহন গুণে ও তাপে সম্পন্ন হয়, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। এক্ষণে দেখা গেল, যে তেজ অগ্নিতে বিদ্যমান, সেই তেজ সূর্য্যোত্তাপে বিদ্যমান, কিন্তু অগ্নির তেজে বস্ত্রাদি দগ্ধ হয়, সূর্য্যের তেজে কিছুই দগ্ধ হয় না। আবার যে তেজ অগ্নি ও সূর্য্যে বিদ্যমান, সেই তেজ পাচক পিত্তেও বিদ্যমান, অথচ তদ্দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হয়, কিন্তু যেমন সূর্য্যোত্তাপে বস্ত্রাদি দগ্ধ হয় না, তদ্রূপ

পাচক পিত্তের তেজেও পাকস্থলী দগ্ধ হয় না। আবার যে অগ্নি বা সূর্য্যের তেজ চক্ষে বিদ্যমান, কিন্তু সেই তেজ দ্বারা চক্ষু দগ্ধ হয় না।) বস্তুতঃ রূপেন্দ্রিয়, বর্ণ ইহাদিগকে তৈজসের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া জ্যোতির অন্তর্ভুক্ত করিলেই যেন ভাল হয়, কারণ তেজ শব্দে তীক্ষ্ণতা, কিন্তু চক্ষে ও বর্ণে তেজের তীক্ষ্ণতা কোথায়? এরূপ আপত্তি স্থূল জ্ঞানে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞানে উহা অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হইবে, কারণ জ্যোতি রহিত তেজঃ বা তেজ রহিত জ্যোতিঃ থাকিতে পারে না অথবা তেজ জ্যোতিরই ঘনীভূতাবস্থা, আত্মা জ্যোতির্ম্ময়, আত্মার জ্যোতিতে তীক্ষ্ণতা নাই, সেই জ্যোতিই ঘনীভূত হইয়া তেজে পরিণত হয়। অন্যথা যে চক্ষে বর্ণ দর্শন করা যায়, সেই চক্ষে অগ্নি ও সূর্য্য দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে না। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বহির্জগতের যে পদার্থ দেহে না থাকিবে, দেহে সেই পদার্থের অনুভূতি ও জ্ঞান হইতে পারে না। চক্ষে সূর্য্যের বা অগ্নির তেজ এবং বর্ণের জ্যোতি উভয়ই বিদ্যমান, তাকে দেখিতে পাই—

অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি।
তদ্ যথা—দর্শনমদর্শনং পক্তিমপক্তি মিত্যাদি।

অগ্নিই শরীরে পিত্তান্তর্গত থাকিয়া কুপিত হইলে অশুভ এবং কুপিত না হইলে শুভফল প্রদান করে, তাহা এই যথা—দর্শন অদর্শন, পরিপাক অপাক।

পিত্ত প্রকুপিত বা বিকৃত হইলে দর্শন ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় না এবং পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে দর্শন ও পরিপাক ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়। পাচকপিত্ত ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করে এবং আলোচক পিত্ত চক্ষে অবস্থান করিয়া রূপ-গ্রহণ করে—

"পাচকং পচ্যতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
যদালোচকসংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারণম্।"

এক্ষণে দেখা গেল বহির্জগতের অগ্নি দেহের পিত্তে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বহির্জগতের সমধর্ম্মী পদার্থ দেহে না থাকিলে, দেহে বহির্জগতের সেই পদার্থের অনুভূতি হইতে পারে না, দেহে অগ্নি না থাকিলে, বহির্জগতের অগ্নির অনুভূতি হয় না। দেহে সূর্য্যোত্তাপ না থাকিলে, দেহে সূর্য্যোত্তাপের অনুভূতি হয় না। চক্ষে যদি কেবল অগ্নি বিদ্যমান থাকে, তবে সেই অগ্নির আলোকের সাহায্যে কেবল রাত্রিকালেই চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন হইতে পারে, দিনে সূর্য্যালোকে দর্শন হইতে পারে না। (ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে, সূর্য্যালোক ও অগ্নির আলোক অভিন্ন বা অগ্নি সূর্য্যোত্তাপেরই ঘনীভূতাবস্থা এবং জ্যোতি

হইতে রূপ, রূপ হইতে বর্ণ, বর্ণ হইতে সূর্য্য ও সূর্য্য হইতে অগ্নির প্রকাশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—"আত্মা জ্যোতিশ্চিদানন্দরূপঃ" আত্মা যখন জ্যোতির্ম্ময়, তখন তাঁহাকে দর্শন করা যাইবেনা কেন? বস্তুতঃ আত্মাকে দর্শন করা যায়। কারণ আত্মার জ্যোতিও চক্ষে বিদ্যমান। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন এই-নিরাকার সচ্চিদানন্দকে কি উপায়ে অনুভব করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা সঙ্গত "জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ" জীব ব্রহ্মই অপর কিছু নয়, সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মকে সে অনুভব করিতে পারে, জীব এক মুহূর্ত্তও নিরাকার ছাড়া নহে। সাকার বা সক্রিয় ভাবের মধ্যেই নিরাকার, নিষ্ক্রিয় ভাব বিদ্যমান, সে ভাব তরলীকৃত, সুতরাং চক্ষু, অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণের দ্বারা দৃশ্য নহে, সেখানে মাত্র ভাব আছে, কিন্তু গুণ, ক্রিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি নাই, জীব নিজে নিরাকার ভাবের ঘনীভূতাবস্থা, সুতরাং সে নিরাকারের তরলীকৃত ভাবকে সহজে ধারণা করিতে পারে না। তেজের তরলীকৃত ভাব কি দর্শন করা যায়?)

আর্য্য-মহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেন বি, এ,।

মাতার মহত্ত্ব।

যাঁহারা কোনও কারণে মায়ের একটু বেশী বাধ্য হইয়া পড়েন, তাঁহারা মায়ের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা যাহা প্রকৃত কথা, তাহাই বলেন,—"পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।"

পিতা হইতে মাতাই শ্রেষ্ঠ কেন না, তিনি আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমাদের জন্য অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহার অশেষ করুণা আমাদের উপর নিপতিত হয়। যতদিন মাতৃ করুণা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব নহে, ততদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মাতা আমাদের সতত পোষণ করেন। আপন বক্ষের ক্ষীরধারা প্রদান করিয়া আমাদের জীবন ধারণ করিবার একমাত্র সহায় হন। "শয়নে স্বপনে"—সুখে দুঃখে সর্ব্বদাই আমাদের কল্যাণ চিন্তা করিয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া পড়েন। মাতা সন্তানের জন্য যাহা করেন, অপর কেহই তাহা

সততই কৃতজ্ঞতা উথলিয়া উঠে। যখনই মাতৃ ঋণের কথা মনে পড়ে, তখনই মনে যে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অতি বড় পাষণ্ডও সে কথা মনে করিয়া চক্ষের জল রুদ্ধ করিতে পারে না। মাতার নিকট আমাদের যাহা ঋণ তাহা এ জীবনে অপরিশোধ্য। জন্মের পর জন্ম অতীত হইলেও সে ঋণের অতি ক্ষুদ্রতম অংশও অপরিশোধিত রহিয়া যায়। মাতা এ ঋণের শোধ চাহেন না। পুত্রও এ ঋণের শোধ হইয়াছে, বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না। যদি কেহ কখন এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করেন, ভগবান তাহাকে অভিশাপ করেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশের একজন ধনীলোক বা রাজা,—৺বারাণসীধামে আপন মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার চিতার উপর বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া একটী সুন্দর মঠ স্থাপন করিয়া ছিলেন। সমস্ত শেষ হইয়া গেলে, তিনি ভাবিয়া ছিলেন,—"আজ বুঝি মাতৃ ঋণ পরিশোধ হইল।" তখন তিনি বলিলেন,—"মাতার ঋণ অপরিশোধ্য, মায়ের বুকের যে ক্ষীর, আমি শৈশবে পান করিয়াছি, এতদিনে বোধ হয়, তাঁহার সেই ঋণের এক অংশ শোধ হইল।" ইহাতে বাহ্যতঃ গর্ব্ব প্রকাশ হইলেও মঠ স্থাপয়িতার মনে বোধ হয়, কোন প্রকার গর্ব্বের উদ্রেক হয় নাই। তিনি হয় ত ভাবিয়া ছিলেন যে, যাহা প্রকৃত তাহাই বলিতেছি। কিন্তু ভগবানের অভিশাপ হইতে তিনি মুক্ত হইলেন না। এ দম্ভ ভগবানের অসহ্য হইল। যাহা কেহ কখনও পারে নাই,—পারিবেও না। এরূপ বাক্য উচ্চারণ ভগবানের সহ্য হইল না। মঠ স্থাপনার পরেই আকাশ হইতে বজ্রপাত হইয়া সেই মঠের চিহ্নের বিলোপ সাধন করিল। তিনি তখন বুঝিলেন যে, বাস্তবিকই মাতার নিকট আমরা এতাদৃশ ঋণী যে ঋণের ক্ষুদ্রতম অংশও শোধ করা যাইতে পারে না। ইহা তাঁহার বিফল প্রয়াস হইয়াছিল। ভগবান্ ইহা সহ্য করিতে পারিবেন কেন?

শাস্ত্রকার মাতাকে "দৈব" ও পিতাকে "গুরু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মাতা বাস্তবিকই দেবসম্ভবা। দেবসম্ভবা না হইলে কি তাঁহার অপরিসীম স্নেহের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পাইতাম? মাতৃ জাতির উপরে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে কি তাঁহারা পিতা হইতেও অধিক বলিয়া উক্ত হইতেন? মাতা পিতা সন্তানের জন্য যাহা করেন, তাহার প্রত্যুপকারের সাধ্য আমাদের নাই। নীরবে আপনাকে কৃতজ্ঞ মনে করিয়া সতত তাঁহাদের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছুই করিবার সাধ্য আমাদের নাই।

"নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারোহি নহি কশ্চন বিদ্যতে॥
তয়োঃ নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণ মনশ গিরা।
নতাভ্যামনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমেকং সমাচরেৎ॥"

উশনঃ সংহিতা, অধ্যায় ১,৩৫—৩৭। বাঙ্গালা অর্থ :—"মাতার তুল্য দৈব নাই, পিতৃতুল্য গুরু নাই। তাঁহারা সন্তানের যে উপকার করেন সে উপকারের কোনরূপ প্রত্যুপকার করা অসম্ভব। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক। (যে কার্য্যে নিজের মুক্তির পথ পরিস্কৃত হয়, অথবা যাহা প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় সে সমস্ত কার্য্য) জনক জননীর অনুমতি ব্যতিরেকে করা যাইতে পারে, কিন্তু এতব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য অকর্ত্তব্য। 'পিতৃ মাতৃ পরায়ণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম' এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরকালে আনন্দ বিধান করে।"

ইহা পুত্র কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইলেও কন্যার ও ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পুত্র ও কন্যার দায়িত্ব।—অবিবাহিত অবস্থায়—সুনীতির অনুসরণ কার্য্যে পুত্র কন্যার কোনও প্রভেদ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, কন্যারও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য,—সে কর্ত্তব্যের গণ্ডি হইতে কন্যার কর্ত্তব্যের গণ্ডী আরও বিস্তীর্ণ। যাহাকে উত্তর জীবনের একটী সংসারের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে হইবে, সেই—কন্যার যাবতীয় কর্ত্তব্য পুত্রের কর্ত্তব্যের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত না হইতে পারে। কিন্তু গুরুভক্তি ইত্যাদি যে, সাধারণ কর্ত্তব্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বিবাহিত কন্যার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে, এই জন্য বাহুল্য ভয়ে বিরত হইয়া অবিবাহিত কন্যার আর পুত্রের সহিত সমান কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্দেশ করাই বোধ হয় শাস্ত্র কারগণের উদ্দেশ্য।

মাতা পিতা ব্যতীত অন্যান্য গুরুজন আছেন, তাঁহারাও সর্ব্বথা পূজনীয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, জ্যেষ্ঠ ভগিনী প্রভৃতিও গুরুজন,—"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠঃভ্রাতা চৈব মহীপতি"—ইত্যাদি ১ম উশনঃ—২৫ × ২৭।

ইঁহারাও সর্ব্বদা সম্মানার্হ ও পূজার যোগ্য। ("পতিরেকো গুরু স্ত্রীনাং" উশনঃ ১।৪৭) এই বাক্যের অন্য—অর্থ করিয়া যদি কেহ পিতৃমাতৃ ও শ্বশুর কুলের অন্য কাহাকেও অবমানা করেন, তবে তিনি সর্ব্বথা নিন্দাভাগিনী হইবেন। যদি কোনও ভগিনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করেন, তবে কনিষ্ঠ

২।১।১৯ } জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। অবিবাহিত পিতৃ মাতৃ কুলের গুরুজনের প্রকৃত সেবা ভক্তি ও সম্মান করিতে শিখিলে উত্তর জীবনে শ্বশুর কুলের উপযুক্ত গুরুজনদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে কোনওরূপ অজ্ঞতার জন্য শৈথিল্য ঘটেনা।

"যঃ ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মুঢ়োবমন্যতে।
তেন দোষেণ সংপ্রেত্য নিরয়ংসংপ্রযচ্ছতি॥"

শ্বশুর কুলে গুরুজনের সেবাদি দ্বারা তাহাদের প্রিয়া ও যশোভাগিনী হইবার জন্য এবং আপনার অন্যতম কর্ত্তব্য—পরিপালন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হওয়ার জন্যই মাতা পিতা ও অন্য গুরুজন বর্গের সেবাদি করা উচিত, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহাও ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের প্রতি একটা নৈতিক বাধ্যতাও আছে।

মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুজন সেবা কন্যার যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, আবার গৃহকর্ম্মও সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। দুইদিন পরে যে, একটি গৃহের সম্পূর্ণ কর্ত্রী হইবে, আজ তাঁহাকে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা শিখিতে হইবে। সকলকেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, বলা যায় না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অশেষ সুখভোগও ঘটিতে পারে, আবার নিজের কর্ম্ম ফলে পথের ভিখারিণীও হইতে হয়। সুতরাং এ উভয় অবস্থারই যাহাতে সম্যক্ অনুভব করিয়া আপন অবস্থায় সুখভোগ করিতে পারা যায়,—তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এজন্য মিত ব্যয়িতা শিক্ষা করা প্রত্যেক কন্যার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি বড় মানুষের মেয়ে, আমার এ কাজ শোভা পায় না; এরূপ কার্য্য আমার মর্য্যাদা হানি কর, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সামান্য কার্য্যেও উপেক্ষা করিতে নাই। ধনী পিতা হয়ত ধনী পাত্রে কন্যার বিবাহ প্রদান করিলেন, কিন্তু যদি স্বকর্ম্মদোষে স্বামীর অবস্থা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তবে শেষে ক্লেশের অবধি থাকে না। অভাব ভাবিলেই অভাব আইসে। সামান্য অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিলে কোনও অভাব বোধ হয় না। সুতরাং অভাব পূর্ণ হইল না, এই বলিয়া যে, একটা কষ্ট তাহাও অনুভব করিতে হয় না। মানুষের অভাবের অন্ত নাই। অভাব মনে করিলেই অভাব, আইসে, আবার কোনও অভাবের কথা না ভাবিলে অভাবেরও অভাব ঘটে। অভাব পরিপূর্ণ না হইলে একটা মানসিক অশান্তি ঘটে, ভগবান্‌কে অবিবেচক পক্ষপাতি ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার অপার করুণা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপর একটা

অশ্রদ্ধা জন্মিয়া পড়ে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অভাব কে অভাব জ্ঞান না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অনেক ধনিকন্যা হয়ত মনে করিবেন যে, যতদিন পিতৃ গৃহে আছি, যাহা কপালে থাকে, উপস্থিত ভোগ করিয়া যাই, পরে কিরূপ অবস্থা সম্পন্ন স্বামীর হস্তে পড়ি, তখন হয়ত সুখের শেষ হইয়া যাইবে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া—পিতৃ গৃহে কুমারী অবস্থায় কোনওরূপ কষ্টে জীবনাতিপাত করিতে চাহেন না। যদি ভাগ্যক্রমে সঙ্গতি সম্পন্ন স্বামীর স্ত্রীরূপে পরিগৃহিতা হন, তবে ত তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত—চলদ্বিত্তম্ ধন সম্পদ্ স্থায়ী থাকে না। আজ তাঁহার স্বামী ঐশ্বর্য্যশালী, কাল হয়ত দুই মুষ্টি অন্নের জন্য তাঁহাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। যাহাহোক্ সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। স্বেচ্ছায় অভাবের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয়। দারিদ্রের নিপীড়নকে সতত সাদরে আমন্ত্রণ করিতে হয়। ভবিষ্যতে সুখান্বেষণ করিলে অন্ততঃ এই গুলিকে জীবনের লক্ষ্য রাখিতে হয়।

দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ যেরূপ উৎকর্ষাভিলাষিনী প্রত্যেক কন্যার অবশ্য কর্ত্তব্য,—মিতাচারও সেই সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা করিতে হইবে। সকলেরই মনে রাখা উচিত, "স্বভাবের দোষ সকল হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।" এই বাক্যের সত্যতা অনুভব করিয়া প্রত্যেককে সাবধান হইতে হইবে। যে কোনও দোষকে দমন না করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দিলে, উত্তর জীবনে সমূহ অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। অমিতাচার আমাদেরও এইরূপ একটি দোষ। ইহাকে সর্ব্বতোভাবে দমন করা উচিত। ভগিনীগণের কন্যা ও ভাগিনীগণ অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, যতদিন পিতৃ গৃহে আছি, ততদিন আমার যাহা খুসী ভোগ করিয়া লই; আবার, জনক জননী ও ভ্রাতৃবর্গ অত্যধিক স্নেহপ্রবণতা বশত এ কার্য্যে বিশেষ কোন বাধা প্রদান করেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দোষ সারিয়া যাইবে, সময়ে পড়িয়া প্রকৃত গৃহিণী হইতে পারিবে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহারাও নিশ্চিন্ত থাকেন। উত্তর জীবনে প্রকৃত গৃহিণী হইবার পক্ষে যতপ্রকার দোষ, যতপ্রকার অমিতাচার হইতে পারে, তাহার দমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গুরুজন ভক্তি প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে একটু বলিবার আছে। আমাদের মধ্যে বিশেষতঃ একান্নভুক্ত হিন্দু পরিবারে বোধ হয়, ননন্দাও ভ্রাতৃবধুর স্থান

একটু শঙ্কটাপন্ন। উত্তরে অনেক স্থলে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সৌভাগ্য ক্রমে সে অশান্তির সামান্য অভিজ্ঞতা না ঘটিলেও ইহা সহজ সংঘটনীয় ব্যাপার বলিয়া শুনিয়াছি এবং আমাদের সাহিত্যেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক দু' একখানি উপন্যাসে ও গ্রন্থকর্তা এ চিত্র অঙ্কিত করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমাদের দেশে ননন্দা ও ভ্রাতৃবধূর পরস্পর আচরণ সম্বন্ধীয় যে, একটী গ্রাম্য ছড়া* বিদ্যমান আছে, তাহা তাঁহাদের কলহের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এরূপ আচরণ প্রত্যেক নারীর পক্ষে লজ্জাকর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক এরূপ আচরণের মূলভিত্তি কোথায়, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী মাতৃতুল্যা, প্রত্যহ তাঁহার পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। যিনি প্রত্যহ পূজ্যা তাঁহার প্রতি এরূপ আচরণ যে, অধর্ম্ম তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাহা হইতে বিরত হওয়া আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

ননন্দা ও ভ্রাতৃবধূর কলহের মূল কোথায়, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। স্বামী হইতে জ্যেষ্ঠা ননন্দা হয়ত মনে করেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপন স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তি বশতঃ স্ত্রীর বাধ্য হইয়া ও তাহার মনোরঞ্জন করিতে গিয়া তাঁহার (ননন্দার বা ভগিনীর) অবজ্ঞা করেন, আবার স্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী ভাবিতে পারেন যে, তাঁহার প্রতি তাঁহার দাদার যেটুকু স্নেহ ছিল, তাহা তাঁহার স্ত্রীতে যাইয়া তাঁহার প্রতি দাদার স্নেহ কমিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত কারণে এই সমস্ত মনের দুর্ব্বলতার জন্য সময়ে সময়ে কলহের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এ দুর্ব্বলতা যে কেবল ননন্দার হৃদয়েই বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহা নহে; ভ্রাতৃবধূর হৃদয়ে ইহা একই কারণে থাকিবার সম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক প্রকৃত পক্ষে ইহা সংঘটিত হইতে পারে না। তাহা জগৎকে দেখাইতে হইবে। মাতৃসমা ভ্রাতৃবধূকে উপযুক্ত সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান না করিলে ধর্ম্মহানি হয়। ননন্দাও ভ্রাতৃবধূতে আবার অত্যধিক স্নেহ জন্মিতে পারে। ভাল থাকিতে কে মন্দের দিকে দৃষ্টি প্রদান করিতে ইচ্ছা করে? অন্যে অধম বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

ক্রমশঃ

---

* ননদিনী রাই বাঘিনী, সর্ব্বনাশের গোড়া।

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥ ১৪ ॥

ইত্যষ্টাবক্রে তৃতীয় প্রকরণম্।

চতুর্থ প্রকরণম্।

জনক উবাচ।

হন্তাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া।
নহি সংসারবাহীকৈর্মূঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥ ১ ॥

নহে, কিন্তু যখন নিজে অনুভব করা যায়, তখন তাহাতে আর ভ্রান্তি থাকে না, ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহাতে প্রকৃত পদার্থ স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কোন ফলের আস্বাদ স্বয়ং গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত একরূপ জ্ঞান থাকে, স্বয়ং অনুভব করার পর আর সেরূপ জ্ঞান থাকে না, প্রকৃত পদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। সেইরূপ, মায়ার আবরণে আত্মাময় জগৎকে অজ্ঞানী ব্যক্তি যে নানারূপে দেখে, পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও, সে ভাব একেবারে দূরীভূত হয় না, কারণ, সে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে একরূপ, এবং অন্যরূপ শুনিয়াছে মাত্র। কিন্তু চিত্ত স্থির হইলে, যখন মায়ার আবরণ দূর হইয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হয়, তখন সমস্তই এক পদার্থ জানায় বিষয়বিশেষে হেয়োপাদেয়তা থাকে না। ১৩।

আন্তরিক কলুষশূন্য, দ্বন্দ্ব-জ্ঞানবিহীন, মঙ্গলেচ্ছা-শূন্য ব্যক্তির, অযত্নলব্ধ বিষয় ভোগাদি, সুখ বা দুঃখের হেতু হয় না। শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদির জ্ঞানকে দ্বন্দ্ব জ্ঞান বলে। ১৪।

যে আত্মদর্শী ধীর ব্যক্তি বিষয়ভোগ-রূপ ক্রীড়ায় রত আছেন মাত্র, তাঁহার সহিত সংসারভার বহনকারী মূঢ়মতির সাদৃশ্য হয় না।—মূঢ় ও জ্ঞানী উভয়েই ব্রহ্ম, কিন্তু মূঢ় বদ্ধাভিমানী, সুতরাং সে এই সংসারের সুখ দুঃখে জড়িত আছে; আর যিনি আত্মজ্ঞ ধীর, তিনি ক্রীড়াস্থলে জয় পরাজয়ের ন্যায়, ইহ সংসারে কিছুতেই আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বর্দ্ধিত মনে করেন না। ১।

যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি ॥ ২ ॥
তজ্জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্নজায়তে।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ ॥ ৩ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥ ৪ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥ ৫ ॥
আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি পরমেশ্বরম্।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥
ইত্যুল্লাসষট্‌কং চতুর্থপ্রকরণম্।

* ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও দীন ভাবে যে অবস্থা কামনা করেন, কি আশ্চর্য্য! যোগী ব্যক্তি সেই পদে অবস্থিত হইয়াও আনন্দিত হন না।—কাম্য কর্ম্ম মাত্রেরই ফল ভোগ করিতে হইবে। ফলেচ্ছার সহিত যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে রত থাকিলে তাহার ফলভোগই স্বর্গ ভোগাদি; ইন্দ্রাদিও সেই পথের পথিক, সুতরাং তাহাতে মুক্তি হইতে পারে না, ইন্দ্রাদি দেবগণও সুখ দুঃখের বশবর্ত্তী এবং মুক্তি কামনা করেন। কিন্তু বাসনাশূন্য মুক্ত পুরুষ হর্ষামর্ষ শূন্য। ২।

যেমন ধূম আকাশে দৃষ্ট হইলেও আকাশের সহিত সঙ্গত হয় না, তদ্রূপ পাপ অথবা পুণ্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তর স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ৩।

যে মহাত্মা আত্মাকেই এই সমস্ত বিশ্ব বলিয়া সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন, তিনি যথাগত ভাবে অবস্থিত হইলেও কে তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়?—যিনি হেয়োপাদেয়তা শূন্য, তিনি সহজেই কাম লোভাদি শূন্য হইয়া যদৃচ্ছাগত কর্ম্মমাত্রই করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি অন্যায়ও করেন না, এবং কর্ম্মফল ভোগও করেন না। তাঁহার কোনও কার্য্যই নিবারণযোগ্য নহে। ৪।

ব্রহ্ম হইতে গুল্মাদি পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাদি সম্বন্ধে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ত্যাগ করিতে বিজ্ঞেরই সামর্থ্য আছে। ৫।

পঞ্চম প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন তে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি।
সংঘাতবিলয়ং কুর্ব্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ১ ॥
উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদঃ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ২ ॥
প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্‌বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুঃসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশা নৈরাশ্যয়োঃ সমঃ।
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৪ ॥

ইতি লয়চতুষ্টয়ং পঞ্চমং প্রকরণম্।

ষষ্ঠ প্রকরণম্।

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ১ ॥

তুমি নিঃসঙ্গ, অর্থাৎ বিষয়সংস্পর্শ-রহিত সুতরাং বিশুদ্ধ, অতএব কি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এই পঞ্চভূতের লয় করত স্বতঃই লয় প্রাপ্ত হও। ১।

আত্মা এক, এবং সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশ্বও আত্মা-স্বরূপ তোমা হইতেই উৎপন্ন, ইহা জানিয়া এই রূপেই লয় প্রাপ্ত হও। ২।

তুমি নির্ম্মল, তোমাতে বিশ্বের অস্তিত্ব সম্ভবে না, পরিদৃশ্যমান সমস্তই প্রত্যক্ষ হইলেও বস্তুশূন্য, রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র, অতএব এইরূপেই লয় প্রাপ্ত হও। ৩।

তুমি পূর্ণ; সুখে দুঃখে, আশা ও নিরাশায়, জীবনে ও মরণে সমান হইয়া এই রূপেই লয় প্রাপ্ত হও। ৪।

জ্ঞান এবং লয় কি? আত্মজ্ঞানই জ্ঞান এবং প্রকৃতিতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকাই লয়।—আমি আকাশের ন্যায় অনন্ত এবং ঘটের ন্যায় প্রাকৃত; ইহাই

মহোদধিরিবাহং স প্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ২ ॥
অহং সংশুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্বিশ্বকল্পনা।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৩ ॥
অহং বা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতান্যথো ময়ি।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৪ ॥
ইত্যুত্তরোপদেশচতুষ্কং ষষ্ঠপ্রকরণম্।

সপ্তম প্রকরণম্।

জনকস্য।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন মম নাস্ত্যসহিষ্ণুতা ॥ ১ ॥

জ্ঞান, এবং ইহার ত্যাগ বা গ্রহণাভাবই লয়।—আকাশ যেমন ঘটের মধ্যে থাকিলেও ঘটের নহে, কেবল ঘটমধ্যস্থিত আকাশ ঘটাকার ধরে মাত্র, তদ্রূপ আমি বিশ্বে থাকিয়াও বিশ্বের নহি। ১।

আমি মহা-সমুদ্রবৎ, এবং মায়াময় বিশ্ব-সংসার তরঙ্গের ন্যায়; আমি শুক্তি সদৃশ এবং বিশ্ব ভ্রমবশতঃ শুক্তিতে রৌপ্যের ন্যায় আমাতে কল্পিত মাত্র; আমি সর্ব্বভূতময় ও সর্ব্বভূত আমাতেই স্থিত; ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানে উক্ত জগৎ প্রপঞ্চে প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি না থাকাই লয়। ২—৪।

অনন্ত মহা সমুদ্রবৎ আমাতে স্বকল্পনা-বায়ু দ্বারা বিশ্বতরী ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, ...

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচি স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন মে ক্ষতিঃ ॥ ২ ॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
নাত্মা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রাত্মনি নিরঞ্জনে।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
ততো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয় কল্পনা ॥ ৫ ॥

ইত্যনুভবপঞ্চকং নাম সপ্তমপ্রকরণম্।

অষ্টম প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণন্তি কিঞ্চিৎ হৃষ্যতি কুপ্যতি ॥ ১ ॥

উক্ত মহাসাগরে ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গমালা স্বতঃ উত্থিত বা বিলীন হইতেছে, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। ২।

এই আত্মারূপ সাগরের বিশ্ব এই নাম কল্পনামাত্র। আমি অতি শান্ত, নিরাকার এবং এই রূপেই আছি।—অর্থাৎ আমার রূপান্তর বা অবস্থান্তর নাই। ৩।

আত্মা প্রাকৃতিক ভাব প্রাপ্ত নহে; অথবা কোন প্রকৃতিক ভাব নিরঞ্জন আত্মাতে নাই। আমি এইরূপেই শান্ত, বাসনা বিরহিত এবং নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত। ৪।

আমার নিকট কিছুই হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না, কারণ আমি চৈতন্য মাত্র, এবং এই বিশ্ব সংসার ইন্দ্রজালবৎ। ৫।

বদ্ধ এবং মুক্তের প্রভেদ কি?—যখন চিত্ত কোনও বিষয়ের বাসনা করে,

তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২ ॥
তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥ ৩ ॥
যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥ ৪ ॥
ইতি বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নাম অষ্টমপ্রকরণম্।

—•—

নবম প্রকরণম্।

গুরুরাহ।

কৃতাকৃতে ন দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা।
এবং জ্ঞাত্বেহ নির্ব্বেদাদ্ভবত্যাগপরো ব্রতী ॥ ১ ॥

কিছু ত্যাগ করে, গ্রহণ করে, এবং আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হয় তখনই বদ্ধাবস্থা, আর যখন চিত্তে ঐ সকল কিছুই হয় না, তখনই মুক্তাবস্থা। ১-২।

যখন কোনও দৃশ্য পদার্থে চিত্তের আসক্তি থাকে, তখনই বন্ধন, এবং আসক্তি না থাকাই মুক্তি। ৩।

যতক্ষণ আমি আছি (অর্থাৎ আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞান আছে) ততক্ষণই বন্ধন, এবং আত্মাভিমান না থাকাই মুক্তি। ইহা জানিয়া তাচ্ছিল্য বশতঃ কিছুই গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে না। ৪।

—•—

ইহসংসারে কাহারও কখন কৃত ও অকৃত বিষয়ে সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব নিবৃত্ত হয় না; ইহা জানিয়া মমতা বিহীন হইয়া ব্রতশীল ও সংসার-বিরত হও। ১।

কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতা ॥ ২ ॥

অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥ ৩ ॥

কোঽসৌ কালো বয়ঃ কিংবা যত্রদ্বন্দ্বানিনোনৃণাম্।
তান্যুপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্তবৎ তাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

হে বৎস! জীবের সংসার চেষ্টা দেখিয়া কোনও ধন্য লোকেরই জীবনের ও ভোগের বাসনা নিবৃত্ত হয়। ২।

তাঁহারা এই সমগ্র সংসারকে অনিত্য,(আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই) ত্রিবিধ সন্তাপপূর্ণ, অসার, নিন্দিত ও হেয় নিশ্চয় করিয়া শান্ত হন। —ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক—(শারীরিক রোগাদি ও মানসিক শোক, ক্রোধাদি), আধিভৌতিক (সর্পবৃশ্চিকাদিজনিত) ও আধিদৈবিক—(দুর্দ্দৈব জনিত)। সংসার এই ত্রিবিধ দুঃখ পূর্ণ। পাতঞ্জল বলেন "পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈগুর্ণ বৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"। বিচার করিয়া দেখিলে সুখ কোথায়? কোনও বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, প্রাপ্তি মাত্র যে তৃপ্তি তাহা ক্ষণিক মাত্র, পরে তাহার রক্ষণ চেষ্টায় দুঃখ এবং প্রাপ্ত বস্তুর নাশে দুঃখ। এই বিচার সর্ব্ব বিষয়ে করিলে, ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে। ইহাই বৈরাগ্য। এবং ইহা হইতেই শান্তি লাভ হয়। শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব দেহের ধর্ম্ম। দেহেন্দ্রিয় থাকিতে তাহা অপরিহার্য্য। সুতরাং তাহাতে উপেক্ষা করা ব্যতীত শান্তি লাভের অন্য উপায় নাই; এই উপেক্ষা বা উদাসীন ভাবাবলম্বনই ব্রত বা সন্ন্যাস। গীতা বলেন, "কর্ম্মফলে আশ্রয় না করিয়া যদৃচ্ছাগত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করাই সন্ন্যাস।" গৈরিকবস্ত্র পরিধান করতঃ আহারের চেষ্টায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ বা পূজা লাভের আকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাস নহে। মনের শান্তি নিজের নিকট, পরের কাছে নাই, এবং যে কোনও রূপ আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও নাই। ৩।

কালই বা কি, বয়সই বা কি, অথবা যাহাতে মানবগণ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাব অনুভব করে, তৎসমুদয়কেই উপেক্ষা করত জ্ঞানী যথাপ্রাপ্তবৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ৪।

নানা মতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্ব্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥ ৫ ॥
কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিং গুরুঃ
নির্ব্বেদ সমতাযুক্ত্যা নিস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥ ৬ ॥
পশ্য ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ।
তৎক্ষণাদ্বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি ॥ ৭ ॥
বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চতা।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥ ৮ ॥

ইতি নির্ব্বেদাষ্টকং নাম নবমপ্রকরণম্।

—•—

সাধু, যোগী, এবং মহর্ষিগণের মত বহু প্রকার, ইহা দেখিয়া কোন্ মনুষ্য সমস্ত শূন্য হইয়া শান্তি লাভ না করেন ?। ৫।

যিনি প্রকৃত গুরু, তিনি চিন্ময় আত্মার স্বরূপ অবগত করাইয়া এবং নির্ব্বেদ ও সাম্য অবলম্বন করাইয়া কি শিষ্যের উদ্ধার করেন না ?। ৬।

ভূত সমূহের বিকার এবং তৎসমুদয়কে প্রকৃত রূপে দর্শন কর, তাহা হইলে আশু বন্ধনমুক্ত ও প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইবে। ৭।

বাসনাই সংসার, অতএব সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ বাসনা ত্যাগেই সংসার ত্যাগ হইবে, বাস যেখানে হউক তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই।— সংসার ত্যাগ করিতে হইলে, গৃহাদি ত্যাগ করিয়া বনে বাস করা ভ্রান্তি মাত্র, বাসনা ত্যাগ হইলেই যথেষ্ট, নচেৎ, বাসনাদি থাকিলে, বনে গিয়াও ভরত-রাজার বনবাস তুল্য অকিঞ্চিৎকর হইবে। ৮।

বহুমূত্র-তথ্য ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু।
আই, এস, ও এম্, বি, এফ্, সি, এস্, মহোদয়ের ইংরাজী
প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা
অনুবাদিত।

দ্বন্দ্বতা-অবস্থা।

(১) অণ্ডনালিক পদার্থস্রাব।—বহুমূত্র রোগের কঠিন অবস্থায় এই স্রাব সচরাচরই হইয়া থাকে। রোগীর কিছু দিন ধরিয়া শর্করা-নিঃস্রাব হইতে হইতে প্রস্রাবের মধ্যে অণ্ডনালিক পদার্থ স্রাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পূয়ঃ-কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শর্করাযুক্ত প্রস্রাব হইতে হইতে মূত্রনালী সমূহের মধ্যে একটা প্রদাহের উৎপত্তি হয়। তাহারই ফলে এই পূয়ঃ-কোষ সৃষ্টি। অধিকাংশ স্থলে পীড়া যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ও (Kidneys) সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে বিকল হইতে থাকে। তদবস্থায় অণ্ডনালিক স্রাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে, পূয়ঃ-কোষ আরও বৃদ্ধি পায় এবং মূত্র তলানীতে মূত্র-নালী স্রাব দেখা যায়। আমার পরীক্ষিত রোগ সমূহের শতকরা ৪৭.৪১ স্থলে প্রস্রাবের মধ্যে অণ্ডনালিক স্রাব ঈষৎ পরিমানে ও শতকরা ১৭.৩৯ স্থলে বহুল পরিমানে পাওয়া গিয়াছে। বহুল পরিমানাবস্থা ৩—৪ হইতে ১—২০০ দৃষ্ট হইয়াছে। নালীস্রাব সংখ্যায় সচরাচর তত বেশী হয় না। ইহা দেখিতে হয় কণাময়, নয় স্বচ্ছ হইতে পারে; কিন্তু উভয় প্রকারই সাধারণতঃ দেখা যায়। কখন কখন পুরাতন বহুমূত্র পীড়ায় মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (Nephritis) তীব্র মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তখন প্রাগুক্ত কণাময় ও স্বচ্ছ নালী-স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত, চর্ম্ম কোষ-স্রাব (epithelial casts) ও মূত্রগ্রন্থিকোষস্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন রোগী পৃষ্টব্রণ, সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষত (cellulitis) কিম্বা হস্তপদাদিতে গলিত ক্ষত হওয়ায়, ভুগিতে থাকে, তখনই উপরোক্ত উপদ্রব দেখা দেয়। তখন সাধারণতঃ তাহার জীবন অতীব সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যায় যে, অণ্ডনালিক পদার্থের পরিমান শর্করার সহিত বিপরীত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিবিধ প্রকার স্রাবের সহিত যখন অণ্ডনালিক স্রাবের পরিমান খুব বেশী হইতে থাকে, শর্করা থাকুক আর না থাকুক, তখন আমাদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে যে, হতভাগ্য রোগীর জীবন প্রদীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে। পুরাতন অণ্ডনালিক স্রাবের যাবতীয়

লক্ষণগুলি উপস্থিত হইতে থাকে; মুখমণ্ডল ফুলো ফুলো হয়, সমস্ত দেহটী ফুলিয়া পড়ে, শ্বাস যন্ত্রও স্ফীত হয়, হৃদ্‌পিণ্ডও স্ফীত হয়। খুব শীঘ্র শীঘ্র এ গুলি হইয়া পড়ে। এতদবস্থায় রোগী শ্বাস রোধ অনুভব করে, তখন গুরুতর শ্বাস-কৃচ্ছ্র ঘটে। তার পর, অসাড়ভাব (Coma) উপস্থিত হওয়ায় জীবন নাটকের শেষ যবনিকা পড়িয়া যায়।

সচরাচর শুধু অণ্ডনালিক স্রাবেই মৃত্যু ঘটে না ;—উহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত উপদ্রবের একটি বা অধিক বর্ত্তমান থাকে।

(২) ক্ষয় কাশ।—বহুমুত্র পীড়ার সান্নিপাতিক অবস্থায় অণ্ডনালিক স্রাব যত ঘটিয়া থাকে, ক্ষয়কাশ তত দেখা যায় না। তাহা হইলেও, ইহা যে নিতান্ত কম এমত নহে। এই উপদ্রবও চুপে চুপে আসিয়া ধরে। ইহার প্রথম আক্রমণে বক্ষস্থলের কোন ক্লেশই অনুভূত হয় না। প্রথমাবস্থায় কচিৎ কাশের সহিত রক্ত দেখা দেয়। পরে ব্যারামটী পাকিয়া দাঁড়াইলে ফুস্ ফুস্ মধ্যে বড় বড় ছিদ্র হইয়া থাকে; তখন অধিক মাত্রায় রক্ত উঠিতে থাকে এবং ফুস্‌ফুসের রক্তবহা নাড়ী ফাটিয়া যাওয়ায়, রোগী অকস্মাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

বহুমুত্র রোগে অনেক স্থলে ফুস্‌ফুসের তলদেশে ক্ষয়কাশের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা রোগীর সকল বয়সেই হইতে পারে। ইহা হইলে রোগী অধিক দিন বাঁচেনা। থুঁ থুঁ বা কাশের মধ্যে প্রচুর পরিমানে ব্রণ জীবাণু (Sulercle lacilli) দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) বিস্ফোটক।—ভারতে এই উপদ্রবে বহুরোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগী বিশেষভাবে এই উপদ্রবের অধীন হইয়া পড়ে। গ্রীষ্ম ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসর উহাদের বিস্ফোটক ও বিস্ফোটক প্রকৃতি যুক্ত বিস্তর ফোঁড়া হইয়া থাকে। প্রথম আক্রমণে অনেকে তত কাতর হন না। কিন্তু উহাদের জীবনী শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ও পরিশেষে ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। শরীরের যে কোন স্থানে বিস্ফোটক হইতে পারে, কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদেশে বা ঘাড়ে হইলে সাধারণতঃ উহা মারাত্মক হইয়া থাকে ও উহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

(৪) চর্ম্মকোষের ক্ষত।—বহুমুত্র রোগীর শরীরে সামান্য একটু আঘাত লাগিলেই তাহার ফলে ভয়ানক ক্ষত আসিয়া উপস্থিত হয়। একটী সূচের আঘাতও না লাগে, বহুমুত্র রোগীর সে সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলা উচিত।

(৫) গলিত ক্ষত।—বহুমূত্র রোগে বিস্ফোটক অপেক্ষা গলিত ক্ষত অল্প দেখা যায়। কিন্তু এই ক্ষত হইলে সাধারণতঃ মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহা সচরাচর হস্তে ও পদেই হইয়া থাকে। ইহা আপনা-আপনিই হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ইহার উৎপত্তি আঘাত জনিত। এই আঘাত অতীব সামান্য প্রকারের; হয় তো একটা আঁচোড় লাগা, কিম্বা একটা আল্‌পিনের খোঁচা লাগা বা একটা জুতার পেরেক ফুটিয়া যাওয়া, ইহা সচরাচর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতেই প্রথমে আরম্ভ হয়। তখন উহাতে বেদনা বা তীব্র যাতনার কোন প্রকার পূর্ব্বাভাস প্রদায়ক লক্ষণ থাকিতেও পারে, আবার না থাকিতেও পারে। যতদিন উহা পায়ের আঙ্গুলে বা পায়ের তলায় সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন সাধারণতঃ উহা শুষ্কাবস্থায় দৃষ্ট হয়। আক্রান্ত স্থান শুষ্ক হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। যখন উহা গুল্‌ফের ঊর্দ্ধাংশে বিস্তৃত হয়, তখন এই পীড়া সাধারণতঃ রসাল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ইহার বিস্তার ধীরে ধীরে হইলেও, ইহা আরোগ্য হইতে চাহে না। ইহার পরিণাম—রক্ত দুষ্ট ও তজ্জনিত মৃত্যু।

গলিত ক্ষত স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই অধিক হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্য-সুলভ অধিকাংশ ক্ষতই পরীক্ষায় বহুমূত্রজ ক্ষত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

রক্ত-বাহিকা শিরার বাহ্য ঝিল্লীর পরিবর্ত্তন বশতঃই বহুমূত্রজ গলিত-ক্ষত প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিবর্গের কদাচিৎ হইয়া থাকে। প্রবীণ বয়স্ক রোগীরা প্রায়শঃই ইহাতে ভুগিয়া থাকেন। "চিকিৎসক" (Practitioner) নামক মাসিক পত্রিকার জুলাই সংখ্যাতে ওয়ালেচ্ "বহুমূত্র গলিত ক্ষত" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সেন্ট্ টমাসের দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২৬টী বহুমূত্রতা ক্ষতের চিকিৎসা হয়। তন্মধ্যে ২৪টী স্থলে রক্তবাহিনী নাড়ীর আবরক ঝিল্লীর বিপুল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। ক্ষতের পচন ক্রিয়া কালীন উহাতে প্রদাহ ঘটিয়া থাকে। এই প্রদাহ আরোগ্য না হইবার একটি কারণ প্রাগুক্ত-প্রকার ধমনী-ঝিল্লীর পরিবর্ত্তন, আর একটি কারণ উপযুক্ত পুষ্টির অভাবজনিত শরীর বিধানের রুগ্নাবস্থা।

(৬) বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়:—

চক্ষু,—বহুমূত্র রোগে চক্ষুর ছানি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রধান লক্ষণ। মাত্র এই প্রকার ছানিই সাধারণ চিকিৎসা-প্রণালীতে সহজে আরোগ্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা পুস্তকে এরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল ছানিতে ফাটা ফাটা দাগ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, তাহাও অতি সহজে আরোগ্য হইয়াছে, কেবল

মূত্রজ-শর্করা নিঃস্রাব হ্রাস করিয়াই এরূপ আরোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ছানি অধিক বয়সেরই লক্ষণ; কিন্তু যেখানে অল্প বয়সে ইহা দৃষ্ট হয়, সেখানে উহা সাধারণতঃ বহুমূত্রতা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সচরাচর দুইটী চক্ষুই যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে। অস্ত্রোপচার পরামর্শযুক্ত নহে। ইহাতে বিপদ আছে। কেন না, দেখা গিয়াছে যে অনেক স্থলে অস্ত্রোপচারের পরেই অসাড়াবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। এতদবস্থায় রোগী আরোগ্য হইলেও সাধারণতঃ অতি বিলম্বে হইয়া থাকে।

অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লীতে প্রদাহ (Retinitis) ও ঐ ঝিল্লী হইতে বা চক্ষুর অন্য প্রদেশ হইতে কখন কখন রক্তস্রাব দেখা যায়; কিন্তু এরূপ ঘটনা অতীব বিরল।

কর্ণ—বহুমূত্র রোগে কখন কখন বধিরতাও একটী লক্ষণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমশঃ

গৃহিণী আমার।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

১

গৃহিণী আমার গৃহিণী আমার—তোমা[redacted]কৃপায় ফুটিল নেত্র,—
অধমের তুমি ইষ্ট দেবতা—এ পাপীর তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র।
দিয়াছ প্রেয়সী পতিত পাবনী এ অধম উপযাচকে দীক্ষা—
দিয়াছ আমারে জনক জননী ভ্রাতা ও ভগ্নী ত্যেজিতে শিক্ষা।
গৃহিণী আমার প্রেয়সী আমার—কে বলে গো তুমি কৃপার পাত্রী—
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-হত্যাকারিণী অন্তিমে তুমি গো-লোকদাত্রী।

২

দেহি পদ-পল্লবমুদারং গাহিল কৃষ্ণ গোপিকাসঙ্গে,
প্রেয়সীর প্রেমে নাচিল সে কালা—তার পদরজ মাখিয়া অঙ্গে—
সন্ন্যাসী সেজে ন'দের গৌর প্রচার করিল পীরিতি-মর্ম্ম,—
এ দেশমধ্যে নেড়ানেড়ীগণ প্রচার করিল নারীর ধর্ম্ম।
গৃহিণী আমার—প্রেয়সী আমার—কে বলে গো তুমি কৃপার পাত্রী,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-হত্যাকারিণী অন্তিমে তুমি গো-লোকদাত্রী।

৩

আর্য্য ঋষির অনাদি গম্ভীর উঠিল যেথানে শক্তি-স্তোত্র,
নহ কি প্রেয়সী সে ভারতনারী—নহি কি আমরা স্ত্রৈণ গোত্র !
তোমার গরিমা-পীরিতি-বর্ম্মে চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ,
করুক যাহারা করিবে কুচ্ছ—আমরা কখনো নহে হে তুচ্ছ।
গৃহিণী আমার—প্রেয়সী আমার কে বলে গো তুমি কৃপার পাত্রী,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-হত্যাকারিণী অন্তিমে তুমি গো-লোকদাত্রী।

৪

প্রেয়সী আমার প্রেয়সী আমার তোমার মহিমা হবে না খর্ব্ব ;
দুঃখ কি—যদি পাইগো তোমার ভর্ত্তা বলিয়া করিতে গর্ব্ব।
যদি বা বিলয় পায় এ বঙ্গ—লুপ্ত হয় এ স্ত্রৈণ-বংশ,
তোমার মহিমা হবেনা লুপ্ত—তোমার কখনো হবেনা ধ্বংশ।
গৃহিণী আমার প্রেয়সী আমার কে বলে গো তুমি কৃপার পাত্রী,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-হত্যাকারিণী অন্তিমে তুমি গো-লোকদাত্রী।

৫

চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া প্রেয়সী তোমার মধুরাদর্শ,
জাগিব নূতন প্রেমের রাজ্যে—যাচিব পীরিতি বর্ষ বর্ষ।
এ প্রেমভূমির প্রতি জনাপরে আছে কামিনীর করুণ দৃষ্টি,
এই অ-জাতির মাথার উপরে করে দেবগণ তক্র বৃষ্টি !
গৃহিণী আমার প্রেয়সী আমার কে বলে গো তুমি কৃপার পাত্রী,
ধর্ম্ম কর্ম্ম-হত্যাকারিণী অন্তিমে তুমি গো-লোকদাত্রী।

—— * ——

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সতীশের কক্ষ। শয্যা সায়িতা, পার্শ্বে মায়া আসীনা।

প্রভা। ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি, তুমি চলে গেলে?

মায়া। না বউ দিদি, আমি ত তোমার কাছে রয়েছি।

প্রভা। কি হ'বে ঠাকুরঝি? আবার আমার এমন হল কেন?

মায়া। ভয় কি বউ দিদি! তুমি শীগ্‌গিরই সেরে যাবে।

প্রভা। আর ভুগে ভুগে বাঁচতে ইচ্ছা হয় না! নিজেও ভুগ্‌ছি তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি। এর চেয়ে আমার মরণই ভাল।

মায়া। ওকথা কি বল্‌তে আছে বউ দিদি! ছেলেটি হয়েছে, তার মুখ চেয়ে যে তোমায় থাকৃতে হ'বে বউ দিদি।

প্রভা। খোকা কই, ঠাকুরঝি! তাকে কেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

মায়া। সে পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। মুকুন্দর মা'কে তার কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি।

প্রভা। (হঠাৎ উঠিয়া) উঃ উঃ আমার মাথা গেল, মাথা গেল।

মায়া। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক বউ দিদি! আমি তোমার মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

(প্রভার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।)

প্রভা। (ক্ষণেক পরে) ঠাকুরঝি।

মায়া। কেন বউ দিদি!

প্রভা। আবার কত দিন ভুগ্‌তে হবে? খোকাকে এবার কে দেখ্‌বে?

মায়া। তার জন্য কেন ভাব্‌ছ বউদিদি?

প্রভা। তোমার যে, আজ যাবার কথা আছে, ঠাকুরঝি। তুমি গেলে খোকার কি হ'বে, আমায় কে দেখ্‌বে। আর তোমার দাদা, তাকে দুটো ভাতে-ভাত সিদ্ধ করে দেবারও যে কেউ থাকৃবে না।

মায়া। তোমাদের এ অবস্থায় ফেলে কি যেতে পারি?

প্রভা। ইচ্ছে ত হয় ঠাকুরঝি তোমায় আরও দিন কতক থাকৃতে বলি। কিন্তু তোমার ভাসুর সে দিন তোমার যাবার কথা বলে পাঠিয়েছেন। তুমি না গেলে পাছে তিনি রাগ করেন, তাই বল্‌তে পাচ্ছি না!

মায়া। বউ দিদি তুমি ভুল বুঝেছ। বড় ঠাকুর কখনও অন্যায় রাগ করেন না। দাদা তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌লে তিনি আমার এখানে থাকায় অমত করবেন না।

প্রভা। আঃ এতক্ষণে বুকের ধড়ফড়ানিটা গেল।

(ননীর প্রবেশ।)

ননী। কাকীমা, কাকীমা, এইবার তোমায় যেতে হবে। আমি তোমায় নিতে এসেছি। বাবা বলে দিয়েছে, আজ তোমায় যেতে হবে।

মায়া। ননী, বাবা আমার এস। (ননীকে কোলে লইয়া চুমু খাইল)

ননী। এবার গেলে তোমায় আর আস্‌তে দেব না।

প্রভা। কি করে তোমার কাকীমা আজ যাবে বাবা? আমার যে আবার অসুখ করেছে।

ননী। কেন সে দিন ত বল্‌লে তুমি সেরে গেছ।

প্রভা। সেরে ত গেছলুম বাবা। আবার যে আজ অসুখ করল। তোমার কাকীমাকে নিয়ে গেলে আমাদের যে বড় কষ্ট হবে।

ননী। (মায়ার গলা আঁকড়াইয়া) না, না, কাকিমা যাবে। আমি কাকীমাকে নিয়া যাব।

প্রভা। ননী, লক্ষ্মী ছেলে; আজ তোমার কাকীমাকে নিয়ে যেও না, তা হ'লে তোমার খোকা ভাইটি যে, না খেতে পেয়ে মারা যাবে। আমি সেরে গেলে তোমার কাকীমা যাবে।

ননী। তুমি আজই সেরে যাও না; বল না তুমি সেরে গেছ।

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

প্রভা। খোকা বুঝি উঠেছে; আমি তাকে দুধ খাইয়ে আসি।

(উঠিবার চেষ্টা)

মায়া। না বউদিদি, তুমি শুয়ে থাক; আমি যাচ্ছি।

(ননীকে লইয়া মায়ার প্রস্থান।)

প্রভা। আটকান ত গেল; কিন্তু এখানে রাখ্‌তে পার্‌লেই কি কাজ হ'বে। যে রকম ঢেটা বাগ্‌ মানবে বলে ত বোধ হয় না।

(সতীশের প্রবেশ।)

সতীশ। মায়াকে নিতে এসেছে দেখ্‌ছি। কিছু কর্‌তে পার্‌লে কি?

প্রভা। এখন আমায় বিরক্ত করোনা; আমার ভারি অসুখ।

সতীশ। ওঃ বুঝেছি। কাজ হাঁসিল কর্‌তে পেরেছ। মায়া আজ আর যাচ্ছে না।

প্রভা। চুপ কর; পাশের ঘরে আছে; শুন্‌তে পাবে।

সতীশ। কতদিন রাখ্‌তে পারবে?

প্রভা। তা যত দিন বল। সুস্থ শরীরে সেবা খাওয়া বইত নয়। কিন্তু এখানে রাখ্‌তে পারলেই কি আমাদের কাজ হবে?

সতীশ। যদি আম্‌মোক্তারনামা খানা সই করাতে পারি, একেবারে পার্টিশন্ সুট রুজু করে দি। তাহ'লেই আর কোন ভাবনা থাকে না।

প্রভা। ও চেষ্টা মিথ্যা। তোমার বোনের সবই সৃষ্টীছাড়া। বিধবা হ'লে সকলেই বাপ ভাইকে বিষয় দেখ্‌বার ভার দেয়। কিন্তু তোমার বোনের সব উল্টো। ক'বার তোমাকে সব ভার দেওয়াবার চেষ্টা করলুম, কিছুতেই রাজী হলো না। দেখ্‌লে ত কেবলই বলে "বিষয় নিয়ে কি করব; ভাসুরের বিষয়, তিনি দেখ্‌ছেন, তিনিই দেখ্‌বেন।

সতীশ। তা হ'ক। আমি ভাব্‌ছি সই করার কথা বলে দেখি।

প্রভা। না তা করোনা। হয়ত তাতে খারাপ হবে, মনে কিছু সন্দেহ করবে।

সতীশ। তা ছাড়া ত অন্য উপায় দেখিনা।

প্রভা। দেখ, সইয়ের দরকার কি? তোমার বোনের বিষয় তুমি তার ভাসুরের কাছে চাইতে পার না?

সতীশ। যদি বিপিন্ তাতে আমায় হাঁকিয়ে দেয়, বলে আমি কোথাকার কে?

প্রভা। আমি বলি একবার চেয়েই দেখ না। আচ্ছা শরতের সঙ্গে পরামর্শ করলে হয় না?

সতীশ। ঠিক বলেছ। তার কাছে কালই যাব। উভয়ের প্রস্থান।

"শঙ্খধ্বনি।"*

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

ঐ ঐ সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি! দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিতেছি,—কিন্তু এ ভীষণ শঙ্খধ্বনির হস্ত হইতে নিস্তার নাই। তোমরা ভীষণ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইও না,—আমারও না একদিন ঐ পবিত্র মঙ্গল ধ্বনিতে একটা শান্তি

---

* জন্মভূমির গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভাঙ্গা কেনেস্তারা" গল্পে লেখক সুরেন্দ্র নারায়ণের স্থলে ভ্রমবশতঃ সুরেন্দ্রনাথ রায় মুদ্রিত হইয়াছিল, লেখক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

এবং তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। আজ ওধ্বনি আমি সহ্য করিতে পারি না। ঐ ধ্বনি যেন আমার মৃত্যু নিনাদ করে,—আমাকে স্থির হইতে দেয় না। ঘূর্ণিত বায়ুর মত আমাকে দেশ হইতে দেশান্তরে প্রতিনিয়ত বিতাড়িত করিতেছে।

সেদিন,—সেদিন কি ভয়ানক! অঘোর আমার আত্মীয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয়, তথাপি তাহার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। আমরা দুইজনই একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে পড়িতাম, আমি তাহাকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিতাম না। আমি প্রাণপণ যত্ন করিয়াছি, সাফল্যের সম্পূর্ণ আশা,—হঠাৎ দেখি,—পরীক্ষার শেষে অঘোরই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

অঘোরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র একটী জমিদারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। বিদ্যালয়ে জমিদার প্রদত্ত কয়েকটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আমারই পাইবার আশা। শিক্ষকেরাও সে আশা করিতে ছিলেন—হঠাৎ কোথা হইতে অঘোর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিশ্চিত প্রাপ্ত বৃত্তি অঘোর কাড়িয়া লইল। আমি ঘৃণায় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকরীতে প্রবিষ্ট হইলাম।

চারি বৎসর চাকরী করিতেছি—আমার মুনিব আমার উপর অত্যন্ত তুষ্ট। শীঘ্রই আফিসের বড়বাবু হইবার সম্ভাবনা। সাহেবও আভাসে এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। চাকরী জীবনে অঘোরকে পরাজিত করিব বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অঘোর তখন সবে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া আর একটা আফিসে উমেদারী করিতেছিল।

হঠাৎ একদিন আফিসে আসিয়া দেখি, অঘোর আমাদের আফিসের টেবিলে বসিয়া লিখিতেছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এখানে কেন? অঘোর একটু মৃদু হাসিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "আমি বেতন সম্বলিত উমেদারী লাভ করিয়াছি।" অঘোরের মৃদু হাসি আমার অসহ্য মনটা একটু খারাপ হইল। যাক্ তবু সে উমেদার। আমি স্থায়ী ও মুনিবের প্রিয় কর্ম্মচারী। তাহাতে আমাতে অনেক প্রভেদ—এ দ্বন্দ্বে আমিই জয়ী।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। আজ কাল করিয়া আমার উন্নতি হইল না। আমাদের পুরাতন সাহেবটী বদলী হইয়া গেলেন। আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ অভিমতও তাঁহার স্থানীয় নবাগত সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন। এ সাহেবও আমাকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

অঘোরের সহিত নবাগত সাহেবের একটু অধিক ঘনিষ্ঠতা দেখিতে লাগিলাম। অঘোর স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইল। তাহাতে আমার কি? আমি পুরাতন। আমার প্রতিও সাহেবের স্নেহের অভাব নাই। অঘোর যতই সাহেবের তোষামোদ করুক, এখানে আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে'না।

সেদিন আফিসে আসিয়াছি, আমাদের বড়বাবু অবসর লইয়াছেন, বড়বাবুর স্থানের ন্যায্য অধিকারী আমি। আজ আমি বড়বাবু হইব। ট্রামের দুইপার্শ্বে যত দেবদেবী ছিলেন, আফিসে আসিবার সময় হাত যোড় করিতে করিতে আসিয়াছি।

আফিসে আসিয়া দেখি,—বড়বাবুর আসনে অঘোর বসিয়া আছে। আমি বিস্মিত হইয়া অঘোরের দিকে চাহিলাম। সেই মৃদুহাসি—সেই সহজ কণ্ঠ। অঘোর বলিল,—"তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, আমিই বড়বাবু হইয়াছি।" অঘোর বলে কি? সেকি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। হায়! একটু পরেই বুঝিলাম, বিদ্রূপ নয়—সত্য। সেই দিনই সে আফিস জন্মের মত পরিত্যাগ করিলাম।

দেশ ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌ আসিলাম। এইখানে এখন আমি কর্ম্ম করি। মাহিনাও বেশ মোটা পাই। আমি অবিবাহিত। বাসা করিয়া থাকা বড় ঝঞ্ঝাট। দিন কতক এই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছিল—এখন আর সে ঝঞ্ঝাট নাই। একজন আমার স্বজাতি ভদ্রলোকের পরিবার ভুক্ত হইয়া থাকি। মাসিক আমার ব্যয় স্বরূপ তাঁহাদিগকে আমার মাহিনার কিছু অংশ ধরিয়া দিই।

আমার আশ্রয় দাতার পরিবারের মধ্যে একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা, তাঁহার স্ত্রী ও জননী। এখন আমিও তাঁহাদের পরিজনের মধ্যে গণ্য হইয়াছি। মেয়েটীর নাম গিরিবালা আমাদের দেশে এতবড় আইবুড় মেয়ে প্রায় থাকে না। বিদেশে ইহা বিরল নহে।

মেয়েটী অনন্য সুন্দরী—বাপের বড় আদরের। তেমন লজ্জা সরম নাই। খুব সরল ও পবিত্র। আমাদের বঙ্গদেশের মেয়েদের এ বয়সে লজ্জা আসে কিন্তু এ বালিকাতে তাহার কিছুই নাই। আমার তাঁহার সরল ভাবটী বেশ ভাল লাগিত। গিরিবালার পিতার আফিস হইতে ফিরিতে একটু রাত্র হইত। এত বড় মেয়ে কিছুমাত্র লেখা পড়া শেখে নাই। আমি তাহার পিতা ও মাতার অনুরোধে বালিকাটীকে লইয়া সন্ধ্যার সময় একটু একটু পড়াইতে বসিতাম। এই নূতন কাজে বেশ আমার দিন স্বচ্ছন্দে যাইতে ছিল।

প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। গিরিবালার পিতার সহিত তাহার বিবাহ

সম্বন্ধে দুই একটী কথা বার্ত্তা হয়। কলিকাতায় গিরির কাকা কর্ম্ম করেন। তাঁহাকেও একটী ভাল পাত্রের জন্য লেখা হইয়াছে। কোথায়ও কিছু সুবিধা হইতেছে না—আমারও পর্য্যায় প্রভৃতির কখনও কখনও সন্ধান লন্। মনে মনে আমার একটা আশা হইতে লাগিল। ক্রমশঃই এ সম্বন্ধে একটু বেশী রকম শুনিতে লাগিলাম। গিরির ঠাকুরমা একটু আধটু আভাসে ইঙ্গিতে এ বিষয় লইয়া কখনও কখনও তামাসা করেন। গিরি আমার হইবে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক সুখের কথা কি আছে। একদিন প্রকাশ্যে এই সম্বন্ধে গিরির পিতা আমার অভিমত লইলেন। আমি আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। এই কথার পর হইতে গিরি আর আমার কাছে পড়িতে আসেনা। কথাটা লইয়া ভিতরে বাহিরে একটা আন্দোলন চলিতে ছিল। আমিও গিরি লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

হঠাৎ একদিন গিরির কাকার নিকট হইতে তাহার বাবার নিকট টেলিগ্রাফ আসিল; পাত্র স্থির হইয়া গিয়াছে, আগামী শনিবার শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইবে। পাত্র লইয়া বর পক্ষ আগামী কল্য রওনা যাত্রা করিবেন।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত!—বাড়ীতে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গিরির পিতাও এ সংবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাগ্ দত্তা কন্যা অন্যে অর্পিত হইতে পারে না,—গিরির পিতাও সে প্রকৃতির লোক নন; তিনি ভ্রাতাকে পাত্র স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া তার করিলেন। কিন্তু ধিক্ অদৃষ্ট! যাহা আশা করি, তাহাই হয় না; এখানে তো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অঘোর নাই, তথাপি আমার অদৃষ্ট বিড়ম্বনা ঘুচিল না।

সেই দিনই আমি ভেদ বমিতে আক্রান্ত হইয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার নাড়ী ছাড়িয়া গেল—বাঁচিবার আশা রহিল না; যথাসাধ্য গিরির পিতামাতা আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ভাল ভাল ডাক্তার আনিলেন, ডাক্তার দেখাইতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছুই হইল না। ক্রমশঃ আমার হাতে পায়ে খিল ধরিয়া আসিতে লাগিল। কি দারুণ পিপাসা! কি ভয়ানক গাত্র দাহ!

শুনিলাম,—গিরির খুল্লতাত সময়ে টেলিগ্রাম পান নাই—তিনি পাত্র লইয়া উপস্থিত। গিরির পিতা কিন্তু অচল অটল; কন্যার গাত্র হরিদ্রা লগ্ন স্থির হইয়া গিয়াছে—সকলেরই মুখ বিষন্ন,—আমিও ক্রমশঃই মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী

"আমার তো শেষ সময় উপস্থিত—আপনি কেন কন্যার জন্য ভ্রষ্ট করিয়া অধর্ম্মে পতিত হইবেন,—আপনার কন্যা—নবাগত পাত্রে সমর্পণ করুন।"

আমার অবস্থা যেরূপ গিরির পিতারও আর ইহা ভিন্ন উপায় ছিল না। সেই রাত্রে গিরি—নবাগত পাত্রে সমর্পিত হইল। সানাইয়ের মিষ্ট ক্রন্দন স্বর আমার কাণে যাইতে ছিল, আমি মৃত্যুর সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,। কিন্তু দুর্ভাগ্যের মৃত্যু নাই, আমারও মৃত্যু হইল না।

ভোর হইতেই আমি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম,। সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা যে অপরিসীম—মৃত্যু যে অনেক ভাল ছিল।

যে নবাগত সৌভাগ্যবানের সহিত—গিরিবালার বিবাহ হইয়াছে—তিনি নাকি কলিকাতার কোন একটী আফিসের বড় বাবু। একবার সেই সৌভাগ্যবানকে দেখিব—একবার গিরির সেই সরল ফুল্ল মুখখানি দেখিব, তাহার পর—দুই চক্ষু যেখানে যায়—চলিয়া যাইব। ধীরে ধীরে গিরির স্বামীকে দেখিবার জন্য শয্যা হইতে উঠিলাম।

বৈঠক খানায় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন,—অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখি,—সেই অঘোর। তেমনি মিষ্ট হাসি, তেমনি,—সহজ সুরে ভাই ভাল আছ? বলিয়া সম্ভাষণ করিল, কি নিষ্ঠুর অদৃষ্টের পরিহাস! কি দুঃখ! কি লজ্জা! আমি সেই রাত্রেই লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলাম।

কি করিব, কোথায় যাইব, স্থির নাই। একেবারে রাওল পিণ্ডির টিকিট কিনিয়া বসিলাম। মনের অবস্থা অতি শোচনীয় কোন কাজ কর্ম্মেই মন দিতে পারিলাম না। কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল—তাহাও ফুরাইয়া গেল। কাজ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু অভাবে পড়িয়া আবার একটা কর্ম্ম জুটাইয়া লইতে হইল।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সংসারে মাতা ছিলেন—তিনিও আমাদের মায়া কাটাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জীবনের বন্ধন কিছুই নাই। কিন্তু যাহা বলিতেও সবই আছে। আমি একাকী তথাপি একটা সংসার। রান্নার জন্য গৃহ পরিচর্য্যার জন্য পরিচারক এই সমস্ত ব্যয় সংগ্রহের জন্য চাকুরী, সবই আছে। কিন্তু কিছুই নাই। মন শূন্য—উৎসাহ হীন। জীবনের মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি,—বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে।

সুখে দুঃখে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। এক জায়গায় আর স্থায়ী হইয়া থাকিতে ভাল লাগেনা। বন্ধন বিহীন চিত্ত প্রতি নিয়ত ছটফট করে। কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া বিশ্বময় ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়—কোথায় তৃপ্তি কোথায় শান্তি

জানেনা।… কিন্তু তাহারি জন্য অশান্ত মন সর্ব্বদা আকুল।

একদিন হঠাৎ চাকুরীর জবাব লইলাম—পরিচিত বান্ধবেরা ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিজেই ঠিক কারণ জানিনা পরকে কি বুঝাইব! উদ্দেশ্য বিহীন অবস্থায় দেশ ভ্রমণে বাহির হইলাম। কত উপত্যকা কত গিরি—কত নদী কত বন পরিভ্রমণ করিলাম,—কিন্তু যাহা চাই, তাহা পাইলাম না। হায়রে ভ্রান্ত চিত্ত? হায়রে দুর্ব্বলতা! তুমি হয়ত একজনের জন্য একটা জীবনের শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া মরুর মত আবার সম্বলিত দগ্ধ জীবন লইয়া ফিরিতেছ—মুহূর্ত্তে তোমার নিরাশ দগ্ধচিত্ত হাহাকারে সমস্ত বিশ্বটা একটা কঠোর পরিহাসের কেন্দ্র স্থির করিতেছে হয়ত ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর একজন ধরিত্রী স্বর্গজ্ঞানে কাহারও বুকে মাথাটী রাখিয়া একটা কুহক ময়ী স্বপ্নাবেশে আপনার জীবনটাকে সুখ আবেশময় বিশ্বসত্বায় লীন করিয়া আত্মসত্বা ভুলিয়া জীবনের একটা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতেছে। তাহার হয়ত একবারও ভাবিবার সময় নাই। আর একটী অশান্তচিত্ত তাহারি জন্য স্বেচ্ছাগতি বিরহিত শূন্যলোক স্থিত আত্মার ন্যায় দুর্ভেদ্য অদৃষ্ট তাড়নে বিশ্রাম বিহীন পরিভ্রমণে আপনার অনিচ্ছায় দিক্ হইতে দিগান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তৃপ্তি হীন—শান্তি হীন—চিরগতি শীল। বিশ্রামের স্থান নাই—অবকাশ নাই, যুগ যুগান্তরেও এ অশান্ত ভ্রমণের পরিসমাপ্তি নাই।

ঘুরিতে ঘুরিতে শিলাঘাটে আসিলাম। প্রশস্ত কৃষ্ণ শিলাখণ্ড মণ্ডিত সোপানে বসিয়া সন্ধ্যার ক্লান্ত সূর্য্যের পানে একটা দিনের পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। হায়! আর কতদিনে বাকি জীবনের অবশিষ্টাংশ শেষ করিতে পারিব।

দূরে ইক্ষুক্ষেত্র ক্লান্ত সূর্য্যের রক্তিম আভায় ঈষৎ হরিদ্রাভ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পরই একটা মাঠ তাহাও সবুজ ভেলভেটের মত সুবিস্তৃত।

ক্ষত বিক্ষত বেলাভূমির মধ্যে দুই একটা ঝাউগাছ তাহারই পদতলে জোয়ারের জল অছাড়ি পিছাড়ি করিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যার স্তব্ধতার মধ্যে নদীর ব্যাকুলতার অস্ফুট সুর আমার বেদনাক্ষুব্ধ বক্ষে আঘাত করিতেছিল। আমিও সেই পতনোন্মুখ শ্লথমূল ঝাউয়ের মত কিসের মায়ায় বেলাভূমি অন্তিম আকর্ষণে আঁকড়াইয়া আছি। স্নিগ্ধ শীতল বারিধির আকুল আহ্বান শুনিয়াও শুনিতেছি না।

এমন সময় দূরে একবার দৃষ্টি পড়িল। দেখি, এক দম্পতি যুগল সেই সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণে বেলাভূমির উপর হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া বেড়াই-

তেছে। ক্ষুদ্র বিষয়ের সহস্র প্রশ্নে যুবতী যুবককে অধীর করিয়া তুলিতেছে। তথাপি সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তাহার কত আগ্রহ—কত আনন্দ। দুই পা চলিতে না চলিতে যুবতী যুবকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া নিম্ন বেলায় কি দেখাইতে লইয়া যাইতেছে। সেই থানেই দুই জনের কতক্ষণ কাটিয়া গেল। আবার অগ্রসর হইল, আবার ফিরিল। কি আনন্দ! কি তৃপ্তি!

এই অনন্ত বিশ্বে অনন্ত আনন্দের মধ্যে আমিই একাকি নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই করিতেছি। তথাপি সেই প্রতি নিয়ত প্রশ্ন—প্রতি নিয়ত প্রশ্নোত্তর।

দম্পতি নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিলাম,—সেই গিরিবালা—সেই অঘোর। আমার প্রাপ্যরত্নাপহরণকারী দস্যু সেই রত্ন গৌরবের স্পর্দ্ধা করিয়া জগৎময় হাসিয়া বেড়াইতেছে—আমি দীন চোরের মত তাহারই ভয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে পলাইয়া বেড়াইতেছি। কি অদৃষ্ট বিড়ম্বনা! প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেদিকে দৃষ্টি করিবারও শক্তি নাই। আমি উঠিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিলাম।

সমস্ত রাত্রি কোথায়ও বসি নাই। অনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণে ক্লান্তি নাই—শ্রান্তি নাই। বিশ্রামের বাঞ্ছাও নাই। যেমন ঘুরিতেছিলাম, তেমনি ঘুরিতে ঘুরিতে বৈকালে একখানি নৌকা লইয়া একটা দূরবর্ত্তী স্থানে কোথায়ও যাইব স্থির করিলাম। সে সময়টা বৈশাখের মাঝামাঝি আকাশ নির্ম্মল ছিল। আমরা নৌকা খুলিয়া দিলাম। নৌকা খানি ছোট—দুইজন মাত্র চালক। আমি নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া ছিলাম।

গঙ্গায় তখন আর বেশী নৌকা ছিল না। আমাদের কিছু দূরে আর একখানি ডিঙ্গী নৌকা ভাসিতেছিল। হঠাৎ আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বায়ু প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। একটু মেঘ কৃষ্ণ বাষ্পের মত বাড়িয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। গঙ্গার শান্ত ঢেউ অশান্ত বালকের মত গঙ্গাময় ছুটোপাটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষুদ্র নৌকা আর কিছুতেই থাকে না। মাঝি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী নৌকাখানিও ঢেউয়ের উপর উঠিতে ছিল পড়িতে ছিল। হঠাৎ নৌকাখানি লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার হাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ডুবিতে বিলম্ব নাই।

আর্ত্ত আরোহীর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বহুদূরে তাহাদের

সাহায্য করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তথাপি একটা ব্যাকুলতা, একটা নিষ্ফল আক্ষেপ;—বেদনায় কাতর হইয়া উঠিলাম। হঠাৎ আমাদের নৌকাখানি কাত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে হাল ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝি সামলাইতে না পারিয়া গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া গেল। নৌকা খানি স্রোতের তালে দ্রুত ছুটিতে লাগিল। আমি তখনও সেই নৌকার উপর দাঁড়াইয়া। একবার ভীত দৃষ্টিতে পরবর্ত্তী নৌকা খানির দিকে চাহিলাম—দেখিলাম তাহার আর চিহ্ন নাই। আরোহীর কোনরূপ আর্ত্ত চিৎকার সেই ঝড়ের মধ্যে অস্পষ্ট অন্ধকারে কিছুই শুনিতে বা দেখিতে পাইলাম না। আমার নৌকাখানি দু' একবার কাত হইয়া সোজা হইয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগও কমিয়া আসিল। আকাশও পরিষ্কার হইয়া আসিল।

তখন ঠিক সন্ধ্যা। হঠাৎ আমার নৌকার পাশ দিয়া—একটা মজ্জমান শ্রান্ত দেহ আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে করিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। আমি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলাম। লোকটী এক একবার ঢেউয়ের উপর দিয়া অন্তিম বলে মুখ তুলিতেছিল। দেখিলাম,—অঘোর। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। জীবনের আগাগোড়া সমস্ত স্মৃতি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল। প্রবল বেগে অঘোর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আমার নৌকার দাঁড়খানি চাপিয়া ধরিল। একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসায় আমি উন্মত্তের মত দাঁড়খানি টানিয়া লইলাম। ক্লান্ত, শ্রান্ত অঘোর আবার প্রবল আগ্রহে দাঁড়খানি আকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, আমি আবার দাঁড়খানি সরাইয়া লইলাম। জীবন রক্ষার কি ব্যাকুল আগ্রহ—আমি নৌকার উপর থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিলাম। তাহার সকল যত্ন সকল চেষ্টা বিফল হইল। স্রোতাবেগে আমার নৌকাখানি সেই মুহূর্ত্তেই ঘুরে ঘুরিয়া গেল। সে তিন চারিবার ঢেউয়ের উপর জোর করিয়া মুখ তুলিল। কি ম্লান শুষ্ক আসন্ন মৃত্যু ভীত রক্ত শূন্য বীভৎস মুখ! তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। পরমুহূর্ত্তেই সে অনন্ত সলিল তরঙ্গ মালার মধ্যে চিরতরে ডুবিয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই তীরবর্ত্তী পল্লীর সন্ধ্যার মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি গভীর রোলে বাজিয়া উঠিল। আমি উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলাম "ঐ—ঐ ডুবে গেল।"

আমি একটা দারুণ অনুশোচনায়—অঘোরের উদ্ধারের জন্য পর মুহূর্ত্তেই গঙ্গাবক্ষে লাফাইয়া পড়িলাম। ডুবিয়া ডুবিয়া সমস্ত গঙ্গা তোলপাড় করিয়া

মত কোন কোন দিন গঙ্গাবক্ষে—অঘোরকে খুঁজিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে পাই নাই। মুহূর্ত্তের অন্যায়ের গ্লানি আজ দ্বাদশ বৎসরেও পরিসমাপ্তি হইল না। এখনও সেই সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি শুনিলে, আমি শিহরিয়া উঠি—ছুটিয়া পালাই। অঘোরের সেই ক্লান্ত রক্তশূন্য মুখখানি ঢেউয়ের তরঙ্গের উপর যেন ভাসিয়া উঠে—সেই অন্তিম আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হস্ত আমাকে বেষ্টন করিতে ছুটিয়া আসে। আমি দূর হইতে দূরান্তরে ঘূর্ণিত বায়ুর মত অনির্দ্দিষ্ট গতিতে পলাইতেছি। কিন্তু সন্ধ্যার সেই শঙ্খধ্বনি আজও আমাকে মুক্তি দেয় নাই।

চিত্র পরিচয়।

জন্মভূমির বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথমেই যে প্রতি-কৃতি প্রদত্ত হইল,—তিনি কলিকাতা ১৭নং কাশীদত্তের ষ্ট্রীট নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ। ইনি গত ত্রিংশ বৎসরাধিক কাল চিকিৎসকরূপে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্ব্বেদের স্থায়ী উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, ইতঃপূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্কলিত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা চারিখণ্ড, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, পথ্য-শিক্ষা, অনুপান-দর্পণ, দ্রব্যগুণ-পরিচয়, প্রাচ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ সকল বঙ্গ সাহিত্য সংসারে প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকটে সমাদৃত হইয়াছে, রাজা শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়, জজ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র, জষ্টিস উড্রপ প্রভৃতি গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ, কবিরাজ মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনায় অতীব প্রীত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

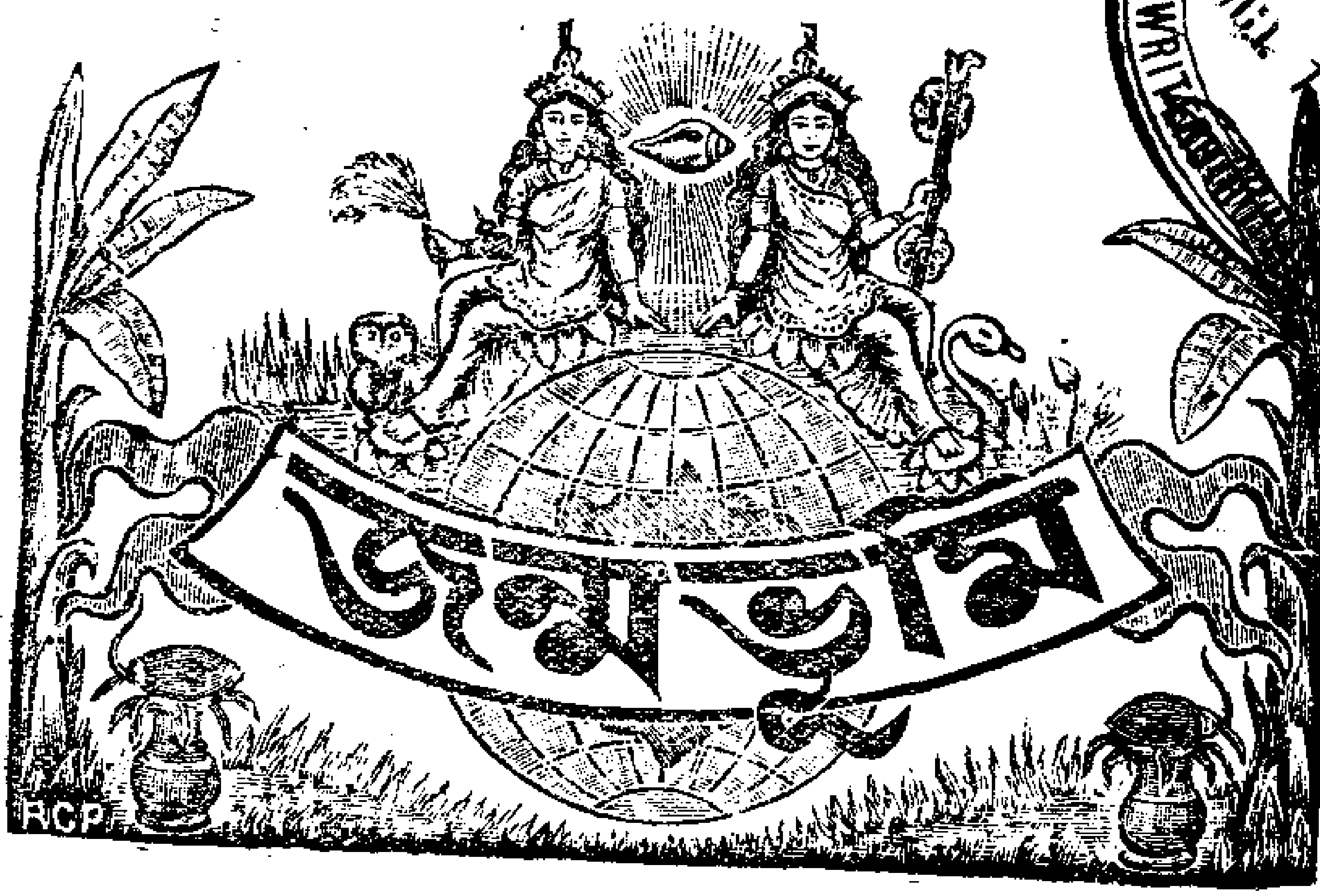
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানানুলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্কলিত প্রত্যেক গ্রন্থে তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আমাদের পরম পূজ্যপাদ প্রাচীন ঋষি প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে,—যাহা আজ পর্য্যন্তও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনায় কবিরাজ মহাশয় জনসমাজে পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমরা জন্মভূমির পাঠক মহোদয়গণকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কবিরাজ মহাশয়ের সুলিখিত নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদনার্থ জন্মভূমিতে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। ভগবান কবিরাজ মহাশয়ের দীর্ঘজীবন ও সুখসৌভাগ্য প্রদান করুন।



বহুদর্শী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার দত্ত এম, বি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

কে বড়?

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে কে বড়? পুরুষ বড় কি প্রকৃতি বড়?

প্রকৃতি কি? প্রকৃতি পদার্থ,——

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধি রেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥ গীতা।

শ্রীভগবান বলিতেছেন,—

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি আমার প্রকৃতি।

এই অষ্ট প্রকৃতি জগতের মুল উপাদান বা এই অষ্ট পদার্থে জগৎ রচিত হইয়াছে। ক্ষিতি—কঠিন, অপ্—তরল, তেজ—উষ্ণ, মরুৎ—চঞ্চল বা গতিশীল ও ব্যোম বা আকাশ—ছিদ্র। মহা আকাশরূপ অতিবৃহৎ ছিদ্রের মধ্যে বায়ু এবং তন্মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল ও জীবজন্তু সমস্ত অবস্থিত।

জগতের এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার অবয়ব ঐ অষ্ট প্রকৃতি বিহীন, তবে অবয়বভেদে পদার্থের তারতম্য আছে। চেতন পদার্থে বায়ুর চাঞ্চল্য অধিক, উদ্ভিদে তদপেক্ষা কম, অচেতনে নাই বলিলেই হয়। তদ্রূপ কঠিনতা, তরলতা, উষ্ণতা ও ছিদ্রতা সকল দ্রব্যে সমান নহে, কোন পদার্থে বেশী, কোন পদার্থে কম। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশাদি অষ্ট পদার্থ হইতে জগৎ জাত এবং অষ্ট প্রকৃতি জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে বৃহত্তম, যতই খরচ হউক, অষ্ট পদার্থের অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তজ্জন্য উহাদিগকে জগতের উপাদান বা প্রকৃতি বলা হয়। আমাদিগের ঋষিরা বলেন, ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই প্রতিরূপ এবং জড় চেতনেরই ঘনীভূতাবস্থা। বস্তুতঃ তাঁহারা এক চেতন ব্যতীত তত্ত্বান্তর স্বীকার করেন না। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। চেতন অত্যন্ত তরলাবস্থা, সেখানে কেবল মাত্র চৈতন্য আছে, কিন্তু গুণ বা ক্রিয়া নাই। সেই চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ অহংভাবে পরিণত হয়, অহং ঘনীভূত হইয়া বুদ্ধি তত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্ব মনস্তত্ত্বে, মন আকাশে, আকাশ বায়ুতে, বায়ু তেজে, তেজ জলে ও জল পৃথিবীতে পরিণত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই মতের কিঞ্চিৎ পোষকতা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, একই মূলভূত বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া বহু হইয়া এই বৈচিত্র্য জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদিগের গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃতি জগৎ-কর্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির গবেষণার ফলে আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ কিরূপ সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে "এক একটি পরমাণু বাস্তবিকই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড, অপিচ মহাব্রহ্মাণ্ড যে ছাঁচে ঢালা, অণু ব্রহ্মাণ্ডও সেই ছাঁচে ঢালা। পরমাণুগণ যে কেবল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, তাহা নহে, বাস্তবিকই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড-পরমাণুর মধ্যে তাড়িতাণুগণ গ্রহ উপগ্রহাদির ন্যায় অবিরত স্ব স্ব কক্ষায় প্রবল বেগে ঘুরিতেছে। সেই ঘূর্ণনের বেগ এত প্রবল যে, প্রতি সেকেণ্ডে তাঁহারা শত শত কোটিবার আবর্ত্তন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এক একটি পরমাণু এক একটি ব্রহ্মাণ্ড নহে, পরন্তু বহু ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়। এই ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের প্রত্যেকটির কেন্দ্র স্থলে একটি করিয়া পুংতাড়িত-যুক্ত অণু সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছে এবং তাহাকে ঘেরিয়া স্ত্রীতাড়িত যুক্ত তাড়িতাণুপুঞ্জ আবর্ত্তিত হইতেছে।" বস্তুতঃ বিরাট বিশ্বে প্রকৃতি পুরুষের যে লীলা দৃষ্ট হয়, ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুতেও তাহা দৃষ্ট হয়। এই নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ)

পুংতাড়িতযুক্ত ক্ষেত্রের উপর স্ত্রীতাড়িতযুক্ত কণার আবর্ত্তন আমাদিগকে শবরূপী শিবের বক্ষে মহামায়ার নর্ত্তন স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাচীন ঋষিগণ যে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম কেবল "মহতো মহীয়ান্" নহেন, তিনি "অণোরণীয়ান্" এক্ষণে তাহার অর্থ কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অণুব্রহ্মাণ্ড ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড—সষ্টিম-ব্রহ্মাণ্ড। ব্যষ্টি সমষ্টিরই প্রতিকৃতি।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এতকাল পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া ব্যোম বা ইথার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা তদুপরি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটিস্তর অতিক্রম করিয়া মুলপ্রকৃতি ও প্রকৃতির পর আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যাহা যন্ত্রবলে দর্শন করেন, ঋষিরা তাহা যোগবলে মনশ্চক্ষে দর্শন করিতেন। বস্তুতঃ আমরা আর্য্যসন্তান হইলেও আর্য্যদিগের সেই যোগবলের মর্ম্ম অবগত নহি এবং তজ্জন্য ঋষি উপদেশের প্রতি অযথা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। ঋষিদিগের সময়ে আধুনিক অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের প্রচলন ও ব্যবহার ছিল না। অথচ ব্যোম অপেক্ষা সূক্ষ্মস্তরে তাঁহারা কিরূপে পৌছিলেন? কিরূপেইবা আত্মাকে দর্শন করিলেন, কিরূপেইবা প্রকৃতি পুরুষের ভেদ নিরূপণ করিলেন এবং কিরূপেইবা প্রকৃতিকে জগৎ-প্রসবিনী জগৎ-কর্ত্রী জানিয়া শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর, কিন্তু বিস্ময়কর হইলেও যথার্থ, যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হওয়া যায়। অধুনা পাশ্চাত্য দেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক-উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার মুলে জ্ঞান-বল, আর ঋষিদিগের জ্ঞানের মুলে যোগবল। যোগবল মনের বল, যোগবলে সর্ব্বদর্শী হওয়া যায়। মনের দ্বারা জানার নাম জ্ঞান এবং যোগবলে দুই চক্ষের ক্রিয়া রহিত হইয়া দুইভ্রুর মধ্যস্থ তৃতীয় চক্ষু উদ্ভাসিত হইলে, তদ্দারা দর্শনের নাম যোগবলে দেখা, ইহাকেই প্রজ্ঞা চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু বা মনশ্চক্ষু বলে। মনই জানে এবং মনই দেখে, তবে প্রভেদ এই— মনের দ্বারা জানিতে কেবল জ্ঞানের প্রয়োজন এবং মনের দ্বারা দেখিতে যোগবলের প্রয়োজন। ঋষিরা জ্ঞান ও যোগ উভয় বলেই বলীয়ান্ ছিলেন, অতএব তাঁহাদিগের ভ্রম প্রমাদ হইত না।

পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে হইলে, প্রথমে পদার্থের স্থূল স্তর হইতে সূক্ষ্মস্তরে যাইতে হয়, অন্যথা সূক্ষ্মের ক্রিয়া জানা যায় না। এই যে সহস্র অশ্ববলে ইলেকট্রিক ট্রাম চলিতেছে, এই যে দশ সহস্র অশ্ববলে জাহাজ বা রেলের গাড়ী চলিতেছে, এই শক্তি ও বল সূক্ষ্ম জগতের। সূক্ষ্ম জগতের এই

শক্তি ও বল তরলাবস্থায় বা তরঙ্গায়িতরূপে ছিল, তখন শক্তি ও বলের বিকাশ ছিল না, তারপর মানুষ তাহাকে বুদ্ধিবলে যন্ত্রাবদ্ধ ও ঘনীভূত করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছে। ঝড় হয় কেন? বায়ুর পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে, তদ্ব্যতীত বায়ুর খরচও আছে, তজ্জন্য যেখানে বায়ুর অভাব হয়, সেখানে অন্য স্থান হইতে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া বায়ুর অভাব পূরণ করে, কিন্তু ঝড় সর্ব্বদা হয় না, সুতরাং বায়ুর শক্তির বিকাশও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না। বায়ু অষ্ট প্রকৃতির অন্যতম, অতএব ঝড় প্রকৃতির ক্রিয়া। মানুষ বহির্জগতের এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়া প্রকৃতির শক্তি ও বল বুঝিতে পারিয়াছে। তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের শক্তি, ক্রিয়া, বল ও অবস্থান জানিতে হইলে, প্রথমে স্ত্রীপুরুষের শক্তি, ক্রিয়া ও বল জানা দরকার। স্ত্রীপুরুষের যে ভাব সে ভাব সূক্ষ্মজগতের প্রকৃতি পুরুষের, কারণ স্ত্রীপুরুষ ক্ষিত্যাদি অষ্ট প্রকৃতি ও ব্রহ্ম পুরুষের সমবায় বা ঘনীভূতাবস্থা। স্ত্রীপুরুষের সংযোগে যেমন সন্তানোৎপত্তি হয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তিও তদ্রূপ। তবে স্ত্রীপুরুষ কেবল সন্তানের জননী ও জনক এবং প্রকৃতি ও পুরুষ সমগ্র বিশ্বের জননী ও জনক বা আদি পিতা মাতা। পরন্তু স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ও প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ একপ্রকার নহে। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বায়ু ও জলের সংযোগের ন্যায়। যেমন চঞ্চল বায়ুর প্রবল আঘাতে জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, অথবা স্ত্রীপুরুষের দৃষ্টি পরস্পর নিবদ্ধ হইলে, যেরূপ উভয়ের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঈক্ষণে প্রকৃতি তদ্রূপ চঞ্চলভাবাপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ প্রকৃতি পুরুষের উত্তম দৃষ্টান্ত। অতঃপর কর্তৃত্ব, সংসারে প্রকৃতিই গৃহকর্ত্রী, সেখানে পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। ইহাই হইল প্রকৃতি পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল দৃষ্টান্ত। ইহাপেক্ষা সূক্ষ্মস্তরে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ নাই, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধ আছে। যেমন সন্ন্যাসী, সে কামিনীত্যাগী হইলেও প্রকৃতির কর্তৃত্বাধীন, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রার তাড়না আছে। বায়ুর শোষণ গুণে তৃষ্ণা, তেজের দহন গুণে ক্ষুধা হয়, সুতরাং সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াও প্রকৃতির তাড়না এড়াইতে পারে না। অতঃপর জরা মরণ ও ব্যাধি। জন্মিলেই জীবকে ব্যাধি ও জরা মরণের অধীন হইতে হয়। পঞ্চভূতের আকর্ষণে মৃত্যু ও বিকর্ষণে জীবের জন্ম হয় এবং শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার হ্রাস বৃদ্ধিতে জীব ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

আকর্ষণে প্রকৃতির ক্রোড়ে চিরসমাধিলাভ করে। ফলতঃ প্রকৃতিই সর্ব্বে সর্ব্বা, প্রকৃতিই একমাত্র জগতের কর্ত্রী। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে আধিব্যাধিতে সংসারে বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির কর্তৃত্ব, পুরুষ সর্ব্বত্র শবরূপী শিবের ন্যায়। প্রকৃতির এক নাম শক্তি, শক্তির শক্তি ব্যতীত শবের শক্তি কোথায়? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতিতে তথা জলেস্থলে আকাশে নক্ষত্রে সর্ব্বত্র প্রকৃতির শক্তি বিরাজ করে। পৃথিবীর ঘূর্ণন, জলের জোয়ার ভাটা, সূর্য্যের অয়ন, বায়ুর চাঞ্চল্য বা গতিশীলতা সমস্তই শক্তির ক্রিয়া। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ। প্রকৃতি জগৎ-কর্ত্রী। গীতায়ও এই মত পরিব্যক্ত—

"কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।"

কার্য্য এবং কারণের কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু।

কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

ঈশ্বর কর্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন নাই, স্বভাব বা প্রকৃতি হইতেই কর্তৃত্বাদি প্রবর্ত্তিত হয়।

বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বই ছিল, যেমন তাঁহার জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, তেমনি "এক বহু হইব" বলিয়া প্রকৃতিকে সমস্ত শক্তি দান করিয়া নিজে মহাশক্তির চরণতলে নিপতিত হইলেন, ঈশ্বর সেই হইতে মৃত। বোধোদয়ে পড়িয়াছি, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, এক্ষণে তাঁহার আকারও নাই, চৈতন্যও নাই, পরন্তু ঈশ্বরপুরুষেরও যে দশা, ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষ পুরুষেরও সেই দশা!!!

সমস্যা-পূরণ।

লেখক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত।

(পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত "কর্ম্মযোগ" নামক ইংরেজী পুস্তক হইতে)

নৃপতি ভাবিতে লাগিলেন—কোন পথে যাই, কোন পথ অধিকতর শ্রেয়স্কর। গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম—কোন আশ্রম আত্মোপলব্ধির অধিক সহায়ক?

আত্মবুদ্ধি যখন সমস্যা-পূরণে পশ্চাৎপদ হইল, নৃপতি তখন অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিভিন্নরুচি বিভিন্নআদর্শ বিচিত্র মানব মন—এই দ্বন্দ্ব অনৈক্যের মধ্যে পড়িয়া নৃপতির সমস্যা আরও জটিলতর হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী বলিল, "সন্ন্যাসাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।"

গৃহী বলিল, "গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।"

এমনই অনেকে আপন আপন অন্ধতার পরিচয় দিয়া নৃপতির অমূল্য জীবনের একাংশ বৃথা ব্যয় করিল। সত্যান্বেষণ আভ্যন্তরিক প্রয়াস সাপেক্ষ। এই প্রয়াস পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই তবে বাহিরের ঘটনা ঠিক ঠিক পথ প্রদর্শনে আহ্বান করে। নৃপতির ঔৎসুক্য দীর্ঘ অবস্থিতির অবকাশে ক্রমে সাধনায় পরিগণিত হইল। শুধু মীমাংসার জন্য নৃপতি বিপুল সাম্রাজ্যও পরিত্যাগে যখন স্থিরচিত্ত হইলেন, এমন সময় একদিন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী রাজসভায় আগমনকরতঃ নৃপতিকে কুশলাশীর্ব্বাদ করিলেন।

"সন্ন্যাসিপ্রবর আমার একমাত্র কুশল, একমাত্র অভিলাষ—পথের সমস্যা-পূরণ। আপনি আমায় কুশলাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এই সমস্যা যদি পূরণ করিয়া দেন তবেই আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হইবে।"

সন্ন্যাসী নৃপতির ব্যাকুলতা দর্শনে হৃষ্টচিত্তে সমস্যা শ্রবণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

"মহাশয়, সমস্যা এই—গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম, এই দুই আশ্রমের কোনটি মঙ্গলতর, কোনটি শ্রেষ্ঠ?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন,

"রাজন্, আপনার কি ঐ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত আছে?"

"না, মহাশয়, আমার চিত্ত দোলায়মান, আমার কোনই স্থির সিদ্ধান্ত নাই।"

"রাজা, শুনে, দেখে, ঠেকে, তিন রকমে শিক্ষা হয়, ইহার মধ্যে যে দেখে শেখে, সেই বুদ্ধিমান। যদি শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন তোমার বোধ হইয়া থাকে, আমার অনুগামী হও।"

অনন্তর নৃপতি একমাত্র উত্তরীয় গ্রহণকরতঃ সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন। যে ঐশ্বর্য্য এতদিন তাঁহাকে জড়জগতের কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সে ঘোষণা সে প্রভুত্ব যে এত বৃথা এবং এত মিথ্যা আজ উন্মুক্ত আকাশ

গেল সে প্রভুত্ব নয়, সে দাসত্ব। নৃপতি বুঝিলেন, একটা বড় ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। এবার তার প্রতিশোধ।

এমনি করিয়া দীর্ঘ দিন পথে পথে কাটিতে লাগিল, কিন্তু যে সত্য তত্ত্বের জন্য নৃপতির মন ব্যাকুল হইয়াছে, এখনও তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। নৃপতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী ভাবিলেন,—আর নয়, এইবার নৃপতির পথ নির্দ্দিষ্ট হউক। পরদিন তাঁহারা আর এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

"বৎস, আমরা আগামী প্রভাতে এই রাজ্যের রাজাকে দর্শন করিতে যাইব। কল্য রাজার একমাত্র দুহিতা স্বয়ংবরা হইবেন। আমরা স্বয়ংবরসভার দর্শক হইব।"

একমাত্র কন্যা—রাজার নয়নমণি, বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী—যৌবনময়ী, সৌন্দর্য্যের ললামভূতা, পরমবিদুষী—রাজদুহিতার স্বয়ংবর। সমগ্র সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া উৎসব। নগরীর দ্বারে দ্বারে পুষ্পপত্রের মঙ্গলতোরণ, রাজপথে বাঁকে বাঁকে নহবৎমঞ্চ, কুঞ্জে কুঞ্জে নবজাগরণ—উৎসবাভিনয়, প্রেমনাটিকার গীতাভিনয়। প্রাসাদকুঞ্জে স্বয়ংবরসভা। শিল্পীর অপূর্ব্ব রচনায় নন্দন সভারই অনুরূপ। বৈদেশিক রাজন্যবর্গ, রাজকুমারবর্গ রাজার অতিথি—জামাতৃ পদপ্রার্থী। আগামী প্রভাতে ভাগ্যদেবীর একটা পরিহাসলীলার অভিনয় হইবে। ক্রমে সে প্রভাত সমাগত হইল। রাজগণ, কুমারগণ সভায় নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে আসীন হইলেন। বন্দিগণ মঙ্গলগীতি গাহিলেন। রাজকুমারী মনোরম বেশে সঙ্গিনীসহ দোলায় আরোহণ করিয়া সভায় উপনীত হইলেন। কুমারী একবার চকিতে সভা নিরীক্ষণ করিলেন।

ফুলদোলা একে একে আসনের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। ভাটগণ নিজ নিজ রাজার বা রাজকুমারের মনোহর ছন্দোবন্দে গুণ কীর্ত্তন করতঃ পরিচয় প্রদান করিল। সঞ্চারিণী দীপশিখা যেমন সম্মুখে আলোক ও পশ্চাতে অন্ধকার বিস্তার করিয়া চলে রাজদুহিতা সেইরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রদক্ষিণান্তর দোলা পুনরায় কুসুমমঞ্চে ফিরিয়া আসিল। বরমাল্য হাতেই রহিল। মনোমত বর মিলিল না। সহসা কুমারীর দৃষ্টি সভাকুঞ্জের এক কোনে পতিত হইল। নৃপতি ও সন্ন্যাসী দেখিলেন, রাজকুমারীর দৃষ্টি যে দিকে নিপতিত হইয়াছে তথায় গৈরিকবসন তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি এক তরুণ সন্ন্যাসী—দিব্যপুরুষ দাঁড়াইয়া। স্বয়ংবর হইয়া গেল। ইঙ্গিতে ফুলদোলা সেই দিব্য পুরুষের সম্মুখে নীত হইল। রাজকুমারী তরুণ সন্ন্যাসীকে বরমাল্য অর্পণ

করিলেন। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন,—"কি কর, কি কর! আমি সন্ন্যাসী, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী। রমণীগ্রহণে আমার ধর্ম্মলোপ হইবে।" রাজকন্যা অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা দুহিতার সেই অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "সন্ন্যাসী, যদি দারিদ্র্য-নিবন্ধন তুমি ভীত হইয়া থাক, সুস্থ হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার কন্যা স্বয়ংবরা হইয়া যাহাকে বরমাল্য অর্পণ করিবে, আমার অর্দ্ধরাজ্য তাহাকে দিব।"

"রাজা, আমি তরুতলবাসী সন্ন্যাসী, আমার রাজ্যে প্রয়োজন?"

রাজা বলিলেন –

"সন্ন্যাসী, আমার কন্যা তোমাকে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছে, তুমিই তার পতি, এ কন্যা অন্য কাহাকে সম্প্রদান করিলে সে দ্বিচারিণী হইবে; ভাল, আমার রাজ্য না লও কন্যা গ্রহণ কর। সতী পতিধর্ম্ম অবলম্বন করে, তুমি সন্ন্যাসী আমার কন্যা সন্ন্যাসিনী, তুমি গ্রহণ না করিলে ইহার গতি কি হইবে?"

"রাজা সকলেরই গতি ভগবান, তোমার কন্যা সতী, সতীধর্ম্ম পালন করুক। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি সন্ন্যাসী, আমার ধর্ম্ম আমি পালন করি।"

সন্ন্যাসী সম্মুখে সম্মুখে রাজদুহিতা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। সন্ন্যাসী দ্রুত চলিতে লাগিলেন। রাজ-দুহিতাও দ্রুত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা এই-রূপে নগরসীমানা অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন।

দর্শক নৃপতি এবং তাঁহার গুরু সন্ন্যাসীবর এই বিচিত্র অভিনয় অতি ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছিলেন। যখন রাজ-দুহিতা নবীন সন্ন্যাসীর অনুগামিনী হইলেন, তখন গুরু বলিলেন,—

"রাজন, চল আমরা ইঁহাদের অনুসরণ করি।"

গুরু শিষ্য দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

প্রান্তর, বন, বনান্তর তাঁহারা অতিক্রম করিলেন। ক্রমে দিনের অবসান হইল। সন্ধ্যা আসিল, সন্ধ্যায় তাঁহারা এক বিজন নিবিড়ারণ্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

নৃপতি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এই নিবিড় অরণ্য, সূচীভেদ্য অন্ধকার, হিংস্র শ্বাপদাদির ক্রীড়াভূমি, সর্ব্বোপরি প্রচণ্ড শীত,—কি করিয়া আপনি এই দারুণ কষ্ট সহ্য করিবেন?"

সন্ন্যাসী নৃপতির কথার উত্তর না দিয়া শুধু বলিলেন, "ঐ দেখ উঁহারা শালতরু-শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চল, শীঘ্র চল, মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দ্রুত কাননে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন, নৃপতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনীভূত ও ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে বনপক্ষীর পক্ষকম্পননিস্বন, পদপৃষ্ট শুষ্ক পত্রের মর মর ধ্বনি, কভু দূরে কভু নিকটে হিংস্র পশুর অপরিস্ফুটআরামব্যঞ্জক শব্দ—অরণ্যানী আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অরণ্যের বাহিরে যদিও কোনরূপে দৃষ্টি চলে, ভিতরে পরিহিত শুভ্র বসনও ঘন মসীপটসদৃশ প্রতীত হয়। এমনি সৃষ্টির প্রাক্কালসম তিমিরে তরুণ সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। দীর্ঘ দিনের অবিশ্রাম পথবাহন, দুঃসহ অন্তর-ক্লেশ, তদুপরি অরণ্যের অন্ধকারে স্বামীর অন্তর্ধান,—রাজদুহিতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ক্রমে রজনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইল। তথাপি সশিষ্য সন্ন্যাসীপ্রবর অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত।

ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র উদিত হইল। পত্রান্তরালে স্থানে স্থানে ম্লান জ্যোৎস্না অরণ্যগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। এমন সময় তাঁহারা অদূরে রাজদুহিতার করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন, ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, ক্রমে রাজদুহিতার সম্মুখীন হইলেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান, তবুও কুমারী তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তরে বাহিরে অন্ধকার। সন্ন্যাসী পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন, উত্তরে কেবল মাত্র অস্ফুট করুণ বিলাপ। অগত্যা সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া রাজদুহিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

"কেন তুমি, এই নিশীথে এই ঘোর বিজন অরণ্যে বিলাপ করিতেছ?"

রাজকন্যা চমকিয়া উঠিলেন, নিস্তব্ধে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার রাজকন্যা উত্তর করিলেন,

"আপনারা কে?—বুঝিয়াছি,—নিশ্চয়ই আপনারা দেবতা, আমার দুঃখ দেখিয়া দয়া করিয়া আমায় দেখা দিয়াছেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া ব্যাকুলা রাজনন্দিনী সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,

"মা, আমি সকলই জানি, কাল সকালে তোমায় তোমার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিব।"

"বাবা, পিত্রালয়ে আর কেন যাব? সতীর কর্ত্তব্য পতীর অনুসরণ; আমায় পথ দেখাইয়া দাও, আমি স্বামীর কাছে যাই, না হয় এই ঘোর বনে হিংস্র জন্তু আমার বিনাশ করুক।"

"মা, নারী সহধর্ম্মিণী, তুমি সন্ন্যাসীর সহধর্ম্মিণী, কেন মা তোমার পতিকে স্বধর্ম্মবিচ্যুত করিবে? পতি সতীর ঈশ্বর, তুমি পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাও, সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় পূজায় আপনাকে নিযুক্ত কর।"

"বাবা কার পূজা করিব? পতিকে কোথায় পাইব?"

"কেন মা, যেমন করিয়া ঈশ্বরের করে—মানস পূজা, সে পূজা অবশ্যই তাঁহার চরণে স্থান পাইবে। তুমি সতী পতির কল্যাণকামনাব্রতে ব্রতী হও। কাল সকালে তোমায় পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিব।"

অতঃপর তাঁহারা এক বিশাল তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে বৃক্ষতলে নিশা যাপনার্থ তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষে একটি পক্ষিপরিবার নীড়ে সুপ্ত ছিল। রাজকুমারী এবং সন্ন্যাসীর কথোপকথন-শব্দে জাগিয়া উঠিয়া একমনে শুনিতেছিল। যখন জানিতে পারিল, এই বৃক্ষ-তলেই তাঁহারা নিশা যাপন করিবেন, তখন পরিবারস্বামী পক্ষিপ্রবর তদীয় সহ-ধর্ম্মিণীকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "দেবী এখন কি করিব? আমাদের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন, আমরা গৃহী, অতিথি দেবতার চেয়েও বড়। এই প্রচণ্ড শীত, উঁহাদের গায়ে ত যথেষ্ট আবরণ নাই। বোধ হয় সমস্ত দিন মুখে এক বিন্দু জলও পড়ে নাই, তার উপর মানসিক উদ্বেগ, দেবী আমরা কি করিব?"

"প্রিয়তম, তাই ত কি করিব, আমরা গৃহী আমাদের ঘরে আজ অতিথি—তাই ত কি করা যায়?"

"দেখ, আমি বাহির হইলাম, দেখি কি করিতে পারি, হিংস্র পশু হইতে রক্ষার জন্য অগ্নি প্রয়োজন, তুমি কতকগুলি শুষ্ক পত্র সংগ্রহ কর।"

স্বামী স্ত্রী এইরূপ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

বৃক্ষপদমূলে শুষ্ক পত্র সংগৃহীত হইল। কিছুক্ষণ অতীত হইলে, পক্ষিবর অগ্নি আনয়ন করিলেন। শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করা হইল। সহসা অগ্নির আবির্ভাব দেখিয়া রাজদুহিতা এবং নৃপতি আশ্চর্য্য হইয়া সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমরা আজ এই বৃক্ষবাসী একটি পক্ষিপরিবারের অতিথি, আমাদের শীত অপনোদনার্থ পক্ষী-দম্পতি এই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, এস আমরা এই সেবা গ্রহণ করিয়া ধন্য হই।"

অতঃপর তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইয়া শীত নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অতিথিগণকে তাহাদের সেবা গ্রহণ করিতে দেখিয়া পক্ষী-দম্পতী ভগবৎ

চরণোদ্দেশে নমস্কার করিলেন। তাহাদের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

সহসা পক্ষিবর অস্থির হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "হায় হায়, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি। ইঁহাদের ত এখনও ক্ষুন্নিবৃত্তির কিছুই উপায় হয় নাই? দেখি, এখন কি করিব, কোথায় যাইব, এই গভীর নিশীথে কি করিয়া ইঁহাদের ক্ষুধায় অন্ন সংগ্রহ করিব? শুন, গৃহে অতিথি উপবাসী, গৃহস্থের মহা অধর্ম্ম, আপনার দেহদানেও অতিথির পরিচর্য্যা করিতে হয়। তুমি ক্ষুদ্র শাবকগণকে দেখিও, আমি অতিথিসৎকারে দেহ অর্পণ করিলাম। আমার দগ্ধ মাংসে ইঁহাদের যৎকিঞ্চিৎও সেবা হইবে।"

বলিতে বলিতে পক্ষিবর অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইলেন।

সহধর্ম্মিণী পক্ষিণী ভাবিলেন,—সেবার ত কিছুই হইল না। স্বামীর ক্ষুদ্র দেহ, তিন জন অতিথির কি হইবে? প্রভুর আমি সহধর্ম্মিণী, কিন্তু ক্ষুদ্র শাবকগণকে কে দেখিবে, ক্ষুধায় কে তাহাদের আহার দিবে? যিনি, দিবার, এই জগৎ সংসারকে যিনি আহার দিতেছেন, তিনিই দেখিবেন, তিনিই আহার দিবেন। আমি সহধর্ম্মিণী, পতির ব্রতের সহায়তা করি। এইরূপে পক্ষিণীও অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নৃপতি, গৃহস্থ পক্ষি-দম্পতী অতিথিসৎকারের জন্ম অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল। দেখ মা, পক্ষিণী সতীধর্ম্মে স্বামীর ব্রতপালনে আপন জীবন বিসর্জ্জন করিল।"

পক্ষি-শিশুগণ জাগিয়া উঠিয়া জনকজননীর আত্মবিসর্জ্জন দেখিল। অতঃপর পরস্পর বলিতে লাগিল, "আমরা পিতামাতার অধম সন্তান, আমরা এখনও বসিয়া আছি, তাঁহারা যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ত এখনও পূর্ণ হয় নাই, যে সন্তান জনকজননীর আরব্ধ অপূর্ণ কার্য্য পূর্ণ না করে, সে ত সন্তান নামের নিতান্ত অযোগ্য। এস আমরা পিতার যজ্ঞ পূর্ণ করি।"

বলিতে বলিতে পক্ষিশিশুগণ একে একে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিল।

* * * * * *

পরদিন প্রভাত হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "নৃপতি, তোমার সমস্যা পূরণ হইল কি? দেখ সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম—কামকাঞ্চনত্যাগ শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থের পক্ষে গৃহীর ধর্ম্ম—পরার্থে আত্মদান—শ্রেষ্ঠ। মা তুমিও বুঝিলে নারীর পক্ষে সহধর্ম্মিণীর ব্রত পালনই শ্রেষ্ঠ। অতঃপর রাজ কন্যাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া সন্ন্যাসী ও নৃপতি নিজ নিজ গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন।

বহুমূত্র তথ্য ও চিকিৎসা।

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু আই, এস, ও এম্, বি, এফ্, সি, এস্, মহোদয়ের ইংরাজী প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা অনুবাদিত।

(নিদান শাস্ত্র Pathology.)

এই পীড়ার নিদানালোচনা আমি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছি। এতাদৃশী আলোচনা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার প্রবন্ধটী অনেকটা উপস্থিত বক্তব্য টীকা-টিপ্পনী রকমের। এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই পীড়ার নিদান আমরা সুচারুরূপে অবগত নহি। অধুনা ডাক্তারি মতে যকৃত, প্যান্ক্রিয়া (Pan creas) নামক পরিপাক-সহায় যন্ত্র বিশেষ ও স্নায়ু-কেন্দ্রই ব্যষ্টিরূপে হউক সমষ্টিরূপে হউক ইহার উৎপত্তির হেতু। এই পীড়ায় মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার বড় একটা সুবিধা ভারতবর্ষে ঘটিয়া উঠে না। বহুমুত্র রোগী প্রায়ই চিকিৎসার্থ হাস্পাতালে অধিক দিন থাকে না; এই প্রকার রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা শব চ্ছেদ করিবার অনুমতি একেবারেই দেন না। সুতরাং এই পীড়ার শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। এতদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পাঠককে ইউরোপ বা আমেরিকা দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে।

চিকিৎসা।

এই পীড়ার প্রকৃত নিদান কি? যতদিন আমাদিগের তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ততদিন আমাদিগকে কেবল উহার লক্ষণ গুলিরই উপশম করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

বহুমুত্র রোগের চিকিৎসায় প্রস্রাবের শর্করা নিঃস্রাব বন্ধ করাই আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য; কেননা উহাতে প্রস্রাবাধিক্য আত্যন্তিক পিপাসা প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। (১) ঔষধ সেবন দ্বারা; (২) পথ্য বিচার দ্বারা; এবং (৩) স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ম পরিপালন দ্বারা আমরা শর্করা-

নিঃস্রাব হ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। সুতরাং আমি এই পীড়ার চিকিৎসা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাই :—(১) ভৈষজ্য চিকিৎসা ; (২) পথ্য বিষয়ক চিকিৎসা ; (৩) এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন বিষয়ক চিকিৎসা। আমি ইহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। আমার প্রবন্ধে বিশদ আলোচনার স্থান হইয়া উঠিবে না।

(১) ভৈষজ্য চিকিৎসা—বহুমূত্র রোগে উপকারী বলিয়া বিস্তর ঔষধ জানা গিয়াছে। উহার কোনটীই ঐ পীড়ার অব্যর্থ ঔষধ নহে। তত্রাচ, উহাদের কতকগুলি বড়ই উপকারী।

এই তথাকথিত অব্যর্থ ঔষধের মধ্যে অহিফেন ও অহিফেনমূলক কোডিন্ (Codeine) এবং অহিফেন-সারই (Morphine) বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় এখনও প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই অহিফেন দ্বারা চিকিৎসা বেশী দেখা যায় ; কেননা, ইউরোপের ব্যক্তিবর্গ অহিফেন-সেবন-অভ্যাসটীকে যত ভয় করিয়া থাকেন, ভারতবাসিগণ তত ভয় করেন না। ভারতে অহিফেন-সেবন বিশেষরূপে প্রচলিত ; ৪০ বৎসরের উপর যাহাদিগের বয়স, তাহারা অধিকাংশই এই অভ্যাসে অভ্যস্ত। এই অভ্যাসটী ইউরোপেই হউক, আর ভারতেই হউক, সহজে পরিত্যাগ করা যায় না ; তত্রাচ, ইউরোপের গ্রন্থকারগণ ইহার যতটা কুফলের বর্ণনা করিয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে কুফল ততটা ভয়াবহ নহে। আমরা এমন বিস্তর ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অহিফেন-সেবন করিয়াও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত বয়স, পর্য্যন্ত জল বাতাস ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী মানসিক ও শারীরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অত্যধিক পরিমানে অহিফেন সেবন করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের স্বাস্থ্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। ভারতে দেখা যায়, অহিফেন ও অহিফেনমূলক কোডিন্ই বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা প্রস্রাবের পরিমান হ্রাস করে ; শর্করা-স্রাব কমাইয়া আনে ; পিপাসা ও গাত্র দাহের উপশম করে ; এবং মোটের উপর শরীরটীকে অনেকটা সুস্থ করিয়া তুলে। বহুমূত্র রোগে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিয়া থাকে ; অহিফেনে কোষ্ঠবদ্ধতা আরও বৃদ্ধি পায়। এইটীই অহিফেন সেবনের একটা অসুবিধা। সুতরাং অহিফেন-সেবন অপেক্ষা 'কোডিন্' ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ; কেন না, অহিফেন অপেক্ষা ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা কম ঘটাইয়া থাকে। কাহারও কাহারও ধাতুতে কোডিন অপেক্ষা

অহিফেনেই বেশী উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু অহিফেন ও কোডিন্ উভয় দ্রব্যেই শর্করা নিঃস্রাব মন্দীভূত হয়। কোডিন্ দ্রব্যটী সাধারণতঃ 'নক্সভমিকা' (Nux Vomica) নামক বিষাক্ত উদ্ভিদে ও অন্যান্য বিরেচক উদ্ভিদের সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এতন্নিমিত্ত, উহার কোষ্ঠবদ্ধতা গুণ হ্রাস পায়। বহুমূত্র-চিকিৎসায় অহিফেন সেবন কালীন দাস্ত পরিষ্কার রাখিবার জন্য প্রাতে নিয়মিত রূপে 'অ্যাপেন্টা ওয়াটার' নামক লবণ-জল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বহুমূত্র চিকিৎসায় অহিফেন যে বিশেষ উপকারী, অনেক ইউরোপবাসী ডাক্তারও একথা স্বীকার করিয়াছেন। পেভী, কফ্ম্যান্, ভন্ নুরডেন্ ও ইউ-রোপের আরও বিস্তর প্রথিত নামা ডাক্তার অহিফেন প্রয়োগে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেন যে, অহিফেনে সুন্দর ফল ফলিয়া থাকে,—তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অহিফেন-সেবনে ক্ষুধা মান্দ্য ঘটিয়া থাকে, কাজে কাজেই আহারও কমিয়া আইসে এবং রোগও প্রশমিত হইতে থাকে। আবার অন্য কেহ কেহ বলেন, অহিফেন স্নায়ুমণ্ডলীকে সুশীতল রাখে; অহিফেনের এতদ্গুণ বশতঃই বহুমূত্র রোগ দূরীভূত হইয়া যায়। এই শেষোক্ত মতের অনুকূলে বিস্তর বক্তব্য আছে।

প্রস্রাবে যখন অধিক মাত্রায় অণ্ডলালিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে; কিম্বা যখন অসাড়াবস্থা হইবার আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে, তখন অহিফেনে নিতান্ত বিপরীত ফল ফলে। যখন প্রস্রাবে অ্যাসিটোন্ (acetone) ও ডাই-অ্যাসেটিক্ অ্যাসিড্ (diacetic acid) নামক পদার্থ দৃষ্ট হয়, তখন তাহার পরিণাম অনেক স্থলে অসাড়াবস্থা না হইলেও অহিফেন-প্রয়োগ কিছুদিন বন্ধ রাখা হয়। অহিফেন সাধাধারণতঃ বহুমূত্র রোগীর উপকার করিয়া থাকে।

স্যালিসাইলেট্ অফ্ সোডা ও অ্যাস্পিরিন্ (Salicylate of soda and aspirin):—'রয়াল্ ইন্ফার্ম্মারী' নামক হাস্পাতালের ডাক্তার উইলিয়ম্সন্ বলেন, বহুমূত্র চিকিৎসায় স্যালিসাইলেট্ অফ্ সোডা ও অ্যাস্পিরিন্ বিশেষ ফলপ্রদ।—("চিকিৎসক," জুলাই ১৯০৭)। তিনি বলেন, এই দুইটী দ্রব্যে তিনি অহিফেন ও অহিফেন মূলক পদার্থ অপেক্ষাও অধিকতর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি স্যালিসাইলেট্ অফ্ সোডা ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ৩।৪ বার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়া আবশ্যকানুসারে ১৫ গ্রেণ বা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্যালিসাইলেটের ফলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; কেননা ইহাতে কোন কোন সময় বিষ-লক্ষণ (toxic symtoms) দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিক স্যালিসাইলেটের পক্ষপাতী।

ডাক্তার উইলিয়মসনের স্যালিসাইলেট্ অপেক্ষা অ্যাস্পিরিনে বিষক্রিয়া কম ঘটিয়া থাকে। তিনি ইহার মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ১৫ গ্রেণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে বলেন। তিনি কয়েকটী বহুমূত্র রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ঔষধ দ্বয়ে ঐ সকল রোগীর নিশ্চয়ই উপকার দর্শিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার চিকিৎসিত রোগীর বেলায় দেখা যায় যে, কয়েকটী স্থলে স্যালিসাইলেট্ অফ্ সোডা এবং অ্যাস্পিরিন্ এই দুইটী ঔষধে বেশ সুন্দর ফল ফলিয়াছে; ইহাতে শর্করা নিঃস্রাব হ্রাস পাইয়াছে অথচ তন্নিবন্ধন শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। যেখানে পীড়া মৃদুবীর্য্য, প্রধানতঃ সেখানেই স্যালিসাইলেট্ অফ্ সোডা ও অ্যাস্পিরিনের ফল অতীব সুন্দর হইয়া থাকে। তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিগণের কঠিন পীড়ায়ও কখন কখন উহাতে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ঐ দুইটী ঔষধে শর্করা-নিঃস্রাব কিছুদিনের জন্য হ্রাস পাইয়া থাকে ও বন্ধও হয়। সান্নিপাতিক অবস্থায় যখন হৃদ্পিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ আসিয়া দেখা দেয়, তখন এই দুইটী ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল।" •

যেখানে বহুমূত্র পীড়ার সঙ্গে বাত দেখা দেয়, সেখানে স্যালিসাইলেট ও অ্যাস্পিরিনে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। বহুমূত্র পীড়ায় অনেক সময় স্নায়ু-বেদনা (Neuralgia) দেখা দেয়। তখন অ্যাস্পিরিন্ ব্যবহারে ঐ বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, অ্যাস্পিরিন্ ব্যবহারে অধিক পরিমান শ্বেতসার পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে; কেননা, উহা ব্যবহার কালীন রোগীর দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পরিপাকাভাব বশতঃ যে শর্করা-নিঃস্রাব কমিয়া আইসে, একথা বলা চলে না।"

ওয়েষ্ট্ ও ডন্ক্যানের মতে "ইউরেনিয়ম্ নাইট্রেট্" (Uranium Nitrate) নামক পদার্থে কখন কখন শর্করা-স্রাব হ্রাস পায়। ডন্ক্যান্ বলেন প্রত্যহ ১২ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় আহারের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

জাম্বুল্ বীজ (Jambul Seeds) এবং উহা হইতে উৎপন্ন ঔষধাদি কখন কখন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, শর্করা হ্রাস করিতে এই ঔষধের বিশেষ একটু শক্তি আছে; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা কোন কাজেরই নহে।

স্যান্টোনাইন্ (Santonine) বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করিয়া বেশ সুন্দর ফল

পাওয়া গিয়াছে। সেজরনেট্ (Sajournet) বলেন, ইহার প্রভাবে শর্করা কমিয়াছিল, মূত্রাধিক্য হ্রাস পাইয়াছিল, রোগীর বল বৃদ্ধি হইয়াছিল, তৃষ্ণার লাঘব হইয়াছিল, মুখ শুষ্ক হওয়া আর ততটা ছিল না। ইহা রোগীকে সাধারণ মাত্রায় প্রত্যহ ২।৩ বার হিসাবে ১৪ দিন যাবত দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গার দ্রাবক ঘটিত ক্ষার (Carbonate) বা " বেন্‌জোয়েট্ অফ্ লিথিয়া" (Benzoate of lithia) নামক ধাতব ঔষধও প্রদত্ত হইয়া থাকে। দুই সপ্তাহ ব্যবহারের পর স্যান্‌টোনাইন্ বন্ধ রাখা হয়; ২০।২৫ দিন পরে আবার উহা প্রয়োগ করিতে হয়। ডাক্তারগণ বলেন, এইরূপ ২।৩টী পর্য্যায়ে স্যান্‌টোনাইনের ব্যবহার সাধারণতঃ আবশ্যক হইয়া থাকে, স্যান্‌টোনাইন্ বন্ধ কালীন ধাতু-ঘটিত ঔষধ চালাইতে হয়। ক্রমশঃ।

গীত।

এসহে এসহে আজি মিলিয়া সকলে,
করিব আরতি প্রভু চরণ কমলে,
জ্ঞান পঞ্চ দীপ জ্বালি, শ্রদ্ধাঘৃত দেহ ঢালি,
মুখেতে মঙ্গল গীতি গাও কুতুহলে।
ভক্তিরূপ বিল্বদল, প্রেম অশ্রু পূত জল,
হয়ে সবে কৃতাঞ্জলি দাও পদতলে
প্রীতির কুসুম নিয়ে গেঁথে মালা গলে দিয়ে
চাহ বর যেন সবে নাহি যান ভুলে।
কি আছে মোদের আর, কি দিয়ে শুধিব ধার,
রাখুন বিধাতা সবে কল্যাণ কুশলে।

দশম প্রকরণম্।

গুরুরাহ।

বিহায় বৈরিণং কামং অর্থঞ্চানর্থসংকুলম্।
ধর্ম্মমপ্যেতয়োর্হেতুং সর্ব্বত্রানাদরং কুরু ॥ ১ ॥
স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা।
মিত্রক্ষেত্রধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ ॥ ২ ॥
যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥ ৩ ॥

বাসনারূপ শত্রুকে, অনর্থসংকুল অর্থকে এবং এতদুভয়ের হেতুভূত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়ে আস্থা শূন্য হও—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল কর্ম্ম হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মার্থ কাম এই তিনটি সকাম কর্ম্মের ফল, আর মোক্ষ, অশুক্ল অকৃষ্ণ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; সুতরাং ধর্ম্মার্থ কামের প্রতি হতাদর হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম সৎকর্ম্মে হয়। সৎকর্ম্মে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে, তাহার শুভ ফলে অর্থাদি ভোগ হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্ম অর্থাদির হেতু। আবার অর্থ হইতেই বিষয়-কামনাদি জাত ও বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং অর্থ অনর্থে পূর্ণ। এবং কামনা পরম শত্রু; সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মরণ প্রভৃতি সমুদায়ই বাসনা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব এই কাম ও অর্থকে ত্যাগ কর এবং ধর্ম্মেও বীতস্পৃহ হও। ১।

সুহৃদ্, ভূমি, কোষ, স্ত্রী, ধন প্রভৃতি সামান্য দিনের জন্য মাত্র; এ সকলকে স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালবৎ জ্ঞান কর। ২।

যে যে বিষয়ে বাসনা জন্মে, তাহাই সংসার; প্রগাঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করত বিগততৃষ্ণ হইয়া সুখী হও।—যাহাতে চিত্ত আকর্ষণ করিবে,-তাহাকেই বিপদের

তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪ ॥
ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসৎ তথা।
অবিদ্যাপিনকিঞ্চিৎ সা কা বুভুৎসাতথাপি তে ॥ ৫ ॥
রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানি চ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥ ৬ ॥
অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপি কর্ম্মণা।
এভিঃ সংসারকান্তারে ন বিশ্রান্তমভূন্মনঃ ॥ ৭ ॥

বিষয়-তৃষ্ণাই বন্ধন, এবং তাহার নাশই মুক্তি; সংসারে অনাসক্ত হইবামাত্র প্রতিক্ষণেই সন্তোষ লাভ হইতে থাকে। ৪।

তুমি অদ্বিতীয়, জ্ঞানময় এবং বিশুদ্ধ; এই বিশ্ব জড় ও অলীক। এবং অবিদ্যাও নাই, তবে কেন তুমি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইতেছ?—আত্মায় অবিদ্যাদির সংস্পর্শ হইতে পারে না। যে ব্রহ্মাণ্ডকে মায়াময় এবং আত্মাকে এক, শুদ্ধ, চিন্ময় বলিয়া জানে, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ৫।

রাজ্য, সন্তান, স্ত্রী, দেহ ও ধন সমূহে তুমি সংসক্ত আছ, অথচ তাহা জন্মে জন্মে নষ্ট হইতেছে—এই জন্মে যাহাদের লইয়া সংসারী হইয়াছ, যাহাদের জন্য সতত বিব্রত হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাহারা কোথায় ছিল? না পর জন্মেই তাহাদের সহিত তোমার এই রূপই সম্বন্ধ থাকিবে? তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসিয়াছে, পরেও সেই জন্য আবার কোথায় যাইবে কে বলিতে পারে? তবে তাহাদের জন্য তুমি কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ কর কেন? ৬।

অর্থ, কাম, এবং সুকৃত কর্ম্মেরই বা প্রয়োজন কি? এই সংসার-বিপিনে এসকলে চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে না। ৭।

কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা।
দুঃখমায়াসদং কর্ম্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্ ॥ ৮ ॥
ইত্যুপশমাষ্টকং দশমপ্রকরণং।

একাদশ প্রকরণম্।

গুরুরাহ।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি ॥ ১ ॥

তুমি কত জন্মই কায়মনোবাক্যে দুঃখ ও ক্লেশদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব এখনও তুমি বিরাম লাভ কর। ৮।

সংসারের উৎপত্তি, বিকৃতি ও লয় স্বভাবতঃই হইতেছে, ইহা যিনি নিশ্চয়রূপে জানেন, তিনিই বিকার বিরহিত, ক্লেশশূন্য, ও সুখে শান্তি লাভ করেন।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যে বাসনাই সংসার, সমস্তই বাসনাবশে হইয়াছে, এবং আমিই সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বময়, আবার এখানে বলিতেছেন যে সমস্তই স্বভাবজাত, প্রকৃতি-বশেই হইতেছে, এবং পর শ্লোকেই বলিতেছেন যে ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা; এই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়? কর্ত্তা আত্মা কি ঈশ্বর, অথবা সমস্তই নিসর্গজাত ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, যে ঈশ্বর ও আত্মার প্রভেদ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভেদ নাই। শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর পরসূক্ষ্ম, অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত, সূক্ষ্ম অখণ্ড, চিন্ময়স্বরূপ এবং তিনি ইচ্ছাময়। সেই ইচ্ছা নানারূপে নানাভাবে স্ফুরিত হওয়ায়, উক্ত সূক্ষ্মতম চিন্মাত্র, বাসনাবলে ঘনীভূত হইয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। আবার সেই বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘাতে সংসৃতির বিকৃতি ঘটে। অর্থাৎ যেমন দুই তিনটি বিভিন্ন বল এক পদার্থে বিভিন্ন দিক হইতে প্রযুক্ত হইলে, কোনও বলের নির্দ্দিষ্ট গতি না প্রাপ্ত হইয়া এক অভিনব দিকে গতি হয়। সংসারের গতির বিকারও তদ্রূপ, কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বাসনায় অনুরূপ না হওয়ায়, ঘটিয়া থাকে। আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, অন্য ইচ্ছা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে, ঠিক সেইরূপই হইবে, কিন্তু অপর ইচ্ছা

ঈশ্বরঃ সর্ব্বনির্ম্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃ শান্তঃ ক্বাপি ন সজ্জতে॥ ২॥
আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
তৃপ্তঃ স্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি। ৩॥
সুখদুঃখে জন্মমৃত্যু দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
সাম্যদর্শী নিরায়াসঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৪॥

তাহাতে বাধা দিলে, সেই ইচ্ছায় বলের তারতম্যানুসারে গতিভেদ হইবে। ইহাই নৈসর্গিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। এই অসংখ্য বাসনা কার্য্যের কারণ। নারায়ণ কারণ সাগরে ভাসিতেছেন, অর্থাৎ অসংখ্য কারণের মধ্যে সেই এক আত্মাই বিরাজ করিতেছেন। আমি, অর্থাৎ আমাতে অবস্থিত আত্মা মাত্র, বিশ্ব সংসারের সমস্ত কার্য্য করি না, তবে কিছু করি বটে। সমস্ত ইচ্ছার সমবায়ে যাহা ঘটে, তাহাই নৈসর্গিক ঘটনা। সুতরাং ঈশ্বর ও নিসর্গ, পুরুষ ও প্রকৃতি একই। ঈশ্বরের যে ভাব নির্লিপ্ত, তাহাই পুরুষ ও যে ভাব কার্য্য করে, তাহাই প্রকৃতিরূপে উক্ত মাত্র। অতএব সমস্ত প্রকৃতিবশে ঘটিতেছে, ইহা নিশ্চয় ধারণা হইলে, নিজের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ভাব তিরোহিত হইয়া শান্তি লাভ হয়। ১।

পরমাত্মা ঈশ্বরই সমস্ত সৃষ্টির হেতু, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, যিনি ইহা নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই অন্তঃকরণ সমস্ত আশা শূন্য হইয়া শান্তি যুক্ত হইয়াছে, তিনি আর কিছুতেই আসক্ত হন না। ২।

আপদ্ এবং সম্পদ্ যথা কালে, বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত না হইয়াও, স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়, যিনি ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি তৃপ্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ নির্ম্মল হইয়াছে, তিনি কিছুতেই বাসনা বা শোক করেন না। ৩।

সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতিবশেই হইয়া থাকে, যিনি ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, নিরায়াস, এবং কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না—কোনও এক বাসনা জনিত ভোগের অবসানেই সেই বাসনার কার্য্য শেষ হইল; সুতরাং কর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে দেহাদি নিষ্প্রয়োজন। ৪।

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়া হীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্র গলিতস্পৃহঃ॥ ৫॥
নাহং দেহো ন মে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যমিব সংপ্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতংকৃতম্॥ ৬॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তসুনির্বৃতঃ॥ ৭॥
নানাশ্চর্য্যমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বাসনঃ স্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি॥ ৮॥

ইতি জ্ঞানাষ্টকং একাদশ প্রকরণং।

—•—

দ্বাদশ প্রকরণম্।

জনক আহ।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ॥ ১॥

সংসারে চিন্তাই দুঃখের হেতু, অপর কিছু নহে; ইহা নিশ্চয়কারী ব্যক্তি চিন্তাকেই পরিত্যাগ করত সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া সুখী ও শান্তি যুক্ত। ৫।

আমি দেহ নহি, আমারও দেহ নাই, আমি চিন্ময়, যিনি ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কৈবল্য পদেই অবস্থান করত, কৃত ও অকৃত কার্য্য স্মরণ করেন না।—অর্থাৎ তৎপ্রতি মনোযোগ করেন না। ৬।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মা অথবা আমি, যিনি ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, তিনি নির্ব্বিকল্প, শুদ্ধ, শান্ত এবং প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত সমস্ত বিষয়েই সন্তুষ্ট। ৭।

নানা প্রকার আশ্চর্য্যময় এই বিশ্ব কিছুই নহে, যিনি ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি বাসনাশূন্য, পূর্ণ বিকাশিত, এবং সংসার অনিত্য জ্ঞানেই শান্ত। ৮।

প্রথমে কায়িক কর্ম হইতে তৎপরে ...

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥
সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাং তথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধ্বা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥

চিন্তা হইতেও বিরত হইয়া এই রূপেই আছি। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। ১।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহে প্রীতি না থাকায়, এবং আত্মার নিরাকারত্ব হেতু তৎপ্রতিও চিত্ত আকৃষ্ট হইবার কারণ না থাকায়, আমার চিত্ত, বিক্ষেপশূন্য, একাগ্র হওয়ায়, এই রূপেই অবস্থান করিতেছি। ২।

সমাধি অনুষ্ঠানের জন্য আত্মাতে চিত্তারোপ বিক্ষেপেরই হেতু হয়, এই নিয়ম অবলোকন করত আমি এই রূপেই আছি।—চিত্ত আত্মাতে অর্পণ করিবার চেষ্টাতেও চিত্ত-বিক্ষেপ হয়। ৩।

হে ব্রহ্মন্! হেয় ও উপাদেয় জ্ঞানাভাবে হর্ষ বা বিষাদ বিহীন হইয়া আমি এই রূপেই আছি।—হেয় বস্তু অর্থাৎ রোগ, শোকাদির অভাব এবং উপাদেয় বস্তু অর্থাৎ দার, পুত্র, ধনাদি অভিলষিত পদার্থের প্রাপ্তিই হর্ষের হেতু এবং তদ্বিপরীতে বিষাদ হয়; সুতরাং হেয়োপাদেয় জ্ঞানাভাবেই হর্ষ বিষাদ শূন্যতা জন্মে। ৪।

ইহা আশ্রম, ইহা অনাশ্রম, ইহা গ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, এই সকল জ্ঞানে বিকল্প বোধ করত এই রূপেই আছি। ৫।

অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই সমান; এই তত্ত্ব বিশিষ্ট ... রূপেই আছি।—অজ্ঞানতঃ কর্ম্মত্যাগে চিত্ত প্রসব শূন্য হয় না। ৬।

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৭ ॥
এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥ ৮ ॥

ইত্যেবমেবাষ্টকং দ্বাদশপ্রকরণং।

ত্রয়োদশ প্রকরণম্।

পুনঃ শিষ্যঃ ॥

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১ ॥
কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, তাঁহাকে চিন্তা করিলে চিন্তাকেই ভজনা করা হয়; সুতরাং আমি তচ্চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এমনই আছি।—আত্মা সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য, সুতরাং কে কাহাকে কি ভাবে চিন্তা করিবে? ইহা একেবারে দ্বৈতভাবাভাব। ৭

যিনি এই রূপ করেন, অথবা যাঁহার স্বভাবই এইরূপ, তিনিই কৃতার্থ অর্থাৎ লব্ধপদ। ৮।

—*—

আমি কিছুই নহে, আমার কিছুই নাই, এই জ্ঞান-জনিত সন্তোষ-সুখ কৌপীন-ধারীরও হয় না; এই নিমিত্তই আদান প্রদান পরিত্যাগ করত আমি যথা সুখে অবস্থান করিতেছি।—অর্থাৎ কৌপীনধারীরও যদি বহির্বাসের প্রতি আস্থা থাকে, তাহা হইলে তিনিও সুস্থ নহেন। ১।

কোথাও শারীরিক খেদ, কোথাও রসনার খেদ, কোথাও বা চিত্তের খেদ, অতএব সর্ব্ব প্রকার অবসাদ পরিহার করত যথা সুখে পুরুষার্থে অবস্থান করিতেছি। ২।

কৃতং কিমপি নৈবস্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎকর্ত্তুমায়াতি তৎকৃত্বাসে যথাসুখম্ ॥ ৩ ॥
কর্ম্মনৈষ্কর্ম্যনির্ব্বন্ধভাবা দেহস্থযোগনঃ।
সঙ্গাৎ সংযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৪ ॥
অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা বা শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥
স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো ন বা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৬ ॥
সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥

ইতি যথাসুখসপ্তকং ত্রয়োদশপ্রকরণম্।

কেহ কিছুই করেন না, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইহা অনুভব করত যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন তাহাই করিয়া যথা সুখে অবস্থান করিতেছি।—কার্য্যের উদ্যোগ, চেষ্টা বা ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, যদৃচ্ছাগত কার্য্য করিয়া থাকি। ৩।

দেহাভিমানী যোগীরাই কর্ম্মে বা কর্ম্মহীনতায় আবদ্ধ; আমি নিঃসঙ্গ বা সংযোগাভাব হেতু যথাসুখেই অবস্থান করিয়া থাকি। ৪।

আমার (আত্মার স্থিতি, গতি, বা শয়ন কিছুতেই অর্থ বা অনর্থ নাই। স্থিতি, গতি, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত করিয়াও যথাসুখে অবস্থান করি।—বিনা কারণে, অর্থাৎ করিতে হয় করিতেছি, এই ভাবে সকল কার্য্যই করিয়া থাকি। ৫।

নিদ্রায় আমার ক্ষতি নাই, যত্ন করিলেও সিদ্ধির প্রতি আস্থা নাই; সুতরাং বিনাশ-ভয় ও হর্ষ ত্যাগ করত যথা সুখে অবস্থান করিতেছি। ৬।

সংসারের সর্ব্ব ভাবেই সুখ দুঃখাদি বহু প্রকার অনিয়ম দর্শন করিয়া, শুভাশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করত যথাসুখে অবস্থিতি করিতেছি।—স্থূল কথা,

মায়া।

লেখক,— শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

রমেনের কক্ষ। রমেন ও কমলা।

কমলা। বাবা এখান থেকে কনে দেখ্‌তে যাবেন। বল্‌ছিলেন, এই মাসেই প্রকাশের বে দিবেন।

রমেন। হ্যাঃ শুনেছি। তা বেশ হ'বে। প্রথম যখন তোমার ভায়ের বে হয়, শরীরটা খারাপ ছিল, ভাল করে খেতে পারি নাই। এবার সুদ-শুদ্ধ আদায় কর্‌ব। তোমাদের খিড়কীর পুকুরের খয়রা মাছের বংশ এবার আর রাখ্‌ছি না।

কমলা। দেখ, কথাটা শুনে মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে।

রমেন। অন্তিম কালের অনুতাপে কোন ফল নাই।

কমলা। আহা বউ-টার কি হবে?

রমেন। হঠাৎ ভাজের জন্য এত দরদ্‌ হ'ল কেন? সে ত বেশ আছে।

কমলা। সতীন হ'লে কেউ কি বেশ থাক্‌তে পারে? দেখ তোমায় একটা কাজ কর্‌তে হবে।

রমেন। তোমার একজন সতীন আন্‌তে হবে নাকি?

কমলা। আমার কেন সতীন্‌ হ'তে যাবে?

রমেন। ছেলে বেলা ষাঁড় পূজা করেছিলে বলে, ছাড়ান যাবে মনে কর্‌ছ নাকি? আচ্ছা যখন ষাঁড়কে বল্‌তে "ষাঁড়, ষাঁড়, ষাঁড়; আমি হই জন্ম এয়োস্ত্রী, আমার সতীন হ'ক ষাঁড়," তখন ষাঁড় তোমায় কি উত্তর দিত?

কমলা। তোমার এক কথা। আমরা বুঝি ঐ মন্তর বল্‌তুম?

রমেন। যে মন্তরই পড়ে থাক, নিস্তার নাই। আমি তোমার জন্যে ভাল দেখে এক সতীন আন্‌বই আন্‌ব।

কমলা। তোমার সাধ্যি কি? কিছুতেই তা পারবে না। আমি আনতে

রমেন। তুমি কিসে আট্‌কাবে?

কমলা। যা দিয়ে তোমায় এত দিন আঁচলে বেঁধে রেখেছি।

রমেন। আঁচলের গেরো পুরোণো হলে পচে গিয়ে ছিঁড়ে যায়।

কমলা। আমার ফাঁস যতই পুরাণো হবে, ততই কষে যাবে। এখন ও সব কথা যাক্। প্রকাশের যাতে আবার বে না হয়, তার উপায় তোমায় কর্‌তে হ'বে।

রমেন। বিরহ জর্জ্জরিত নাগর নাগরীর শুভ দৃষ্টি ঘটান ছাড়া আর অন্য উপায় ত দেখ ছি না। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কমলা। কেন? প্রকাশ একবার বউয়ের সঙ্গে দেখা করুক না। বউ যদি আসে সব গোল চুকে যায়।

রমেন। তোমার বাবাকে যখন এরূপ অপমান করেছে, তখন কি প্রকাশের আর সেখানে যাওয়া ভাল দেখায়।

কমলা। প্রকাশ ত আর কুটুম্বিতা কর্‌তে যাবে না। বউয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে আস্‌বে।

রমেন। সুন্দর যুক্তি বটে। কিন্তু তোমার বাবা যদি না মত করেন!

কমলা। মা বল্‌বে, তা ছাড়া আমরাও আব্দার করে ধরি, বাবা প্রকাশের সেখানে যাওয়াতে অমত কর্‌বেন না।

রমেন। এ রকম আব্দার করাটা কি অন্যায় হবে না? প্রকাশের শ্বশুরের ব্যবহারে মনে বড় কষ্ট পেয়েই তোমার বাবা প্রকাশের বে দিতে ব্যস্ত হয়েছেন।

কমলা। তা জানি। কিন্তু বউটা যে একেবারে ভেসে যাবে। হয়ত তার তত দোষ নাই। সে হয়ত আস্‌তে চায়, তার বাপ্ মা আস্‌তে দিচ্ছে না।

রমেন। বউ ঠাকরুণ যে একেবারে নির্দ্দোষী তা আমার বোধ হয় না। তবে অভিমান নাশিনী বিরহ বটিকা সেবনে নিশ্চয়ই এতদিনে আরোগ্য লাভ করেছেন! আর তুমি যখন বল্‌ছ ভেবে দেখি। কিন্তু বউ গিন্নী যদি আস্‌তে না চান?

কমলা। তা হ'লে প্রকাশের বিয়ে দিতে হবে। না, তা হবে না। আমার মনে নিচ্ছে বউ আস্‌বে, তার আস্‌তে ইচ্ছা আছে।

রমেন। তাই সম্ভব বোধ হয়। আর এতদিনেও যদি বউগিন্নি না সেরে থাকেন, তা—হলে তার ব্যায়রাম শিবেরও অসাধ্য।

কমলা। আজ ত প্রকাশ এখানে রয়েছে, সে আজিই একথার যাক্ না। আমি এখনই বাবাকে বলি।

রমেন। এখন থাক্। খোকার ভাতের হাঙ্গামটা চুকে যাক, তার পর ঠিক কর্‌ব।

কমলা। আজ যে বাবা কনে দেখ্‌তে যাবে!

রমেন। তাতে কি হয়েছে। কনে দেখ্‌লেই ত আর বে হয় না। কথায় বলে লাখ কথার কম একটা বে হয় না। এ তা ছাড়া বিয়ের পিটে বিয়ে। শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে দু-লাখ কথার দরকার।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

কি রে?

ভৃত্য। আজ্ঞে, মহেশ বাবু এসেছেন।

রমেন। আরে ডেকে দে,—ডেকে দে, এই খানেই ডেকে দে।

(ভৃত্যের প্রস্থান।)

রমেনের সেই পাগলা ভায়রা ভাই। ভালই হয়েছে, তার কাছে বউ-ঠাকুরাণের হাল জানা যাবে।

(কমলার প্রস্থান।)

পাগ্‌লার সঙ্গে আলাপ রেখে ভালই করেছি।

(মহেশের প্রবেশ।)

রমেন। এই যে গুরুজী। নমস্কার! অধীনের প্রতি আজ এত দয়া কেন?

মহেশ। শিষ্যেরাই আমার প্রাণ। এদিক দিয়া যাচ্ছিলাম, তাই একবার এলাম। সে দিন যে নূতন যোগ শিক্ষা দিয়াছি, তা আয়ত্ত কর্‌তে পেরেছ?

রমেন। তা পেরেছি বটে। কিন্তু কোন ফল পাই নাই। অপরলোক দূরের কথা নিজের স্ত্রীপুত্রকে অবধি বশে আন্‌তে পারলেম না।

মহেশ। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পার্‌বে। তোমায় যে প্রক্রিয়া শিখাইয়াছি, এই থেকেই বর্ত্তমান Messmarisem উৎপত্তি।

রমেন। দেখ গুরুজী! আমার বোধ হয়, যোগ টোগ আমাদের মত সংসারী লোকের জন্য নয়!

মহেশ। সম্পূর্ণ ভুল! যোগে সংসারী নাই,—অসংসারী নাই। যোগীর যোগী

চিত্তের উপর অধিকার দরকার। অভ্যাস কর, সংযোগ কর, সকল হ'বে। যখন ইচ্ছা করবে অমাবস্যার নিশিতে সূর্য্যোদয় করিতে পারিবে, দারুণ শীতে গ্রীষ্ম আনিতে পারিবে, মরুভূমি শস্য শ্যামলা করিতে পারিবে।

রমেন। আচ্ছা গুরুজী, যোগবলে তোমার মেঝ ঠাকুরঝির মতিগতি ফেরাতে পারে ? তাকে প্রকাশদের বাড়ীতে এনে দিতে পার ?

মহেশ। যোগের অসাধ্য কিছুই নাই ? কিন্তু অপরে পারবে না! প্রকাশকে যোগ শিক্ষা করতে হবে।

রমেন। আমি এ বিষয়ে প্রকাশকে রাজী করাতে পারব। কিন্তু উপস্থিত তোমার ঠাকুরঝির মনের অবস্থা কেমন ?

মহেশ। মনুষ্য মাত্রেই অন্ধ। কে কার মনের অবস্থার কথা বলতে পারে ?

মহেশ। বাহ্যিক লক্ষণে যতটা ধরা যায়। তোমার ঠাকুরঝি কি প্রায়ই অন্য মনস্ক থাকে ?

মহেশ। যে যোগ অভ্যাস করে নাই, তাকে ত অন্যমনস্ক থাকতেই হবে।

রমেন। তাহলে বউ ঠাকুরণ অন্যমনস্ক হয়েছে।

মহেশ। নিশ্চয়ই।

রমেন। কি রকম অন্যমনস্ক ? কখন ভাত খেতে ভুলে যায় ?

মহেশ। যার যোগ শিক্ষা নাই, তাকে ক্ষুধা পেলে খেতেই হবে।

রমেন। আচ্ছা কখন চুল বাঁধতে ভুলে যায় ?

মহেশ। কি ? তুমি আমার সহিত ব্যঙ্গ করছ! আমি তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। আমি এখনই চল্লাম।

রমেন। আহা গুরুদেব চটো কেন ? আমি কি তোমায় ব্যঙ্গ করতে পারি ?

মহেশ। আমি কোন কথা শুনব না। তোমায় অভিশম্পাৎ দিলাম; তোমার যোগ শিক্ষা হবে না।

(মহেশের প্রস্থান।)

রমেন। চটে গিয়ে সব মাটি করে দিলে। ঠিক কিছু বোঝা গেলনা। কিন্তু যখন পিরীতের বেমুর মকরধ্বজ বিরহের পুরিয়া এতদিনে পেটে পড়েছে, নিশ্চয়ই তার ফল ফলবে। (প্রকাশের প্রবেশ।)

রমেন। ভাগনের মুখে হাত দিকে এসে অত মলিন মুখে বেড়াচ্ছ কেন ?

প্রকাশ। আজ কি তোমার লোক খাওয়ান আছে ?

রমেন। সে খবরও বুঝি রাখ না। কাল শনিবার, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি।

প্রকাশ। তা হলে চলো না, একটু বেড়িয়ে আসি ?

রমেন। কোথায় ?

প্রকাশ। ময়দানে।

রমেন। এই দুপুর রৌদ্রে রোষ্ট হবার এত সখ কেন ?

প্রকাশ। সারা দিন ঘরে বসে থাক্‌তে ভাল লাগে না।

রমেন। বেশ আজ থাক। হাল্‌ফিল্‌ তোমার বউভাত আস্‌ছে, তার পর দিন রাত তোমার সঙ্গে পথে ঘাটে ঘুর্‌ব।

প্রকাশ। রমেন, রমেন, বাবাকে বল্‌বে আর বিয়েতে কাজ নাই।

রমেন। তা বউ ঠাকরুণ যদি না তোমার সঙ্গে ঘর করেন, তা—হলে ত নূতন করে সংসার পেতে সুখী হতে হবে।

প্রকাশ। সংসারের সুখ—সে ত অনেক দিন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আবার বিয়ে—তাতে শুধু নূতন জ্বালা নূতন অশান্তি।

রমেন। সকলেই কি তোমার প্রথম পক্ষের মত হবে ? এবারকার ভাবী বউ ঠাকরুণ তার চেয়ে ভাল হতে পারে।

প্রকাশ। মন্দও ত হতে পারে ?

রমেন। দেখে শুনে দিলে কেন মন্দ হবে ?

প্রকাশ। না রমেন, আমি পার্‌ব না ; আবার বে কর্‌তে আমার মন চায় না।

রমেন। একথা তোমার বাবাকে বলেছ ?

প্রকাশ। না। অনেক বার বল্‌ব মনে করেছি। তাঁর মনঃক্লিষ্ট মুখ দেখে পারি নাই।

রমেন। তা আমি বল্‌লেও তিনি মনে আরও কষ্ট পাবেন, তুমি বল্লেও পাবেন।

প্রকাশ। না, রমেন, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো, যে ঊষা, তার স্নেহ, মমতা, মায়ের আদর, মায়ের ভালবাসা, দিদির যত্ন, দিদির সহানুভূতি উপেক্ষা করে, আমাদের এত অপমান করেছে, সে ঊষার সহিত আমি কোন সম্পর্ক রাখ্‌ব না। তাকে আমি পরিত্যাগ কর্‌ব ; কিন্তু আবার বিয়ে—তা পার্‌ব না, তা হবে না।

রমেন। কিন্তু তোমার উষাকে ত্যাগ কর্‌বেই বা কি করে? সেকেলে বামুনগুলো ডাইভোর্সের বন্দোবস্ত না করে, এমন এক ধর্ম্মের বাঁধন করে গেছে, যে, তা থেকে মুক্তি নাই। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন। তোমায় কারুকে ত্যাগও কর্‌তে হবে না, আবার বিয়ে কর্‌তেও হবেনা, আমি এমন এক উপায় ঠিক করেছি।

প্রকাশ। কি? কি?

রমেন। তোমার দিদি বল্‌ছিল, তোমাদের অপমান, সেত তোমার উষা করে নাই, তার বাপ মায়ে করেছে—এতে তার দোষ কি?

প্রকাশ। দিদি এই কথা বল্‌ছিল। আর এই দিদিকে উষা অগ্রাহ্য কর্‌ত। উষা——————

রমেন। আহা, আমায় শেষ কর্‌তে দাও না। তুমি যদি এই সময় তোমার গিন্নির সঙ্গে দেখা করে, আস্‌বার কথা বল, সে নিশ্চয়ই আসে। তা হলে ভালয় ভালয় সব গোল চুকে যায়।

প্রকাশ। বাবার এই অপমানের পর সেখানে যাওয়া অসম্ভব।

রমেন। তুমি ত তোমার শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছ না; তুমি তোমার গিন্নির কাছে,—তাকে আন্‌তে যাচ্ছ। এতে মান অপমানের কিছুই নাই। আমি পরশু বাবাকে বলে, তাঁর মত কর্‌ব। তোমায় সেই দিনই বউঠাকরুণের কাছে যেতে হবে। একবার তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হলেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন কোথায় বেড়াতে যাবে বল্‌ছিলে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ভীষ্ম।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কাব্যের প্রথম উদ্দেশ্য। যাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, কোনও অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহাই কাব্য মধ্যে গণ্য। তাহার পর, কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের স্বাভাবিকতা আবশ্যক। যাহা অস্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে, তাহাতে নূতনত্ব বা চমৎকারিত্ব থাকিলেও, সহানুভূতি বা অনুকম্পার অভাব হইয়া থাকে। অঙ্কিত চরিত্রে পাঠকের অনুকম্পা না থাকিলে, তাহার বিপদে মুক্তির ইচ্ছা, মুক্তি লাভে চিত্তের ভার

---

*ভীষ্ম নাটক—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

লাঘব, প্রভৃতি না হইলে, কাব্যের চিত্তাকর্ষণী শক্তি থাকে না। পক্ষান্তরে, যাহাতে পাঠকের চরিত্রোৎকর্ষ জন্মে, দৃষ্টান্ত দ্বারা পাঠকের অজ্ঞাতসারে তৎসাধন করা শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; নচেৎ জীবন-শূন্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিত্রে, ও জীবিত মানবে যে প্রভেদ, পূর্ব্বোক্ত গুণের অভাব বিশিষ্ট কাব্যে ও উক্ত গুণসমন্বিত কাব্যেও সেইরূপ প্রভেদ হয়; সুতরাং চরিত্রোৎকর্ষ সাধনকে, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। এই কয়েকটি গুণ যে কাব্যে নাই, তাহা লালিত্য বা চমৎকারিত্ব গুণে হৃদয়গ্রাহী হইলেও, তাহাকে উচ্চ শ্রেণীর কাব্য বলা যায় না। বাহ্য জগৎ বর্ণনা, অন্তর্জগতের উপর তাহার ক্রিয়া প্রদর্শন, প্রত্যেক চরিত্রের পার্থক্য রক্ষা, ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা প্রভৃতিও কাব্যের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অল্প কথায়, সহজে পাঠকের মনে যত অভিনব চমৎকার ভাবের আবির্ভাব করা যায়, লেখকের লিপিপটুতার ততই অধিক গৌরব। বিষয় নির্ব্বাচন বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কোনও মহৎ বিষয়, বা সাধারণের স্বার্থজড়িত বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য রচিত হইলে, সহজে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কোনও পরিচিত মহাপুরুষের চরিত্র অবলম্বনে কাব্য রচনা করিতে পারিলে কবির সে পক্ষে অনেক সুবিধা।

সাধারণতঃ কাব্য সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দৃশ্যকাব্য বা নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। দৃশ্য কাব্যে যে সকল বিশেষ গুণ থাকার নিতান্ত প্রয়োজন, কাব্যান্তরে সে সকলের সমাবেশ অপরিহার্য্য না হইতে পারে। নাটকে, পাত্রমুখেই সমস্ত কথা বলিতে হইবে। কবির নিজের কোন কথা বলা চলিবে না। অনেক কথা কবি নিজে বলিলে হয়ত বেশ গুছাইয়া সুন্দররূপে বলিতে পারিতেন, কিন্তু পাত্রমুখে রসভঙ্গ ভয়ে সংক্ষেপে সে সকল কথা বলা অত্যন্ত কঠিন; সে স্থলে কবিকে বিলক্ষণরূপ লেখনী সংযত করিতে হয়। ইহা দৃশ্য কাব্যের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা জনক। ঘটনা-পরম্পরা ও পাত্র পাত্রীর কথোপকথন দ্বারাই কবির ভাবের অভিব্যক্তি হইবে।

ঘটনার ধারাবাহিকতা ও সম্পূর্ণতা নাটকের প্রধান অঙ্গ। যে কোনও বিষয় লইয়াই লিখিত হউক না কেন, একই ধারাবাহিক ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা কবিভাবের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিই নাটকের উদ্দেশ্য সাধক। আনুষঙ্গিক ঘটনান্তর, মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায় হইতে পারে মাত্র। ঘটনা বিশেষের মূল হেতুর সঞ্চার, ক্রমশঃ পুষ্টি, সম্যক বৃদ্ধি তজ্জনিত ...

চরিত্রাঙ্কন পটুতা কবির একটি প্রধান গুণ। প্রথম শ্রেণীর কবি, নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় কয়েকবার তুলি টানিয়াই একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, ক্রমাগত তুলিকা ঘষিয়া চিত্র ফুটাইতে হয় না। সেই চিত্র যতবারই নয়নপথে পতিত হউক না কেন, চিনিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। ভাষাগত পার্থক্য না থাকিলেও প্রত্যেক চরিত্র পৃথক্ ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

তাহার পর নাটকের প্রধান অঙ্গ ইহার কথোপকথন। প্রতি কথায় পরস্পরের চিত্তে ঘাত প্রতিঘাত হওয়াই নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব। এই ঘাত প্রতিঘাতের ফলে, এবং কোথাও বা কারণান্তর সাহায্যে চিত্তমধ্যে দ্বন্দ্বভাবের সংঘর্ষ দ্বারা, পাত্রবিশেষকে আন্দোলিত করিয়া, ক্রমে তাহার চিত্তমধ্যে প্রবল ঝটিকা উৎপাদন করতঃ অন্যতম ভাবকে বিধ্বস্ত ও ভাবান্তরের জয় সংঘটিত করিয়া দর্শকের চিত্ত চমৎকৃত করাই কবিত্বের পরিচায়ক। চরিত্রের ক্রমপরিবর্ত্তন প্রদর্শন, কার্য্যকারণের গূঢ় সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান, সম্পূর্ণ মানব চরিত্র অঙ্কন প্রভৃতি সূক্ষ্ম কার্য্যে পটুতা প্রদর্শনই উচ্চ শ্রেণীর কবির কার্য্য।

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দৃশ্য কাব্য এই শিক্ষা দানের বিশেষ উপযুক্ত স্থল। অন্য শ্রেণীর কাব্য অনেকে পাঠ করেন না, কিন্তু নাটকের অভিনয় অনেক শ্রেণীর লোকই দর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং সদসৎ কার্য্যের শুভাশুভ পরিণাম প্রদর্শনের ইহা উপযুক্ত স্থল।

৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায় একজন উচ্চ শ্রেণীর নাটককার। তৎপ্রণীত নুরজাহান, সাজাহান প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক তাঁহাকে পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারদিগের মধ্যে স্থান দিয়াছে। ভীষ্ম পৌরাণিক নাটক। ভীষ্মের পরিচয় কোনও হিন্দুর নিকটেই দিতে হইবে না। এত বড় মহৎ চরিত্র জগতে দুর্লভ। সে চিত্র বেদব্যাস যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্র এদিক্ ওদিক্ করা চলে না। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রকেও সে পক্ষে কোনও কষ্ট করিতে হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তিনি কোথাও পূর্ব্ব লেখকের পদাঙ্ক ত্যাগ করেন নাই। বেদব্যাস যাহাকে যেরূপ চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রও তাহার চরিত্র সেই আদর্শে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। স্বকপোলকল্পিত চরিত্রে চিত্রিত করিয়া কাহাকেও তোলেন নাই বা হীন করেন নাই। তাহাতে যেমন একটু সুবিধাও আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। যেমন কল্পনার সাহায্যে নূতন সৃষ্টি করিবার পরিশ্রম অনেকটা কমিয়া যায়, তেমনিই

অনেক স্থলে কবির হাত পা বাঁধা থাকে। তবে যেখানে পূর্ব্ব কবি বা ঐতিহাসিক নীরব, দ্বিজেন্দ্র সেইখানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়াছেন। ভীষ্ম নাটকেও দ্বিজেন্দ্রকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ভীষ্ম চরিত্র বর্ণন এই নাটকের মূল বিষয়।

"ভীষ্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বন্ধে কবির লিখিত ভূমিকাই যথেষ্ট। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা হইতে পতন পর্য্যন্ত ইহাতে আছে। ভীষ্মের সহিত অম্বার সম্প্রীতি, দাশরাজের ও মাধবের চরিত্র, এবং ভীষ্মের প্রতি শাল্বের বিদ্বেষ, উমা ও মহাদেব সংবাদ প্রভৃতি কয়েকটি কবির সৃষ্টি; অন্য সর্ব্বত্রই কবি বেদব্যাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বীয় লিপিকৌশল দেখাইতে বিরত হন নাই। তাঁহার তেজোময়ী লেখনী সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ করিয়াছে। পাঠক দুই একটা উদাহরণ দেখুন। যখন ভীষ্ম মাধবের মুখে শুনিলেন, যে সত্যবতী পুত্রকে রাজ্যদানে স্বীকৃত না হইলে, মহারাজ শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করিতে পাইবেন না, তখন ভীষ্ম বলিলেন,—

"এই মাত্র? হায় পিতা, আমার কারণে
তুমি দুঃখী, রুগ্ন, দীন, মলিন, কাতর।
জান না কি পিতা তব একটি ইঙ্গিতে—
অসাধ্য সাধিতে পারি ... ... কেন মুখ ফুটে
বল নাই প্রিয়তম জনক আমার—
—এত স্নেহ—এত স্নেহ পিতৃ-দেব-তব—
অধম পুত্রের প্রতি! দেখাইব পিতা—
এ অগাধ স্নেহের অযোগ্য নহি আমি।
এদুঃখ আমার জন্য! পারি যদে প্রাণ
তোমার সুখের জন্য দিতে বলিদান।"

তাহার পর ভীষ্ম পিতার নিমিত্ত সত্যবতীকে প্রার্থনা করিতে দাশরাজ সমীপে গিয়া যখন শুনিলেন, তাহারা তাঁহার বিবাহ হইলেও কন্যা দানে অসম্মত, (অথচ তিনি ইতি পূর্ব্বেই অম্বার প্রণয় মুগ্ধ. অম্বাকে হৃদয় দান করিয়াছেন,) তখন তাহাতেও স্বীকৃত হইবার জন্য দেবগণের নিকট জানু পাতিয়া হৃদয়ের বল প্রার্থনা করিলেন।

—"স্বর্গে দেবগণ!
"এ হৃদয়ে বল দাও। আমি তুচ্ছ নর—
অসক্ত দুর্ব্বল আমি। শক্তিহীন আমি

অসহায়! বলদাও দেবগণ? তবে—
বাসনারে চূর্ণ কর, নিষ্পেষিত কর
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে। সর্ব্ব অহঙ্কার
দূর কর। সর্ব্ব স্বার্থ- ভস্ম ক'রে দাও।
ব্যাপ্ত কর মর্ম্মস্থল গাঢ় অন্ধকারে—
যার মধ্যে আলোকের রেখা নাহি থাকে।
শক্তি দাও দেবগণ।”

তাহার পর অম্বার সহিত ভীষ্মের সময়াস্তরে সাক্ষাৎ হওয়ায় ভীষ্মের বিষম পরীক্ষাস্থল উপনীত হইল। ভীষ্ম অম্বাকে ভগিনী সম্বোধন করতঃ তাঁহার কাতর প্রার্থনার উত্তরে বলিলেন,—

“ভাসায়ে দিওনা দেবি! কর্ত্তব্য আমার,
তোমার নয়ন জলে। ভাসাইয়া দাও
অতীতের সুখস্মৃতি। ভাসাইয়া দাও
ইহকাল পরকাল তব অশ্রুজলে।
ভাসায়ে দিওনা শুধু প্রতিজ্ঞা আমার।
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব ভেঙ্গে চুরে
ডুবে ভেসে যাক্, শুধু পর্ব্বতের মত—
দাঁড়ায়ে থাকুক গর্ব্বে কর্ত্তব্য আমার।
তবে আজি প্রাণাধিকা ভগিনী আমায়—
আমারে বিদায় দাও”—
ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরাতন, অতি পুরাতন, সহস্রবার শ্রুত, পঠিত বিষয়কেও এরূপ ভাবে বর্ণনা করা সকলের সাধ্য নহে। এরূপ ভাব অনেক স্থলে আছে, সকল গুলি উদ্ধৃত করিতে হইলে আর একখানি ভীষ্ম লিখিতে হয়। পাঠক অম্বা ও ভীষ্ম সংবাদ যেখানে যেখানে পড়িবেন, সেই সেই স্থানেই এইরূপ প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাইবেন।

এখন ভীষ্ম চরিত্র সম্বন্ধে একটা কথা আছে। ভীষ্ম এত মহৎ হইয়াও দুর্য্যোধনাদির পাপপক্ষ অবলম্বন করিলেন কেন? কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে যখন বেদব্যাস ভীষ্মকে ঐরূপই অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং কবি বেদব্যাসেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন তখন এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা

যাইতে পারে, যে ভীষ্ম মহাভারতের নায়ক নহেন, কিন্তু ভীষ্মনাটকের নায়ক ভীষ্ম। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে নাটকের নায়ক নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, সেই জন্য বেদব্যাসের দুষ্মন্ত কালিদাসের দুষ্মন্ত হইতে স্বতন্ত্র। সেইজন্য কালিদাসকে অঙ্গুরীয় ও ধীবরের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এস্থলেও, কবি যে অলঙ্কার শাস্ত্র মান্য করিয়া চলিয়াছেন, তাহা কবিলিখিত ভূমিকাতেই দেখা যায়। সুতরাং যদি কৌরব-পক্ষাবলম্বন ভীষ্মের সহস্র গুণের মধ্যেও একটা দোষ হয়, তবে কবিকে একটু বিপদে পড়িতে হইবে। সেই জন্য কবি ভীষ্মের মুখেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াইছেন।—"দুর্য্যোধন রাজা, আমি প্রজা। রাজার বিপদে তাকে রক্ষা করা প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্য। পরে, "আমি তার অন্ন খেয়েছি।" পুনর্ব্বার, "বুঝতে পারছি—এ অন্যায়। কিন্তু বিপদে রাজাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। ভীষ্ম জীবন থাকৃতে কৃতঘ্ন হ'তে পারবে না।" (৫অ-৪ দৃশ্য।) তাহার পর ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যু ইচ্ছা করায় আত্মহত্যা দোষ স্পর্শ করার ভয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

"এই আত্মহত্যা-পাপ তোমার ইচ্ছায়,
আশীর্ব্বাদ কর যেন ধৌত হ'য়ে যায়।

তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন—

"ভীষ্ম! আমি নির্ব্বিকার! চেয়ে দেখ দেখ তবু
আমার নয়নে জল। ভক্ত! নরোত্তম!
পুণ্যশ্লোক! মহাভাগ! যোগী! বীরবর!
ত্যাগের আদর্শ! পাপ স্পর্শিবে তোমায়?
সাধ্য তার? ঐ দেখ তব মহিমায়
তব পদতলে পাপ কেঁদে গলে যায়।"

এই মহিমা ভীষ্মের ত্যাগ। ভীষ্ম মূর্ত্তিমান্ ত্যাগ। ত্যাগের জন্য রাজ্য ও প্রিয়তমা পত্নী লাভে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইলেন, ত্যাগের জন্য স্বেচ্ছামৃত্যু হইয়াও স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। এরূপ ত্যাগ জগতে আর দেখা যায় কি?

নূতন চরিত্র সম্বন্ধে দাশরাজ ও মাধব হাস্যরস রসিক কবির সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। মাধবে শকুন্তলার মাধুর্য্যের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। দাশরাজ এক অদ্ভুত জীব। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাযই করিতে পারে না; উঠিতে বসিতেও অক্ষম। স্ত্রীর ভয়ে বিব্রত, অথচ মনে মনে রাজা বলিয়া গর্ব্ব আছে। তাহার উপর হস্তিনাধিপতির শ্বশুর। ভয়ঙ্কর কথা। এরূপ চরিত্র

গ্রামমাত্রের অধীশ্বর ধীবর রাজের না হইয়া অন্য যে কোনও রাজার হইলে অসঙ্গত হইত। অবশেষে দাশরাজ ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শত্রুর প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে গিয়া স্বীয় মন্ত্রীকেই বধ করিয়া ফেলিলেন। বাটী গিয়া দেখেন মন্ত্রী নাই।

অম্বিকা ও অম্বালিকা দুইটি ক্রীড়াময়ী বন্য কপোতী। সর্ব্বদা হাস্য ও সঙ্গীতে রতা, সংসারের সুখ, দুঃখ, চিন্তা তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। স্বামীর অনুমতি ক্রমে স্বামীর মৃত্যুকালেও গান করিতে পারিল। আর সকল চরিত্রই প্রায় মহাভারতের এবং মহাভারতের অনুরূপ, স্থানে স্থানে সামান্য এদিক্ ওদিক্ থাকিলেও, যেখানে বেদব্যাস যাহাকে যেরূপে চিত্র করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রও সেইরূপই রাখিয়াছেন। নাটকের উৎকর্ষ সাধন জন্য, বা অপকর্ষ নিবারণ জন্যে, কোথাও বেদব্যাসের দেবতাকে পশু, বা বেদব্যাসের হীন চরিত্রকে দেবতা স্বরূপে অঙ্কিত করেন নাই। সে বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রের শক্তি ও সাহস অসাধারণ ছিল। ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে বলিবার বড় কিছু নাই। ৺দ্বিজেন্দ্রের তেজস্বিনী ভাষা বাঙ্গালার সাহিত্যামোদী কাহারও নিকট অপরিচিত নহে। কবি যেখানে নিজ ভাষা ও ভাব প্রকাশের অবসর পাইয়াছেন, সেইখানেই পাঠককে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। তাহার পর, দ্বিজেন্দ্র লালের সঙ্গীত। সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্র সিদ্ধহস্ত, অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দেখিতে দেখিতে তাঁহার গান দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। ভীষ্ম নাটকেও কয়েকটি সুন্দর গান আছে। দুঃখের মধ্যে, কবি সকল গুলির সুর দিয়া যাইতে পারেন নাই। একটি গান পুস্তক প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে গীত হইতেছে। সেটি গঙ্গার স্তব। "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে—" ইত্যাদি। এই নাটকে উৎকৃষ্ট ভাব ও ভাষায় এত অধিক সন্নিবেশ আছে, যে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রায় সমস্ত নাটক খানিই উদ্ধৃত করিতে হয়। সুতরাং এই খানেই ভীষ্ম সমালোচনা শেষ করা গেল। ফলতঃ ভীষ্ম নাটকে পূর্ব্ব লিখিত কাব্যগুণের কোনটারই অভাব নাই। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে এই নাটকে প্রশংসা করিবার সহস্র স্থান থাকিলেও, একা কবি সমস্ত গুলির অধিকারী নহেন।—তিনি বেদব্যাসের পদানুসারী মাত্র।

মানব-দেহের উপর সূর্য্যরশ্মির ক্রিয়া।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানাস্থানে সূর্য্যালোক দ্বারা অনেক ব্যাধির চিকিৎসা হইত। শুনা যায়,—প্রাচীন গ্রীসবাসীরা সেকালে রৌদ্র সেবন করিয়া শরীর সুদৃঢ় করিত। রোমের অধিবাসিগণও আতপ সেবনের পক্ষপাতী ছিল। রোগীর দেহে সূর্য্যরশ্মি লাগাইবার জন্য রোমগণের নির্দ্দিষ্ট গৃহ সকল রক্ষিত হইত। রোমীয়গণ ঐ আলোক চিকিৎসাগারকে "Solaria" বলিত। সূর্য্যরশ্মির রোগ নাশক ও পচন নিবারক শক্তির কথা প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরাও জানিতেন। আমাদের চিরাচরিত কার্য্যের প্রতি লক্ষ করিলে ইহা সহজেই বুঝাযায়। আজও প্রসূতিগণ প্রসবের পর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য রৌদ্রে বসিয়া থাকেন। আজও জননী ক্ষুদ্র শিশুকে তৈলসিক্ত করিয়া সূর্য্যপক্ক করেন। কোন প্রদাহিত স্থানে ঔষধ মর্দ্দন করিতে হইলে আমরা রৌদ্রে বসিয়াই সে কার্য্য সম্পন্ন করি। খাদ্য সামগ্রী পচিয়া উঠিবার ভয়ে মধ্যে মধ্যে উহাকে রৌদ্রে রাখিবার প্রথা, এদেশে চিরদিনই আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ রোগাপনয়নের জন্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতি কৃশ, ধমনী-পরিব্যাপ্ত দেহ শাম্ব সহস্রাংশু দিবাকরের অনুগ্রহে নিষ্পীড় ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এখনও ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃসন্ধ্যায় করপুটে ও মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যোপস্থাপন করিয়া থাকেন। সকল দেবতা থাকিতে আর্য্য ঋষিরা আদিত্য—দেবকেই রোগহারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ডেনমার্কের ডাক্তার এন্ আর্, ফিন্‌সেন্ (N. R. Finsen.) মহোদয় কোপেন্‌হাগেন্ হাঁসপাতালে মানব দেহের উপর সূর্য্যরশ্মির ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়াছেন যে মার্ত্তণ্ডকিরণে বিবিধ রোগ-বীজাণু ধ্বংস হয়; দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা শারীর যন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। সূর্য্যালোক ত্বকের মধ্য দিয়া জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়। শরীরের যে অংশে অধিক আলোক লাগে সে অংশ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইয়া উঠে। পরীক্ষা দ্বারা আরো প্রমাণিত হইয়াছে যে সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষিত করিলে যে লাল নীল হরিদ্রা, ভাওলেট্ প্রভৃতি বহুবর্ণের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভাওলেট্ আলোকই বীজাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ। সূর্য্যালোকে ভাওলেট্ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আলোক তরঙ্গ বিদ্যমান আছে। উহাকে আল্‌ট্রা ভাওলেট্ রে

(Ultra-violet rays.) বলে। রোগ চিকিৎসার পক্ষে এই আলট্রা-ভাওলেট রে অধিক উপযোগী। ফিনসেনের আবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখন বিশেষজ্ঞগণ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অনেক রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। এই চিকিৎসার নাম "Heliotherapy" ফরাসী দেশের চিকিৎসা বিভাগে ইহার বিশেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার Leon Cerf বলেন, দীর্ঘ পনরবৎসর সময়ের মধ্যে আমরা ইহার উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। প্যারিসের "Press Medicale" নামক পত্রে ডাক্তার Delilli লিখিয়াছেন —

"সার্জ্জিকেল টিউবার কিউলোসিস্" রোগে আতপ চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার সুফল এত শীঘ্র প্রকাশ পায় যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৯১১ সালে Rollier নামে এক ব্যক্তি কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা-ফল বাহির করেন। ইহারা সকলেই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিল। তালিকা দৃষ্টে বুঝাগেল ৩৬৯ জন রোগীর মধ্যে ২৮৪ জন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪৮ জন কিঞ্চিৎ সুস্থ, ২১ জন পূর্ব্ববৎ অসুস্থ এবং ১৬ জন মৃত। ডাক্তার Hines যে, সকল দগ্ধ ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না, এই চিকিৎসা দ্বারা সে সকল অতি সত্বরই আরোগ্য হইতে পারে। পেশীবাত ও দুষ্টক্ষত ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। ডাক্তার Finsen বলেন, হাম ও বসন্ত রোগের পক্ষেও এই চিকিৎসা উপযোগী। তবে ঐ দুই রোগে সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা লাল আলোকই আবশ্যক হয়। বসন্ত রোগীকে প্রথম হইতে লাল আলোকে রাখিতে পারিলে গুটিকা মধ্যে পূযোৎপত্তি হয় না,— রোগান্তে রোগীর গাত্রে বসন্ত-চিহ্নও প্রকাশ পায় না। নরওয়ে প্রদেশে ইহার বিশেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থ বাড়ীতে যে গৃহে হাম বা বসন্ত রোগী থাকে তাহার আলোক পথগুলি রক্তবস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়।

সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্য কেহ কেহ আতপ চিকিৎসা অনুমোদন করেন। এক সময়ে কতকগুলি রমণীকে সূর্য্য কিরণে রাখা হইয়াছিল। তাহাদের মস্তক যাহাতে উত্তপ্ত না হয়; তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অল্প দিন মধ্যে শ্যামাঙ্গীরা নিগ্রোদিগের ন্যায় এবং গৌরাঙ্গীরা মেহগ্নি কাঠের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্টা হইয়া পড়িল, কিন্তু সকলেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল। যৌবনের সৌকুমার্য্য তাহাদের প্রত্যেক অবয়বে যেন ফুটিয়া উঠিল;—মাংসপেশী সুগ-

সর্ব্বাঙ্গে সূর্য্যকিরণ লাগানকে ডাক্তারেরা "Sun bath" বা রৌদ্রস্নান বলেন। এই রৌদ্রস্নান দ্বারা দৈহিক বলের সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও বৃদ্ধি হয়। অনেক বিষন্নরোগী ইহা দ্বারা চিত্তস্বাস্থ্য লাভ করে। বাতব্যাধি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মধুমূত্র, রক্তাল্পতা ও বিবিধ দুরারোগ্য চর্ম্মরোগে রৌদ্রস্নান পরম হিতকর। ব্রণ, পুরাতন ক্ষত, একজিমা, টাক প্রভৃতি রোগেও রৌদ্র লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়। সকলেই ইচ্ছা করিলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। রৌদ্র স্নানের পদ্ধতি এইরূপ :—

একটি রৌদ্রময় স্থানে কম্বল পাতিয়া তদুপরি রোগী শয়ন করিবে। বালিশের সাহায্যে মস্তকটি কিছু উচ্চে রাখিতে হইবে। দেহের রৌদ্র সংলগ্ন ভাগটা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার অপরাংশে রৌদ্র লাগাইতে হইবে। প্রথম দিন রোগীকে অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রথমে ১৫ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পরিমাণ কাল বাড়াইবে। এই চিকিৎসার সময় মস্তকে বরফ পূর্ণ থলি (Ice bag) ও চক্ষুতে নীলবর্ণের চশমা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগীর গাত্রে বস্ত্রাদি থাকা অনুচিত।

রৌদ্রস্নানের আরো দুই একটি সাধারণ নিয়ম আছে। নিম্নভূমি অপেক্ষা উচ্চস্থানই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। বালার্ক অপেক্ষা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণ অধিক উপকারী। রৌদ্র স্নানের পর গাত্র মর্দ্দন করতঃ কিছুক্ষণ ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া সুশীতল জলে স্নান করিলে অধিক ফল লাভ হয়। ক্ষয়কাশ ও হৃদ্‌রোগীর পক্ষে এই চিকিৎসা নিষিদ্ধ। অতি দুর্ব্বলের পক্ষেও ইহা হিতকর নহে। অধ্যাপক Roget নিতান্ত রুগ্নদিগের পক্ষে নিত্য রৌদ্রে কিছুক্ষণ ক্রীড়া বা ভ্রমণ করাই যথেষ্ট চিকিৎসা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে এইরূপে রৌদ্র সেবন করিলেও রুগ্ন-ভগ্ন স্বাস্থ্য আবার সমুন্নত হইয়া উঠে।

সমালোচনা।

মালা—শ্রীমতী রাণী জ্যোতিস্ময়ী দেবী প্রণীত। কলিকাতা ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম দাস দ্বারা মুদ্রিত।

"মালা"—কাব্যের পূর্ব্বাভাষে পণ্ডিতপ্রবর রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থকর্ত্রী আপনার হৃদয় সমুদ্র আলোড়িত করিয়া এক একটি মুক্তাফল তুলিয়া এই "মালা" গাঁথিয়াছেন, জীবন দেবতার চরণোপান্তে উপহার দিবার জন্য। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধে আছে; আমার বিশ্বাস, যাঁহার উদ্দেশে "মাল" গ্রথিত তাঁহার নিকট ইহা পৌছিয়াছে। এ কাব্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সার্থকতা হইতে পারে?"

আমরা "মালা" কাব্য খানি অতি যত্নের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বাভাষের সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। যে কাব্য এবং কবিতা যে পরিমাণে হৃদয়ের আবেগে প্রাণের ভাষায় লিখিত হয়,—সেই পরিমাণেই পাঠক পাঠিকগণের মর্ম্ম স্পর্শ করে; যে কাব্য এবং কবিতা সাহিত্য সংসারে নাম লব্ধ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইবার প্রলোভনে কষ্ট কল্পনা করিয়া লিখিত হয় তাহা পাঠার্থির অন্তরের বাহিরে পড়িয়া থাকে। "মালা"—খণ্ড কাব্য খানি ভাবে, ভাষায় সজীবতা পরিস্ফুট;—প্রেম স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ। শোকাবেগ পূর্ণ প্রাণস্পর্শী "মালা" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছি।

মর্ম্মবাণী।—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্র নাথ রায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য ছয় পয়সা।

আমরা "মর্ম্মবাণী" প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছি; "মর্ম্মবাণী"—সাধারণ সম্বলিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র নহে, ইহা সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত অনেকগুলি সুলেখকের রচনা মর্ম্মবাণীতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা মর্ম্মবাণীর স্থায়ীত্ব ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। } ১৩২২ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

শব্দ-ব্রহ্ম ও টেলীগ্রাফ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

শব্দ দ্বিবিধ, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। যাহা মুখে বলা হয়, তাহাই ধ্বন্যাত্মক-শব্দ এবং যাহা অক্ষরে লেখা যায়, তাহাই বর্ণাত্মক শব্দ। লেখা ও বলার মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য নাই, বর্ণে যাহা লেখা যায়, মুখে তাহাই বলা হয়। বলিয়া ও লিখিয়া আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। বোবা কথা কহিতে পারে না, কিন্তু লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। প্রথমে ধ্বন্যাত্মক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রথমে মানুষ কথা কহিতে শিখিয়াছে, পরে লিখিতে শিখিয়াছে।

আকাশের গুণ শব্দ, এই শব্দই "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম"। যাহা হইতে এই ওম্ ধ্বনি হয়, তাহাই ব্যোম বা আকাশ। এই শব্দ আকাশে নিরন্তর বিদ্যমান এবং ইহাই কারণরূপী বা নিত্য শব্দ, কিন্তু আমাদিগের শ্রোতব্য নহে। যাহা শ্রোতব্য, তাহাই কার্য্যরূপী বা অনিত্য। শব্দ—ব্রহ্ম, শব্দের বিনাশ নাই। নিত্যশব্দ চিরস্থায়ী ও অনিত্যশব্দ অস্থায়ী। আকাশ শব্দময়, কিন্তু বায়ুর

আকর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাত ব্যতীত সেই শব্দের বিকাশ হয় না। বায়ু চঞ্চল-স্বভাব, বায়ুর চাঞ্চল্যে আকাশ সর্ব্বদা আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সেই আঘাত বায়ু ও আকাশ অপেক্ষা কোন কঠিন পদার্থে লাগিলে শব্দ উৎপন্ন এবং শ্রুতিগোচর হয়। আমাদিগের দেহ একটি যন্ত্র, ঐ যন্ত্রের চালক বায়ু। আমরা মুখে যে শব্দ উচ্চারণ করি, তাহা বায়ুর ক্রিয়া এবং কর্ণে যে শব্দ শ্রবণ করি, তাহা আকাশের ক্রিয়া। বস্তুতঃ শব্দোচ্চারণ ও শব্দ শ্রবণ যদি দেহের ক্রিয়া হইত, তবে মৃত কথা বলিতে ও শুনিতে পাইত এবং মৃতের সহিত বায়ু ও আকাশ ধ্বংস হইয়া যাইত, সুতরাং বুঝিতে হইবে, বায়ু ও আকাশ বহির্জ্জগতের জিনিস এবং জীবজগৎ না থাকিলেও বায়ু এবং আকাশের ধ্বংস বা তাহাদের গুণের লাঘব হয় না। পরন্তু ইহাও সত্য যে, জীবজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বায়ু ও আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা হইতেই জীবজগৎ রচিত হইয়াছে। জগতে বায়ু বা আকাশবিহীন স্থান নাই, যেখানে বায়ু, সেই খানেই আকাশ এবং যেখানে আকাশ, সেই খানেই বায়ু। বায়ু পুরুষ এবং আকাশ—প্রকৃতি। আকাশ রন্ধ্র, "যৎ শুষিরং তদাকাশম্" যাহা ছিদ্র, তাহাই আকাশ। বায়ুর গুণ স্পর্শ ও আকাশের গুণ শব্দ, চঞ্চল স্বভাব বায়ু আকাশকে নিরন্তর স্পর্শ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে ও সেই সঙ্ঘর্ষ বা ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, তবে কোন কঠিন পদার্থে সেই ঘাত প্রতিঘাত না লাগিলে শব্দ উৎপন্ন হইলেও তাহা শ্রুতি-গোচর হয় না। ঝড়ের সময় বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় এবং সেই বায়ু-প্রবাহ বৃক্ষের গায়ে সংলগ্ন হয় বলিয়া বৃক্ষ হেলিতে দুলিতে থাকে ও তাহার ফলে শোঁ শোঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। এই শব্দ ধ্বন্যাত্মক, কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দের ও আকার আছে। মহাভারতে দেখিতে পাই—

তত্রৈকগুণ মাকাশং শব্দ ইত্যেব তৎ স্মৃতম্।
তস্য শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরং বিবিধাত্মকম্॥
ষড়্জ ঋষভগান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবত স্তথা।
পঞ্চম শ্চাপি বিজ্ঞেয় স্তথা চাপি নিষাদবান্॥
এষঃ সপ্তবিধঃ প্রোক্তো গুণ আকাশসম্ভবঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ তু সর্ব্বত্র স্থিতোঽপি পটহাদিষু॥
মৃদঙ্গভেরীশঙ্খানাং স্তনয়িত্নো রথস্যচ।
যং কশ্চিৎ শ্রূয়তে শব্দঃ প্রাণিনোঽপ্রাণিনোঽপিবা॥

এবং বহুবিধাকারঃ শব্দ আকাশসম্ভবঃ ॥
আকাকাশজং শব্দ মাহু রেভির্ব্বায়ুগুণৈঃ সহ।
অব্যাহতৈ শ্চেতয়তে ন বেত্তি বিষমস্থিতৈঃ ॥

আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ, সেই শব্দ নানা প্রকার। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই সকল শব্দ ব্যাপক ভাবে সর্ব্বত্র থাকিয়াও পটহাদি বাদ্যযন্ত্রে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, মেঘ, রথ, প্রাণী বা অপ্রাণী যাহার যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহা এই সপ্তস্বরের অন্তর্গত। এইরূপে আকাশ-সম্ভব শব্দের আকার নানা প্রকার। এই সকল শব্দ স্পর্শগুণ সহ (স্পর্শ নানাবিধ, উষ্ণ, শীতল ইত্যাদি) দ্বারা প্রতিহত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়। উহা বিষমাবস্থায় থাকিলে অনুভূত হয় না।

এক্ষণে দেখা গেল ধ্বন্যাত্মক শব্দও আকারপরিশূন্য নহে, কিন্তু সেই আকার কি প্রকার? বায়ু আকাশের যতটুকু অবয়বকে আঘাত করে, শব্দের আকার ততটুকু। আমরা হস্তপদাদি স্থূল অবয়ব দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদিগের হস্ত বা পদাঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাও বায়ু ও আকাশের ক্রিয়া। এই আঘাত যতটুকু স্থানের ব্যাপক, শব্দের আকার ততটুকু। আমরা জিহ্বা নাড়িয়া কথা বলি, জিহ্বা যতটুকু স্থানকে আঘাত করে, শব্দ তদনুরূপ আকারে উৎপন্ন হয়। শব্দের আকার না থাকিলে, তারের টেলী-গ্রাফের সেই টরে টক্কা শব্দ সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে অপরিবর্ত্তিত আকারে পৌছিতে পারে না। হরিকে ডাকিলে রাম আসিয়া উপস্থিত হইত। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ একই নিয়মের অধীন। যেমন হরিকে ডাকিলে হরিই আসে, তৎ পরিবর্ত্তে অন্য কেহ আসে না, তদ্রূপ টেলীগ্রাফে হরি বলিয়া ডাকিলে হরি শব্দটিই উপস্থিত হয়, রাম শব্দ উপস্থিত হয় না বা বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে না। আবার তারের টেলীগ্রাফে যেমন বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে না অথবা শব্দের আকার পরিবর্ত্তিত হয় না, তদ্রূপ তারবিহীন টেলীগ্রাফেও যে শব্দ প্রেরিত হয়, তাহাই অপরি-বর্ত্তিত আকারে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া পৌছায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে, শব্দেরও ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদি আকার আছে এবং এই শব্দ কার্য্যরূপী বা অনিত্য, কিন্তু কার্য্য শেষে ঐ শব্দ শ্রুতিগোচর না হইলেও আকাশে উহার তরঙ্গ নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, অন্যথা উহা অপরিবর্ত্তিত আকারে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী তারবিহীন টেলীগ্রাফের যন্ত্রে পৌছিতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই

উপলব্ধি হইতেছে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে শব্দকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা সত্য, শব্দ—ব্রহ্ম, সুতরাং অবিনাশী, শব্দের ধ্বংস নাই এবং শব্দ জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে ও প্রয়োজন মত তাহাকে আকর্ষণ করা যায়। পরন্তু ভগবান্ অপেক্ষা তাঁহার নাম বড়, ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে; ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা পাই না, কিন্তু তাঁহার নাম সর্ব্বদা পাই, নাম-ব্রহ্ম সর্ব্বদা আকাশের স্তরে বিদ্যমান, ইচ্ছা করিলেই আমরা তাঁহার নাম আকর্ষণ ও উচ্চারণ করিতে পারি। আর ভগবান্ জীবরূপে যে কোন মূর্ত্তিতে ধরায় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার দেহখানি একই সময়ে জগতের সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেও পারে না, কিন্তু তাঁহার নাম-ব্রহ্ম শব্দ তরঙ্গরূপে আকাশের সর্ব্বত্র ভাসিয়া বেড়ায় এবং তাঁহার দেহ খানির ওজন থাকিতেও পারে; কিন্তু নামের ওজন নাই বা থাকিতে পারে না। তজ্জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে যে ভগবান্ অপেক্ষা তাঁহার নাম বড়।

যেমন জগতে একটি ব্যতীত সূর্য্য নাই, তদ্রূপ বায়ু, আকাশ, জল এবং ক্ষিতিও এক একটি, অতএব একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে, তাহা আকাশের সর্ব্বাবয়বে বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ইহাই আশ্চর্য্য যে, সেই শব্দ কিরূপে অপরিবর্ত্তিত আকারে আকাশে ভাসমান থাকে। মহাভারতকার বলিতেছেন, শব্দ-সকল বৈষম্যভাবে অবস্থান করে, তজ্জন্য জানা যায় না, ইহাতে এই বুঝায় যে বৈষম্যভাব হইতে সাম্যভাবে আনিতে পারিলে জানা যায়। সাম্যভাবে আনিতে হইলে বায়ুর স্পর্শগুণের সহায়তা বা ঘাত প্রতিঘাতের আবশ্যক, তদ্ব্যতীত আকাশস্থ শব্দ-সকল চেতনালাভ করে না। অতএব শব্দ-সকলকে সাম্যাবস্থায় আনিতে হইলে, সমধর্ম্মী স্পর্শগুণবহুল পদার্থের প্রয়োজন। যেমন আমাদিগের চক্ষে সূর্য্য বা অগ্নির তেজ আছে বলিয়া সেই তেজের সহিত চক্ষের তেজের ঘাত প্রতিঘাতে দর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তদ্রূপ আমাদিগের দেহে স্পর্শগুণাত্মক বায়ু আছে বলিয়া আমরা আঘাত করিতে সমর্থ হই এবং শব্দ-গুণাত্মক শ্রবণেন্দ্রিয় আছে বলিয়া শব্দ শুনিতে পাই। আমরা ক্ষুদ্র জীব, এক মহাশক্তির অণু পরমাণু আমাদিগের দেহে বিদ্যমান, তজ্জন্যই সমধর্ম্মীর আকর্ষণে ও ঘাত প্রতিঘাতে আমাদিগের দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সূর্য্যের তেজ ও অগ্নির তেজ এবং সূর্য্যের তাপ ও অগ্নির তাপ সমধর্ম্মী, পরন্তু অগ্নি পৃথক্ পদার্থ নহে, সূর্য্যের ঘনীভূত তাপ। সূর্য্যোত্তাপে বস্ত্র দগ্ধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যকান্তমণি সাহায্যে সূর্য্যোত্তাপ ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত

রাত্রিকালে দীপালোকে আমাদিগের দর্শন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। সূর্য্যের তেজ ও অগ্নির তেজ সমধর্ম্মী না হইলে, একই চক্ষু দ্বারা দিনে ও রাত্রিতে দর্শন সম্ভবপর হইত না। যেমন রাত্রিকালে সূর্য্যদেব লুক্কায়িত হইলেও বিনষ্ট হন না, পুনর্ব্বার উদিত হন এবং তাঁহার সমধর্ম্মী দীপালোক দ্বারা রাত্রিকালে দর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তদ্রূপ শব্দ-তরঙ্গ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু আকাশে ভাসমান থাকে এবং বায়ু-গুণ বহুল পদার্থ দ্বারা আবার সেই শব্দ আকৃষ্ট ও ব্যক্ত হয়।

শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে বৈজ্ঞানিক প্রবর মিঃ এডিসনের মন্তব্য সত্য বলিয়াই মনে হয়। তিনি বলেন, শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সঙ্গীত গীত ও লোকমুখে যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, এক্ষণে এমন যন্ত্রের আবিষ্কার করা যাইতে পারে যে সুর, তাল, মান, লয়সহ সেই সকল সঙ্গীত ও শব্দ সেই যন্ত্রে ধ্বনিত হইবে।

তেজ সূর্য্যমণ্ডলের শক্তি-বিশেষ, সূর্য্যকান্তমণি তৈজস পদার্থ, তজ্জন্য সমধর্ম্মীর আকর্ষণে সূর্য্যকিরণ হইতে অগ্নি আকর্ষণ করা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অগ্নির সহিত সূর্য্যের তেজের সাধর্ম্ম্য না থাকিলে, একই চক্ষু দ্বারা দিনে ও রাত্রিতে দর্শন হইতে পারে না। পদার্থে সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য উভয়ই বিদ্যমান, এই সাধর্ম্ম্য গুণে সূর্য্যকান্ত মণির দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে অগ্নি আকর্ষণ করা যায়। এই সাধর্ম্ম্য গুণে মাকাল বৃক্ষে মাকাল ফলই ফলে, আম্র বৃক্ষে আম্র এবং কাঁঠাল বৃক্ষে কাঁঠাল ফলে ও বৈধর্ম্ম্য গুণে মাকাল বৃক্ষে আম্র, আম্রবৃক্ষে কাঁঠাল ও কাঁঠাল বৃক্ষে আম্র ফলে না।

আমরা জলের তরঙ্গ দেখিয়া আকাশের তরঙ্গ অনুমান করিতে পারি। জলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাও বায়ুর ক্রিয়া। বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে জলে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং সেই তরঙ্গ হেলিয়া দুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জলকে ঠেলিয়া তরঙ্গায়িত করে। তদ্রূপ বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

যেমন একটি ফুটবল কোন কঠিন বস্তুর উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা সেই বস্তুকে আঘাত করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া নিক্ষেপকারীকে আঘাত করে, আকাশের সহিত বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতও তদ্রূপ। ফুটবলের এই প্রত্যাগমনের নাম প্রতিঘাত, ঘাতের পর প্রতিঘাত। বড় পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে, তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, ইহাই প্রতিঘাত। শব্দ অবিনাশী না হইলে পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া রাম বলিয়া ডাকিলে তাহার প্রতিধ্বনিতে রামশব্দ শ্রুতিগোচর হইত না।

অধিক দূরে গমন করে এবং যে স্থান হইতে গমন করে, ঠিক সেই স্থানে প্রত্যা-গমন করে। এইরূপে যাওয়া আসার দূরত্বানুযায়ী শব্দ-তরঙ্গ ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়। এক্ষণে স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে, শব্দের ঘাত প্রতিঘাত আছে। নীতি শাস্ত্রে শাস্ত্রকারগণ দুর্ব্বাক্য বলিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। বাল্যকালে ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, কিন্তু এক্ষণে বুঝিতেছি অন্তকে দুর্ব্বাক্য কহিলে, তাহা নিক্ষিপ্ত ফুটবলের ন্যায় প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় হৃদয়কে আঘাত করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাদ্যযন্ত্র, মেঘ, রথ, প্রাণী বা অপ্রাণী যাহার যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, সমস্তই ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্ত স্বরের অন্তর্গত। গায়কগণ এই সপ্তস্বরের আদ্যক্ষর "স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি" লইয়া সঙ্ক্ষেপে স্বর সাধনা করেন। এই সপ্তস্বর আবার উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন ভেদে ত্রিবিধ। উদর হইতে ঐ সপ্তস্বর নির্গত হইলে, উদারা বা নিম্ন সপ্তক, কণ্ঠ হইতে নির্গত হইলে মুদারা বা মধ্য সপ্তক এবং মস্তক হইতে নির্গত হইলে, তারা বা উচ্চ সপ্তক নামে অভিহিত হয়। অতএব উচ্চ নিম্নাদি ভেদে ঐ সপ্তস্বর ২১ গ্রামে বিভক্ত।

আমরা যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, তাহা উদর, কণ্ঠ ও মস্তক হইতে নির্গত হয়। যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হউক, তাহা এই ২১ গ্রামের অন্তর্গত। বায়ুর আকর্ষণে শব্দ আকৃষ্ট হইয়া বায়ুর বিতাড়নে আকাশে বিস্তৃত হয়। এই বায়ু ও আকাশ আমাদিগের দেহ-যন্ত্রেও বিদ্যমান, তজ্জন্য শব্দ আকৃষ্ট ও উচ্চারিত হয়। যেমন সূর্য্যের তেজ আমাদিগের চক্ষে আছে বলিয়া সূর্য্যের তেজের সহিত চক্ষের তেজের ঘাত প্রতিঘাতে দর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তদ্রূপ বহির্জগতের বায়ু ও আকাশের সমধর্ম্মী বায়ু ও আকাশ আমাদিগের দেহে আছে বলিয়াই বাহিরের মহাশক্তির সহিত দেহের ক্ষুদ্র শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে আমরা কথা কহিতে ও শুনিতে পারি। সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীকে আকর্ষণ করে, ইহাই জগতের নিয়ম। এই সাধর্ম্ম্য গুণে ধর্ম্ম ধর্ম্মকে, অধর্ম্ম অধর্ম্মকে, পাপ পাপকে, পুণ্য পুণ্যকে আক-র্ষণ করে। পাপ পুণ্য এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পদার্থ বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব পদার্থও যে নিয়মের অধীন, পাপ পুণ্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মও সেই নিয়মের অধীন। এই সাধর্ম্ম্য গুণে দুইটি হারমোনিয়ম যন্ত্রে সুর দিলে একটির উদারার বা প্রথম সপ্তকের স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নির সহিত অপরটির উদারার বা প্রথম সপ্তকের স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি মিলিয়া যায়। সেইরূপ একটির মধ্য সপ্তকের

নি এবং একটির উচ্চ সপ্তকের স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নির সহিত অপরটির স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি মিলিয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, শব্দেরও সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য আছে। স ও ঋ উভয়ই শব্দ, কিন্তু "স" সুরের সহিত "ঋ" সুরের মিশ খায় না। আবার স ও স উভয়ই শব্দ, কিন্তু উদারার "স" সুরের সহিত মুদারার "স" সুর মিশ খায় না। এই সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য ও পদার্থতত্ত্বের আলোচনা করিলে মনে হয়, মিঃ এডিসনের কথিত যন্ত্র প্রস্তুত কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। বায়ুগুণ বহুল ও আকাশগুণ বহুল বা অগ্নিগুণ বহুল পদার্থের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। আমার মনে হয়, উদারা, মুদারা ও তারা অর্থাৎ নিম্ন সপ্তক, মধ্য সপ্তক ও উচ্চ সপ্তকের ২১ গ্রাম বা পরদা সমন্বিত যন্ত্র প্রস্তুত করিলে জগতের সমস্ত সুর তাহাতে ধ্বনিত হইতে পারে।

তান্ত্রিকের দুর্গাপূজা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল।

আগমনী।

কোটি জনমের কঠোর সাধনে
শুভ্র শরৎ উদিয়াছে মনে,
প্রশান্ত আজি প্রাণ;
নাহি বরষার প্রবল পীড়ন,
শ্বেত শশীকলা কমদরশন,
চিদাকাশে ভাসমান।
থামিয়াছে ঘোর অশনিনিনাদ,
না তুলে হৃদয়ে হরষ বিষাদ
কল-কল্লোল ঘোর;
ইন্দ্রিয়-ফণী বিবরে লুকায়,
কাশ কহ্লার কুমুদ মালায়

আজি মা, জীবনে এল শুভ দিন,
কামনা কালিকা না করে মলিন,
এ মম মরম আর;
এস তবে তুমি হে মোর জননী!
পূজিব তোমারে শিব-সোহাগিনি!
গাঁথিয়া ভকতি হার।

বোধন।

শুক্লা ষষ্ঠী—কি শুভ লগন!
আজি মা তোমাকে করিব বোধন
প্রবুদ্ধ প্রাণে মম;
মুদিয়াছি তাই নয়ন আমার,
রুধিয়াছি তাই চিত্ত-দুয়ার

বহির্জগৎ বাহিরেতে রয়,
অন্তরে তুমি হও মা উদয়
চিন্ময় রূপ ধরি ;
নিম্ন-কুহরে রাখ মা চরণ,
উঠুক ফুটিয়া ঊর্দ্ধ-বদন,
শ্রীপদ-পরশে মরি।

শুভ্র সরোজ, নাভি দশদল
বিকশিত করি' চল চঞ্চল
হৃদয়-পদ্ম পরে ;
সেথা দশভুজা জ্যোতির মূরতি,
কুমার, গণেশ, কমলা, ভারতী,
হেরিব নয়ন ভরে' !

পূজা।

শুভ সপ্তমী পূজা সমাধান,
বিষয়াসক্তি দিনু বলিদান,
বলি দিনু মমকার ;
ফেলি বহুরূপ অয়ি বহু-রূপা !
এস কণ্ঠে হংসী-স্বরূপা,
গুঞ্জরি ওঙ্কার।—
মহা অষ্টমী বাসরে জননী !
শুনি ও নীরব ওঙ্কার-ধ্বনি
খুলিল ললাট-দ্বার।
ফুটিল অমনি দ্বি-দল কমল,
জ্বরে চিৎ-শিখা জ্বল জ্বল জ্বল,
ভেদ-ভাব অপসার।—
তার পর মাগো নবমীর রাতে
বিলস' পরম হংসের সাথে
সহস্রদলে মম ;
সেথা 'আমি-তুমি-কাল-রূপ-নাম'
কিছু নাহি রয়, ঝরে অবিরাম
আনন্দ অনুপম।

বিজয়া।

তার পর মাগো বিজয়াদশমী,
পরিহরি' মহা সপ্তম ভূমি,
এস মা নিম্ন দেশে ;
রসনা-ক্ষরিত অমৃত ঢালিয়া
হ্লাদিনী-লহরে নাচিয়া নাচিয়া
মূলাধারে নামো শেষে।
সেথা মায়াময়ি ! ঘুমাও জননি !—
বাহ্য চেতনা ফিরে মা অমনি,
নয়ন খুলিয়া চাই ;
দেখি—তারা তুমি করেছ পয়ান,
তবু আনন্দ-মগন পরাণ,
স্বপন-আভাষ পাই।
যেন মনে হয়—আকাশ সাগর,
নদ, নদী, হ্রদ, জঙ্গমাচর,
সবার ভিতর তুমি !
বাহু পসারিয়া অমনি যে ধাই,
করি কোলাকুলি যারে কাছে পাই,
ফণীর অধর চুমি !

চতুর্দ্দশ প্রকরণম্।

শিষ্যেণ পুনরুচ্যতে।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসরণো হি সঃ॥ ১॥
ক্ক ধনানি ক্ক মিত্রাণি ক্ক মে বিষয়দস্যবঃ।
ক্ক শাস্ত্রং ক্ক চ বিজ্ঞানং যদা মে গলিতা স্পৃহা॥ ২॥
বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তয়ে মম॥ ৩॥
অন্তর্ব্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে॥ ৪॥

ইতি শান্তিচতুষ্কং নাম চতুর্দ্দশপ্রকরণম্।

যিনি স্বভাবতঃ শূন্য চিত্ত হইয়াও, ভ্রম বশতঃ সংসার চিন্তা রত হন, তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় (পরে) সংসার বাসনা বিরহিত হন।—স্বপ্নে, সুখ বিভীষিকাদি দর্শন করত, নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যেমন স্বপ্নের অনিত্যতা সহজেই অনুভূত হয়, ঐরূপ, লোকের জ্ঞানোদয় হইয়া সংসারও অনিত্য নিশ্চয় হয়। ১।

আমি বাসনাশূন্য হইয়াছি, আমার নিকট ধন, বন্ধু, বিষয়রূপ দস্যুসমূহ, শাস্ত্র, ও বিজ্ঞান, এসকল কোথা?। ২।

দ্রষ্টাপুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হওয়ায়, আমার নৈরাশ্য, (কর্ম্মরূপ) বন্ধন, মোক্ষ বা মুক্তির জন্যও চিন্তা নাই। ৩।

যিনি মনে মনে বিকল্প রহিত অথচ বাহ্যে স্বচ্ছন্দবিহারী, সেইরূপ ব্যক্তিগণ ভ্রান্তের ন্যায় বিভিন্ন অবস্থাযুক্ত হইলেও, তত্তৎ পরিজ্ঞানে সমর্থ।—স্থির অথচ নির্লিপ্ত হইলে, অজ্ঞানী লিপ্ত সংসারীর ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিয়াও, কার্য্যের গতি এবং হেতু ফলাদি স্পষ্ট জানিতে পারিবে। কিন্তু চঞ্চল অথবা স্বয়ং লিপ্ত হইলে, আর সেরূপ হয় না। বাহ্যিক কার্য্য জ্ঞানী ও অজ্ঞানের সমান হইলেও জ্ঞানী নির্লিপ্ত ও তত্ত্বদর্শী। ৪।

পঞ্চদশ প্রকরণম্।

গুরুণোচ্যতে।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥ ১ ॥
মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২ ॥

সত্ত্বগুণপ্রধানা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন তেমন উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই অভীষ্ট লাভ করেন, অপরে আজীবন শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়াও মোহাচ্ছন্ন থাকেন।—অদৃষ্ট দোষে অনেকেই উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ অথবা সন্দেহ বশতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান। সাধু দেখিলেই দুইটা উপদেশ গ্রহণ করা চাই, কিন্তু ভিতরের কথা বুঝিবার চেষ্টা, বা সেই মত কার্য্য করা হয় না; যাঁহাদের বুদ্ধি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সদুপদেশের মর্ম্ম জানিয়া জ্ঞান লাভ করত শান্ত থাকেন। ১।

বিষয়ে বীতস্পৃহাই মুক্তি, এবং বিষয়ে আসক্তিই বন্ধন, ইহাই বিজ্ঞান, ইহা সার জানিয়া যথেচ্ছা আচরণ কর—এই সামান্য একটি কথার ভিতর সমস্ত যোগ, জ্ঞান, মুক্তি সমস্তই রহিয়াছে; কিন্তু একথা কে কাহাকে বুঝায়, এবং কেই বা বুঝে? গুণময়ী প্রকৃতি অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সহজ কথা বুঝিতে দেয় কই? আর বুঝিলেই বা চলে কই? বিষয়স্পৃহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। যত সুখের আশা ঐ মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যেই যে নিহিত। এমন গোলক ধাঁধাঁ ত আর কিছু নাই। কাজেই বিষয়স্পৃহা বজায় রাখিয়া নানারূপ আড়ম্বরের প্রয়োজন। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। বায়ু জল প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। সর্ব্বত্র বায়ু বিরাজমান, জলও সহজ প্রাপ্য। শিশুর আহার মাতৃশরীরে থাকে। অথচ তোমার ধর্ম্ম মোক্ষাদি যদি তদপেক্ষাও প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাহা তদপেক্ষাও সুলভ নিশ্চয়, নহিলে কখনই প্রয়োজনীয় নহে। এই সহজ কথাটি স্মরণ রাখিয়া, যদি মুমুক্ষু হও, তবে বিষয় স্পৃহা ত্যাগ কর, নচেৎ মুক্তি কামনা করিও না। ২।

বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকং জড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩ ॥
নত্বংদেহোনতেদেহোভোক্তাকর্ত্তানবাভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥ ৪ ॥
রাগদ্বেষৌ মনোধর্ম্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্ব্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্ব্বিকারঃসুখংচর ॥ ৫ ॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্ম্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
তৎ ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥
শ্রদ্ধৎস্ব তাত শ্রদ্ধৎস্ব নাত্র মোহং কুরু প্রভো।
জ্ঞানস্বরূপোভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

এই তত্ত্ব জ্ঞানে বাগ্মী ব্যক্তিকে মূক, প্রাজ্ঞকে জড় এবং মহোদ্যোগীকেও অলস করে, এই নিমিত্তই মুমুক্ষু লোকে বিষয়তৃষ্ণা হইতে বিরত হয়। ৩।

তুমি দেহ নও, তোমার দেহ নাই, তুমি ভোক্তা বা কর্ত্তা নহ, তুমি দ্রষ্টা ও চিদ্রূপ, অতএব নিরপেক্ষ হইয়া সুখে বিচরণ কর। ৪।

(সুখানুশয়ী) অনুরাগ ও (দুঃখানুশয়ী) দ্বেষ মনের ধর্ম্ম কিন্তু এই মন কদাচই তোমার নহে; তুমি বিকল্প ও বিকার শূন্য, চৈতন্যস্বরূপ, অতএব সুখে বিচরণ কর। ৫।

আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতও আপনাতেই জানিয়া মমত্ব ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হও।—সমস্তই আমি এবং আমাতে স্থিত, এই জ্ঞান জন্মিলে অহঙ্কার ও মমত্ব অর্থাৎ আমি এবং আমার এই জ্ঞান থাকা অসম্ভব, এবং তাহাতেই সুখ। ৬।

সাগরে তরঙ্গবৎ যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, তুমিই নিঃসন্দেহ সেই (আত্মা), অতএব চিন্ময় এবং ক্লেশশূন্য হও। ৭।

তুমি এবিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হও, মোহজনিত ভ্রান্তি ত্যাগ কর; তুমিই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও জ্ঞান ও আত্মা স্বরূপ ভগবান্। ৮।

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ।
আত্মা নগন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥ ৯ ॥
দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক্ব বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥ ১০ ॥
ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ ॥ ১১ ॥
তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ১২ ॥
একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতঃ কর্ম কুতোঽহঙ্কারএব চ ॥ ১৩ ॥
যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথগ্ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৪ ॥

সত্ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট দেহের অবস্থান, নাশ ও উৎপত্তি আছে। কিন্তু আত্মার নাশ বা বিকাশ নাই, তবে তজ্জন্য কেন অনুতাপ করিতেছ? ৯।

এই দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্তই থাকুক আর অদ্যই বিনষ্ট হউক, চিন্মাত্ররূপী তোমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ১০।

অনন্ত মহাসাগর সদৃশ তোমাতে বিশ্বরূপ ঊর্ম্মিমালা স্বতঃ উত্থিত বা লয় প্রাপ্ত হইলেও, তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ১১।

বৎস! তুমি চৈতন্য স্বরূপ, তোমা হইতে এই বিশ্বের প্রভেদ নাই, অতএব কি নিমিত্ত কাহারও কোনও বিষয়ে হেয় বা উপাদেয় জ্ঞান হইবে?—সকলেই এই এক আত্মা, সুতরাং ইহার মধ্যে জনগত, হেতুগত, বা বিষয়গত পার্থক্য অসম্ভব। ১২।

তুমি এক, অক্ষয়, শান্ত, জ্ঞানময়, ব্যোম-স্বরূপ, এবং নির্ম্মল; তোমার জন্মই বা কি? কর্ম্মই বা কোথায়? এবং অহঙ্কারই বা কিসের? ১৩।

স্বর্ণ নির্ম্মিত কটক নূপুরাদি বিভিন্ন অলঙ্কার সমূহ যেমন স্বর্ণ মাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্ততেই তুমি মাত্র বিরা-

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসংকল্পঃ সুখীভব ॥ ১৫ ॥
তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারীচকশ্চন ॥ ১৬ ॥
ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বাসনঃস্ফূর্ত্তিমাত্রোনকিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ১৭ ॥
এক এব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
নতে বন্ধোঽস্তি মোক্ষোবাকৃতকৃত্যঃসুখংচর ॥ ১৮ ॥
মা সংকল্প বিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥ ১৯ ॥

এই আমি এবং উহা আমি নহি এই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ও সমস্ত আত্মময় নিশ্চয় করত কল্পনাবিহীন হইয়া সুখী হও। ১৫।

প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি একমাত্র হইলেও তোমারই অজ্ঞানতা বশতঃ এই বিশ্বরূপ ভ্রম জ্ঞান হইতেছে। তোমা ভিন্ন অন্য সংসারী, এবং নিঃসংসারী আর কেহ নাই।—সংসারে একমাত্র তুমি আছ, সুতরাং তুমিই একমাত্র সংসারী; অথচ তুমি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, তোমার সংসারাদি কিছুই নাই। ১৬।

এই বিশ্ব কিছুই নহে, ভ্রমমাত্র, ইহা নিশ্চয়কারী ব্যক্তি বাসনাশূন্য এবং স্ফুর্ত্তিমাত্র হইয়া কিছুই নাই জ্ঞানে শান্ত থাকেন। ১৭।

এই ভব সাগরে একমাত্র (আত্মাই) ছিল, আছে, এবং থাকিবে; (সেই আত্মা স্বরূপ) তোমার বন্ধন মোচন নাই, সুতরাং কৃতকৃত্য হইয়া সুখে বিচরণ কর। ১৮।

হে চিন্ময়, সংকল্প বা বিকল্প হেতু মনকে ক্ষুব্ধ করিও না; আনন্দস্বরূপ

ত্যজ ধ্যানং হি সর্ব্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্ত এবাসি কিং বিমৃষ্য করিষ্যসি ॥ ২০ ॥
ইতি তত্ত্বোপদেশবিংশকং নাম পঞ্চদশপ্রকরণম্।

—•—

ষোড়শ প্রকরণম্।

পুনর্গুরুরাহ।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১ ॥

সকল বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ কর, হৃদয়ে কোনও রূপ ভাবনাকে স্থান দিও না; তুমি আত্মাস্বরূপ এবং মুক্ত, তুমি চিন্তা করিয়া কি করিবে? ২০।

—*—

তুমি যতই বহুবিধ শাস্ত্রাদি পাঠ বা শ্রবণ করনা কেন, ঐ সকল বিষয় একেবারে বিস্মৃত না হইতে পারিলে, কখনই সুখী হইতে পারিবে না।—শাস্ত্র পাঠাদিতে শান্তি হয় না। উপরতিই শান্তির মূল। সকল বিস্মৃত না হইতে পারিলে সুখী হইতে পারিবে না। কেন? যেহেতু স্মৃতিই সকল সুখ, দুঃখ, ভোগাশক্তি বা বিরক্তির হেতু। আত্মীয় স্বজন বিয়োগের স্মৃতিই দুঃখদায়ক। পক্ষান্তরে, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার হেতুও স্মৃতি। কোনও রূপ উপাদেয় পদার্থ ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইবার সময় তাহার সুন্দর আস্বাদনের কথা মনে না থাকিলে সে দ্রব্য আহার করিবার জন্য লালসা কেন হইবে? যাহা ভোগ্য বস্তু তাহার ভোগে এইরূপ সুখ লাভ করিব, এই জ্ঞান পূর্ব্ব স্মৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। সেই স্মৃতি না থাকিলে, কোন বস্তুর হেয়োপাদেয়তা থাকে না। অনুরাগ সুখানুশয়ী ও বিদ্বেষ দুঃখানুশয়ী। কোন্ বস্তু সুখদায়ক, বা কোন্ বস্তু দুঃখদায়ক, তাহার জ্ঞান স্মৃতি মূলক। দুঃখদায়ক বস্তুর প্রাপ্তি এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টাদি, ও সুখকর বস্তুর অপ্রাপ্তি বা তাহা প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টাদি সমস্তই দুঃখকর। সুতরাং মূলে সমস্ত দুঃখের হেতুই স্মৃতি। এই স্মৃতি পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মনে উদিত হইতে না দেওয়া ব্যতীত শান্তি লাভ অসম্ভব। স্মৃতি কি? "অনুভূত বিষয়া-

ভোগং কর্ম্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্ব্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥ ২ ॥
আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেনধন্যঃপ্রাপ্নোতিনির্ব্বৃতিম্ ॥ ৩ ॥
ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

হওয়াই স্মৃতি। সুতরাং অনুভব কালে চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট না হইলে, স্মরণ না থাকিবারই কথা। memory is attention, অন্য কার্য্যে লিপ্ত আছ, অথচ তোমার নিকট দিয়া একজন চলিয়া গেল, তোমার চক্ষে পড়িল, অথচ পর মুহূর্ত্তেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, বহু বৎসর পূর্ব্বের এক দিনের কোনও একটা কথা তোমার স্মরণ আছে, কেননা সেই ঘটনার সময় তোমার চিত্ত সে বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, যে উদাসীন ভাবে ভোগ করিলে স্মৃতি থাকে না। কিন্তু সকল সময় সে ভাব আয়ত্ত হয় না। তখন, ভোগ্য বস্তুর পূর্ব্ব স্মৃতিকে মনে স্থান না দেওয়াই কর্ত্তব্য। এইরূপে স্মৃতি ত্যাগ হইতে পারে। ফলকথা, সর্ব্বত্র উদাসীন ভাবই অবলম্বনীয়। সর্ব্বত্র অনভিস্নেহ, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে অনুরাগ বা বিদ্বেষ বিহীন হওয়াই শান্তিলাভের উপায় এবং জ্ঞানের লক্ষণ। ১।

হে বিজ্ঞ! যখন তোমার মন সমস্ত আশা শূন্য হইবে, তখন তুমি ভোগই কর, আর কর্ম্মই কর, অথবা সমাধিস্থই হও, সকলই শোভা পাইবে। ২।

কর্ম্মফলাসক্তিযুক্ত যত্নই লোকের দুঃখ, ইহা কেহই জানে না; যিনি এই উপদেশ মাত্র পাইয়া শান্তি লাভ করেন, তিনিই ধন্য। ৩।

চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলনের চেষ্টা করিতেও যিনি খিন্ন হন, সেই অলসশ্রেষ্ঠ ভিন্ন অপর কেহ সুখী নহে।—চেষ্টা বা উদ্যোগের সহিত কোন কর্ম্মই করিবে না। ইহা নূতন প্রকারের আলস্য, এ আলস্যে নিদ্রাতেও যেমন বিরক্তি পরিশ্রমেও তদ্রূপ, প্রবৃত্তিতেও অনাস্থা অপ্রবৃত্তিতেও তাহাই। দেহধারীকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥ ৫ ॥
বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥
হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈনির্ব্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ৭ ॥
প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে ॥ ৯ ॥

আমি ইহা করিয়াছি এবং ইহা করি নাই, যখন চিত্ত এই দ্বৈত জ্ঞান হইতে মুক্ত হইবে, তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি নিরপেক্ষ হইবে।—মুক্ত ব্যক্তির নিকট এ সকলের প্রভেদ কি? তাহার, ধর্ম্মার্থ—কাম দূরে থাকুক, মোক্ষের প্রতিও দৃষ্টি নাই; যে বদ্ধ, মোক্ষ তাহারই বাঞ্ছনীয়, মুক্তের নহে। ৫।

যিনি বিষয়বিদ্বেষ্টা তিনি বিদ্বেষ যুক্ত, আর যিনি অনুরক্ত তিনি অনুরাগ যুক্ত; কিন্তু যিনি আকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগেচ্ছা শূন্য, তিনিই প্রকৃত রাগ দ্বেষ বিহীন। ৬।

যত দিন কিছু মাত্র স্পৃহা থাকিবে, তত দিন নির্ব্বিচারাবস্থাযুক্ত লোকেরও হেয় ও উপাদেয় জ্ঞান থাকিবে; এবং তাহাই সংসারতরুর মূল। ৭।

প্রবৃত্তি হইতে অনুরাগ এবং নিবৃত্তি হইতে দ্বেষ জন্মে; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই দ্বন্দ্ব জ্ঞানই পরিত্যাগ করত বালকের ন্যায় যথাবৎ অবস্থান করেন।—অনেকের বিবেচনায় সংসার পরিত্যাগ করিলেই মুক্তি হইল, পুত্র কলত্রই বন্ধন। কিন্তু তাহা নহে, বন্ধন মনে। বিষয়বিদ্বেষও বন্ধন, পরে বলিতেছেন। ৮।

যিনি দুঃখ পরিহারের জন্য সংসার ত্যাগে সঙ্কল্প করেন, তিনি সুখানুরাগী, সুতরাং তিনিও বদ্ধ, কিন্তু যিনি বীতরাগ তাঁহার দুঃখ নাই, সুতরাং তিনি

ভাব্‌বার গল্প।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

আজ সে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। শ্রাবণ মাস অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে। নদ নদী হ্রদ সরোবর উথলিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। শিখিগণ নৃত্য করুক আর না করুক, মধ্যে মধ্যে কেকারব করিতেছে। কেতকী, কুমুদ, কহ্লার কিছু কিছু অবশ্যই ফুটিয়াছে। দু একটী দয়েলও মাঝে মাঝে শিস্ দিতেছে। প্রকৃতি সুন্দরী কেমন এক মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চারিদিক পরিপূর্ণ, মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। এমন সময় এই মহানগরীর উত্তরে অবস্থিত চারি পাঁচ ক্রোশ দূরের কোন গ্রাম হইতে কথা কহিতে কহিতে দুটী বালক কলিকাতা অভিমুখে দ্রুত আসিতেছে। হস্তে কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক সযত্নে বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা আছে। খালি পা, খালি মাথা, সামান্য বসন ও এক একটী সামান্য জামা গাত্রে আছে মাত্র। বালক দুটী এক একখানি বড় মানকচু পাতা আতপত্র বা বারিপত্র রূপে মস্তকে ঢাকা দিয়া কলিকাতার কোনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ আসিতেছে। বালক দুটী প্রায় সমবয়স্ক ও প্রায় একই রকম। বাহিরে যেমন এক রকম দেখিতে, অন্তরেও বোধ হয় ইহারা এক প্রকৃতি বিশিষ্ট। একটীর নাম শশিশেখর আর একটীর নাম বীরেন্দ্রনাথ। পথে তাহারা পরস্পরে এমনই আলাপে মগ্ন যে পথ ভ্রমণের শ্রম ও বৃষ্টিপাতের দরুণ ভিজিয়া যাওয়ার কোন কষ্টই তাহারা উপলব্ধি করিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। দুজনেরই মুখ বেশ প্রফুল্ল অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। দেখিলেই বোধ হয় দুজনেই মেধাবী ও বিদ্যালাভে বিশেষ যত্নপরায়ন। বীরেন্দ্র বলিল, "ভাই, বিদ্যালাভার্থ আমরা ত সবিশেষ যত্ন করিতেছি এবং কিছু কিছু কৃতিত্বও লাভ করিতেছি; কিন্তু আমাদের বিদ্যা-লাভের উদ্দেশ্য কি? এত যে যত্ন, এত যে আয়াস, ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল কথঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের তুষ্টি সাধন ও নানারূপ ভোগাদি দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করা? শশিশেখর বলিল না ভাই, ইহাই ঠিক নহে; অথচ, তাহাই কথঞ্চিত ঠিক বটে। দেখ বিদ্যালাভ করিয়া আমরা যদি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা শুধু যে কেবল পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণাদি করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি করি তাহা নহে; তাহাদিগকে

প্রতিবাসীবর্গের প্রতিও আমাদের নানা কর্ত্তব্য আছে, অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন প্রতিবাসীগণের অভাব অভিযোগাদি মোচনে চেষ্টা করিতে পারি, দেশের ও দশের কল্যাণকর নানা হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আপন আপন সমাজের বহুতর উন্নতি সাধন করিতে পারি, আর তাহা ছাড়া বিদ্যার অর্জ্জন করাই মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান অভাব মোচনের উপায়। অজ্ঞানতা বা মুর্খতা নানা কুফলের প্রসূতি। সেই জন্য বিদ্যা-শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বীরেন্দ্র বলিল, শশি, তুমি যাহা বলিলে, এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু উহার আর একটী বিপরীত দিকও আছে। দেখ. বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সকলেই যে প্রভূত ধন-লাভে সমর্থ হয় এমত নহে বা সকলেই যে ঐরূপে ধনবান হইয়া অকাতরে উহা বিতরণে সক্ষম হয় এমনও নহে। আরও দেখ, অনেকেই জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানাভিমানী হইয়া উঠে এবং প্রতিবাসীগণের বা সাধারণ দশজনের উপকার করা দূরে থাক—তাহাদিগকে মুর্খ জ্ঞানে তাহাদের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে চায় না। কেহ কেহ বা এমন নাম-যশের ভিখারী হইয়া উঠে যে, কি অর্থ দ্বারা কি জ্ঞান বা বিদ্যা দান দ্বারা যেখানে যথার্থ নিরন্ন স্বজন বা স্বদেশবাসীর উপকার হইবে বা অজ্ঞ প্রতিবাসীসন্তান বা গ্রামস্থ মুর্খ ভাই গুলির শিক্ষার উপায় হইবে তাহা না করিয়া এমন স্থানে অর্থদান করিলেন যেখানে তাহার তত অভাব ছিল না বা এমন অনাবশ্যক নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখিলেন বা বক্তৃতা দিলেন যাহার বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। এইরূপ নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে তাহারা বিদ্যালয়ে আসিয়া পঁহুছিল। পাঠক আপনি কি মনে করিতেছেন? আপনি বোধ হয় ভাবিতেছেন যে, যে বালকগণ এই সকল উচ্চ কথার আলোচনা করে, তাহারা কখনই অল্পবয়স্ক নহে ও তাহাদের পক্ষে খালি পায়ে, কচুপাতা মাথায় দিয়া ও ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পুস্তক জড়াইয়া পথ চলিতে চলিতে বিদ্যালয়ে যাওয়া কতকটা যেন কেমন কেমন দেখায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ইহা একটী প্রকৃত ঘটনা। যদ্যপি সন্দেহ হয় দু'একজন বৃদ্ধের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ইহার সত্যাসত্য বা এইরূপ সম্ভব বা অসম্ভব কিনা জানিয়া লউন।

উপরিউক্ত ঘটনার পর প্রায় পনের বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ বালক দুটী উপস্থিত কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে একবার সন্ধান লওয়া

এখন ডাক্তারি করে। এম, বি, পাশ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব-পরিচয় কিছু জানা আবশ্যক। শশিশেখর অতি শৈশবেই পিতৃহীন হয়েন। তাহারা তিন সহোদর। বড় শ্যামাচরণ পিতার মৃত্যুর পর পিতার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যাদি দেখিতেন ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণাদির ভার তাঁহারই উপর এক রকম ন্যস্ত ছিল। জানবাজারে একখানি টেবিল, চেয়ার আলমারী প্রভৃতির দোকান ও টালিগঞ্জে একখানি চাউলের আড়ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অতি অল্প দিনেই এই দুইটী কারবারই এক রকম বন্ধ হইয়া আসিল। শ্যামাচরণ কুসঙ্গে পড়িয়া বড় একটা হিসাব পত্র দেখিতেন না. এমন কি দোকানে ও আড়তে যাওয়া আসাও বন্ধ করিয়া দিলেন। কর্ম্ম-চারিগণের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসা চালাইলে আজকাল যেমন হয়, ইহাদের কারবারের অবস্থাও প্রায় সেই রকম হইল। প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী বা বিশ্বাসী ভৃত্য একালে বিরল। চুরি চামারি ও লোকসান রীতিমত হইল। কিছুদিন পরে ব্যবসা উঠিয়া গেল। শ্যামাচরণ তখনও মদে ও আনুসঙ্গিক নানা আপাতঃ মধুর আমোদে একবারে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। সংসার চলা দায় হইয়া উঠিয়াছে। কিছু কিছু ঋণও আরম্ভ হইল। ক্রমে এটা সেটা বিক্রয় হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও চৈতন্য নাই। মধ্যম ভ্রাতা রামচরণ সেও কতকটা ঐ ধরণের ;—আয় ব্যয় বুঝে না। তাহার মাঝে মাঝে কিছু পাইলেই হইল। মাঝে মাঝে দাদার নিকট কিছু কিছু অর্থ প্রার্থনা করে, বড় ভাই যেমন করিয়া হউক তাহা সঞ্চয় করিয়া দেয়, সে বিনা বাক্যে তাহা গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। ছোট শশীশেখর তখনও পড়িতেছে। এফ. এ, পাশ করিয়া Medical College এ অধ্যয়ন করে। যদিও সে কতকটা বুঝে বা শুনিতে পায়, তথাচ বড় ভাইএর বিরুদ্ধে কোন কথা কওয়া দূরে থাক, সে এ সকল কথা আদৌ মনে স্থান দেয় না। জানে দাদা কর্ত্তা, তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন, তাঁহার কার্য্যাদির আলোচনা করা আমার উচিৎ নহে ও আবশ্যকও নাই। ক্রমে শ্যামাচরণ একেবারে অকর্ম্মন্য হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় বাস্তু ভিটার সংলগ্ন জমি ও বাগান বন্ধক দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন ও পূর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ মাত্রায় আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে শশীশেখর মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতে করিতে বিবাহ করেন ও প্রত্যহ বাড়ী হইতে কলেজে যাওয়ার অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় সকলের

পরে শশীশেখর যখন এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন শ্যামাচরণ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়া বাস্তু ভিটাটী পর্য্যন্তও বন্ধক দিয়াছেন ও পূর্ব্ব কথিত ভূমিখণ্ড বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, শশীশেখর ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া শশীশেখর ডাক্তারি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিনয় নম্র গুণে ও মধুর ব্যবহারে গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অল্প দিনেই তিনি দুদশ টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন ও একে একে বড় ভাইয়ের গুণাবলীর পরিচয় পাইলেন। উপস্থিত বাস্তু ভিটাটী উদ্ধার করিয়া লইলেন ও যাহার নিকট আবাস-বাটীর সংলগ্ন বাগানখানি বিক্রীত হইয়াছিল তাঁহাকে নানা অনুরোধ করিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইলেন। বড় ভাইকে কোন অনুযোগ করা দূরে থাক একটী কথাও কহিলেন না। বড় ভাই তখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সামান্য চাকরীর অনুসন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যাহা হউক শশীশেখর উন্নতি করিয়া স্বগ্রামে বংশের পূর্ব্ব মর্য্যাদা বজায় রাখিতে সক্ষম হইলেও সর্ব্বদাই যেন কেমন বিষণ্ন ভাবে জীবনযাপন করিতেন। কেহই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। শশীশেখর কি ভাবেন জানেন? শশীশেখর ভাবেন বিদ্যা অর্জ্জনও করিলাম, বংশের মুখোজ্জ্বলও হইল; অর্থের প্রচুর সমাবেশ না হউক অন্ততঃ সংসারের কোনও অভাব নাই। বাড়ী ঘর, বাগান বাগিচা, গাড়ী ঘোড়া সকলইত এক রকম চলিতেছে। পূজাদি ক্রিয়াকলাপও ত মধ্যে মধ্যে হইতেছে। কিন্তু মনে শান্তি নাই কেন? স্ত্রী পুত্র, বেশী না হউক কিছু ধন সঞ্চিত আছে তবে অভাব কিসের? কিজন্য মন ম্রিয়মান, শান্তিহীন? আচ্ছা পাঠক, শশীশেখর এরূপ ভাবিতে থাকুন আমরা ইতিমধ্যে একবার বীরেন্দ্রনাথের সংবাদ লইয়া আসি আসুন।

বীরেন্দ্রনাথও প্রভূত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার পিতা ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া অল্পকালের মধ্যেই ধনবান হন। তাহাদের কোনও অভাব ছিল না। বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনের একত্র সমাবেশ। বীরেন্দ্রনাথ বাণীর বরপুত্র মালক্ষ্মীও অকস্থ। দুজনেই তাহাকে সমান কৃপা করিয়াছে। বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরমাসুন্দরী ভার্য্যা একটী পুত্ররত্ন উপহার দিয়াছে। এমন সময় এক দিন পিতা, মাতা বা ভার্য্যা কাহাকেও কিছু না বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে কেহই কিছু বলিতে পারেন না। ধনে মানে, বিদ্যা বুদ্ধিতে গ্রামে বীরেন্দ্রনাথের কেহই

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। দয়া দাক্ষিণ্যাদি নানা গুণে গুণী ও জ্ঞানী হইয়া বীরেন্দ্রনাথ গ্রামস্থ সকলকে কি যে, বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা কেহ বলিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার নাম গ্রামের গৃহে গৃহে প্রত্যহ সুখ্যাতির সহিত ধ্বনিত হইত। আর্ত্তের সেবায়, গৃহহীনের গৃহ-সংগ্রহে, পাঠার্থীকে পুস্তক দানে ও গ্রামস্থ নানা অভাব অভিযোগাদি মোচনে বীরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই সমুৎসুক। তাহার ন্যায় পরদুঃখকাতর, পরোপকারের জন্য উৎসর্গিকৃত-জীবন আর কেহই ছিল না। তাহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে গ্রামস্থ লোক যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। পিতা মাতা ভার্য্যা বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহার জন্য, বিষণ্ণ ও বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে তাহার আলোচনা করিতেন। সতী, পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী একরূপ পাগলিনীর ন্যায় দিন অতিবাহিত করিতে ছিলেন। গ্রামস্থ আপামর সাধারণ সকলেই বলিত,—আহা এমন সোণার কমল ফেলিয়া রাখিয়া গুণী ও জ্ঞানী হইয়া বীরেন্দ্রনাথ কি দুঃখে সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের শশীশেখরও এই পরম বান্ধব রত্নকে এইরূপে হারাইয়া সদাই বিশন্ন মনে সংসারের নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিতেন ও আপনার অবস্থার সহিত বীরেন্দ্রনাথের অবস্থার তুলনায় আলোচনা করিতেন।

এইরূপে প্রায় দশ বৎসর কাল অতীত হইল। শশীশেখর স্বীয় আবাস বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপরিস্থিত নিজকৃত নানা তরুলতা পরিপূর্ণ ও সুন্দর পুষ্করিণী সুশোভিত উদ্যান বাটীতে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন;—ভগবান কি? মানুষ কি? ভগবানে ও মানুষে কি সম্বন্ধ? মানুষ ভগবানকে চায় কেন? বীরেন্দ্রনাথ যে একদিন বলিয়াছিল যে, মানুষ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া ধনবান হইতে পারে বটে, কিন্তু ধন ত দরিদ্র সেবায় অকাতরে ব্যয় করিতে পারে না, বিদ্বান হয় বুদ্ধিমান হয়, কিন্তু কৈ অকাতরে বিদ্যা বুদ্ধি দান করিতেও সমর্থ হয় না। কথাটা তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু, এখন ত দেখিতেছি, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমিও ত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, পরিবারবর্গকে কিছু সুখে রাখা ব্যতীত, কৈ এমন কোনও কার্য্য একটীও করি নাই যাহাতে দেশের বা দশের কোনও উপকার হইতে পারে। তবে বোধ হয়, আমাদের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহা কিছুই নহে! কেন না কৈ স্বার্থ ব্যতীত পরার্থ ত কিছুই বুঝি নাই? আর স্বার্থ বুঝিয়াই বা শান্তি পাইয়াছি কৈ? বীরেন্দ্রনাথ বোধ হয় বাল্যেই এমন একটা তত্ত্বের আভাস পাইয়া-

ছিল যাহার প্রেরনায় সে অমন রূপবান, বিদ্বান, ও গুণবান হইয়াও প্রভূত ধন শালী পিতার একমাত্র সন্তান হইয়াও পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও প্রফুল্ল পারিজাতসম পুত্র ত্যাগ করিয়া, সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। আর আমি-ক্ত শত চিন্তা করিয়া, কত ভাঙ্গিয়া, কত গড়িয়া এই ক্ষুদ্র মনের শান্তি আনিতে পারিলাম না। ঈশ্বর চিন্তার অবকাশ নাই বা তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম নই। উক্তরূপে চিন্তা করিতে করিতে শশীশেখর অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে এক গৈরিক বস্ত্রে ও জামায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত অথচ মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতাপরা সন্ন্যাসী মূর্ত্তি তাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে, দেখিতে পাইল। শশীশেখর এই অদ্ভুদ্ আগন্তুকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। "ভাই শশী, একাকী নির্জ্জনে বাগানে বসিয়া কি করিতেছ,"—এই বলিয়া নবাগত সন্ন্যাসীবেশধারী ব্যক্তি তাহাকে সম্বোধন করিল। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া, পুরাতন বন্ধু—যাহার কথা এইমাত্র আলোচনা করিতেছিল ও যাহার কথা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়—সম্মুখে সন্ন্যাসী বেশে প্রিয়তম অপেক্ষা প্রিয়ভাবে সম্ভাষণ করিতেছে শুনিতে পাইয়া আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আনন্দে তাহার বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না। সন্ন্যাসী আবার বলিতেছে—"ভাই শশী নিরুত্তর কেন? এখানে বসিয়া কি করিতেছ?" তখন শশী বলিল—"ভাই বীরেন্দ্র, তোমার এই ধর্ম্মারুণ রাগরঞ্জিত প্রশান্ত বদন ও মনোহর বেশ দেখিয়া তোমায় দেবতা বলিয়া ভ্রম হইতেছে। তুমি কি আমাদের বাল্যখেলার সাথী বীরেন্দ্রনাথ।" বীরেন্দ্র বলিল—"তা'ছাড়া আর কি? তুমিও সেই শশী, আমিও সেই বীরেন্দ্র।" এই ভাবের দুই একটী কথার পর দুই বন্ধুতে সম্মুখস্থ কাষ্ঠাসনে বসিয়া নানা আলাপ করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র তাহার সহিত যতই সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার কথা জিজ্ঞাসা করে শশী ততই ব্যাকুল হইয়া উঠে ও বলে ভাই তুমি কি করিয়া এ পথে আসিলে, কি করিয়া মায়া ত্যাগ করিলে, কি করিয়া এমন সোণার সংসার ত্যাগ করিলে? বীরেন্দ্রনাথ বলিল, "তুমি তাহা শুনিয়া কি করিবে? আমার মন যাহা চাইত তোমার সোণার সংসার তাহা দিতে পারিত না, কাজে কাজেই, আমায় হীরকের খনির অনুসন্ধানে ফিরিতে হইল। ভাই, হীরকের অনুসন্ধান পাইলে কি কেহ স্বর্ণের জন্য লালায়িত হয়? আচ্ছা, ও সকল কথা এখন থাক তুমি কেমন আছ ও এখানে

আকাশ পাতাল যে প্রত্যহ কি ভাবি, তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না। একটা কথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার মনে বিন্দুমাত্রও শান্তি নাই। মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, কিছুতেই মনকে শান্ত করিয়া রাখিতে পারি না। সকলই আছে, অথচ যেন কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে মন যাহা যাহা অভিলাষ করিয়াছে,—এখন বোধ হয় তাহার কোনটারই অভাব নাই। তবুও মন কেন সুস্থির নয় বুঝি না। এক একবার মনে হয়, বোধ হয়, যাহা পাইলে মনের শান্তি হয় তাহা এ সংসারে নাই। তোমার মত সংসার ত্যাগ করিয়া ইহা অপেক্ষা কোনও সার বস্তুর সন্ধানে ফিরিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় স্ত্রী, পুত্র, বিলাস, বৈভব দৃঢ় বন্ধনে, মায়ার বন্ধনে, প্রেমের বন্ধনে, লোভের বন্ধনে, আমায় চারিদিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কি করিয়া এ বন্ধন ছেদন করি, এই মায়া এই প্রেম, ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে নিষ্ঠুর হইতে হয়! অকৃতজ্ঞ হইতে হয়! চারিদিকে তাহারা বেড়িয়া আছে। আমার আশ্রয়ে তাহারা লালিত পালিত হইতেছে এবং প্রতিদান স্বরূপ প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধনে আমায় বাঁধিয়াছে। এবন্ধন কি ছিন্ন করা যায়? এই সকল চিন্তায় আমার বিন্দু-মাত্র শান্তি নাই—আমার যে সে অশান্তি কি ভয়ানক যন্ত্রণা দায়ক তাহা আর আমি কি বুঝাইব। এই সকল কথা শশী বেশ উত্তেজিত ভাবে বলিতেছিল। এদিকে বীরেন্দ্রনাথ হঠাৎ এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দৌড়িয়া গিয়া সম্মুখস্থ একটী নারিকেল গাছকে বাহুবেষ্টন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল "ভাই শশী, আমার একি হইল? অকস্মাৎ এই বৃক্ষটী আমায় জড়াইয়া ধরিল কেন? তোমার উদ্যানে কোন যাদু আছে না কি? এ বৃক্ষটী মায়াবী না কি?" শশীশেখর, বন্ধুবরের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না কেবল বলিতে লাগিল, সেকি ভাই, তোমার একি হইল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ গাছটী তোমায় জড়াইয়া ধরিয়াছে! সেকি কথা, গাছে কি কখন মানুষকে জড়াইয়া ধরিতে পারে? কৈ দেখি, এই বলিয়া শশী বীরেন্দ্রনাথের নিকটে গিয়া বৃক্ষের অপর দিক হইতে বীরেন্দ্রের বেষ্টিত বাহু টানিয়া পৃথক করিয়া দিল ও বলিল, "ভাই, এই ত বৃক্ষের বন্ধন খুলিয়া গেল, গাছে কি, মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?" যেমন এই কথাটী বলা, অমনি বীরেন্দ্রনাথ সজোরে শশীশেখরের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিল,—"চল ভাই শশি, আমরা শান্তি নিকেতনে যাই, গাছেও মানুষকে বাঁধিয়া-রাখিতে পারে না, মানুষেও মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ গাছকে বাঁধে, মানুষ তাহা

মানুষ আপনাকে বদ্ধ মনে করে। আপনার সুখের জন্য সে আপনিই পাঁচজনকে জড়াইয়া থাকে, কিন্তু ভাবে, তাহাকে যেন সকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তোমায়ও কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই। আমি যেমন ইচ্ছা পূর্ব্বক এই গাছটী জড়াইয়া ধরিয়া ছিলাম, তুমিও ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব পরিপূরিত এই সংসার রূপ বিশাল বটবৃক্ষটী জড়াইয়া রহিয়াছ। তাহারা তোমায় বাঁধে নাই, তুমিই আত্মসুখের জন্য তাহাদিগকে জড়াইয়া রহিয়াছ, কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ নহে, এই জন্য তুমি শান্তি পাইতেছ না। প্রকৃত সুখ অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবে, যেখানে তুমি তাহা অন্বেষণ করিয়াছি সেখানে তাহা নাই। তুমি ভ্রম বশতঃ অনিত্যে নিত্যবস্তুর সন্ধান করিয়াছ। তাই তুমি ব্যর্থ মনোরথ। আইস, এই দণ্ডে তোমার সকল ভ্রম নিরসন কর। আইস নিত্য বস্তুর সন্ধানে আমরা বহির্গত হই।"

চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, বীরেন্দ্রনাথ তেমনই শশীশেখরকে আকর্ষণ করিল। শশীশেখর তদ্দণ্ডেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ঘটনাটী প্রকৃত, আখ্যায়িকাটী গল্প। কিন্তু অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

আর্য্য-মহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকশিতের পর।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,।

বিদ্যাভ্যাস।

কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থিত কালে যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিবেন। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়া রাখা ভাল। এখানে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিলে তাহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পিতামাতার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা অধিকতর যুক্তি সঙ্গত হইত, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া রাখিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি।

সকলের পক্ষেই অবিবাহিত জীবন বা ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাই বিদ্যাভ্যাসের প্রকৃত [illegible]

আবার যে জনক জননী গৌরী বা রোহিণী দানের সুফল কামনা করিয়া কন্যা সম্প্রদানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের কন্যার পক্ষে বিদ্যাভ্যাস নিতান্তই কঠিন হইয়া পড়ে। বিবাহিতাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার স্পষ্টরূপে কোনও নিষেধ না থাকিলেও স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মের যেরূপ বিধি, তাহাতে বিবাহিতার পক্ষে একরূপ—একরূপ কেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অষ্টম বর্ষে অথবা নবম বর্ষে কন্যার বিবাহের বিধির বিশেষ কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ সহজে নির্দ্দেশ করা সুদুর সাধ্য। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজঃস্বলা॥
প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈবচ।
এয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানমোহিতৈঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাংক্তেয়ঃ য বিপ্র বৃষলীপতিঃ॥"*

পরশর সংহিতা ৭।৬-৯।

(সাধারণ অর্থে বুঝিতে হইবে) অষ্টম বর্ষেই বিবাহ বিধান দিয়াছেন ;—

"বিবাহোহষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যাবাধ্য প্রশস্যতে।"

এই বিধানের অন্যথা করিলে পিতা প্রভৃতির নরকে গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, বাল্য বিবাহ পারিবারিক সুখের একমাত্র নিদান। বাল্যে বিবাহ দিলে স্বামী স্ত্রীর প্রণয় যেরূপ গাঢ় হয়, যৌবনের বিবাহ সেরূপ ফল প্রদান করিতেই পারে না, কন্যার ভালরূপ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে আপন একমাত্র আরাধ্য পতি দেবতায় অপ্রমেয় ভক্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়।

ভগবান মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "ত্রিংশ বর্ষীয় যুবক দ্বাদশ বর্ষীয় কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে। অথবা চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয় যুবক অষ্টম বর্ষীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে।" মনু ৯।৯।

* কলিতে ভগবান মনু ব্যতীত পরাশরের মতকেই অনেকে প্রবল বলিয়া মনে করেন। এ কারণে তাঁহার মতই উদ্ধৃত হইল। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও পরাশরের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান মনুর এইরূপে উভয় পক্ষের বয়োনির্দ্ধারনের ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, বিবাহের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাকে লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রানুশীলন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ৪৯ অনুশাসনে ইহার সার্থকতা কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

সংহিতাকারগণ কন্যার বিবাহ কাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কেহ অষ্টম বর্ষে, কেহ পাত্র বিশেষে দ্বাদশ বর্ষেও বিবাহের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুর প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম শাস্ত্রেই এই বিধি নিষেধ ও বাদ প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সর্ব্বত্র শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সহজ হইয়া উঠে না। অনুকূল তর্কদ্বারা এ সমস্তের যতদূর সমাধান হইতে পারে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। হয়ত একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার আদেশ করিলেন দক্ষিণ মুখে যাইতে হইবে, অন্য জনের আদেশ হইল উত্তর মুখে যাইতে হইবে। এস্থলে কোনও নিষেধ না থাকিলে একটা স্পষ্ট অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং এখানে কতকটা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অন্ধভাবে কাহারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহাতে আবার ধর্ম্ম হানি হয়, ইহাও কাহারও কাহারও মত :—

"যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

ধর্ম্মশাস্ত্রে কোনও স্থলে বিরোধ ঘটিলে যুক্তি খাটাইয়া ভাল মন্দ বিচার করা কর্ত্তব্য। যে বিধি যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইবে তাহাই গ্রহণীয় ;—

ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধেতু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যে সমস্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন সে সমস্ত বিধি কেবল তাঁহাদের অনুমানের উপর অবস্থিত ইহা অতি অশ্রদ্ধের কথা। ত্রিকালজ্ঞ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সমস্ত অনুশীলন কতকটা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত ও কতকটা অভিজ্ঞতা ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠাপিত ইহা বরং বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, অনুকূল তর্ক বিচার দ্বারা সে সমস্তের রহস্য ও গূঢ়ার্থ সম্যক বোধ হইবার পর আত্ম বিচার প্রভৃত কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার যুক্তি যুক্ততা সম্বন্ধে কদাপি আমাদের চিন্তা করিবার অধিকার তাহার উপর থাকিতে পারে না, এরূপ বিশ্বাস থাকা ভাল নহে। ইহাতে মস্তিষ্কের সুব্যবহার না হইয়া বরং অপব্যবহার হয়, বলিয়াই আমার বিশ্বাস সমস্ত আয়ুশাসনের গূঢ়ার্থ না জানিতে পারি অথবা জানা ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদের সাধ্য না হইতে পারে, অথবা অপ্রকৃত অর্থ জ্ঞান হইতে

পারে, এই সমস্তর জন্যই আর্য্য ঋষিগণের উপর আমাদের অন্ধ বিশ্বাস থাকা কতকাংশে আবশ্যক। আবার সকলে ইহা আচরণ করিয়া থাকে বলিয়া আমারও ইহা আচরণ বিধেয় এই উদ্দেশ্যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ধর্ম্ম হানির আশঙ্কা। ভগবান বেদব্যাস স্পষ্টই বলিয়াছেন ;—

"কারণাদ্ধর্ম্মবিচ্ছেন্ন-লোক চরিতঞ্চরেৎ।" (মহাভারত।)

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে নারী পুরুষের বিবাহ বয়স নির্ণয় আরও কঠিনতর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহের সহিত শরীরের পূর্ণ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধের প্রকাশের জন্য ভগবান মনুর ধর্ম্মানুশীলনের কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিষয় কি লিখিত আছে, দেখা যাউক।

যাহা হউক যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন অভিভাবকগণ প্রাণপন যত্ন সহকারে কুমারীকে বিদ্যা শিক্ষা দান করিবেন।

"কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।

* * *

ততো বরায় বিদুষে কন্যা দেয়া মনীষিভিঃ॥"

শিক্ষার্থিনী ও আপন সময় ও সুযোগের অনিশ্চয়তার কথা স্মরণ রাখিয়া পরম অভিনিবেশ সহকারে যথাসাধ্য বিদ্যার আয়ত্তীকৃত করিয়া লইবেন। বিদ্যার্থিনী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—

বিদ্যা কর্ম বয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি যস্য বৈ।
মান্য স্থানানি পঞ্চাহুঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরূণি চ॥

উশনাঃ ১।৪৮

"বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্॥" মনু।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীকে লোকে সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু সে সম্মান প্রকৃত সম্মান নহে। নিজের সৎকর্ম্মাদির দ্বারা দশজনের সম্মান লাভ ঘটিতে পারে, নিজের বয়োবৃদ্ধতা হেতুও অন্যে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বদা সৎপথে ও সৎসঙ্গে অবস্থান করি, যাহাতে মনোমধ্যে যে একটি নৈতিক শক্তির (moral force এর) উদ্ভব হয় তাহাও অপর দশজনের নিকট সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে। এ সকল সম্মান হইতে বিদ্যাবত্তা যে,

ভক্তি মিশ্রিত হইয়া শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হইতে পারে। এই শ্রদ্ধাই 'বীরপূজার' (Hero worship এর) হেতুভূত! যিনি বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। বিদ্বান্‌কে যতটুকু সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে, বিদুষীর প্রতি তদপেক্ষা সহস্রগুণ সম্মানের উদ্ভব স্বাভাবিক। কেননা তাঁহার জাতির ইহাতে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট দাবীও আছে (Divine right of sex).

বিদ্যাভ্যাসকালে কন্যাগণ নৈতিক গুণরাজির আয়ত্ত করিতে যত্নবতী হইবেন। বিদ্যাশিক্ষা সময়ে অনেক কুমারী আপন মনে অনেক উচ্চ আশা পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময়ে আবার সেই গৌরবই আবার গর্ব্বের জনক হইয়া দাঁড়ায়। অহঙ্কার যাহাতে হৃদয়ের ত্রিসীমানায় আসিতে না পারে তৎ সম্বন্ধে প্রত্যেকের সতত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নারী হৃদয়ে এই অহঙ্কার সমুৎপন্ন হইয়া নারী জাতির যাহা কিছু গুণরাজি তাহা সমস্তই বিলীন করিয়া দেয়। অন্যের মধ্যে যাহা কিছু উত্তমগুণ থাকে, সে সমস্তেরও প্রতি একটা ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। দয়া, বিনয়, নম্রতা ও মিষ্ট ভাষিতা প্রভৃতি যাহা নারী দেবীত্বের নিদান তাহারও হীনতা প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ।

আত্মা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ-দৃশ্য।

নৃপেন্দ্রনাথের বাটির সুসজ্জিত কক্ষ। ঊষা ও অতসী।

অতসী। মেজ দিদি, আজ গুরুমা আস্‌বে না?

ঊষা। না,—তাঁর ছেলের না কার অসুখ করেছে।

অতসী। কাল যে স্বরলিপি বলে দিয়েছিল, ভুলে গেছি। তুমি ব'লে দেবে?

ঊষা। কোন স্বরলিপি?

অতসী। তুমি সে দিন যে গান লিখেছিলে—তার। মেজদিদি তুমি একবার গাও না। স্বরলিপি আমি বুঝ্‌তে পারি না; শুন্‌লে সুর বেশ মনে থাকে।

ঊষা। গীত।

"(মা) নমস্তে নমস্তে শারদে।
তুমি সুখদা মোক্ষদা, তুমি আদি অন্ত,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি হৃদি পদ্ম
কে বুঝিতে পারে গো মা কেবা পাবে অন্ত
কারে ভাসাও দুঃখনীরে, কারে ফেল শ্রীপদে।"

(মলিনার প্রবেশ।)

মলিনা। (নেকলেসের বাক্স হাতে করিয়া) অতসী, তোর হীরার নেক্‌লেস্‌ এসেছে, দ্যাখ্‌।

ঊষা। দেখি। (বাক্স লইয়া দেখিতে দেখিতে) এই ফুলের পাতাটা ঠিক করতে পারে নী।

অতসী। মেজ দিদি, সে দিন চৌধুরীদের কনেবউ যে নেক্‌লেসটি পরে এসেছিল, দেখেছিলে? কেমন সুন্দর গড়ন।

ঊষা। হাঃ হাঃ! তোর এক কথা। এতে আর তাতে। সে ত সোণার এ হীরা দেওয়া।

(চন্দ্রমুখীর প্রবেশ।)

চন্দ্রমুখী। পরে দেখ্‌লি অতসী? ঠিক হয়েছে?

মলিনা। আয়, আমি পরিয়ে দিচ্ছি। (নেকলেস পরাইয়া দিল)

(রাখালের মায়ের প্রবেশ।)

রাখালের মা। বউ মনি, অতসীর কি নূতন লেকলেস হ'লো।

চন্দ্রমুখী। হ্যাঃ, এসো।

রাখালের মা। আহা, কি চমৎকার লেক্‌লেস। এত লোকের বাড়ী যাই, কোথাও এমন দেখি নাই! কি ঝক্‌মক্‌ করছে? বিপিন বাবুর শ্যালার সঙ্গেই কি অতসীর বে'র ঠিক হল, বউ মনি?

চন্দ্রমুখী। না এখনও পাকাপাকি হ'য় নাই। ভাব্‌ছি ঐখানেই দ'ব। ছেলের মা বড় সাধা সাধি করছে।

রাখালের মা। তা ত করবেই। পূর্ব্ব পুরুষের কত তপস্যার ফল থাক্‌লে তবে এ বাড়ীর মেয়ে লোকে ঘরে নিয়ে যেতে পারে? এই মাসেই কি হ'বে বউ মনি?

চন্দ্রমুখী। এ মাসে না হ'ক, মাঘ মাসে হ'বে।

উষা। মা, এ বালা আমি আর পরব না। আজ ক্ষ্যান্তির মেয়ে এসেছিল, তারও হাতে এই ধরণের বালা ছিল।

চন্দ্রমুখী। আজিই আমি বাবুকে নূতন বালার কথা বল্‌ব।

রাখালের মা। বউ মনি, শুন্‌ছিলেম সে দিন নাকি উষার শ্বশুর মিন্সে এসেছিল?

চন্দ্রমুখী। হ্যাঃ।

রাখালের মা। মিন্সে কিছু বল্‌লে না। এমন করে দুধের মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়েছিল, সে কথার কি বল্‌লে?

চন্দ্রমুখী। বল্‌বে আবার কি? বল্‌বার কি মুখ আছে। মিন্সের আবার চোট কত? বাবু চাকর বামুনের মাহিনা অবধি দিতে চেয়েছিলেন, মিন্‌সে তা নিতে চায়নি।

রাখালের মা। মিন্‌সে মুচি নইলে এমন করে।

মলিনা। আবার ডবডবানি দেখিয়ে গেছে ছেলের বে দেবে?

রাখালের মা। মগের মুল্লুক কিনা? মনে কর্‌লেই অমন বে হ'বে। আর কে অমন ঘরে মেয়ে দিতে যাবে? মিন্‌সেকে দরওয়ান দিয়ে দূর করে দিতে হয়।

চন্দ্রমুখী। বাবু তা বলেছিলেন, আমার ঐ মামা শ্বশুর কর্‌তে দেয় নাই।

রাখালের মা। তোমার মামাশ্বশুর চিরকালই ঐ রকমের। তুমি উষাকে কিছুতেই সেখানে পাঠিও না। তা হ'লেই শুড় সুড় করে পায়ে ধর্‌তে আস্‌বে।

চন্দ্রমুখী। আবার সেখানে পাঠাব? মাগী মিন্‌সে এসে আমার মেয়ের পায়ে ধরে গাট মানবে তবে সেখানে মেয়ে পাঠাব।

মলিনা। মনে করেছে ছেলের বে দেবার কথা বল্‌লেই আমরা ভয় পেয়ে উষাকে পাঠাব।

রাখালের মা। আক্কেল খেকো মিন্‌সের এ আক্কেল হল না। তোমরা কি দুঃখে সেখানে পাঠাবে? তোমাদের কি মেয়েকে ভাত কাপড় দেবার ক্ষমতা নাই? আর জামাইয়েরই বা রকম খানা কি? লেখাপড়া শিখেছে, পাশ করেছে কি করে বাপ মায়ের এমন ব্যবহার দেখে চুপ করে আছে। ভাল হলে এত দিনে এর বিহিত কর্‌ত।

মলিনা। সে আবার বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়! মা বোনের হয়ে উষাকে খোঁটা দিত।

উষা। অতসী আয়, লালমাছেদের খাওয়াই গে।

(উষা ও অতসীর প্রস্থান)

রাখালের মা। আহা দুধের বাছাকে এমন কষ্ট দেয়। চামার চামারণীকে জেলে দিতে হয়।

চন্দ্রমুখী। তোমায় বল্‌ব কি, রাখালের মা। আমার উষাকে যারা এমন লাঞ্ছনা করেছে, ইচ্ছে হয় তাদের মাথায় ঝাঁটা মারি।

(একজন ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। মা বাগানের পুকুর থেকে মাছ এসেছে।

চন্দ্রমুখী। পেসাদীকে বল এখনই কুটে দিতে। এই বেলা না ভেজে রাখ্‌লে গন্ধ হবে।

ঝি। দুজন বামুনই খেয়ে দেয়ে কোথায় গেছে।

চন্দ্রমুখী। তা ছাড়া গোষ্ঠ ঠাকুর ত রয়েছে।

ঝি। তার বুঝি জ্বর হয়েছে।

চন্দ্রমুখী। বামুন গুলো বাড়িয়ে তুলেছে দেখ্‌ছি। রাখালের মা মাছ গুলো ভেজে দিয়ে এসো ত।

রাখালের মা। তোমারই খাচ্ছি বউ মনি, আর এ সামান্য কাজ পার্‌ব না। আমি এখনই ভেজে দিচ্ছি।

(রাখালের মা ও ঝিয়ের প্রস্থান)

মলিনা। মা, অতসীর বেতে কি উষার শ্বশুরবাড়ী নিমন্ত্রণ কর্‌বে?

চন্দ্রমুখী। না, তাঁদের সঙ্গে আবার কুটুম্বিতা কর্‌তে যাব।

মলিনা। নেমন্ত্রণ না করাই ভাল। যে ছোটলোক।

(ক্ষ্যান্ত ঝিয়ের প্রবেশ)

ক্ষান্ত। ওমা, মেজ জামাই এসেছে। বল্‌ছে বাড়ীর ভেতর আস্‌বে।

চন্দ্রমুখী। কেন, বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নী?

ক্ষান্ত। না, বাবু বেরিয়ে গেছেন। আমায় বল্‌লে খবর দিতে। মেজ দিদি মনির সঙ্গে দেখা কর্‌বে।

চন্দ্রমুখী। আর দেখা কর্‌তে হবে না। যে ব্যবহার।

মলিনা। দেখো না কি বলে? হয়ত কনে জুট্‌ছে না তাই আদিখ্যেতা কর্‌তে এসেছে।

চন্দ্রমুখী। অমন জামাইয়ের আমার মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা নাই। (ক্ষণেক ভাবিয়া) আচ্ছা, তুই দেখ কি বলে।

ক্ষান্ত। তা হ'লে কি ডেকে দ'ব, মা।

চন্দ্রমুখী। আচ্ছা। (ক্ষান্তর প্রস্থান)

চন্দ্রমুখী। ছোঁড়া কি বলে তুই শোন।

(চন্দ্রমুখীর প্রস্থান)

মলিনা। সেই ত ছেলেকে পাঠাতে হলো। আবার শাসিয়ে গেছলো যে দেবে।

(প্রকাশের প্রবেশ)

মলিনা। কিগো বে'র নিমন্ত্রণ করতে নাকি? কবে দিন হলো। এবার পাচ্ছো কত? উষার বের সময় যা পেয়েছিলে তার চেয়ে বেশী পাবে ত? এবার ত আর একটা পাশ করেছ; খুব তেড়ে মুশে নিও, অনেক দিন চলা চাইত।

প্রকাশ। তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য এখানে আমি নাই। আমি এসেছি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে।

মলিনা। ওঃ, তোমার ইস্তিরীকে নিতে। কেন এততেও কি আশ মেটে নাই? এবার নিয়া গিয়ে সপ্তরথী মিলে অভিমন্যু বধ করবে নাকি?

প্রকাশ। আমাদের ত রথ কেনবার ক্ষমতা নাই; বধ করতে জানব কি করে?

মলিনা। তা খুব ভাল জান। আচ্ছা নিয়ে যাবার কথা বলতে একটু লজ্জা হ'লো না?

প্রকাশ কোন অন্যায় কথা ত বলি নাই, যে লজ্জা হবে?

মলিনা। মুখ তুলে কথা কইছ কি করে। বাপ মা কেন, সকলে মিলে উষাকে কি না কষ্ট দিয়েছ? তোমাদের যা ব্যবহার অন্য লোক হ'লে মাথা হেট করে থাকত।

প্রকাশ। যাতে মাথা হেট হয় সে রকম কাজ আমরা করি না, করতে জানি না।

মলিনা। ছেলের বে দিয়া বউ ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে কথায় কথায় গাল দেওয়া, ধরে ধরে মারা, পৌরষের কাজ নয়? ভদ্র ঘরে——

প্রকাশ। মিথ্যা কথা। যে একথা বলেছে মিথ্যা বলেছে।

মলিনা। আমাদের বংশে কেউ মিথ্যা বলতে জানে না। ছোটলোকের ঘরেই বউকে এমন করে যন্ত্রণা দেয়।

প্রকাশ। ঝি বউকে ভাল উপদেশ দেওয়া ছোটলোকের কাজ, না অভ্যাগতকে অপমান করা ছোটলোকের কাজ, এ বিষয়ের মীমাংসা কর্‌বার জন্য আমি এখানে আসি নাই। আমি তাকে নিতে এসেছি, জান্‌তে চাই সে যাবে কি না?

(চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী। কেন? তোমাদের——— (প্রকাশ চন্দ্রমুখীকে প্রণাম করিল) তোমাদের কি জেদ নিয়ে যেতেই হবে। মেয়ের বে দিয়েছি বলে কি বেচে খেয়েছি যে, যখনই হুকুম কর্‌বে তখনই তাকে রাবণের পুরে পাঠাতে হ'বে।

প্রকাশ। আমি ত বেচা কেনার কথা বল্‌ছি না মা। বিয়ের পর সকলেই শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে।

চন্দ্রমুখী। শ্বশুর শাশুড়ী ভাল হলেই থাকে। তোমাদের যা ব্যবহার তাতে মনে করো না যে, উষাকে আবার সেখানে পাঠাব।

প্রকাশ। খারাপ ব্যবহার করা আমাদের অভ্যাস নয়, কর্‌তে জানিও না।

চন্দ্রমুখী। তোমার বাবা সে দিন শাসিয়ে গেছে তোমার আবার বে দেবে। তাকে বলো এ ডব্‌ডুবানিতে আমরা ভয় করি না। তুমি আবার বে কর্‌লে আমার মেয়ের কিছুমাত্র এসে যাবে না। যখন পেটে জায়গা দিতে পেরেছি, তাকে হাঁড়িতেও ঠাঁই দিতে পার্‌ব। জানব সে বিধবা হয়েছে।

প্রকাশ। তা হলে আপনারা তাকে পাঠাবেন না?

চন্দ্রমুখী। না।

প্রকাশ। আমি একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।

চন্দ্রমুখী। আর তার সঙ্গে দেখা করে কি হবে। আমারা তাকে পাঠাবি না, সে যাবে না। তোমাদের যা করবার হয় করো।

প্রকাশ। বেশ। তাই হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রমুখী। আচ্ছা মলিনা, তুই নয় একবার উষাকে ডেকে দে।

(চন্দ্রমুখী ও মলিনার প্রস্থান)

প্রকাশ। বৃথা চেষ্টায় বৃথা আশায় এসেছি। ওঃ এত তেজ!

(উষার প্রবেশ)

উষা আমি তোমায় নিতে এসেছি। তোমার বাপ মা দিদি বলেছেন

তোমায় পাঠাবেন না। আমি তোমায় যাবার জন্য জেদ করছি না, অনুরোধ করছি না। আমি শুধু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, তুমি যাবে কি না ? আমার কাছে থাক্‌বে কি না ?

উষা। আমার সেখানে কষ্ট হয়।

প্রকাশ। কি কষ্ট উষা ?

উষা। কেবল সকলে ঝি চাকরের কাজ করতে বলে ; না করলে খোঁটা দেয়।

প্রকাশ। এ ছাড়া তোমার আর কোন কষ্ট আছে ?

উষা। আর কি কষ্ট ?

প্রকাশ। বেশ আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় সেখানে কোন কাজ করতে হ'বে না, তোমায় কেউ কোন কাজ করতে বল্‌বে না। এখন তুমি যাবে ?

উষা। (মুখ নত করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল)

প্রকাশ। চুপ করে রয়েছ যে ? বল, আমার সঙ্গে যাবে ?

উষা। আমার বাপ মায়ের কাছে তোমরা সকলে স্বীকার করবে বল ?

প্রকাশ। কি স্বীকার ?

উষা। তোমরা অন্যায় করেছ, আর এ রকম করবে না।

প্রকাশ। তুমি মনে কি করেছ যে আমার বাপ মা তোমার বাপ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন ? তাঁরা ত কোন অন্যায় করেন নাই যে, তাঁদের হীনতা স্বীকার করতে হবে। বরং তোমার বাপ মা যা করেছেন তাতে তাঁদেরই ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত।

উষা। আমার বাপ মা মেয়ের বে দিয়াছেন বলে ত চোরের দায়ে ধরা পড়েনি যে, তোমার বাপ মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে যাবেন ?

প্রকাশ। তোমার বাপ মা করতে বাকী রেখেছেন কি ? পূজার সময় বাবা তোমাদের তত্ত্ব পাঠান তা তোমার বাপ মা ফিরিয়ে দেন ; তোমাকে নিতে লোক আসে তাকে তোমার বাপ মা দরওয়ান দিয়া বাড়ীর বার করে দেন ; তার পর বাবা নিজে আসেন তাঁকে তোমার বাপ অযথা অপমান করেন, তা ছাড়া তোমার মা আজ আমায় স্পষ্ট বলেছেন যে তিনি মনে করবেন তুমি বিধবা হয়েছ। তোমার বাপ মায়ের এ সব করা এ সব কথা বলা কি ভাল হয়েছে ?

উষা। তোমাদের যে রকম ব্যবহার তাতে আমার বাপ মা আর কি কর্‌বেন?

প্রকাশ। আমাদের ব্যবহার? যাক, এখন ও সব কথার দরকার নাই। তোমার যাবার ইচ্ছা থাকে বল, না ইচ্ছা থাকে তাও বল।

উষা। তোমার বাপ মা এসে আমার বাপ মায়ের কাছে না বল্‌লে কি করে যাব।

প্রকাশ। আমার বাপ মা এখানে আস্‌বেন না। তাঁরা তোমার বাপ মায়ের আত্মীয়তাও চান না। তুমি যাবে?

উষা। কি করে যাব?

প্রকাশ। তা হ'লে তুমি আমায় চাও না?

উষা। তুমি কেন এখানে থাক না?

প্রকাশ। তোমাদের আশ্রয়ে থাকব? যেখান থেকে বাবা অপমানিত হয়ে চলে গেছেন, সেখানে আমি থাক্‌ব। উষা, তোমার পিতা সে দিন বাবাকে যেরূপ অপমান করে ছিলেন, তাতে তার মাথায় পায়ের জুতা খুলে মারাও আমার পক্ষে অন্যায় হ'বে না।

(ক্রোধভরে চন্দ্রমুখী ও মলিনার প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী। এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাড়ীতে বসে আমার মাথায় জুতা মার্‌তে চাও। ঝি,—ঝি কে আছিস্। দরওয়ানকে বল এখনই এই ছোটলোক ছোঁড়াকে জুতা মার্‌তে মার্‌তে বার করে দিতে।

প্রকাশ। দরওয়ানের ভয় দেখাও? সে ভয়————না তুমি স্ত্রীলোক আমি তোমার বাড়ীতে আসি নাই। পথ চিন্‌তে এসেছিলাম, চিনেছি, কিন্তু মনে রেখো যে, মুখে তোমরা আমার বাপ মাকে অপমান করেছ সেই মুখে এক দিন তাঁদের কাছে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তে হ'বে। (প্রকাশের প্রস্থান)

চন্দ্রমুখী। ছোঁড়ার তেজ দেখ্‌লি? ঝি মাগীরা কোথায় গেল। ছোঁড়াকে ধরে আনুক, থামে বেঁধে জুতা মারুক। (চন্দ্রমুখীর প্রস্থান)

উষা। মা, মা! দিদি, দিদি, চলে গেল। (মলিনার কাঁধে হাত দিয়া মাথা নত করিল।)

মলিনা। উষা। ও কি?

উষা। না, যাক্। দরকার নাই।

বহুমূত্র তথ্য ও চিকিৎসা।

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু আই, এস, এবং এম্, বি, এফ্, সি, এস্, মহোদয়ের ইংরাজী প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা অনুবাদিত।

(নিদান শাস্ত্র Pathology.)

ধাতব ঔষধ।—শর্করা নিঃস্রাব বন্ধ করিবার গুণ ইহার বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ইহাতে রোগীর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তাহাকে মোটের উপর অনেকটা সুস্থ করিয়া থাকে। যেখানে বহুমূত্রজ অসাড়াবস্থার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে এবং যেখানে প্রস্রাবের মধ্যে অ্যাসিটোন ও ডাই-অ্যাসেটিক অ্যাসিডের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে অধিক মাত্রায় বাই-কার্ব্বনেট্ অফ্ সোডা ব্যবহার করাইলে এবং রোগীর দাস্ত খোলসা করাইলে ঐ দুর্ঘটনা আর ঘটিতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাক) হইতে দুই আউন্স পর্য্যন্ত কিম্বা তাহারও অধিক বাই কার্ব্বনেট্ অফ্ সোডা দেওয়া যাইতে পারে। অসাড়াবস্থা দেখা দেওয়ার পরও কয়েকটী রোগীকে ধাতব ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করা গিয়াছে। সে ক্ষেত্রে সোডা বাই কার্ব্ব রোগীকে সেবন, আবার যন্ত্র সাহায্যে শিরার মধ্যেও প্রবেশ করান হইয়া ছিল।

ইউরোপের অনেক জল-সরবরাহ স্থলে (Watering Stations) খনিজ যুক্ত জল (Mineral Waters) দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া বিস্তর রোগী সুফল পাইয়াছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা মেদ বৃদ্ধি বশতঃ পীড়িত, এবম্প্রকার জল তাঁহাদের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। ঐ সকল স্থানের জল বাতাস এবং পারিপার্শ্বিক নিচয় বেশ স্বাস্থ্যকর বলিয়াই রোগীগণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; নচেৎ, তাঁহাদের ব্যবহৃত জলে বহুমূত্র রোগ আরোগ্য করিবার যে একটা বিশেষ গুণ ছিল এমত কথা বলা যায় না।

ব্রোমাইড্ অফ্ পটাসিয়ম্, অ্যাণ্টিপাইরিন কুইনাইন, আর্সেনিক, ফস্‌ফেট অফ্ লাইম্, আয়রণ এবং আরও অনেকানেক ঔষধ বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের সুফল সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ যায় নাই। এই ঔষধের অনেক গুলিতে রোগীর স্বাস্থ্য মোটের উপর একটু

ভাল করিয়া দেয়। এই কারণেই উহাদের দ্বারা পরোক্ষভাবে বহুমুত্র পীড়া উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (diastase) প্রভৃতি আলোড়ন (ferments) এবং যকৃৎ ও প্যান্‌ক্রিয়া নামক পরিপাক-সহায় যন্ত্রের নিষ্কাশন করিয়াও দেখা গিয়াছে। ফল নানা প্রকার হইয়াছে।

নূতন ঔষধ।—এইগুলি নূতন ঔষধ; যথা, ডাইয়েবিট্রসিরিন্ (diabetserin) অ্যান্টিমেলিন্ (antimellin), স্যাকারোসল্‌ভল্ (Saccharasolvol), গ্লাইকোসল্‌ভল্ (Glycosolvol) এবং সেন্‌ভ্যাল্ (Senval)——("চিকিৎসক" জুলাই)।

ডাইয়েবেট্রসিরিন্ নামক ঔষধের প্রধান উপাদান গুলি এই—ক্লোরাইড্ সলফেট্ এবং কার্বনেট্ অফ্ সোডিয়ম্, সলফেট্ অফ্ ম্যাগনেসিয়ম্ গ্লাইকো ফস্‌ফেট্ অফ্ লাইম্ এবং এসেরিন্। অনেকে বলেন যে, ধমনীর আবরক ঝিল্লীর পরিবর্ত্তন বশতঃই এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ঔষধে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দেয় না, ইহাই আধুনিক বিশ্বাস। বার্লিন সহরে ফ্রাঙ্কেল ২৯টী স্থলের মধ্যে ২২টী স্থলে এই ঔষধ দ্বারা সুফল পাইয়াছিলেন।

অ্যান্টিমেলির নামক ঔষধের উপাদান এই—অহিফেন, স্যালিসাইলিক্ এসিড্ এবং জাম্বুল (Jambul)। ইহার প্রয়োগে অনেক স্থলে বেশ উপকার পাওয়া গিয়াছে।

স্যাকারোসল্‌ভল্ ঔষধটী স্যালিসাইলিক্ এসিড্ হইতে প্রস্তুত। গ্লাইকোসল্‌ভল্ ঔষধটীতে জাম্বুল বীজ ও অধিক মাত্রায় শ্বেতসার বিদ্যমান আছে।

সেন্‌ভ্যাল্ ঔষধটীতে সোডিয়ম্ ম্যাগনেসিয়ম্ ও লিথিয়ম্ নামক ক্ষার পদার্থ এবং ভ্যালেরিয়ান্ নামক ভৈষজ্য উদ্ভিদ বিশেষ, পিপারমেন্ট্ ও দুই একটী সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য বিদ্যমান আছে।

প্রাগুক্ত ঔষধ গুলিতে কোন কোন স্থলে সেরূপ উপকার দর্শে না। অন্যান্য ঔষধেও ঠিক এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

পথ্যবিষয়ক চিকিৎসা।—প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ বহুমূত্র রোগে পথ্যের সুব্যবস্থা করিলেই প্রস্রাবে শর্করা স্রাব হ্রাস পাইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে, পথ্য বিষয়ে সাবধান হইলে শর্করা-স্রাব একরূপ বন্ধই হইয়া যায়। পথ্য বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিলে যদিও অতি সহজেই এই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে, তথাচ কার্য্যতঃ (বিশেষতঃ ভারতীয় রোগীর বেলায়) ইহা তত

সহজ সাধ্য হইয়া উঠে না। ভারতবাসী প্রধানতঃ শ্বেতসার ও শর্করা আহার করিয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে যখন তাহাঁকে মাংসাহার করিতে দেওয়া হয়, তখন রোগী খিট্‌খিটে হইয়া থাকে এবং তাহার স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না। ইউরোপবাসীর প্রধান খাদ্যই মাংস। এমন রোগীও খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে, অনেকদিন বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন থাকিতে পারে না। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদিগকে বড় অনেক দিন ধরিয়া আহারাদির কঠোর সংকোচ সহ্য করিতে হয় না। রোগীর পক্ষে শ্বেতসার একেবারে নিষিদ্ধ হয় না; কেন না তাহাতে বিপদ আছে। পরে সে বিপদের কথা বলিব। প্রত্যেক বহুমূত্র রোগীকেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে শ্বেতসার আহার করিতে দেওয়া হয়। রোগীর অবস্থা বিশেষে এই শ্বেত-সার—পরিমাণের তারতম্য করা হইয়া থাকে। পীড়ার মৃদু অবস্থায় রোগীকে যখন শ্বেত-সার খাইতে দেওয়া হয়, তখন সে সকল প্রকার শ্বেত-সারই পরিপাক করিতে পারে। তখন তাহার প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করাও নিঃসৃত হয় না। প্রত্যেক রোগী কি পরিমাণে শ্বেত-সার পরিপাক করিতে পারে, আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে; এই কার্য্যটী প্রথমতঃ বড়ই দুরূহ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পীড়ার বিবরণগুলি একটু প্রণিধান করিলেই ইহা অতীব সহজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। "চিকিৎসক" নামক কাগজের জুলাই সংখ্যাতে ডাঃ ল্যাব্‌ "বহুমূত্র রোগে পথ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে বহুমূত্র রোগী কি পরিমাণে শ্বেত-সার পরিপাক করিতে সক্ষম তাহা স্থির করিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি উহাতে এইরূপ বলিয়াছেন;—"যখন তোমার নিকট একজন রোগী প্রথমে আইসে, তখন তুমি প্রথমে, পথ্যের পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল বলিয়া দিও যে, তুমি যাহা যাহা আহার করিবে, সেগুলি পৃথক পৃথক মাপ করিবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে প্রস্রাব করিবে তাহা সমুদয় বোতলে ধরিবে। তারপর দেখিবে রোগী কি পরিমাণে শ্বেত-সার উদরসাৎ করিয়াছে এবং কি পরিমাণেই বা তাহার প্রস্রাবের মধ্যে শর্করা নিঃসৃত হইয়াছে; রোগীর ভুক্ত আহার্য্য ও প্রস্রাব নিঃসৃত শর্করা এই দুইটীর তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, রোগী শ্বেত-সার আহার করিতে সক্ষম কি না এবং সক্ষম হইলে কি পরিমাণে সক্ষম। ভুক্ত দ্রব্য ও শর্করাস্রাবের পরিমাণে যতটুকু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, ততটুকু পরিমাণে শ্বেত-সার রোগী পরি-পাক করিতে সক্ষম বুঝিতে হইবে।"

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

যোগ-বল।—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; আশ্বিন ১৩২২ সাল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ সম্পাদিত। কার্য্যালয় ১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ১৵০ এক টাকা দুই আনা। প্রতি সংখ্যা ৵০ দুই আনা। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে, (১) অবতরণিকা, (২) জগদ্‌জ্ঞান, (৩) স্থূলতা সূক্ষ্মতা ও সৃষ্টি, (৪) দেহের মূল পদার্থ, (৫) চেতন ও অচেতন, (৬) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, (৭) গুণ, বীর্য্য ও প্রভাব, (৮) স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ, (৯) সৃষ্টি তত্ত্ব, (১০) লঘু গুরু। যোগবলের প্রত্যেক প্রবন্ধই অভিনবত্ব পূর্ণ। যে বিজ্ঞান-বলে পাশ্চাত্য জাতি জ্ঞানবিজ্ঞানে এতাদৃশ উন্নতি—লাভ করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞান যে আমাদিগের গীতা উপনিষদাদি ধর্ম্ম তত্ত্ব ও আয়ুর্ব্বেদে নিহিত আছে, যোগ-বলে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাচীন ঋষিযুগে যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কিরূপে পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তাঁহারা মোক্ষ লাভ করিতেন, যোগবলে তাহা আলোচিত হইতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক সঙ্গে সমালোচনা করিয়া তন্মধ্যে প্রাচ্য পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান যে, শ্রেষ্ঠতর তাহাই প্রদর্শন করা কবিভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশ্য। আমরা যত দূর বুঝিলাম, তাহাতে মনে হয়, মহদুদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যাতেই যত দূর সম্ভব সিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্রাদি বহুল উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের অভাব না থাকিলেও যোগবলের ন্যায় একখানি অভিনব মাসিকপত্রের অভাব ছিল, অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, সেই অভাব কবিরাজ মহাশয়ের উদ্যমে পূর্ণ হইতে চলিল। আমরা কবিরাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যের সফলতা কামনা করি।

ব্রাহ্ম সমাজের সাধ্য ও সাধনা।—স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ছাপা, কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য দশ আনা মাত্র।

এই পুস্তকের প্রথমেই "নিবেদন" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, পুস্তক খানি গ্রন্থকারের জীবনের অন্তিমাবস্থায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং গ্রন্থকারের স্বর্গারোহণের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পর্ব্বদিবসে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সাধারণ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়

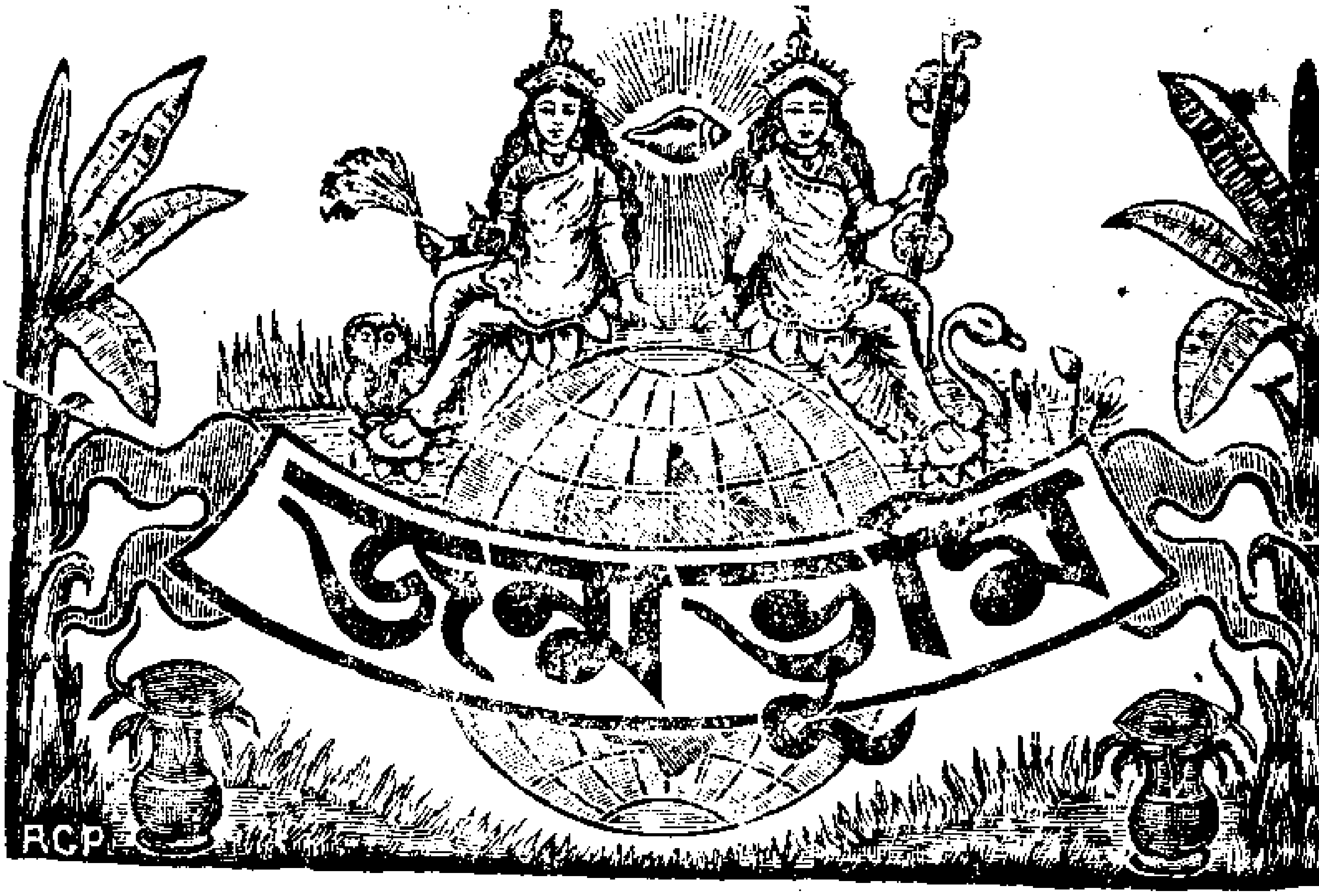
গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। (১) ব্রাহ্মসমাজের মূলভাব, (২) অধ্যাত্ম শাস্ত্রাবলম্বন, (৩) শাস্ত্রার্থগ্রহণ, (৪) বেদান্তোদিত ধর্ম্ম, (৫) বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, (৬) ব্রাহ্মসমাজের মত কি? (৭) ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তালোচনা, (৮) বিবিধ প্রবন্ধ। বিষয়গুলি সারগর্ভ ও উপদেশ পূর্ণ, "ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা"—পুস্তকের প্রবন্ধ সমূহে অধুনা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের অনুমোদিত প্রকৃত তাৎপর্য্য ও তাহার সাধন প্রণালী বিবৃতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতৎ পুস্তক পাঠে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হওয়া যায়; জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সত্যধর্ম্মাপিপাসু সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী।—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত। "রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য দুই আনা।

এই পুস্তকে স্কন্দ পুরাণান্তর্গত রেবা খণ্ডোক্ত মূল সংস্কৃত এবং স্বর্গীয় দুর্গাদাস ঘটক বিরচিত ছন্দোবদ্ধ বাঙ্গালা কথা ও পূজা পদ্ধতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা ও কাশী প্রভৃতি বহু দেশের বহু প্রকারের পূজা পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন্ দেশে কিরূপ সিন্নি বিতরণ করিবার প্রথা; কোন স্থানে কিরূপ কথা হয়, কোন স্থানে কোন সময় কি প্রণালীতে পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা এই "সত্য নারায়ণের পাঁচালী" খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

মালা।—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার প্রণীত মূল্য আট আনা মাত্র।

এই পুস্তকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। "মালা" পাঠ করিয়া দেখা গেল, কবিতাগুলি অক্ষম রচনার উদাহরণ স্থল নহে, নবীন গ্রন্থকার কাব্য সাহিত্যে উৎসাহ পাইবার যোগ্য।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। ১৩২২ সাল, আশ্বিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গীতোক্ত ধর্ম্ম

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন কথা হইতেছে যে, গীতা "জ্ঞানী ভক্তই আমার প্রিয়তম" বলিতেছেন, তবে কি অজ্ঞানীর জন্য শ্রীভগবান্ কোন ব্যবস্থা করেন নাই? সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মশাস্ত্র কি অজ্ঞানীকে নরকের পথ দেখাইয়া জ্ঞানীর জন্যই মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন? জ্ঞানীই মুক্তির অধিকারী হইবে, অজ্ঞানী প্রেতযোনী অথবা তির্য্যকযোনী প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে নরকের অধিবাসী হইবে? ইহাই কি গীতোক্ত ধর্ম্মের মত? না তাহা নহে, যাহা সকল শাস্ত্রের সার পদার্থ, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়াছে তাহা যে কেবল মাত্র জ্ঞানীকেই পরিতৃপ্ত করিবে, অজ্ঞানীকে বঞ্চিত করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর

তবে দেখা যাউক গীতা অজ্ঞানী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, বিশেষতঃ আরও বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক যে অজ্ঞানীও ইচ্ছা করিলে জ্ঞানী না হইয়াও ধর্ম্ম জগতে তাহার জীবন চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে কি না. প্রথমতঃ দেখা যাউক গীতা অজ্ঞানীকে কি কি আশ্বাসবাণী দিতেছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম॥"

৯ম ২২ শ্লোক।

অনন্যমনে আমাকে চিন্তা করতঃ যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, এবং আমাতে নির্ভরশীল, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকি।

একটা গল্প মনে পড়িতেছে, সাধারণের অবগতির জন্য এখানে প্রকাশ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, সেটী এই—

কোন পল্লীগ্রামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ব্যতীত আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, ব্রাহ্মণ বড়ই দরিদ্র, কিন্তু দরিদ্রই হউক আর ধনীই হোক, মানব জীবনের শুধু মানবের কথাই বা বলি কেন, জীব মাত্রেরই যেটী সর্ব্বাপেক্ষা তুচ্ছ বলিয়া ধারণা, সকল বিষয় চলিলেও কেবল সেইটী না হ'লে কিছুতেই উপাদান চলে না, সেই তুচ্ছ বিষয়টীর নাম আহার। অথচ এইটীই আবার জীবদেহ রক্ষার কারণ, সুতরাং ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানে সর্ব্ব প্রকারে নির্ভরশীল হইয়াও সেই একমাত্র আহারের জন্য তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে হইত, ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যথা নিয়মে আহ্নিককৃত্যাদি সমাপন করিয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইতেন, পরে দুই প্রহরের মধ্যে যাহা পাইতেন তাহাই লইয়া আসিয়া স্বামী স্ত্রী আহার করিতেন, ব্রাহ্মণী কিন্তু বাটীর বাহির হইতেন না, তিনি বাটীতে থাকিয়াই সংসারের কাযকর্ম্ম দেখিতেন, কিন্তু তিনিও স্বামীর ন্যায় সর্ব্বদা ভগবানে নির্ভর করিতেন. একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং বহু লোকের দ্বারস্থ হইয়াও সামান্য এক মুষ্টি তণ্ডুলও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, দুই প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বে রিক্ত হস্তে বাটীতে আসিলেন, স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কি করিবেন, উপবাস ভিন্ন যখন উপায়ান্তর নাই, তখন তাহাই সাব্যস্থ হইল, স্বামী স্ত্রী উপবাসী রহিলেন। সন্ধ্যাকালে সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করিতে করিতে উল্লিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাইলেন, অবশ্য উহা বহুবার পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু

আজ ঐ শ্লোকটী পড়িয়া মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তারপর একটী লৌহ-শলাকা লইয়া শ্লোকটীর উপরে দাগ দিলেন, বিশ্বাস, যে ভগবান কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না, এ শ্লোকটী বোধ হয় অপরের লেখা অথবা ইদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের ভাষায় যাহাকে প্রাক্ষিপ্ত বলে, তাহাই হইবে, যাই হোক তিনি শ্লোকটীকে কাটিয়া দিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে আবার উদরান্নের জন্য বাহির্গত হইলেন, কিন্তু আজ আর হাঁটিতে পারিতেছেন না, পূর্ব্বদিনের উপবাস জনিত দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ গ্রামের প্রান্তভাগে একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। খানিক পরে উঠিয়া বসিলেন* কিন্তু আর যাইতে পারিলেন না, ক্ষুধার জ্বালায় মাথা ঘুরিতে লাগিল, বাটীর দিকে ফিরিলেন, বটে, কিন্তু বাটী আসিয়া কি খাইবেন, আজ যদি কালকের মত উপোস ক'রতে হয় তা হ'লে আর তো দেহে প্রাণ থাকিবে না, তবে কি ব্রাহ্মণের দেহাবসানই শ্রীভগবানের ইচ্ছা, ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, কিন্তু এখন সে কথা যাউক।

এদিকে ব্রাহ্মণী ভাবিতেছেন, আজ যদি তিনি কালকের মত সুধু হাতে ফিরিয়া আইসেন; তবে আমাদের কি হইবে, ব্রাহ্মণকন্যা মর্ম্মান্তিক দুঃখে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হে দীনবন্ধো! হে অগতির গতি! হে অকূলের কুল! হে অনাথের নাথ! তুমি ভিন্ন দীন ভিখারি আমাদের আর কেহই নাই, হে শরণাগতের আশ্রয়! তোমা ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব প্রভু! এ বিপদে তুমি ভিন্ন আর আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা কেহ নাই, শ্রীমধুসূদন! আজ এই উদরান্নের জন্য লালায়িত দরিদ্রা ব্রাহ্মণ কন্যা এবং তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা স্বামীকে রক্ষা করুন।"

বুঝি সে ডাক শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছিল, অথবা ডাকার মত ডাকতে জান্‌লে বুঝি সে ডাক পৌঁছানই নিয়ম, ব্রাহ্মণী দেখিতে পাইলেন, কিশোর বয়স্ক হৃষ্ট পুষ্ট একটী বালক কতকগুলি দ্রব্য সম্ভার মাথায় করিয়া তাঁহাদের বাটীর দিকে আসিতেছে। বালকের রংটী কালো, সে ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়াই মাথার বোঝা নামাইয়া একটী প্রণাম করিল, ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ বাবা? তুমি কোথা হ'তে আসছ? এ সব জিনিস কাহার জন্য লইয়া যাইতেছ? কালো কহিল,—এ সব আপনাদেরই জিনিস।

কালো। আজ্ঞে হাঁ।

ব্রাহ্মণী। আমাদের তো বাবা কেউ নাই, এ সব জিনিস আমাদের কাছে কে পাঠাইবে? তুমি বোধ হয় বাড়ী ভুল ক'রেছ?

কালো। না মা, বাড়ী ভুল করিনি, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি ব'লে দিয়েছেন যে, এই গুলি কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে দিবে, এ বাড়ী কি তাঁহার নয়?

ব্রাহ্মণী। হাঁ তাঁহারই বাড়ী, কিন্তু কেই বা পাঠিয়েছেন, আর কেনই বা তিনি এ সমস্ত আমাদিগকে দিতেছেন, এ কথা তো তুমি আমাকে ব'লছো না।

কালো। হাঁ মা? তুমি কি এ দেশের সকল লোককে চেন? মা! আমি বিলম্ব ক'রতে পার্ব্বো না, আপনার স্বামী এলে তিনি সকলই বুঝতে পার্ব্বেন।

ব্রাহ্মণী আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া চাউল, দাইল, ঘৃত, চিনি ও তরকারি প্রভৃতি যাহা ছিল একে একে উঠাইয়া লইলেন। তারপর কালোর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখখানি বড় সুন্দর আরও দেখিলেন, বালকের কারুণ্য পূর্ণ চক্ষুদ্বয় ছল্ ছল্ করিতেছে, তাহাতে সেই শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে, মুখের এই ভাব দেখিয়া স্নেহপ্রবণ রমণী হৃদয় গলিয়া গেল, ব্রাহ্মণী একদৃষ্টে বালকের মুখ পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, বালকের বুকের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষতস্থানে রক্ত জমিয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মণী—সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, বাবা! তোমার বুকে এমন রক্ত পড়ছে কেন?" "তোমার স্বামীই আমার বুক চিরিয়া দিয়াছেন," এই কথা বলিয়াই বালক চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণী কি ভাবিলেন, কিন্তু বালককে আর দেখিতে পাইলেন না, একটু পরেই বিশুষ্ক মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বামীকে এত শীঘ্র আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এত শীঘ্র যে?

ব্রাহ্মণ নিজের শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, দেখ! কোন্ বাবু তোমাকে এসব জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, কৈ সেকি এদেশে—তো তেমন বড়লোক কেহ নাই! কে এনেছিল? সে কি বালক, ব্রাহ্মণী আদ্যোপান্ত সকল কথা খুলিয়া বলিল, শেষে কহিল, হাঁ গা? তুমি নাকি তার কাঁটা দিয়ে বুক চিরে দিয়েছ?

ব্রাহ্মণের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সেই নীরদ বর্ণ বালক-বাহকের কথা শুনিয়া

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং

কথাটা মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আরও মনে পড়িল, অবিশ্বাস জন্য শ্লোকটীকে কাটিয়া দেওয়া, ব্রাহ্মণের চক্ষে জল আসিয়াছে, শ্রীভগবানের বক্ষে আঘাত করিয়াছি ভাবিয়া তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছেন, তাহার চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার বাক্‌শক্তি যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে কহিতে লাগিলেন।—

মহিম্ন পারম্ তে পরম বিদুষো যদ্যসদৃসি
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনা-মপিস্তদবসন্না স্বয়িগিবঃ।
অথাবাচ্যং সর্ব্বঃসমতি পরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষস্তোত্রে হরঃ নিবপবাদ পরিকরঃ॥
অতীত পন্থানাং তব চ মহিমা বাঙ্মনোসয়ো
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমবিধত্তে শ্রুতিরোঽপি।
স কস্য স্তোতব্যো কথিবিধগুণ কস্য বিষয়
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পতত্তি ন মনঃ কস্যন বচঃ॥

ক্রমশঃ

কলের গান।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

কলের গান সকলেই শুনিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে স্বর, তাল, মান ও লয়যুক্ত গীত, বাদ্য ও শব্দ রেকর্ডে সংযুক্ত থাকে এবং রেকর্ড হইতে তাহা ধ্বনিত ও শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হয় ত অনেকেই অবগত নহেন। গ্রামোফোন যন্ত্রটিকে মানুষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মানুষ যেমন নানাস্থরে কথা বলে, তাল, মান ও লয়সহকারে সঙ্গীত গান করে, গ্রামোফোনও তদ্রূপ। গ্রামোফোনের চোঙ্গ মানুষের কণ্ঠদেশ, সাউণ্ড বক্স কণ্ঠস্বর, পিন—জিহ্বা ও রেকর্ড মুখ। মানুষ যেমন জিহ্বা ও মুখ নাড়িয়া কথা বলে, কণ্ঠ ভাজিয়া সঙ্গীত গান করে, কলের গানও তদ্রূপ—পিন ও রেকর্ড সংযুক্ত হইলে, তাহা হইতে গীত, বাদ্য ও শব্দ নির্গত হয়, কিন্তু সাউণ্ড বক্স গ্রামোফোনের গলার স্বর, অতএব কেবল পিন, রেকর্ড ও চোঙ্গ সংযুক্ত হইলেই শব্দ নির্গত হইতে পারে না, তৎসহ সাউণ্ড বক্সের সংযোগ আবশ্যক। মানুষের কণ্ঠদেশ দেহের আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ, তজ্জন্য কণ্ঠদেশ হইতে শব্দ নির্গত হয়, তদ্রূপ গ্রামোফোনের

আকাশ পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম বা পঞ্চম মহাভূত। গগন, অন্তরীক্ষ, শূন্য ও ব্যোম আকাশের নামান্তর। আকাশ আকাশের বস্তু, পৃথিবীর বস্তু নহে। ক্ষিতি অপ্ দ্বারা আবৃত, অপ্ তেজ দ্বারা আবৃত, তেজ বায়ু দ্বারা আবৃত। বায়ু আকাশ বা ব্যোম দ্বারা আবৃত। ক্ষিতির উর্দ্ধে অপ্, অপের উর্দ্ধে তেজ, তেজের উর্দ্ধে মরুৎ ও মরুতের উর্দ্ধে আকাশ। ক্ষিতি শব্দে মৃত্তিকা বা পৃথিবী, অপ্ শব্দে চন্দ্র, মেঘ ও বৃষ্টি, তেজ শব্দে সূর্য্য, মরুৎ শব্দে বায়ু ও ব্যোম শব্দে আকাশ। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ হইতেই স্থূল জগতের সৃষ্টি, আবার শব্দেই স্থূল জগতের লয়। লয়-কার্য্যে স্বয়ং ভগবান ভবানীপতি নিযুক্ত, তজ্জন্য আমরা শেষের দিন স্মরণ করিয়া ব্যোম্ ব্যোম্ বলিয়া ভবানীপতির অর্চ্চনা করি। আকাশের গুণ শব্দ, আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই—

আন্তরীক্ষাস্তু শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং
সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহোবিবিক্ততা চ।

শব্দ, শব্দেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ ছিদ্র ও বিবিক্ততা বা অসম্পৃক্ততা আকাশ হইতে জাত বা আকাশের পরিণাম।

যেমন সূর্য্যের তেজ, ক্ষিত্যাদি মহাভূতের অন্যতম তৃতীয় মূল পদার্থ এবং সূর্য্য পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী, তদ্রূপ আকাশ পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম মূল পদার্থ এবং আকাশ পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী। যেমন সূর্য্য পার্থিব বস্তু নহে, তদ্রূপ আকাশ বা ব্যোমও পার্থিব বস্তু নহে। আমরা পৃথিবীতে ক্ষিতির স্তরে অবস্থান করিতেছি। ক্ষিতির উর্দ্ধে অপের স্তর, অপ তত্ত্ব—চন্দ্র, মেঘ ও বৃষ্টি। অপের উর্দ্ধে তেজের স্তর, তেজ সূর্য্য, তেজের উর্দ্ধে মরুতের স্তর ও মরুতের উর্দ্ধে আকাশ বা ব্যোমের স্তর। অতএব ব্যোম বা আকাশের স্তর যে ক্ষিতির কত উর্দ্ধে তাহা ঠিক বলা সুকঠিন। ব্যোম বা আকাশই শব্দের আধার। ব্যোম বা আকাশ ব্যতীত কোন প্রকার শব্দের বিকাশ হইতে পারে না। কিন্তু সেই আকাশ কোথায়? উর্দ্ধে, অতি উর্দ্ধে, কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই আকাশের গুণে আমরা সর্ব্বদা শব্দোচ্চারণ করি, আকাশ না থাকিলে, এক মুহূর্ত্তে আমাদিগের বাক্‌রোধ হইয়া যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে আমরা কিরূপে আকাশকে প্রাপ্ত হই? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন নহে। যেমন সূর্য্যমণ্ডল ও বায়ুর স্তর পৃথিবী হইতে অনেক দূরবর্ত্তী হইলেও আমরা

স্পর্শ-তরঙ্গ যেমন সর্ব্বদা আমাদিগকে আঘাত করে,—অন্যথা—সূর্য্য তেজের অভাবে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর বা পরিপক্ক হয় না এবং বায়ুর স্পর্শ-তরঙ্গের অভাবে আমাদিগের শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে, তদ্রূপ ব্যোম বা আকাশ পৃথিবী হইতে বহু দূরবর্ত্তী হইলেও আমরা তাহার শব্দ তরঙ্গের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত,—অন্যথা আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচিনা, কথা বলিতে পারি না, বাক্‌রোধ হইয়া আমাদিগের মৃত্যু ঘটে। ক্ষিতির মূল অপ্, অপের মূল তেজ, তেজের মূল মরুৎ ও মরুতের মূল ব্যোম বা আকাশ। এইরূপে পদার্থের মূল উর্দ্ধে বলিয়া গীতায় জগৎরূপী অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উর্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন অগ্নি সূর্য্যমণ্ডলের জিনিস, তদ্রূপ শব্দ মহাকাশের জিনিষ। যদি এক মুহূর্ত্তে জীব ও উদ্ভিদ জগৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, তথাপি জগদ্দেহের ক্ষিত্যাদি পদার্থের অস্তিত্ব এবং তাহাদিগের গুণ বিনষ্ট হইবেনা এবং চঞ্চল বায়ুর বিচরণ, সূর্য্যের আলোক ও দীপ্তি, মেঘের গর্জ্জন প্রভৃতিও অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং তেজের রূপ-তরঙ্গ, বায়ুর স্পর্শ-তরঙ্গ ও ব্যোমের শব্দ-তরঙ্গ যে, সূর্য্য, বায়ু ও আকাশের জিনিস, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই আকাশই ব্যোম এবং ব্যোমই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ভাষিত ইথার। ব্যোমই শূন্য, শূন্যই ছিদ্র, ছিদ্রই ছিদ্রও বটে, পদার্থও বটে, কারণ পদার্থ মাত্রেরই গুণ থাকিবে, গুণব্যতীত পদার্থ থাকিতে পারে না। অতএব আকাশে যখন লঘুতা গুণ বিদ্যমান, তখন আকাশও অবশ্যই পদার্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ইথার এত লঘু যে তাহাতে ভারিত্ব গুণটি পর্য্যন্ত অনুমিত হয় না, আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে এই মতেরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, আকাশের গুণ লঘু। বলাবাহুল্য, আকাশ ও ব্যোম্ একই পদার্থ এবং আকাশ বা ব্যোমেরই ইংরাজী নাম ইথার। এই ব্যোমই শব্দের আধার। ব্যোম ব্যতীত শব্দের বিকাশ হইতে পারে না। স্বর্ শব্দে আকাশ এবং স্বর শব্দে সপ্তস্বর। স্বর্ বা আকাশ হইতে স্বর বা শব্দ উচ্চারিত হয়। যে কোন প্রকার শব্দ এই সপ্ত স্বরের অন্তর্গত। সপ্তস্বর এই—

"তত্রৈকগুণ মাকাশং শব্দ ইত্যেব তৎ স্মৃতম্।
তস্য শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরং বিবিধাত্মকম্॥
ষড়্জর্ষভগান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চম স্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
এষঃ সপ্তবিধঃ প্রোক্তো গুণ আকাশসম্ভবঃ। মহাভারত।

আকাশের গুণ শব্দ, শব্দ নানাবিধ। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম

অতএব যে কোন শব্দ এই সপ্তস্বরের অন্তর্গত। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়, শব্দ ও সুর উভয়ে বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ে অভিন্ন বা একই পদার্থ। স্বর বা সুর হইতেই শব্দ নির্গত হয়। এই সপ্তস্বরের আগুক্ষর বা স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি লইয়া সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে সুর সাধনা করিয়া থাকেন। শব্দ যে আকাশের গুণ, তাহা আমরা মেঘের গর্জ্জনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মেঘের গর্জ্জনই আদি শব্দ এবং ঐ শব্দই জীব জন্তুতে ও অন্যান্য বস্তুতে ধ্বনিত হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই পঞ্চভূতাত্মক, তবে যে পদার্থে পৃথিবীর অংশ অধিক, তাহাকে পার্থিব, যে পদার্থে আকাশের গুণ অধিক, তাহাকে আকাশীয় ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। আকাশীয় পদার্থের লক্ষণ এই—

শ্লক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মৃদু ব্যবায়ি বিবিক্তমব্যক্তরসং শব্দবহুল মাকাশীয়ং।
তন্মার্দ্দবশৌষির্য্যলাঘবকর মিতি।

যে দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ বা মসৃণ, সূক্ষ্ম, ব্যবায়ী, অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত রস এবং শব্দবহুল তাহা আকাশীয়। আকাশীয় পদার্থ মৃদুতা, ছিদ্রতা ও লঘুতা জনক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামোফোনের সাউণ্ডবক্স গ্রামোফোনের কণ্ঠস্বর, সাউণ্ড বক্স হইতেই প্রকৃত পক্ষে সুর নির্গত হয়, কিন্তু প্রশ্ন এই—উহাতে এমন কোন পদার্থ আছে যে তদ্দ্বারা শব্দ উৎপন্ন ও নির্গত হয়? উহাতে যে পদার্থ বিগুমান, তাহার নাম অভ্র। যেমন মানুষ, পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুতে শব্দ গুণ বিগুমান, তদ্রূপ অভ্রেও শব্দগুণ বিগুমান। পদার্থ দ্বিবিধ, চেতন ও অচেতন। চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ পদার্থই ক্ষিত্যাদি অষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট, তবে পদার্থ- বিশেষে প্রকৃতির তারতম্য আছে। কোন পদার্থে ক্ষিতির, কোন পদার্থে অপের অংশ অধিক ইত্যাদি। অপিচ যে পদার্থে ক্ষিতির অংশ অধিক, সেই পদার্থে ক্ষিতির গুণ এবং যে পদার্থে অপের অংশ অধিক, সেই পদার্থে অপের গুণ সমধিক পরিস্ফুট। চেতন ও অচেতন উভয়বিধ পদার্থেই এইভাব বিগুমান। চেতন ও অচেতনে প্রভেদ এই—চেতনের ইন্দ্রিয় বিগুমান, অচেতনে ইন্দ্রিয়াভাব। চরকে দেখিতে পাই—

খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্য-সংগ্রহঃ।
সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয় মচেতনম্॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ সমূহ এই সকল দ্রব্য। ইন্দ্রিয়

অতএব অচেতনে কেন শব্দগুণ না থাকিবে? অভ্র অচেতন, অভ্রে শব্দ গুণ বিদ্যমান. তবে অভ্র ইন্দ্রিয়বিহীন বলিয়া মানুষ, পশু পক্ষীর ন্যায় স্বয়ং রব করিতে পারে না, কিন্তু অন্য পদার্থের সংযোগে তাহার শব্দ গুণের বিকাশ হয়, চেতন ও অচেতনে এই মাত্র প্রভেদ। গ্রামোফোনের শব্দের বাক্‌সে অভ্র এবং তড়িৎ শক্তি বিশিষ্ট তার একত্র সংযুক্ত থাকে, তজ্জন্য তড়িৎ শক্তির সঙ্ঘর্ষে অভ্র হইতে স্বর নির্গত হয়। যেমন আকাশে সৌদামিনীর সংযোগে মেঘ হইতে শব্দ নির্গত হয়, তদ্রূপ সাউণ্ড বক্‌সের তড়িৎশক্তি বিশিষ্ট তারের সংযোগে অভ্র হইতে শব্দ নির্গত হয়। অভ্র যে আকাশীয় পদার্থ এবং অভ্র হইতেই যে শব্দ নির্গত হয়, তাহা অভ্রের গুণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। যে পদার্থ মসৃণ, মৃদু, ব্যবায়ী, অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত রস এবং শব্দবহুল, তাহা আকাশীয় পদার্থ। আকাশীয় পদার্থ দেহের মৃদুতা, ছিদ্রতা ও লঘুতাজনক। অভ্র—আকাশীয় পদার্থ বা আকাশ হইতে জাত, কারণ অভ্র মসৃণ. মৃদু. ব্যবায়ী, অভ্রে অম্ল মধুরাদি কোন্ রস অবস্থিত, তাহা বলা যায় না। অভ্র—শব্দ বহুল, কারণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে শব্দ নির্গত হয়। অভ্রের উৎপত্তির বিবরণ আয়ুর্ব্বেদে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

অথাভ্রকস্যোৎপত্তির্নাম লক্ষণগুণাশ্চ।
পুরা বধায় বৃত্রস্য বজ্রিণা বজ্র মুদ্ধৃতম্।
বিস্ফুলিঙ্গা স্ততস্তস্য গগনে পরিসর্পিতাঃ।
তে নিপেতুর্ঘনধ্বানাচ্ছিখরেষু মহীভৃতাং।
তেভ্য এব সমুৎপন্নং তত্তদ্গিরিষু চাভ্রকম্॥

পুরাকালে বৃত্রাসুরকে নিধন করিবার জন্য বজ্রধারী ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে, ঐ বজ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত ও আকাশে উড্ডীয়মান এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া মেঘগর্জ্জন শব্দ সহকারে বড় বড় পর্ব্বতের শিখরদেশে পতিত হইয়াছিল, এইরূপে যে যে পর্ব্বতে ঐ অগ্নিকণা নিপতিত হইয়াছে, সেই সেই পর্ব্বতেই ঐ অগ্নিকণা হইতে অভ্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

তদ্বজ্রং বজ্রজাতত্বাদভ্রমভ্ররবোদ্ভবাৎ।
গগনাৎ স্খলিতং যস্মাদ্ গগনঞ্চ ততো মতম্॥

ইন্দ্রের বজ্র হইতে অভ্র উৎপন্ন, একারণ অভ্রের এক নাম বজ্র, মেঘের গর্জ্জন হইতে উৎপন্ন, একারণ উহার এক নাম অভ্র এবং আকাশ হইতে স্খলিত,

পাঠক দেখিলেন, অভ্র স্বর্গীয় পদার্থ। স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের নিঃক্ষিপ্ত বজ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত, এবং তাহা আকাশে উড্ডীয়মান ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া মেঘ গর্জ্জনবৎ শব্দের সহিত পর্ব্বতে নিপতিত হইয়াছিল, ঐ অগ্নিকণা হইতে অভ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তজ্জন্য অভ্রে অগ্নিগুণ, মেঘের গর্জ্জন বা আকাশের শব্দগুণ বিদ্যমান। আকাশ, মেঘ ও শব্দগুণ বিশিষ্ট, তজ্জন্য অভ্রে মেঘের গর্জ্জন ও আকাশের ছিদ্রতা, এবং লঘুতা ও শব্দ প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান। অভ্র চতুর্ব্বিধ—

পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।

অভ্র চারিপ্রকার পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্রাভ্র।

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অভ্র হইতে শব্দ নির্গত হয়।

দর্দ্দুরং ত্বগ্নিনিঃক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিম্।

দর্দ্দুর নামক অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে, ভেকের ন্যায় শব্দ করে।

নাগন্তু নাগবদ্বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি।

নাগাভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে সর্পের ফুৎকার সদৃশ শব্দ হয়।

এক্ষণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, তড়িৎ শক্তি বিশিষ্ট তারের সংযোগে অভ্র হইতেই গ্রামোফোনের শব্দ নির্গত হয়। তড়িৎ, বিদ্যুৎ, সৌদামিনী ও অগ্নি এ সকলই সূর্য্যের শক্তি। তজ্জন্য আকাশে সৌদামিনীর সংযোগে মেঘের গর্জ্জন পরিশ্রুত হয়। প্রশ্ন এই—আমরা তো স্বর্গে বাস করি না, অতএব ক্ষিতিতত্ত্বে অবস্থান করিয়া কিরূপে স্বর্গের বা আকাশের ক্রিয়া বুঝিতে পারি? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন নহে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহু দূরবর্ত্তী হইলেও, তাহার ঘনীভূত তেজ পৃথিবীতে অগ্নিরূপে বিদ্যমান এবং আকাশ ও মেঘ বহু দূরবর্ত্তী হইলেও, আকাশীয় বস্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান, সুতরাং অগ্নি ও আকাশীয় বস্তুর যে সংযোগ, তাহা বস্তুতঃ সূর্য্য এবং আকাশেরই সংযোগ এবং এই সংযোগের ক্রিয়া দেখিয়া সূর্য্য ও আকাশের ক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়। অভ্র শব্দবহুল বা আকাশীয় পদার্থ।

পাঠক! আপনি হয়ত এযাবৎ শুনিয়া আসিতেছেন, অভ্র খনিজ পদার্থ, বলা বাহুল্য, ইহা আধুনিক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মত এক্ষণে মত পরিবর্ত্তন করিয়া ঋষিদিগের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিবেন কি?

উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা প্রত্যেক পদার্থেই বিদ্যমান, সুতরাং অভ্রও উৎকৃষ্ট

অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্বং গুণাধিকম্।
দক্ষিণাদ্রিভব মল্পসত্বং স্বল্পগুণপ্রদম্॥

উত্তর দেশ বা হিমালয়জাত অভ্র অত্যন্ত সত্ববান্ ও গুণাধিক। দক্ষিণদেশীয় পর্ব্বতজাত অভ্র অল্পসত্ববিশিষ্ট ও অল্পগুণ প্রদ।

চতুর্ব্বিধ অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্র উৎকৃষ্ট—

সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ।

সকল অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্র শ্রেষ্ঠ, উহা সর্ব্বব্যাধি ও মৃত্যু বিনাশক।

অশোধিত অভ্র-ভস্মের দোষ।

অভ্র যথারীতি শোধন ও ভস্ম করিয়া সেবন করিতে হয়, কারণ অভ্রে নানাবিধ গিরিজ দোষ বিদ্যমান। অশোধিত অভ্র সেবনে এই সকল পীড়াজন্মে—

পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথং।
হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধ মভ্রস্বগুরুং গুরুতাপ্রদং স্যাৎ॥

অশুদ্ধ অভ্র নানাবিধ রোগ এবং কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদয় ও পার্শ্বগত বেদনা ও শরীরের গুরুতা উৎপান করে।

অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীত মায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠপ্লীহোদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ॥

শোধিত অভ্রভস্ম কষায়রস, মধুররস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমি-বিনাশক।

রোগান্ হন্তি দ্রঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে।
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব॥
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্।
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্॥

নিত্য সেবিত মৃতাভ্র—ব্যাধি বিনাশক, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক, বীর্য্য-বর্দ্ধক ও অত্যন্ত কোমলতা জনক। অপিচ উহা দীর্ঘায়ু ও সিংহ বিক্রম তুল্য পরাক্রমশালী পুত্র জনক, অকাল মৃত্যু নাশক এবং ইন্দ্রিয় শক্তি-বর্দ্ধক।

এক্ষণে দেখা যাউক, রেকর্ডের উপাদান কি এবং কিরূপেইবা উহাতে শব্দ আকৃষ্ট হয় ও আবদ্ধ থাকে। রেকর্ডের উপকরণ লাক্ষা, লাক্ষার বাঙ্গলা নাম গালা, গালায় রেকর্ড প্রস্তুত হয়। দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকার উপর বজ্রপতন

সম্পন্ন, তড়িৎ, সৌদামিনী ও বজ্র সূর্য্য মণ্ডলের শক্তি, সেই শক্তি প্রত্যেক ধাতব পদার্থে বিদ্যমান, পদার্থের স্বভাব এই যে, সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীকে আকর্ষণ করে, তজ্জন্য অট্টালিকার উপর বজ্র নিপতিত না হইয়া লৌহদণ্ডের উপর পতিত হয়। লাক্ষা বা গালা তৈজস বস্তু, যেমন লৌহাদি ধাতব পদার্থে তেজ বা সূর্য্যশক্তি নিহিত থাকে, এবং তাহার আকর্ষণ প্রভাবে অট্টালিকায় বজ্র পতিত না হইয়া লৌহদণ্ডে পতিত হয়, তদ্রূপ গালাপদার্থেও সূর্য্যের তেজ নিহিত থাকে, তবে ধাতব পদার্থে যে ভাবে থাকে, গালায় সে ভাবে থাকে না। গালা অগ্নি-সংযোগে যেরূপ ভস্মীভূত হয়, লৌহাদি ধাতব পদার্থ অগ্নি-সংযোগে তদ্রূপ ভস্মীভূত হয় না। কারণ লৌহ ও অভ্রাদি পদার্থ, মূল পদার্থ, তজ্জন্য অগ্নি সংযোগেও সহজে বিকৃত বা রূপান্তরিত হয় না। গালায় সূর্য্য শক্তি নিহিত থাকে বলিয়াই সঙ্গীত, সুর ও শব্দ তাহাতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যেমন লৌহদণ্ডে বিদ্যুৎশক্তি আকৃষ্ট হইলেও, লৌহদণ্ডে তাহা আবদ্ধ থাকে না এবং পুনর্ব্বার তাহা সূর্য্য মণ্ডলে গমন করে, তদ্রূপ শব্দ ও সুর, তেজের সমধর্ম্মী বলিয়া গালায় শব্দ আকৃষ্ট হইলেও তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার কথা নহে, প্রশ্ন এই—তবে কেন আবদ্ধ থাকে ? কারণ গালা পিচ্ছিল বস্তু, পিচ্ছিল বস্তু মাত্রেই তন্তুযুক্ত ও আটা। যেমন কাঁঠালের আটা হস্ত পদাদিতে সংলগ্ন হইলে, তাহাতে হস্ত পদাদি আটকাইয়া যায়, তদ্রূপ গালা অগ্নি সন্তাপে দ্রব করিয়া তদবস্থায় তন্নিকটে কোন ধ্বনি করিলে, তাহা গালায় আটকাইয়া যায়, তদ্রূপ সঙ্গীত ও শব্দ রেকর্ডে আকৃষ্ট হয় ও আবদ্ধ থাকে এবং পিনের সহিত রেকর্ডের সজ্ঘর্ষে ও তড়িৎ তারের সহিত অভ্রের সংযোগে সেই সঙ্গীত ও শব্দ সুর, তাল, মান ও লয় সহকারে গ্রামোফোনে ধ্বনিত হয়। আমার এইরূপ অনুমান, বলাবাহুল্য, অনুমান প্রত্যক্ষমূলক, কারণ জগতে যে ভাব বা পদার্থ নাই, জীব কখনও তাহার অনুমান করিতে পারে না, তাহা অনুমান খণ্ডের বহির্ভূত, তবে সকলেরই জানা উচিত যে, কেবল অনুমানে বা কথায় ক্রিয়া-নিষ্পত্তি হয় না, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া চাই।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর সজ্ঘর্ষে বা ঘাত প্রতিঘাতে আকাশ হইতে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ অপর কিছুই নহে, "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" বা ব্যোম। দেখা যায় দুইটি পদার্থের পরস্পর সজ্ঘর্ষে প্রথমে শব্দ ও পরে তাপোৎপন্ন হয়, সুতরাং তাপ শব্দাধীন, শব্দব্যতীত তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না এবং তাপ

তাপ যে চঞ্চল বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তাপ ও তেজ যে অভিন্ন ও সূর্য্যমণ্ডলেরই শক্তি, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে ?

ইহার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যুৎ ও বজ্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে, বিদ্যুৎ ও বজ্র আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষের ফল, পরন্তু উহারা অগ্নিযুক্ত এবং অগ্নি সূর্য্য-তেজেরই ঘনীভূতাবস্থা।

শব্দ দ্বিবিধ, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। যাহা অক্ষরে বা বর্ণে লেখা যায়, তাহাই বর্ণাত্মক শব্দ এবং যাহা মুখে ব্যক্ত হয়, তাহাই ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বর্ণাত্মক শব্দের ন্যায় ধ্বন্যাত্মক শব্দেরও আকার আছে, অন্যথা আকারপরিশূন্য হইলে, তাহা কোন পদার্থে আবদ্ধ করিয়া বা আটকাইয়া রাখিতে পারে না, কেবল মাত্র সেই একমেবাদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম নিরাকার, তিনি কোন বস্তুতেই আবদ্ধ নহেন। পরন্তু আত্মা সাকার এবং তিনি যাবৎ পদার্থের মায়া বা আসক্তি ত্যাগ করিতে না পারেন, তাবৎ পদার্থের সহিত সংযুক্ত থাকেন।

মাতৃ-আরাধনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার।

(১)

শরতে সারদা পূজা আবার আসিল।
জগত জুড়িয়া সেই ঘোষণা বাজিল॥
কি এক আনন্দ ভাবে, নেহার মগন সবে,
আশার উল্লাসে যত হৃদয় নাচিল।
দুখ জ্বালা শোক তাপ সব ঘুচে গেল॥

(২)

নব বেশ নব ভুষা করিয়া ধারণ।
সবে মিলে সাজিয়াছে অপূর্ব্ব শোভন॥
সবার বয়ানে হাসি, প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
এক ভাবে এক ধ্যানে সকলে বিভোর।

(৩)

তিনদিন তরে হায় মায়েরে পাইয়া।
হেন জাগরণে যদি মাতে সব হিয়া॥
চিরতরে মাকে পেলে, না জানি কি ফল ফলে,
না জানি কি ভাবে সবে হয়রে মগন!
না জানি কি বহে প্রেম সুখ প্রস্রবণ!!

(৪)

ভেবে দেখ, কিবা শোভা কৈলাস ভবনে।
শঙ্করের বামে চির শঙ্করী মিলনে॥
বলবীর্য্য, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, সুশোভিতা বিদ্যাবুদ্ধি,
হিংসা দ্বেষ নাহি লেশ, সব দূরে গত।
পবিত্র জাহ্নবী সদা তথা বিরাজিত॥

(৫)

ভূত প্রেত দৈত্যসহ ঋষির মিলন।
মূষিক ময়ূরে নাহি বিবাদ কখন॥
মৃগেন্দ্র বৃষভ দোঁহে, মিশিয়াছে এক দেহে,
ভয় ত্রাস দ্বিধানাশ পুণ্য দরশন।
মার আগমনে হেথা কি মধু মিলন!

(৬)

জেগেছ যদিরে ভাই জাগো চিরতরে।
চিরন্তন হৃদিমাঝে রাখো মাকে ধোরে॥
জ্ঞানী ধনী অভিমান, দুঃখী দীন ভেদ জ্ঞান,
পরিহার কর সবে মাতৃ দরবারে।
পূজ সবে একপ্রাণে মাকে ভক্তিভরে॥

(৭)

রাজরাজেশ্বরী মাতা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।
দুঃখীরূপা ধূমাবতী সেই একই মাতা॥
মায়ের আদর্শ নিয়ে, ভেদাভেদ দূরে দিয়ে,
এস সবে একপ্রাণে হাতে হাতে ধরি।
মায়ের সমীপে গিয়ে পদ পূজা করি॥

(৮)

স্বার্থের পশরা আজ ফেলে দাও দূরে।
নিঃস্বার্থ মঙ্গল ভাবে হৃদি দাও ভরে॥
ত্যাগীশ্বর শিব সম, কর হৃদি অনুপম,
মায়ের মঙ্গল ঘট তাহাতে রচনা।
হৃদে হৃদে কর সবে তাহার স্থাপনা॥

(৯)

প্রাণ ঢালি ভালবাসা দাও পরস্পরে।
উচু নীচু জ্ঞান ভাই রেখনা অন্তরে॥
শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বাস, অন্নাভাবে হাহুতাশ,
ঐ যে কাঙ্গাল দীন—ডাকরে উহারে।
আলিঙ্গনে বাঁধ তব হৃদয় ভিতরে॥

(১০)

শত্রু মিত্র ভেদাভেদ করে দাও দূর।
মায়ের মঙ্গল গীতি গাও হে মধুর॥
কল্যাণী জননী যার, কোথা অমঙ্গল তার,
মার পদ পূজ সবে থেক নাকো দূর।
অন্তরে পাইবে শান্তি হৃদি ভরপুর॥

(১১)

এসেছ জননী যদি দেহ এই বর।
তোমারে অন্তরে যেন হেরি নিরন্তর॥
আজি যে উৎসব হেথা, রহে যেন চির গাথা,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন সতত বিকাশে।
তব পূজা হয় যেন মানসে মানসে॥

(১২)

আমি মার, মা আমার, যেন নাহি ভুলি।
ভায়ে ভায়ে মিলি যেন মার কাছে খেলি॥
চরণের ধূলি দিয়ে, পবিত্র কর মা হিয়ে,
তোমার পূজাতে যেন হয়ে থাকি লীন।

(১৩)

যতনে সাধনা রত হও দেখি ভাই।
মন হতে যাবে সব আপদ বালাই॥
আপনারে হীন ভেবে, থেকনা সংসারে ডুবে,
মাতৃ আগমনে যদি পাইলে চেতনা।
শ্রদ্ধাভরে কর তবে মাতৃ-আরাধনা॥

(১৪)

মায়ের সন্তান মোরা এ দৃঢ় ধারণা।
হৃদয়ে ধরিয়া কর তাঁর উপাসনা॥
সন্তান বৎসল মাতা, আদরে কহিবে কথা,
মলিন বদন যত মুছাবে যতনে।
শোক তাপ দূরে যাবে মাতৃ আগমনে॥

(১৫)

তাপহরা, ওমা তারা, দীন দয়াময়ি!
জনমে জনমে যেন মোরা তব হই॥
তব পদ পাশরিয়ে, কামিনী কাঞ্চন নিয়ে,
হেন দশা হয়েছে মা, আমা সবাকার।
বুঝেছি বুঝেছি মা! তা বুঝেছি এবার॥

গীত।

বাসনা করেছি মনে তোমার সঙ্গে থাকিব,
কে আছে আমার আর কার কাছে যাইব।
কত লোকের কত আছে, মনের সাধে বেড়াতেছে,
ভাবি আমি একা বসে জানিনা কি করিব,
সংসারের কোলাহলে দিন যে গেল চলে,
বিলম্ব আর হ'লে পরে দুকুল হারাব।
কত দুঃখ পাইলাম, কত আমি কাঁদিলাম,
এবার তোমার সঙ্গে থেকে চির সুখী হইব।

যস্যাভিমানোমোক্ষেঽপিদেহেঽপিমমতাতথা।
ন বা জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ ॥ ১০ ॥
হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ব বিস্মরণাদৃতে ॥ ১১ ॥
ইতি বিশেষোপদেশৈকাদশকং ষোড়শ প্রকরণম্।

সপ্তদশ প্রকরণম্।

গুরুঃ।

তেন জ্ঞানফলং প্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা।
তৃপ্তঃস্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যমেকাকী রমতে তু যঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার মোক্ষাভিমান আছে, তাঁহার দেহাভিমানও রহিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকে জ্ঞানী বা যোগী বলা যায় না। সে কেবল দুঃখভাগী।—যেহেতু সে ত্যাগী হইয়াও মুক্ত নহে। ১০।

তদ্ভিন্ন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উপদেষ্টা হইলেও, সর্ব্ববিস্মৃতি ব্যতীত সুখী হইতে পারিবে না।—আমি এবং আমার, অনুরাগ, অথবা দ্বেষ, ত্যাগ বা ইচ্ছা, এসকল কোন জ্ঞানই থাকিবে না; তাহা হইলেই সমস্ত বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। এই সংসারের এবং দেহের অস্তিত্বজ্ঞান-শূন্য হওয়া আবশ্যক। তাহাই মুক্তি। ১১।

যিনি তৃপ্ত, ইন্দ্রিয়-মল-বিহীন, নিয়ত নিঃসঙ্গ ও সন্তুষ্ট, তাঁহারই জ্ঞান ও যোগাভ্যাসের ফল লাভ হইয়াছে।—ক্রিয়াযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই উভয়ই চিত্ত শান্ত করণোপায়। চিত্ত শান্ত হইলে ভোগলালসা তৃপ্ত হয়, বিনা উপভোগেও উপভুক্তবৎ চিত্ত তৃপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়সমূহও বিষয়[illegible]বিরতি—হেতু নির্ম্মল হয়, এবং পরমানন্দ লাভ হয়। সুতরাং, এই সকল হইলে, যোগ এবং জ্ঞানের ফল লাভ

ন কদাচিৎ জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতে।
যত্র একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ ॥ ৩ ॥
যস্তু ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতঃ।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ ॥ ৪ ॥
বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলো হি মহাশয়ঃ ॥ ৫ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা ন হি ॥ ৬ ॥
বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥

ইহ জগতে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কদাচই খিন্ন হন না; যেহেতু তিনি জানেন, যে তিনিই একাকী সমগ্র বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যাপিয়া আছেন। ২।

সল্লকীপল্লব ভক্ষণে আনন্দিত করী-শাবকের পক্ষে নিম্ব যেমন প্রীতিকর হয় না, আত্মানন্দে আনন্দিত ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ভোগও তদ্রূপ অপ্রীতিকর। ৩।

যিনি উপভুক্ত বিষয়ে অনাসক্ত এবং অনুপভুক্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাশূন্য, তাদৃশ ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। ৪।

ইহ জগতে ভোগ ও মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিই দেখা যায় (অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই ভোগবাসনা রত, এবং মোক্ষাভিলাষী যদিও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক, তত্রাচ দেখিতে পাওয়া যায়); কিন্তু যিনি ভোগ বা মোক্ষ কিছুই কামনা করেন না, (যাঁহার সর্ব্ব বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে,) এরূপ মহানুভব নিতান্ত বিরল। ৫।

এরূপ উদারচিত্ত লোকের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং জীবন ও মৃত্যু সকলই সমান। কিছুতেই প্রীতি বা বিরতি নাই। ৬।

তিনি বিশ্বের প্রলয়াকাঙ্ক্ষাও করেন না, স্থিতিতেও তাঁহার দ্বেষ নাই, যাহা কিছু জীবনধারণোপায় থাকে, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করত যথা সুখে অবস্থান করেন, সুতরাং তিনিই ধন্য। ৭।

কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেন ত্বেবং গলিতধীঃ কৃতী।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৮ ॥
শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্বা ক্ষীণসংসারসাগরে ॥ ৯ ॥
ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা কাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্রে বিমলাশয়ঃ।
সর্ব্বত্র বাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্ব্বত্র রাজতে ॥ ১১ ॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্ণন্ বদন্ ব্রজন্।
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
ন দদাতি ন গৃহ্ণাতি মুক্তঃ সর্ব্বত্র নীরসঃ ॥ ১৩ ॥

উক্ত জ্ঞানলাভে কৃতার্থ ব্যক্তি বিগলিতবুদ্ধি এবং কৃতী; তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণাস্বাদনাদি ইন্দ্রিয়কার্য্য সমূহ করিয়াও যথাসুখে অবস্থান করিয়া থাকেন।—যদৃচ্ছাগত বিষয়ভোগে আসক্তি বা বিরক্তি না থাকাই শান্তিসুখ। ৮।

তাঁহার শূন্যদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়সমূহ বিফল, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুতেই অভিলাষ বা বিরক্তি নাই। ৯।

মুক্তচিত্ত জনের অবস্থা কি চমৎকার! তিনি জাগ্রতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, এবং উন্মেষ ও নিমেষশূন্য।—তিনি নিদ্রিতের ন্যায় নিমীলিতনেত্র ও ইন্দ্রিয়কার্য্যরহিত নহেন, অথচ জাগ্রতবৎ চেষ্টা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়োপভোগাদি রহিত। ১০।

মুক্ত ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই সুখী রূপে দৃষ্ট, সকল বিষয়ে বিশুদ্ধাশয় এবং আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া সকল বিষয়ে বিরাজিত। ১১।

যে মহাশয় ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, আহার, গ্রহণ, কথন ও ভ্রমণ করিলেও মুক্ত। ১২।

মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র নীরস, অর্থাৎ তিনি নিন্দাও করেন না, স্তবও করেন না,

সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্‌।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
সুখে দুঃখে নরে নার্য্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ ১৫ ॥
ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণেনরে ॥ ১৬ ॥
ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুপাশ্নুতে ॥ ১৭ ॥
সমাধানাসমাধানহিতাহিতবিকল্পনাঃ।
শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিবসংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়া।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি ন ॥ ১৯

যে মহাশয়ের চিত্ত কিছুতেই বিহ্বল হয় না, অনুরাগিনী পত্নী বা সমুপস্থিত মৃত্যু উভয়েই সমান ভাব এবং সুস্থ, তিনিই মুক্ত। ১৪।

সর্ব্বত্র সমদর্শী ধীর ব্যক্তির নিকট সুখ ও দুঃখে, নর এবং নারীতে, সম্পদ্‌ এবং বিপদে, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ১৫।

তাঁহার বৃত্তিসমূহ নিরস্ত হওয়ায়, হিংসা, দয়া, ঔদ্ধত্য, দৈন্য, আশ্চর্য্যতা, বা ক্ষোভ কিছুই নাই। ১৬।

মুক্ত ব্যক্তি বিষয়বিদ্বেষী বা বিষয়লোলুপ নহেন, তিনি প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বিষয় অনাশক্ত ভাবে উপভোগ করেন। ১৭।

কৈবল্য মাত্রে সংস্থিত শূন্য চিত্ত ব্যক্তি, কার্য্যের সমাপ্তি বা অসমাপ্তি এবং হিতাহিত কিছুই অবগত নহেন। ১৮।

এ সংসার অকিঞ্চিৎকর নিশ্চয়কারী, অহঙ্কার ও মমতা শূন্য, এবং অন্তঃকরণ

মনঃপ্রকাশসংমোহ স্বপ্নজাড্যবিবর্জ্জিতঃ।
দশাং কামপি সংপ্রাপ্তো ভবেদ্গলিতমানসঃ ॥ ২০

ইতি তত্ত্বজ্ঞস্বরূপবিংশতিকং সপ্তদশপ্রকরণম্।

—•—

অষ্টাদশ প্রকরণম্।

শান্তিশতকং।

যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১ ॥
অর্জ্জয়িত্বাখিলানর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ন হি সর্ব্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥ ২ ॥

তাঁহার চিত্ত মোহ, বিকাশ, স্বপ্ন ও জড়তা শূন্য, এবং গলিতমানস হইয়া তিনি কি এক অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! ২০।

—•—

অষ্টাবক্রের শান্তিশতক, অর্থাৎ শান্তি বিষয়ক শত শ্লোক :—

যে পরমাত্মার জ্ঞান উদয় হইলে, সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ ভ্রমমাত্র প্রতীত হয়, সেই সুখ স্বরূপ, শান্ত, ও তেজোময় পরমাত্মাকে নমস্কার।—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে দৃষ্ট সুখ দুঃখ যেমন অপ্রকৃত মনে করে, জ্ঞান হইলে এই সংসারও ঠিক তদ্রূপ অনুভূত হয়। ১।

জীব বিপুল অর্থোপার্জ্জন করত বহুবিধ ভোগই করিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ব পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইতে পারে না।—ভোগ অর্থাৎ সুখ দুঃখ উভয়বিধ ভোগ;

কর্ত্তব্যদুঃখমার্ত্তণ্ডজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ।
কুতঃ প্রশমপীযূষ ধারাসারমৃতে সুখম্ ॥ ৩ ॥
ভবোঽয়ং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ।
নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবিনাম্ ॥ ৪ ॥
ন দূরং ন চ সংকোচাল্লব্ধমেবাত্মনঃ পদম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরায়াসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ৫ ॥
ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ।
বীতশোকাবিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ ॥ ৬ ॥
সমস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ।
ইতি বিজ্ঞায় ধীরো হি কিমভ্যস্যতি বালবৎ ॥ ৭ ॥

সংসারে কর্ত্তব্যকর্ম্মই দুঃখ, ঐ দুঃখরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধচিত্ত ব্যক্তি শান্তিরূপ অমৃত ধারা ব্যতিরেকে কি রূপে সুখী হইতে পারে?—মুক্তের কর্ত্তব্য কিছুই নাই, অকর্ত্তব্যও নাই। ৩।

এই সংসার প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নহে, কেবল কল্পনা মাত্র। স্বভাবের অভাব কখনও হয় না; এই বিশ্ব সংসারের অস্তিত্ব বা অভাব কেবল চিন্তাশীল জীবের কল্পনা মাত্রে অবস্থিত।—বস্তুতঃ এক আত্মাই নিত্য, জগৎ প্রপঞ্চ মায়া মাত্র। ৪।

বিকল্প শূন্য, অনায়াস লভ্য, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন ব্রহ্মপদ দূরও নহে এবং সান্নিধ্য-হেতু লব্ধপ্রায়ও নহে।—ব্রহ্মপদ কিহেতু অনায়াসলভ্য তাহা ১৫ অধ্যায় ২ শ্লোকে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জীবের ভ্রান্তিবশতঃ তাহা নিত্যলব্ধ হইয়াও অলব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ৫।

মোহমাত্র নিবৃত্ত হইয়া আত্ম-স্বরূপোপলব্ধি হইবামাত্র, দৃষ্টি আবরণশূন্য হওয়ায়, জীব বিগতক্লেশ হইয়া বিরাজ করিয়া থাকে।—যত দিন মোহজালে দৃষ্টি আচ্ছাদিত থাকে, ততদিন আত্মজ্ঞান হয় না। ৬।

আত্মা মুক্ত ও নিত্য, পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই কল্পনা মাত্র। ধীর অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জানিয়াও বালকের ন্যায় অপর কোন্ বিদ্যা অভ্যাস করিবেন?—এই সহজ কথা জানিলে আর [illegible]

আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ কল্পিতৌ।
নিষ্কামঃকিংবিজানাতিকিংব্রূতেচকরোতিকিম্ ॥ ৮ ॥
অয়ং সোঽহময়ং নাহম্ ইতি ক্ষীণা বিকল্পনাঃ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য তুষ্ণীংভূতস্য যোগিনঃ ॥ ৯ ॥
ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ ॥ ১০ ॥
স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে।
নির্ব্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ ॥ ১১ ॥
ক্ক ধর্ম্মঃ ক্ক চ বা কামঃ ক্ক চার্থঃ ক্ব বিবেকিতা।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১২ ॥
কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন ক্কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথাজীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৩ ॥

আত্মাই ব্রহ্ম এবং পরিদৃশ্যমান ভাব ও অভাবসমূহ সমস্তই কল্পনা মাত্র। নিষ্কাম ব্যক্তি (ইহা নিশ্চয় করিয়া) আর জানিবেনই বা কি, বলিবেনই বা কি, এবং করিবেনই বা কি ? ৮।

সমস্তই আত্মামাত্র নিশ্চয় করত তুষ্ণী অবলম্বনকারী যোগী ব্যক্তির, 'এই আমি এবং উহা আমি নহি' এইরূপ ভ্রান্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। ৯।

এইরূপ শান্ত যোগীর চিত্তবিক্ষেপ বা চিত্তের একাগ্রতা নাই, বুদ্ধির প্রাখর্য্য বা হীনতা নাই, এবং সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই। ১০।

নির্ব্বিকল্পস্বভাব যোগীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে, লাভে ও অলাভে, জনপদে ও বিজনে, কোন ইতর বিশেষ নাই। ১১।

ইহা করিয়াছি ইহা করি নাই, ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাববিরহিত যোগীর ধর্ম্মই বা কোথা ? কামনাই বা কিসের ? অর্থই বা কি নিমিত্ত এবং বিবেকিতাই বা কি ? —কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যের ধর্ম্মার্থকাম ও বিবেক কেমন করিয়া থাকিবে ? ১২।

জীবন্মুক্ত যোগীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা অভিলাষাদি থাকে না; তিনি কোনও রূপে জীবন নির্ব্বাহ করেন মাত্র।—ঐ জীবন নির্ব্বাহে প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইয়া [illegible] পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্ম্ম সঞ্চিত ছিল তাহা ভোগ করিতেই হইবে,

ক্ব মোহঃ ক্ব চ বা বিশ্বং ক্ব চ ধ্যানং ক্ব মুক্ততা।
সর্ব্বসংকল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্ব্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৫ ॥
যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিংচিন্তয়তিনিশ্চিন্তোদ্বিতীয়ংযোনপশ্যতি ॥ ১৬ ॥
দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে ত্বসৌ।
উদারস্তুনবিক্ষিপ্তঃসাধ্যাভাবাৎকরোতিকিম্ ॥ ১৭ ॥
ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্ত্তমানোঽপি লোকবৎ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্য পশ্যতি ॥ ১৮ ॥

সুতরাং তজ্জন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ না করিয়া ইহ জন্মেই সেই সমস্ত ভোগ করেন, এবং বাসনাদি বিরহিত হইয়া পুনরায় কর্ম্মসঞ্চয়ে বিরত হন। ১৩।

যে মহানুভব কল্পনামাত্র অতিক্রম করত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট মোহই কোথা? এই বিশ্বই বা কোথা? ধ্যানই কোথা আর মুক্তিই বা কোথা?—তিনি আদৌ বদ্ধই নহেন, সুতরাং তাঁহার আবার মুক্তি কিরূপ? ১৪।

যিনি বিশ্ব দেখিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি, বিশ্ব নাই এরূপ কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু যিনি বাসনাশূন্য হইয়াছেন, তিনি বিশ্ব দেখিয়াও দেখিতেছেন না, সুতরাং তিনি আর কি করিবেন?—পরোক্ষ জ্ঞানে বিশ্বের অভাব কল্পনা করিতে হয়, অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। ১৫।

যিনি পরব্রহ্ম দেখিয়াছেন, তিনিই অহং ব্রহ্ম চিন্তা করুন, (অর্থাৎ যাঁহার ব্রহ্ম ও অহং এই ভেদজ্ঞান আছে, তিনি অভেদ জ্ঞান সাধন করুন;) কিন্তু যিনি অদ্বৈত-দর্শী নির্ব্বিকল্প, তিনি আবার কিসের চিন্তা করিবেন? ১৬।

যাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ অনুভব হইয়াছে, তিনিই নিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু যে উদার ব্যক্তি চিত্তবিক্ষেপ শূন্য,সাধনীয় বিষয়ের অভাবে, তিনি আবার কিসের সাধনা করিবেন? ১৭।

যিনি ধীর এবং সংসার বিরাগী, তিনি সংসারে সাংসারিকের ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়াও আত্মার সমাধি, বিক্ষেপ অথবা আসক্তি প্রভৃতি কিছুই দেখেন

গিরিশ-স্মৃতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল।

শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র প্রথম হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। সে যাত্রা সামলাইবার পর হইতে গিরিশচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কি গুরুভ্রাতাগণ সকলেই তাঁহাকে পুনরায় রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন। বিধিমতে প্রয়াস পাইলেও কেহই তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

তাঁহার শরীর ত্যাগের কয়েকদিন পরে আমাকে প্রয়োজন বশতঃ মিনার্ভা থিয়েটারে তখনকার একমাত্র অছি ও অন্যতম সত্বাধিকারী স্বনাম ধন্য উকিল স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। অন্যত্র দেখা করিবার অসুবিধা থাকায় আমি এক অভিনয় রাত্রে থিয়েটারে তাঁহার সহিত দেখা করি। সেদিনকার কথা প্রসঙ্গে মহেন্দ্র বাবু আমায় বলেন যে, অতঃপর গিরিশ চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান নাট্যকারের নাটক নাটিকার অভাব হইলেও, রঙ্গালয় চালাইবার উপযোগী নাটক নাটিকার অভাব না হইতে পারে; কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে নাট্যশালা পরিচালন কার্য্যে পারদর্শী বিচক্ষণ কার্য্যধ্যক্ষের অভাব প্রতি পদে পদে অনুভব করিতে হইবে। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করেন,—

সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লইয়া মহেন্দ্র বাবু যে সময় মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন, তাহার প্রথম শনিবার রাত্রে পাশ্চাত্য নাট্যকার সেরিডনের "স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডেল" নাটকের অনুকরণে রচিত, সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার অতুল কৃষ্ণের "রকম ফের" অভিনয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হয়। "রকম ফেরের" "জালিমের" ভূমিকা যে, অভিনেতার প্রতি অর্পিত হয় তিনি কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ বুধবার রাত্রের অভিনয়ের পর হইতেই থিয়েটারে অনুপস্থিত হন। বৃহস্পতিবার বেলা ১০ টার পর পর্য্যন্ত সাক্ষাত পাওয়া গেল না। শনিবারে অভিনয়। মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়—ইহার ভিতর জালিমের ভূমিকা আয়ত্ত করিয়া অভিনয় করিতে কোন অভিনেতাই সাহস করিলেন না। মহেন্দ্র বাবু অনন্যোপায় হইয়া সে শনিবার "রকম ফের" বন্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন এবং সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরিশচন্দ্র

তাহার পূর্ব্ব হইতে হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন; যদ্যপি হাঁপানির দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইয়া, সবে মাত্র দুই একদিন পথ্য করিয়াছেন, এমন সময় Business Manager চারু বাবুকে লইয়া মহেন্দ্র বাবু ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র বাবুকে এরূপ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মহাশয় এমন অসময়ে যে? ব্যাপার কি?" মহেন্দ্র বাবু গিরিশচন্দ্রের কথার যথাযথ উত্তর দিয়া "রকম ফেরের" "জালিমের" ভূমিকা অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত অভিনেতার অনুপস্থিতির কথা আনুপূর্ব্বিক সকল বিবৃত করিলেন। গিরিশচন্দ্র অভিনেতার এতাদৃশ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতি ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন,—"কি করিলে হয়, আমি সাজিলে হয়?" মহেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি গিরিশচন্দ্রকে কখনও এত অধীর হইতে দেখি নাই।" তাঁহার শরীর সে সম্বন্ধে অপটু বলায় গিরিশচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন, "সে সব চুলায় যাক্ আপনি Announce করিয়া দিন Partটা পাঠাইয়া দিবেন।" বলা বাহুল্য সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র সে রাত্রে "রকম ফেরের জালিমের" ভূমিকা অতীব দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে এক শনিবার রাত্রে "বলিদান" নাটকে গিরিশচন্দ্র "করুণাময়ের" ভূমিকা অভিনয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বদিন হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। শনিবার বেলা ২৷০ টা পর্য্যন্ত সে বৃষ্টির বিরাম ছিল না। বৈকালে একটু ধরাট দেখিয়া গিরিশচন্দ্র আত্মীয় স্বজনের সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও বেলা থাকিতে থিয়েটারে উপস্থিত হন। তাঁহার থিয়েটারে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। টিকিট বিক্রয়ের অল্পতা নিবন্ধন মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ দুর্য্যোগে ও এই যৎসামান্য বিক্রয়ে আপনার আর অকারণ খোলা গায়ে ঠাণ্ডা লাগাইয়া অভিনয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমি টিকিট ফেরত দিয়া "বলিদানের" অভিনয় বন্ধ করাইয়া দিই।" গিরিশচন্দ্র তাহা নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন, "যাঁরা এই ভীষণ দুর্য্যোগ উপেক্ষা করে আমার অভিনয় দেখিতে এসেছেন, তাঁদের নিরাশ করিতে পারিব না। এতে শরীর যায় তায় আর চারা কি?" সেই রাত্রের অভিনয়ই গিরিশচন্দ্রের জীবনের শেষ অভিনয়। "করুণাময়ের" ভূমিকার অভিনয় কালে সে রাত্রের শীতল বায়ুস্পর্শে তাঁহার হাঁপানি বাড়িল

পরি কয়েকদিন "চন্দ্রগুপ্তের" মহলা দিবার জন্ম থিয়েটারে যাইতে হইল। এই ভগ্নদেহে চন্দ্রগুপ্তের শেষ মহলার দিন প্রথম দুই অঙ্কের অভিনয় দেখিবার পর শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায়, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর উঠিলেন না।

স্বর্গ কোথায়?

লেখক,—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

স্বর্গ সুখের স্থান, স্বর্গ গমনের জন্য সকলেই লালায়িত, কিন্তু স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ নামে কি কোন স্থান আছে? যদি থাকে, সে কেমন স্থান? কে বলিয়া দিবে? কার কাছে জিজ্ঞাসা করিব? ধরাতলে এমন কি কেহ আছেন, যিনি স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইতে পারি? সংসার আর ভাল লাগে না। সংসারের লোক স্বার্থপর, সংসারের ভালবাসা স্বার্থের ভালবাসা। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছি, অনেক রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। সংসার আর ভাল লাগে না, সংসারে আর এক তিলার্দ্ধও থাকিতে ইচ্ছা হয় না, তাই একদিন মনে হইল,—স্বর্গ বলিয়া কি কোন স্থান আছে? যদি থাকে, সে স্থান কোথায় কিরূপ স্থান? সেখানেও কি পৃথিবীর লোকের মত স্বার্থপর লোক আছে? মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন হইতেছে, এমন সময় কে যেন উত্তর করিল, স্বর্গ বলিয়া স্থান না থাকিলে যুধিষ্ঠির কোথায় গিয়াছিলেন? স্বর্গ নিশ্চিতই আছে এবং স্বর্গ সুখের স্থানও বটে। তবে সে স্বর্গ কোথায়? প্রশ্নের উত্তর হইল, স্বর্লোকে—সূর্য্যলোকে। বিষম সমস্যা, সূর্য্যলোকে কি মানুষ থাকিতে পারে? বলি সূর্য্যোত্তাপে মানুষগুলা দগ্ধ হয় না? উত্তর হইল, সূর্য্যোত্তাপ পৃথিবীতে যত ঘনীভূত, সূর্য্যলোকে—স্বর্গে তত ঘনীভূত নহে। একথার প্রমাণ কি? মন তুমি কি স্বর্গে কখনও গিয়াছ? ইহা কি প্রকৃত না তোমার গড়া কথা? ভাঙ্গা গড়া তোমার যে স্বভাব! তুমি কখনও ভাঙ্গ, কখনও গড়! মন উত্তর করিল, আমি ভাঙ্গিও বটে, গড়িও বটে, ভালও বটে, মন্দও বটে, সৎও বটে, অসৎও বটে, কলুষিতও বটে, অকলুষিতও বটে, বলি আমি তো তোমারই, তুমি যেমন আমায় রাখ, যে

ভাবেই তোমায় দেখা দি, তেমন কার্য্যেই লিপ্ত হই, আমি তো তোমা ছাড়া নহি। তুমি প্রভু, আমি আজ্ঞাবহ অনুগত ভৃত্য! তুমি কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি যে স্বয়ং ব্রহ্ম, জীবাত্মা রূপে জীবদেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ। তুমি কি জান না, আমি তোমারই অধীন। আমি তোমারই মন, তুমি যে ভাবে চলিতে বল, আমি সেই ভাবে চলি। তুমি যাহা করিতে বল, আমি তাহাই করি। তুমি যাহা বলিতে বল, আমি তাহাই বলি। আমার কি অপরাধ বল। তুমি আমায় ভাঙ্গিতে বল, তাই ভাঙ্গি, গড়িতে বল, তাই গড়ি। আমার দোষ কি বল? তুমিই আমায় অসৎ পথে যাইতে বল, তাইতো আমি অসৎ পথের পথিক হই। তুমি আমায় চুরী করিতে বল, তাইতো আমি চুরী করি। আমি যে তোমার পড়া পাখী, যাহা শিখাও, তাহাই শিখি। আমি তোমারই প্রেরণায় কখনও কামিনীর কখনও বা কাঞ্চনের সেবা করি। তুমি তো কখনও আমায় স্থির থাকিতে দেওনা, যদি একটু স্থির থাকিতে দেও, আমি বলিয়া দিতে পারি, স্বর্গ কোথায়। তবে এখন বলি, স্বর্গ—একটি স্থানের নাম, উক্ত স্থানের নাম সূর্য্যলোক, কিন্তু সেখানে পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যোত্তাপ ঘনীভূত নহে। সূর্য্যোত্তাপের সেই যে জ্যোতিঃ তাহাই ভগবজ্জ্যোতিঃ। ভগবজ্জ্যোতিঃ কি মানুষকে দগ্ধ করে? আচ্ছা তোমার চক্ষে যে জ্যোতিঃ, তাহাও সূর্য্যেরই জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ কি তোমায় দগ্ধ করে? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার ঐ জ্যোতিঃ তোমারই উদরে গিয়া ঘনীভূত হইয়া খাদ্যদ্রব্য পরিপক্ক করে, উদর অথচ দগ্ধ করে না। তুমি কি জাননা, তোমার ঐ জ্যোতি,—আত্মা পুরুষেরই জ্যোতি, তোমার দেহেই ক্ষুদ্র স্বর্গ অবস্থিত। দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, বহির্জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু দ্বারা জীবদেহ গঠিত। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদে প্রভেদ এই—অচেতন ও উদ্ভিদে বহির্জগতের সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার পরিমাণ বড় অল্প, তজ্জন্য তাহাদিগের চৈতন্যের বিকাশ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষে সেই সকল পদার্থের ও চেতনার পরিমাণ অধিক, তজ্জন্য মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের চৈতন্য অধিক। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, মানুষ জগতের অংশ বিশেষ এবং জগতের দেহ হইতে অনবরত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্ম দেহে আসিয়া তোমার স্থূলদেহের পুষ্টি সাধন করিতেছে। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, লোকে কথায় বলে, যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে? অতএব স্বর্গ তোমার দেহেও বিরাজমান এবং জগদ্দেহেও বিরাজমান।

তাহাই তোমার দেহে সুখ রূপে অধিষ্ঠিত। যেমন বহির্জগতের সূর্য্য মেঘাবৃত হইলে তোমার চক্ষুও মেঘাবৃত হয় এবং তোমার তজ্জন্য দুঃখ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ স্বর্গ না থাকিলে তোমার কখনও সুখোদয় হইতে পারে না। স্বর্গ—সুখও বটে, সুখের স্থানও বটে, স্থান হইতেই সুখোৎপত্তি বা সুখোদয় হয়। যেমন উত্তর মেরু বা হিমালয় বরফের বা শীতের স্থান এবং ঐ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় ও তাহা শীতল অনুভূত হয় এবং দক্ষিণ মেরু হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, তদ্রূপ স্বর্গ নামে স্থান আছে, সে স্থান উর্দ্ধে—সূর্য্য-লোকে অবস্থিত। যেমন ভূতত্ত্বে ভূলোক অবস্থিত, তদ্রূপ অপ্ তত্ত্বে চন্দ্রলোকে ভুবর্লোক এবং তেজস্তত্ত্বে সূর্য্যলোকে স্বর্লোক। স্বর্লোকই স্বর্গনামে অভিহিত। তথায় ভূলোকের ন্যায় জীবজন্তু অবস্থান করে, কিন্তু তাহারা তমোবাহুল পৃথিবীতে অবস্থিত জীবজন্তুর ন্যায় তমোগুণাধিক নহে, সত্ত্বরজো গুণাধিক। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোক কাশ্মীর যাইতে চায় কেন? কারণ কাশ্মীরের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। যেমন স্থান এবং জল বায়ুর গুণে কাশ্মীর ভূস্বর্গ নামে অভিহিত, তদ্রূপ স্বর্গ স্থান-মাহাত্ম্যে এবং জল বায়ুর প্রভাবে স্বর্গ নামে অভিহিত। স্বর্গে ঈর্ষা দ্বেষের বা সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য নাই, তৎপরিবর্ত্তে সুখের আধিক্য বিদ্যমান। তজ্জন্য ভূর্লোকের জীব স্বর্গ-গমনের জন্য লালায়িত হয়। হিমালয় স্বর্গের দ্বার। জগতে এমন স্থান আর নাই। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিলে, মোক্ষ-লাভ এবং হিমালয় ব্যতীত স্বর্গ-গমন অসম্ভব। হিমালয়ের উর্দ্ধে চন্দ্রলোক বা ভুবর্লোক, তদূর্দ্ধে সূর্য্যলোক বা স্বর্গ। স্বর্গ দেবতাদিগের বাস স্থান।

বহুমুত্র তথ্য ও চিকিৎসা।

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু আই, এস, এবং এম্, বি, এফ্, সি, এস্, মহোদয়ের ইংরাজী প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা অনুবাদিত।

(নিদান শাস্ত্র Pathology.)

শ্বেতসার পরিপাকের এই মোটামুটী হিসাব যখন পাওয়া যাইবে তখন রোগীর পথ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাহার পথ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। নির্দ্দেশ করিবার সময় যতটুকু শ্বেতসার পরিপাক করিতে রোগী সক্ষম তাহারও কম পরিমাণ তাহাকে আহার করিতে বলিয়া দিবে। রোগীর পথ্য তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তন না করাই ভাল। ক্রমে ক্রমে ঐরূপ করাই যুক্তিযুক্ত কেননা, ধীরভাবে চিকিৎসা করিলে শর্করা স্রাব ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইবে বটে. কিন্তু পুনরায় আর হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

প্রাগুক্ত প্রকার চিকিৎসায় যখন শর্করা-স্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তখন পুনরায় যাহাতে রক্তে অত্যধিক পরিমাণে শর্করা জমিতে না পারে, তদ্‌-বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রোগী যে পরিমাণে শ্বেতসার পরিপাক করিতে সক্ষম তদপেক্ষা অল্প (বা অধিক হইলেও ঠিক ততটা) শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য তাহার পক্ষে ব্যবস্থা করিলে তাহার রক্তে আর শর্করাধিক্য হইতে পারে না। প্রকৃত পরিপাক শক্তি নিম্নলিখিত রূপে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে :—প্রস্রাব শর্করামুক্ত হইলেই আহারে শ্বেতসারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যতদিন পুনরায় রক্তে শর্করাধিক্য না হয়, ততদিন এইরূপ বৃদ্ধি হয়। শর্করাধিক্য হইলেই আহারে শ্বেতসার পরিমাণ কমিতে থাকে। আবার শর্করা স্রাব যতদিন না আরোগ্য হয়, ততদিন ধরিয়া ঐরূপ কমই হইতে থাকে। যে পরিমাণ শ্বেতসারে প্রস্রাবে শর্করা-স্রাব আরম্ভ হয় এবং যে পরিমাণে ঐ প্রস্রাব বন্ধ হয়, এই দুইটী পরিমাণের মাঝামাঝি পরিমাণই রোগী যথার্থরূপে পরিপাক করিতে পারে। শ্বেতসার-পরিপাক শক্তি যখন অনেকদিন ধরিয়া অব্যাহত থাকে, তখন যাহাতে

পারে তদপেক্ষাও অল্প পরিমাণ শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্য তাহার জন্য নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

যে সমুদয় ডাক্তার সরকারী চাকরী করেন না, তাঁহাদের পক্ষে উপর্যুক্ত বিধি পালন করা আদৌ কঠিন নহে। চাউল, গম, গোল আলু, দুগ্ধ, চিনি এবং অন্যান্য সাধারণ খাদ্য দ্রব্যে শতকরা কি পরিমাণে শ্বেতসার থাকে তাহা সকলেরই জানা আছে। রোগী কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আহার করিয়াছে তাহার হিসাব যদি রোগী রাখিতে পারে তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে সর্ব্ব সমেত কতটুকু শ্বেতসার আহার করিয়াছে তাহা আমরা অনায়াসেই স্থির করিতে পারি। তার পর, যদি আমরা তাহার ২৪ ঘণ্টার প্রস্রাব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি এবং কতটুকু শর্করা নিঃসৃত হইয়াছে তাহা যদি স্থির করিতে পারি তবে বুঝিতে হইবে যে, শর্করার যতটুকু পরিমাণ ঠিক ততটুকু শ্বেতসার রোগী পরিপাক করিতে পারে নাই। ঘরোয়া চিকিৎসায় রোগীর পথ্য দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ঠিক রাখা ও তাহার ২৪ ঘণ্টার প্রস্রাবে দৈনন্দিন শর্করা-হিসাব—ইহার কিছুই বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। প্রথম কার্য্যটী রোগী নিজেই করিতে পারে; দ্বিতীয় কার্য্যটী চিকিৎসক তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী দ্বারাই স্বীয় গৃহে সম্পন্ন করাইতে পারেন।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বহুমূত্র রোগীরা কোন কোন শ্বেতসার অধিকতর উত্তমরূপে পরিপাক করিতে পারে, চিকিৎসা কার্য্যেও সকল শ্বেতসার সমান উপকারী নহে। উদাহরণ দেখ; পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন, গোল আলু ও জৈ চূর্ণ (Oatmeal) গম বা চাউল অপেক্ষা সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, যে অন্ততঃ ভারতের এতদঞ্চলে চাউল অপেক্ষা গমই অধিক উপকারী। বিস্তর ব্যক্তির ভূয়োদর্শনের ফলাফল তুলনা করতঃ ল্যাব্ (Labbe) নিম্নলিখিতরূপে সাধারণ শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্য পরিপাকের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন :—

গোল আলু, জই চূর্ণ, ময়দার পিষ্টক (Macaroni), বাদাম, চাউল, হ্যারিকট্‌বীন, ডাউল, মটর, দুগ্ধ, রুটী ও শর্করা।

তিনি বহুমূত্র রোগীর ব্যবহার্য্য শ্বেতসার গুলিকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্য রোগীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। বাঁধাকপি, ফুলকপি, শসা, সালাদ প্রভৃতি শাকসব্জী গৌণ বিভা-

বলেন, গোল আলু মুখ্য শ্রেণীর অন্তর্গত। ইনি বলেন, বহুমূত্র রোগীর পক্ষে রুটীর শ্বেতসার যথার্থরূপ পরিশুদ্ধ নহে বলিয়া রোগীকে রুটী দেওয়া যায় না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে গোল আলু দেওয়া যায়। ময়দার রুটীর কোমল আটাল ভাগ (Gluten bread) প্রভৃতি বহুমূত্র রোগীর বিশেষ উপকারী খাদ্য বলিয়া একটা কথা আছে; কিন্তু ল্যাব্ এতদ্‌বাক্যে বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। ইনি বলেন যে, ঐ প্রকার খাদ্যের উপাদানেরই আদৌ নিশ্চয়তা নাই (উহার কোন কোনটীতে শতকরা বহুল পরিমাণ শ্বেতসার বিদ্যমান থাকে) তা ছাড়া উহার গন্ধ বা স্বাদ উভয়ই অপ্রীতিকর এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে দুষ্পাচ্যও বটে। সাধারণতঃ গোল আলুতে শতকরা ২০ অংশ শ্বেতসার। যে, বহুমূত্র রোগী ১০০ গ্রাম শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারেন, ল্যাব্ তাঁহাকে গোল আলুর শ্বেতসার দৈনিক ৯০ গ্রাম দিতে বলেন। ৪৫০ গ্রাম কাঁচা গোল আলু হইতে ৯০ গ্রাম শ্বেতসার প্রাপ্ত হওয়া যায়, (ইহা অর্দ্ধ সেরের কিছু কম)। প্রত্যহ গোল আলু খাইতে ভাল লাগে না বলিয়া ইহার পরিবর্ত্তে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রুটী, ভাত, প্রভৃতি অন্য প্রকার শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত দ্রব্য এরূপ পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে পরিপাক-শক্তির অপচয় না ঘটে। ল্যাব্ প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে ১০০ গ্রাম শ্বেতসার সরবরাহ করিতে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আবশ্যক হয়:—

গোল আলু	...	...	৫০০ গ্রাম
রুটী	...	...	১৯০ „
শুষ্ক মটর	...	...	১৭০ „
চাউল	...	...	১১২ „

এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, যদি আমরা ৪৫০ গ্রাম গোল আলুর উপকার সমশার্করিক (isoglycosic) পরিমাণ চাউলে পাইতে ইচ্ছা করি তবে আমাদিগকে ১১২ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় /২ সের চাউল আহার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শতকরা ৭৯ অংশ শ্বেতসার। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বহুমূত্র রোগী চাউল অপেক্ষা গোল আলুর শ্বেতসার অধিক পরিমাণে পরিপাক করিতে সক্ষম। এই নিমিত্ত গোল আলুর শ্বেতসারের পরিবর্ত্তে হিসাব মত যতটা চাউলের শ্বেতসার হওয়া উচিত রোগীকে তদপেক্ষা

অন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। ল্যাঙ্কের মতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বহুমূত্র রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ ঃ—

সাধারণ রুটী, বহুমূত্র রোগীর তথাকথিত উপকারী রুটী, ঐ প্রকারের পিষ্টক, বিসকুট, পিষ্টক (Pastries), শুষ্ক শাক্ সব্জী, ফলের আচার (Food-Paste), ভাত বাদাম, নানাবিধ শস্যচূর্ণ (farinas), নারিকেল, শর্করা, মিষ্টান্ন মোরব্বা, ফল, দুগ্ধ, সুমিষ্ট সুরা, আপেলরসোদ্ভব সুরা (cider) যব-সুরা, (beer) ও সরবত।

যদি পরিপাকের ব্যাঘাত না ঘটান হয়, তবে উহাদের কতকগুলি রোগীকে দেওয়া যায়। তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

আমরা ভারতে দেখিতে পাই যে, অধিকাংশ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে মিশ্র খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। দুপুরে বিশুদ্ধ ময়দার চাপাটী বা পুরি বা রুটী দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা ভাত না খাইয়া অধিক দিন থাকিতে পারে না বলিয়া ঐ সকল দ্রব্য অল্প অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে প্রাতে ব্যবস্থা করিতে হয়। বাঙ্গালী রোগীকে বেশ পরিমাণ মত গোল আলু মৎস্য, শাক-সব্জী, উদ্ভিজ্জ তৈল, মাখন বা ঘৃত এবং উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ দুপুরে খাইতে দেওয়া যায়। যে সকল ফল অতি মিষ্ট নহে, জৈ চূর্ণ, সূপ, কিম্বা গ্লাস্মন বিসকুট, দুই একটী অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম এবং শর্করা শূন্য এক পেয়ালা চা জল খাইবার সময় রোগীকে খাইতে দেওয়া যায়। চা বা সূপের সঙ্গে শর্করার পরিবর্ত্তে স্যাকৃসিন্ বা স্যাকারিন্ নামক শর্করা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা, দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে মূত্রগ্রন্থি অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং প্রস্রাবেও অণ্ডলালিক পদার্থের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

গীত।

সিন্ধু।

কে বসিল আজি হৃদাসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর।
সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী, শুকানো তরুতে;
পাষাণে বহে সুধা ধারা॥

আর্য্য-মহিলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,

বিদ্যাভ্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিদ্যা শিক্ষা না করিলে জ্ঞানলাভ ঘটিয়া উঠে না। সুশিক্ষিতা নারীর প্রতি আপন হইতেই অন্যের শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। জ্ঞান লাভ না করিলে পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্ম একরূপ অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। অজ্ঞান ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধ, শ্রুতি সম্পন্ন হইয়াও বধির। কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারাই বিদ্যাভ্যাস করতঃ জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারা যায়, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে সাভিনিবেশ পূর্ব্বক সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় তাহা কে অস্বীকার করিবে? নানা প্রকার সদ্‌গ্রন্থাদির পাঠে নানা জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতির জ্ঞানও না জন্মিয়া যায় না। কন্যার সুনীতি সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ইহা বলাই বাহুল্য। কন্যার জীবনে সুনীতির অভাব ঘটিলে সমগ্র সমাজ নানা প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। সুনীতি সম্পন্না মাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করা সহজ হইয়া উঠে। উত্তর জীবনে এইরূপ গুরু দায়িত্বের কথা মনে করিয়া কন্যাগণ প্রথম জীবনেই তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে সাবধান হইবেন।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জীবনকে সর্ব্ববিষয়ের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করাই জ্ঞানলাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সসম্মানে কৃতকার্য্য হইয়াও যদি আপন কর্ত্তব্য পালনে কাহাকেও বীতস্পৃহা দেখা যায়,—তবে সে নারীর শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধান হয় নাই বুঝিতে হইবে। অশিক্ষিতা ভগিনীগণের মধ্যে আমিই লিখিতে পড়িতে জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারিণী এই অহঙ্কারে যদি কেহ আপন কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন,—তবে তাঁহার পুস্তকলব্ধ সে জ্ঞান অজ্ঞান ভাবেরই বোধক। যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহাই গ্রহণীয়। জগতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণ করা যাইতে পারে,—তৎসমুদয়ই গ্রহণ করা মহত্ত্বের লক্ষণ। বিদেশী বিধর্ম্মী বা ভিন্ন জাতিকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সদ্‌গুণ গ্রহণে উপেক্ষা করা নীচতার পরিচায়ক। নিজের ও দেশের যাহাতে কল্যাণ হইবে, তাহা অতি হীন কার্য্য হইলেও আপনার করণীয়, সে জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাই সুবুদ্ধির পরিচয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহ হইতে উদ্ভূত কুফলকে লক্ষ্য করিয়া একজন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উগ্র আলোকের নিকট পুরাকালের গৃহিণীর সেই অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী বেশ আজ হীনপ্রভ ও মলিন বোধ হইতেছে, গৃহ কর্ম্মের সৌষ্ঠব আজ অনেক স্থলেই নীচ কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে এবং রন্ধন শালার চির পুরাতন চুল্লীর পার্শ্ব ক্রমশঃই অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে.—এমন কি সন্তান সন্ততির লালন পালনও 'আয়া'র কর্ম্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।"

(শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ জায়া।)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এরূপ কোনও দোষ আছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠা লেখিকার উক্তি নারীধর্ম্মের কলঙ্ক ঘোষণা কারবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

এক্ষণে বিষয়ান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। এটি আজকাল প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। নিভৃত পল্লীগ্রামে যেখানে সহরের রুচি আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই,—সেখানে ইহার কতকটা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে বটে, কিন্তু দু'দিন পরে বোধ হয় তাহাও অন্তর্হিত হইবে।

পল্লীব্রতাদি ও জাতীয় জীবন।

আমাদের দেশে নানা প্রকার গ্রাম্য ছড়া, গ্রাম্য উৎসব পল্লী ব্রতাদির প্রচলন ছিল, এখনও সামান্য ভাবে তাহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ক্রমেই লোক মানসের অন্তরালে থাকিয়া বিস্মৃতির গভীর জলে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। এ সমস্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক কন্যার কর্ত্তব্য। মাতাপিতা ও অভিভাবকগণের এ বিষয়ে আপন কন্যা প্রভৃতিকেও যথোচিত উৎসাহ দানে তাহাদের মঙ্গল বিধান করা উচিত। এই সমস্ত পল্লীব্রত, ছড়া ও উৎসবাদিতে যে, অমূল্য উপদেশাবলী নিহিত আছে, তাহা শিক্ষা করিলে প্রত্যেক কন্যার হৃদয় উদার, ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, কর্ত্তব্য কর্ম্মে একপ্রাণতা, জ্ঞানের গভীরতা, প্রভৃতি সঞ্জাত হইয়া আত্মোৎকর্ষে যথেষ্ট সহায়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। এ সমস্ত ব্রতাদি যে নিশ্চয়ই বালিকা হৃদয়ে সুনীতির বীজ বপণ করিয়া দেয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ব্রতের 'কথা'র' মধ্যে যে অপূর্ব্ব উপদেশাবলী উদাহরণচ্ছলে কথিত হইয়াছে, তাহাই বড়ই মধুর। এই সমস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলে নারী জীবনের যাহা উৎকৃষ্ট গুণরাজি তাহার বিকাশ হইয়া

ক্রমে স্ফুর্ত্তিলাভ করে। রোগীর সেবা আর্ত্তের ত্রাণ, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তি শ্বশ্রূ শ্বশুরের ও অন্যান্য পরিজনবর্গের প্রতি যথোপযুক্ত স্নেহ ভক্তি ও মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর উদ্রেক হয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গীয় সমাজে উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া যাঁহাদের অভিমান আছে, তাঁহারা এ সমস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান কুসংস্কার-মূলক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্রতাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতুই তাঁহারা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলে এগুলিকে কুসংস্কার-মূলক বলিতে কেহই সাহস পাইবেন না। শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই ব্রতাদিকে কুসংস্কারমূলক বলা নিতান্তই অশোভন।

আজন্ম স্বতঃ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাহাকেও এরূপ অভিজ্ঞ বিবেচনা করাও একান্ত অজ্ঞতার পরিচয়। কোন কন্যা আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া আত্মম্ভরিতার পরিচয় না দেন ইহাই সর্ব্বথা অভিপ্রেত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিষয় বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এরূপ জ্ঞান করিয়া মাতা পিতাকে অবমাননা করা মুর্খতার পরিচয়। নিজের আত্মজ্ঞান থাকা প্রত্যেক উন্নতি কামি ব্যক্তির পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সেই আত্মজ্ঞানে মাতা পিতার ও অন্য গুরুজনের অবমাননা করা নিতান্ত দোষজ্ঞ তুষ্য। এইরূপ আচরণে ধর্ম্মহানি হয়। অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃবশে থাকাই শাস্ত্রের নিদেশ।

কন্যা আপন উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্ববিধ প্রযত্ন করিবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা কখনও তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পারেন না। কন্যার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য পিতা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন—সে চেষ্টা কেবল কন্যাকে সাহায্য করিবার জন্য। আপন উন্নতি সাধন জন্য বুদ্ধিমতী কন্যার নিজের চেষ্টা চাই। কেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে অন্যে কখনও তাহাকে উন্নতির শিখরে আরোপিত করিতে পারে না। অন্যের শত চেষ্টা ও আন্তরিক সদিচ্ছা সেই নিশ্চেষ্টতার নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অন্যে যদিও ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ অসম্ভব কার্য্যে কথঞ্চিৎ সফলকাম হন তবুও অনতিবিলম্বে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি নিরাশার নিম্নতম উপত্যকায় পতিত হইবেন। আত্মোৎকর্ষ্য বিষয়ে আত্ম চেষ্টাই বলবতী। কন্যাগণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাতাপিতার অবাধ্য হইলে কখনই তাহার শ্রেয়োলাভ হয় না। সে শ্রেয়োলাভের প্রচেষ্টা সর্ব্বথা ব্যর্থ

কন্যা যথানিয়মে শিক্ষিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুনীতির চর্চ্চা দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিতে সর্ব্বদা প্রয়াসিনী থাকিবেন।

বিবাহের প্রকৃত কাল।

জ্ঞানার্জ্জনের পর কন্যা যখন আপন দায়িত্ব বুঝিয়া লইবেন, নারী জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, যখন বুঝিবেন, 'তিনি শুধু তিনি নন দশের মাঝারে একজন।'

যখন বুঝিবেন যে, এক পার্থিব দেবতার তথা পরিজন ও বিশ্বমানবের সেবা করাই যোষিৎকুলের পরম কাম্যবস্তু তখন তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ বিবাহের সঙ্গেই এই দায়িত্ব জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্তও পক্ক হইয়া থাকে। এই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই হইতেই এক নূতন জীবনের সমারম্ভ। এই নূতন জীবনের ও নূতন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। এই নূতন গতির ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগেরও এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করা যাউক।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম-দৃশ্য।

সতীশের কক্ষ। সতীশ, শরৎ ও প্রভা।

শরৎ। এ তো খুব সোজা কেস। তোমার চিঠি পেয়ে মনে হয়েছিল খুব একটা জটিল ব্যাপারের ভার দেবে। শক্ত কেস্ করে করে এমন অভ্যাস হয়েছে যে, সোজা কেসে আর স্ফূর্ত্তি হয় না।

সতীশ। কেস ত সোজা, কিন্তু মায়া না রাজী হ'লে ত কিছু হ'বে না।

শরৎ। কেন? তুমি যা মতলব করেছ বেশ। একখানা আম্‌মোক্তারনামা সই করিয়ে নিলেই হ'বে।

প্রভা। তুমি বুঝ্‌তে পারছ না শরৎ। ঠাকুরঝি যে রকম ঢ্যাটা তাকে সই

শরৎ। আমি সব দিক বিবেচনা করেই বল্‌ছি ঠাকুরঝি? দাদা আর তুমি জেদ করে বল্‌লেই সই কর্‌বে।

প্রভা। তোমরা মেয়ে মানুষের মন বোঝ না বলেই ওকথা বল্‌ছ। অন্য কোন উপায় দেখ নইলে কাজ সিদ্ধি হ'বে না।

শরৎ। তোমার ও ভুল ধারণা ঠাকুরঝি আমি এ রকম কেস অনেক করেছি। আম্‌মোক্তারনামা সই কর্‌লে আর কোন গোল থাক্‌বে না।

সতীশ। আমি যত দিন্ থেকে বল্‌ছি, চেষ্টা কর্‌লে বোধ হয় এতদিনে সুট রুজু করে দেওয়া যেত।

[মায়ার প্রবেশ।]

মায়া। বউ দিদি, খোকার——

[শরৎকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন দিয়া মায়ার ও তৎপশ্চাতে প্রভার প্রস্থান ও শরৎ দরজার দিকে চাহিয়া রহিল]

সতীশ। তোমার ঠাকুরঝির কথায়, আমি মায়ার কাছে আম্‌মোক্তার নামার কথা এত দিন তুলি নাই। আজই——

[প্রভার প্রবেশ]

দেখো, শরৎও যখন মত করেছে, আর দেরিকরে কাজ নাই। আজই রাত্রে খাবার সময় মায়াকে সই করার কথা বল্‌ব। তুমি এর মধ্যে বিষয়ের কথা পেড়ে দেখো। কি বল শরৎ?

শরৎ। আমায় একটু ভাব্‌তে দাও দাদা। ঠাকুরঝি এক গেলাস জল আন্‌তে বল্‌বে!

প্রভা। তা কি হয়। অমনি খাবার আন্‌তে বলি।

শরৎ। এর পর খাবো। এখন শুধু একটু জল দাও।

প্রভা। [দরজার কাছে গিয়া] মুকুন্দর মা, মুকুন্দর মা!

[নেপথ্যে "যাই মা"]

এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

শরৎ। আচ্ছা, নয়, থাক।

[জলের গেলাস হস্তে মুকুন্দর মার প্রবেশ। শরৎকে দেখিয়া তাহার হাতের গেলাস দিতে গিয়া পড়িয়া গেল।]

প্রভা। আ—মর মাগী; চোখে কি দেখ্‌তে পাস না। যা ছুটে আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

[মুকুন্দর মায়ের প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে পুনঃ প্রবেশ।]

প্রভা। [মুকুন্দর মায়ের হাত হইতে গেলাস লইয়া শরৎকে প্রদান করিয়া নে মেঝের জল মুছে নে।.]

[মুকুন্দর মা'র তথা করণ ও প্রস্থান।]

শরৎ। [আস্তে আস্তে জল পান করিয়া] যতই ভাব্‌ছি মনে হচ্ছে ঠাকুরঝির কথা ঠিক। এখন সই করতে বলে কাজ নাই।

প্রভা। দেখ্‌লে ত। আমি গোড়া থেকেই বল্‌ছি।

সতীশ। তা ছাড়া আর কি কর্‌বে বল ?

শরৎ। আমি ভাব্‌ছি, তোমার ভগ্নীর হ'য়ে, বিষয়ের বকরা আর হিসাব চেয়ে, কাল বিপিনকে একখানা চিঠি দি। যদি কোন জবাব আসে তা দেখে পরে ব্যবস্থা করা যাবে। নইলে পরশু রবিবারের পরের রবিবার দু'জনে বিপিনের কাছে যাওয়া যাবে।

সতীশ। বিপিন যদি আমাদের হাঁকিয়ে দেয়, তখন কি কর্‌বে ?

শরৎ। কেন; পার্টিশন সুট দায়ের কর্‌ব।

সতীশ। তখন ত মায়ার সইয়ের দরকার হ'বে। তা আজ সই করতে বলাও যা, দু দিন পরে সই কর্‌তে বলাও তা।

শরৎ। সুট করেই কি সুট ফাইল কর্‌ব। বিপিনের উপর তোমার ভগ্নীর যে ভক্তি ও বিশ্বাস আছে. আস্তে আস্তে তা নষ্ট করে, মোকদ্দমা করতে হবে। তাড়াতাড়ি কর্‌লে, সব নষ্ট হ'বে।

প্রভা। আমারও তো তাই ভয়। ঠাকুরঝির মন ফেরাতে হ'বে।

সতীশ। সময় পেলে ত বিপিনের পক্ষেই ভাল। সে মায়াকে এখান থেকে নিয়া যাবে, তা হ'লে আমাদের জল্পনা কল্পনাই সার হবে।

শরৎ। যাতে না নিয়ে যেতে পারে, আর তোমার ভগ্নী না যেতে চায় তার উপায় কর্‌তে হ'বে।

সতীশ। তা কি পার্‌বে ?

শরৎ। পারব বলে তো বোধ হয়।

সতীশ। কি রকমে ?

শরৎ। বিপিনের কাছে চিঠির জবাব না পেলে কিম্বা তার সঙ্গে দেখা না কর্‌লে ঠিক বলতে পার্‌ছি না। তবে দেখে শুনে আশা হয় পার্‌ব।

প্রভা। উকিলরা ফন্দীবাজ; নিশ্চয়ই শরৎ কোন ফন্দী বার কর্‌তে পার্‌বে।

শরৎ। আমাদের কিন্তু সবই নিঃস্বার্থ চেষ্টা ঠাকুরঝি। যা কিছু করি মক্কেলের সুবিধার জন্য।

সতীশ। তবে দুঃখের মধ্যে সুবিধা টুকু ভোগ কর্‌তে মক্কেলকে বিশেষ অবসর দাও না। উপস্থিত আমাদের ব্যবস্থা কি ঠিক কর্‌লে?

শরৎ। এখন চিঠিই দেওয়া যাক। আর সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের উপর তোমার ভগ্নীর যাতে অবিশ্বাস জন্মায় তার চেষ্টা করো। ঠাকুরঝি, তুমি এ ভার নিলে ভাল হয়।

প্রভা। তা আমি পারব। কিন্তু তোমাদের মতলব যুগিয়ে দিতে হ'বে।

শরৎ। সে সব আমি ঠিক করে দ'ব।

সতীশ। দেখ তোমরা যাই বলো, আমার কি রকম খট্‌কা লাগ্‌ছে। মনে হচ্ছে একটা বৃথা আশঙ্কা করে অকারণ সাবধান হচ্ছ।

শরৎ। সাবধানের বিনাশ নাই।

সতীশ। কিন্তু অতি সাবধানি প্রায়ই পিছলে পড়ে।

শরৎ। আমি তোমায় ভরসা দিচ্ছি। তোমার কোন ভয় নাই। আমায় কি বারবারই বাগান দেখ্‌তে আস্‌তে হয়, বাগানের ফেরৎ মাঝে মাঝে এসে আমি নিজে সব ঠিক করে ন'ব। মাঝে মাঝে কেন, যদি দরকার হয় কার্য্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি রোজ এখানে আস্‌তে প্রস্তুত আছি। আমার যদি পরামর্শ নাও হঠাৎ কোন কাজ করো না। আমি যা বলে দিয়াছি সেই রাস্তা অনুসরণ কর।

প্রভা। দেখো আমিও তাই বলি, এখন সই করার কথা পেড়ো না।

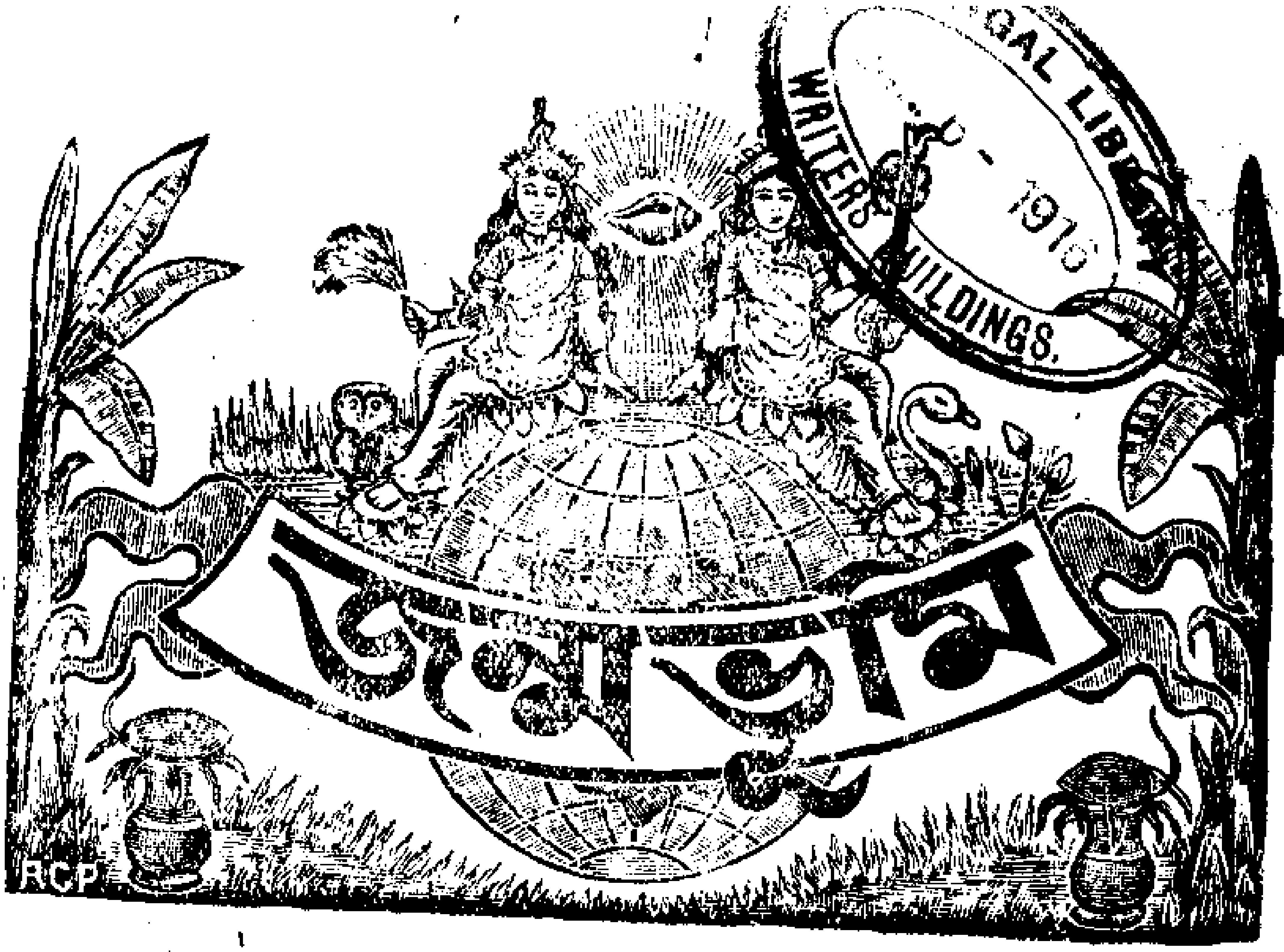
সতীশ। যাক্ আর ভাব্‌ব না। দিন কতক তোমাদের কথা মত চলে দেখি কি হয়।

[এমন সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া ৪টা বাজিল।

শরৎ। ওঃ ষ্টিমারের সময় হয়ে এলো। আমি এখন উঠি।

সতীশ। বা তা কি হয়। চলো জল টল খেয়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।]



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম সংখ্যা।

সত্যবতী।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্কলিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও অজ্ঞাত বাস।

পুরাণের যে যে অংশ অস্বাভাবিক বলিয়া অনেক গুলি লোকে অবজ্ঞা করেন, অস্বাভাবিকতার বিন্দুমাত্র ছায়া না থাকিলেও বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের সেই সেই অংশ যে কত সুন্দর হইত তাহার এক দৃষ্টান্ত সত্যবতী।

পুরুবংশে উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রথম নাম বসুরাজ। তিনি ইন্দ্রদত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া আমাদের মস্তকোপরিস্থ আকাশ পথে পরিভ্রমণ করিতেন, এই কারণে তাঁহার নাম উপরিচর।

রাজা উপরিচর পরম ধার্ম্মিক ও তপস্বী ছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহিতা

উপরিচর শেষে আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই নব পরিণীতা দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রটিকে রাজা স্বয়ং লালন পালন করেন, পুত্রটির নাম হয় মৎস্যরাজ। কন্যাটিকে রাজা নিজ গৃহে রাখেন নাই, কারণ তাহার গাত্রে কেমন এক প্রকার আমিষ গন্ধ ছিল, অলক্ষণা ভাবিয়া সেই কন্যাকে তিনি অতি শিশুকালে যমুনাতীরস্থ একজন চরিত্র সম্পন্ন গৃহস্থ ধীবরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই ধীবর সাধারণ মৎস্যজীবী ধীবর ছিল বটে, কিন্তু তাহার যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল; সেই কারণে লোকে তাহাকে দাসরাজ বলিয়া সম্মান দান করিত। রাজদত্ত কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া অপুত্রক দাসরাজ স্বীয় ঔরসজাতা কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। কন্যাটি পরমরূপ-লাবণ্যবতী। নাম সত্যবতী, কিন্তু গাত্রে একটা দুর্গন্ধ থাকাতে ধীবরেরা তাহার নাম রাখিয়া ছিল মৎস্যগন্ধা।

যৌবন আরম্ভের পূর্ব্বেই দাসরাজ মৎস্যগন্ধাকে যমুনার পারাপারের ঘাটে নৌকা পরিচালনে নিযুক্ত করিয়াছিল। মৎস্যগন্ধা নিত্য নিত্য পিতৃনির্দ্দেশ পালন করিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতেন। "পিতৃ নির্দ্দেশ" বলা হইল তাহার কারণ এই যে, কিশোরী মৎস্যগন্ধা সেই দাসরাজকে পিতা বলিয়াই জানিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দৈবযোগে বরলাভ ও বেদব্যাসের আবির্ভাব।

ক্রমে মৎস্যগন্ধার শরীরে নব যৌবনের সঞ্চার হইল; স্বাভাবিক রূপলাবণ্য চতুর্গুণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। রূপবতী যুবতী মৎস্যগন্ধা একদা আরোহী আগমনের প্রতীক্ষায় যমুনার পারঘাটে নৌকা বাঁধিয়া, রূপে দিক আলো করিয়া নৌকার উপর দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় মহর্ষি পরাশর যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে দর্শন দিলেন। লোকললামভূতা, স্বর্গীয়া অপ্সরা স্বরূপিণী, ভুবনমোহিনী সুন্দরী, তরণী বিহারিণী তরুণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঋষিবরের চিত্ত এককালে বিগলিত বিমোহিত ও বিভ্রান্ত হইল; মিষ্টসম্ভাষণে মৃদুবচনে মৎস্যগন্ধাকে তিনি নিকটে আহ্বান করিলেন। দেবোপম তেজঃ-পুঞ্জ মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া, ভয়ে ও ভক্তিতে জড়ীভূতা হইয়া, মৎস্যগন্ধা

প্রণিপাত করিলেন, বসনাঞ্চল সিক্ত করিয়া যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন, তৎপরে ভূজানু হইয়া, সম্মুখে বসিয়া করজোড়ে ভক্তিসহকারে স্তব করিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইলেন, মৎস্যগন্ধাকে বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর!" মৎস্যগন্ধা বর চাহিলেন; দুটী বর—প্রথম,—গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হইয়া পদ্মগন্ধ হউক, দ্বিতীয়,—তাহার গর্ভে মহাজ্ঞান সম্পন্ন এক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হউক। লোকে দেখিতে না পায় এই অভিপ্রায়ে কুজ্ঝটিকা সৃজন করিয়া মহর্ষি পরাশর মৎস্যগন্ধার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। মৎস্যগন্ধার প্রার্থনায় "তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অভিনব পদ্মগন্ধা সত্যবতী সে দিন আর আরোহী পার করিবার অপেক্ষা না করিয়া নৌকা বাহিয়া পিতৃ ভবনে চলিয়া গেলেন।

যমুনাতীরস্থ দ্বীপের উপর কুমারী অবস্থায় সত্যবতী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রই পৃথ্বীমণ্ডলে বেদব্যাস নামে বিখ্যাত। কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত দ্বীপ মধ্যে মহর্ষি পরাশর সত্যবতীকে পুত্রবর দিয়াছিলেন, সেই কারণে বেদব্যাসের এক নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অন্য পরিচয় পরাশর কুমার।

ব্যাসদেব মাতার অনুমতি লইয়া তপশ্চরণে প্রস্থান করিলেন, সত্যবতী পূর্ব্ববৎ নৌকাপরিচালনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় সত্যবতীর আর দুটি নূতন নাম হইয়াছিল,—গন্ধাবতী ও যোজনগন্ধা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজসন্দর্শন ও বিবাহের প্রস্তাব।

ভীষ্মদেবের পিতা মহারাজ শান্তনু একদিন মৃগয়া যাত্রা করিয়া ঘটনাসূত্রে যমুনা তীরে উপনীত হন; যে ঘাটে সত্যবতী তরণী চালন করিতেন, সেই ঘাটের সমীপে উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তিনি বিশ্রাম করিতে ছিলেন, সেই সময় সত্যবতীর অসামান্য রূপরাশি তাঁহার নেত্রগোচর হয়; সেইরূপে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সহসা তিনি তামসিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন, কন্দর্পের ফুলধনুর অদৃশ্য ফুলশর তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, নিতান্ত কাতর হইয়া তিনি তীর হইতে অবতরণ করিয়া, সত্যবতীর নৌকার নিকটে গমন পূর্ব্বক, বিমুগ্ধচিত্তে

স্বীকার করিয়া শতদল সদৃশ সুন্দর কান্তি বিনষ্ট করিতেছ, ইহার কারণ কি?"

লজ্জাবনত বদনে সুকোমল মৃদুস্বরে সত্যবতী যথা সম্ভব আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। দাসরাজ তাঁহার পিতা, অতি নিকটেই তাঁহার নিবাস, এ কথাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

রাজা শান্তনু সত্যবতীর মুখে দাসরাজের নাম শুনিয়া, কতক উৎসাহে কতক সংশয়ে দাসরাজের বাটীর অন্বেষণে চলিলেন। সত্যবতী সত্য সত্য রাজার কন্যা, এ পরিচয় কেহই জানিত না, সুতরাং "দাসরাজের কন্যা" সংক্ষেপে এই পরিচয় পাইয়া, রাজার মনে সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, অল্প সময়ের মধ্যে ধীবর পল্লী প্রাপ্ত হইয়া তিনি দাসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দাসরাজ আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া, মহাসমাদরে মহাসম্মানে কুরুকুল তিলক নৃপতি শান্তনুর অভ্যর্থনা করিল, অনুজ্ঞা শ্রবণ প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলি পুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া রাজা শান্তনু প্রথমেই বলিলেন, "দাসরাজ! যমুনাকূলে তোমার একটি কন্যা আমি দর্শন করিয়াছি; মর্ত্ত্যলোকে তাদৃশী রূপবতী সুলক্ষণা কন্যা কুত্রাপি আমার নয়ন গোচর হয় নাই; লক্ষণ দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছি, কন্যাটি অনূঢ়া। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে আমার চিত্ত তৎপ্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছে, অতএব সেই কন্যাটি আমাকে সমর্পণ কর, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

দাসরাজ বলিল, "মহারাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্যাকে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করিবেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য; কিন্তু ইহা যেন পরিহাস বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আমি দাস, আপনি রাজ্যেশ্বর, আপনি দাসের সহিত পরিহাস করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত অপরাধী হইতেছি, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ প্রস্তাবে দাসরাজের আপত্তি।

সত্যবতী ইত্যবসরে যমুনাকূল হইতে গৃহে প্রত্যাগতা হইয়াছিলেন; যে গৃহে নরপতির সহিত দাসরাজের কথোপকথন হইতে ছিল, সেই গৃহের পার্শ্ব-কক্ষে এক গবাক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন

রাজা কহিলেন, "পরিহাস মনে করিও না, যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি বলিতেছি, আমি তোমার সত্যবতীকে মহিষীরূপে পরিগ্রহ করিব।"

চিন্তাযুক্ত হইয়া দাসরাজ বলিল, "মহারাজ! আপনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তথাপি আমার মনে দুটি সম্ভাবিত আশঙ্কার উদয় হইতেছে; দুটি আপত্তি উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা।"

রাজ। কি তোমার আশঙ্কা?

দাস। প্রথমতঃ আপনি ক্ষত্রকুলপতি, আপনি এক ধীবরের কন্যাকে বিবাহ করিবেন, শুনিতেই ইহা অসম্ভব।

রাজা। সম্পূর্ণ সম্ভব। শাস্ত্রে আছে, দুষ্কুল হইতে স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি শাস্ত্র পালন করিব, কুলের বিচার করিব না। মনে কোনপ্রকার দ্বিধা না রাখিয়া তুমি আমাকে সত্যবতী দান কর। তোমার এক আপত্তির খণ্ডন হইয়া গেল;—ভাল, তোমার দ্বিতীয় আশঙ্কা কি?

দাস। দ্বিতীয় আশঙ্কা গুরুতর। ভীষ্মদেব আপনার পুত্র; পুত্র বিদ্যমানে আপনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবেন, ইহা বরং সম্ভব হইতে পারে; কেন না রাজগণ বহু মহিষীর পতি হইয়া থাকেন; সেই প্রমাণে সত্যবতী-গ্রহণে আপনার বাধা হইবে না; কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী হইয়া সিংহাসনে বসিবেন, সত্যবতীর গর্ভে পুত্র জন্মিলে সে পুত্র কেবল রাজপুত্র হইয়া রাজার অনুচর হইয়া থাকিবে, রাজমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে না; সত্যবতীও মহিষী-মর্য্যাদার অধিকারিণী হইবে না।

রাজা। সে আশঙ্কা তুমি পরিত্যাগ কর। আমি সত্য সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সত্যবতীর গর্ভে পুত্র জন্মিলে সেই পুত্রকেই আমি রাজপদে অভিষিক্ত করিব। দেবব্রত ভীষ্মদেব সদাসত্য ধর্ম্ম পরায়ণ, আশৈশব সত্যবাদী ও অকপট পিতৃবৎসল; আমি সত্যবতীর পুত্রকে রাজ্যদান করিলে ভীষ্ম কদাচ ক্ষুণ্ণ হইবে না।

দাস। মহারাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমি একটি অপ্রিয় বাক্য নিবেদন করিতেছি। আপনি বলিতেছেন, "সত্যবতীর পুত্রকে রাজ্য দিলে ভীষ্মদেব মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না;"—আমিও জানি, ভীষ্মদেব ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়; কিন্তু তিনি রাজ্য সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হইয়া, বিমাতৃ-কুলের অনুকূলে স্বীয় ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আমার মনে লইতেছে না।

রাজা। ভাল, আজ তবে আমি বিদায় হইলাম, কল্য এইরূপ সময়ে ভীষ্মদেবকে আমি তোমার নিকটে আনয়ন করিব, তাঁহার মুখে আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমার সমস্ত আশঙ্কার ও সমস্ত সংশয়ের বিভঞ্জন হইয়া যাইবে।

রাজা শান্তনু বিদায় গ্রহণ করিলেন, সত্যবতী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গুপ্তস্থান হইতে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন, দাসরাজ চিন্তাকুল হইয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্মের সম্মতি প্রদান ও কঠোর প্রতিজ্ঞা।

দেবব্রত ভীষ্মদেব শান্তনু রাজার পুত্র। একদা গঙ্গাদেবী সুন্দরী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শান্তনু রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়া ছিলেন। নিয়ম ছিল, নারীরূপিণী গঙ্গা বলিয়া ছিলেন "স্বেচ্ছামতে আমি যখন যে কার্য্য করিব, তুমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না, সে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

বিবাহের পর শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে একে একে অষ্ট বসু জন্মগ্রহণ করেন; সাতটি বসু প্রসূত হইবামাত্র জননী একে একে তাহাদিগকে গঙ্গা জলে বিসর্জ্জন দেন; সর্ব্বশেষে ভীষ্মের জন্ম। সাত পুত্র শোকে রাজা শান্তনু নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অষ্টম পুত্রটি সেইরূপে বিসর্জ্জিত না হয়, বিসর্জ্জন দিতে গঙ্গাকে তিনি নিবারণ করিবেন, এই সংকল্পে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া সবিনয়ে গঙ্গাকে তিনি বলিলেন, "রাজ্ঞি! তুমি আমার সাত পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াছ, পাষাণবৎ হইয়া তাহা আমি সহ্য করিয়াছি, এখন আমার এই মিনতি যে, এই পুত্রটি তুমি রক্ষা কর, বিসর্জ্জন দিও না।"

হাস্য করিয়া গঙ্গা বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া গেল; আর আমি তোমার গৃহে থাকিব না।" এই বলিয়া পুত্রটি ক্রোড়ে লইয়া গঙ্গাদেবী রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া যান; তাহার পর পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর একবার আসিয়া রাজাকে এই পুত্রটি দিয়া গিয়া-

অঙ্গীকারানুসারে রাজা শান্তনু নির্দিষ্ট সময়ে ভীষ্মদেবকে সঙ্গে লইয়া দাসরাজের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। দাসরাজ পূর্ব্ববৎ সমাদরে পিতা পুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজা তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবব্রত! এই দাসরাজের একটি পরম রূপবতী কন্যা আছে, তাহার নাম সত্যবতী; জগতী-তলে তাদৃশী রূপবতী কন্যা সম্ভবে না; সত্যবতীর রূপ দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি, সঙ্কল্প করিয়াছি যে, সত্যবতীকে আমি বিবাহ করিব। ইহাতে তোমার কিরূপ অভিপ্রায়?"

ভীষ্ম। মহারাজ! আমার প্রতি এ প্রশ্ন কেন? আমি চিরদিন আপ-নার পদ-সেবায় নিরত, আজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবার আমার অধিকার নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ করুন; তৎপক্ষে আমার অক্ষুণ্ণ অনুমোদন।

রাজা। দাসরাজ বলিয়াছেন, তুমিই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী, সত্যবতীর গর্ভে পুত্র জন্মিলে তাহাকে সিংহাসনের অধিকারী করা হইবে না, তবে আর রাজ হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া কি ফল?

ভীষ্ম। মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দাসরাজও শ্রবণ করুন, রাজ্যাধিকারের লোভে কদাচ আমি পিতৃ ইচ্ছার বিরোধী হইব না; দাসরাজের দৌহিত্র এই রাজ সিংহাসনের অধিকারী হইবেন; সাধ্যানুসারে আমি তাঁহার আনুগত্য করিব।

দাস। (ভীষ্মের প্রতি) যুবরাজ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে রাজসম্পদে অভিলাষ রাখিবে না। এ প্রতিজ্ঞা তুমি পালন করিতে পারিবে,—কিন্তু তোমার ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তোমার পুত্র পৌত্রগণ সিংহাসন অধিকার করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

ভীষ্ম। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি বলিতেছি, চির জীবন আমি কৌমার-ব্রতাচরণ করিব, এ জীবনে কদাচ দারপরিগ্রহ করিব না। ধর্ম্মরাজ সাক্ষী, চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী, বিভানু অগ্নিদেব সাক্ষী, আমার এ প্রতিজ্ঞা কোন ক্রমেই লঙ্ঘিত হইবে না; হিমালয় পর্ব্বত তুল্য আমার প্রতিজ্ঞা অটল।

ভীষ্মের এই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া রাজা শান্তনু সস্নেহে ও সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; দাসরাজ বিস্ময় বিহ্বল হইয়া "ধন্য ভীষ্মদেব, ধন্য প্রতিজ্ঞা," পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, ঘন ঘন তাঁহার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল; তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কুরু বংশীয় শ্রেষ্ঠ নরপতির মহিষী হইবেন, এই আনন্দে তাঁহার আলোড়িত মুখমণ্ডলে অপরূপ আভা বিকাশ পাইল। ভূমণ্ডলে ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা তুল্য প্রতিজ্ঞা আর কেহ করিতে পারে না, এই ধারণায় সত্যবতীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সত্যবতীর বিবাহ ও প্রকৃত পরিচয় প্রদান।

প্রফুল্লবদনে রাজা শান্তনু সগৌরবে দাসরাজকে বলিলেন, "আমার বাক্যে এখন তোমার প্রত্যয় হইল ত? ভীষ্মদেবের ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলে ত? আর এখন তোমার কাল্পনিক আশঙ্কার কোন কারণ নাই; এখন তুমি সানন্দ চিত্তে আমাকে সত্যবতী সমর্পণ কর।

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দাসরাজ সেই মুহূর্ত্তে সম্মতি দান করিয়া কর-পুটে বলিল, "মহারাজ! আমি কৃতার্থ হইলাম।"

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে সত্যবতীর সহিত শান্তনু রাজার শুভপরিণয় সুসম্পাদিত হইল।

পতিসহ হস্তিনাপুরীতে আগমন করিয়া, গন্ধবতী যোজনগন্ধা সত্যবতী কায়মনোবাক্যে পরম যত্নে ভক্তিভরে পতিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তিনবৎসর অতীত হইয়া গেল। এক রজনীতে সত্যবতী প্রসন্ন বদনে—অথচ কিঞ্চিৎ লজ্জা সঙ্কুচিত ভাবে স্বামীকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি পরম ভাগ্যবতী, আপনি আগ্রহ করিয়া এই দাসীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আমার মানবীজন্ম সার্থক। যদি অনুমতি হয়, আমার জীবনের একটী গুহ্য রহস্য নিবেদন করি।"

রাজা কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি কি কারণে এ বিষয়ে আমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছ? আমার নিকটে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, কি তোমার রহস্য আছে, অসঙ্কোচে প্রকাশ কর।"

সত্যবতী লজ্জা বিনম্র বচনে মৃদুস্বরে কহিলেন, মহারাজ! প্রথম যৌবনে পিতার নিদেশানুসারে যখন আমি যমুনা ঘাটে তরণীযোগে পারার্থী-

দিয়াছিলেন। তাঁহার করস্পর্শে আমার গাত্রে পদ্মগন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে; সেই সময় তিনি আমাকে একটি গুহ্য কথা জানাইয়া গিয়াছেন। সে কথা কেহই জানেনা; ঋষিমুখে আমি শুনিয়াছি, আর এই রাত্রিকালে আপনি শ্রবণ করিবেন। আপনি জানিয়া রাখিয়াছেন, ধীবর কন্যার সহিত আপনার বিবাহ হইয়াছে; বাস্তবিক তাহা নহে; ঋষি আমারে বলিয়া গিয়াছেন, ক্ষত্রকুলোদ্ভব একজন ধর্ম্মশীল রাজা আমার জন্মদাতা পিতা, আমি রাজকন্যা; দাসরাজ আমার পালক পিতামাত্র। আমার জন্মদাতা নরপতির প্রকৃত নাম কি, মুনিবর তাহা বলেন নাই, আমিও বলিতে পারিলাম না।”

মহামর্য্যাদা সূচক এই গুহ্যতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া রাজা শান্তনু মহানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সত্যবতী রাজকন্যা, ক্ষত্রকুলসম্ভবা, এই গৌরবে প্রফুল্লচিত্তে তিনি তখন নির্নিমেষ নয়নে সত্যবতীর বদনারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই অবসরে সত্যবতী পুনরায় কহিলেন, “মহারাজ দাসীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আর একটি নিগূঢ় রহস্য নিবেদন করিব। মহর্ষি পরাশরের বর প্রভাবে কুমারী অবস্থায় আমার একটি পুত্র জন্মিয়াছে, সেই পুত্রের নাম হইয়াছে—ব্যাস। ঋষিবর আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, ব্যাস যথাকালে বেদ-বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম গ্রহণ করিবেন, তপোযোগ ও কর্ম্মযোগ সম্পন্ন হইয়া ধরাধামে সুবিখ্যাত হইবেন। তপস্যা করিবার নিমিত্ত ব্যাস এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আমি তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি আমাকে দর্শন দিবেন, এইরূপ তাঁহার অঙ্গীকার আছে।

সত্যবতীর মুখে ব্যাসের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজা শান্তনু অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিলেন, হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাসে তাঁহার সর্ব্বগাত্র কণ্টকিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুত্র লাভ,—পুত্রবিয়োগ ও বৈধব্য।

শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে প্রথমে চিত্রাঙ্গদ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; রাজকুমার চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধশাস্ত্র বিশারদ ও মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইলে পিতার অনুজ্ঞা ক্রমে দেবব্রত ভীষ্মদেব তাঁহাকে রাজ

রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিয়া সর্ব্বত্র মহা যশস্বী হইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব্ব রাজের সহিত ক্রমাগত তিন বৎসর কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে রাজা চিত্রাঙ্গদের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, সেই সংগ্রামে রাজা চিত্রাঙ্গদ প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রশোকে শান্তনু ও সত্যবতী এবং ভ্রাতৃশোকে ভীষ্মদেব অতিশয় কাতর হইয়া ছিলেন।

চিত্রাঙ্গদের জন্মের পর সত্যবতী আর একটি পুত্র প্রসব করেন; সে পুত্রের নাম বিচিত্রবীর্য্য। সেই পুত্রটি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেই সময় রাজা শান্তনু তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ভীষ্মদেব যথাবিধি পিতৃকৃত্য সম্পাদন করিয়া পরম যত্নে বিচিত্রবীর্য্যের লালন পালন করিতে থাকেন; কুমার বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভীষ্মদেব তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রাজ্ঞী সত্যবতীর অভিমতে স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব ও কন্যা হরণ।

বিচিত্রবীর্য্য যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন, ভীষ্মদেব তখন তাঁহার পরিণয় কার্য্য সমাধানার্থ উপযুক্ত কন্যার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। সেই সময় তিনি শুনিতে পান, কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন। কন্যাদের নাম অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকা। বহুতর রাজা ও রাজকুমার সেই কন্যাত্রয়কে লাভ করিবার আশায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি একটি বিবাহের অঙ্গ। সত্যবতীর অনুমতি লইয়া, বিচিত্রবীর্য্যের জন্য, সেই তিনটি কন্যা হরণাভিলাষে ভীষ্মদেব ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন; "আমি ব্রহ্মচারী, বিবাহ করিব না, আমার এক ভ্রাতার নিমিত্ত এই তিনটি কন্যাকে হরণ করিব, যদি কাহার সামর্থ্য থাকে, আমার হস্ত হইতে ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া লও।"—স্বয়ম্বর সভায় সমবেত রাজগণকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কন্যা তিনটিকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন। রাজগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার;

মূর্চ্ছিত হইলেন, বিস্তর সৈন্যসামন্ত যান বাহন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। রণ বিজয়ী হইয়া রাজতনয়াগণকে লইয়া ভীষ্মদেব হস্তিনাপুরী যাত্রা করিলেন। পথে শাল্বরাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। শাল্বরাজা একটি কন্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলেন, তিনি ভীষ্মের রথ হইতে সেইটিকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; শাল্বের রথ সারথী ও অনুচর সেনানীবর্গ বিনষ্ট হইল, শাল্বরাজ নিজেও শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেন; কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহাকে প্রাণে মারিলেন না, মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

ভীষ্মের রথ হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশীরাজের পুরমরূপবতী দুহিতাগুলিকে অবলোকন করিয়া রাণী সত্যবতী পরম পরিতুষ্ট হইলেন, প্রাসাদের অন্তঃপুরে তাঁহাদিগকে রাখিয়া স্নেহ যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। রাজা বিচিত্রবীর্য্য ঐ তিনটিকেই বিবাহ করিবেন, এইরূপ পরামর্শ।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুত্রের বিবাহ, অন্যানুরক্ত কন্যাকে পরিত্যাগ।

অতঃপর বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। কাশী-নরেশের তিন কন্যার মধ্যে অম্বা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, দ্বিতীয়া অম্বিকা, তৃতীয়া অম্বালিকা। পরিণয় রজনী সমাগত হইবার পূর্ব্বে অম্বা একদিন সত্যবতী সমীপস্থ ভীষ্মদেবকে কহিলেন, "হে মহানুভব! স্বয়ম্বর সভায় আমি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আমার পিতারও তাহাই অভিলাষ; শাল্বরাজও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, বিবেচনা করিয়া আপনিই তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করুন।

রাণী সত্যবতী রাজকুমারী অম্বার ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "বৎস! তুমি চিরদিন সত্য-ধর্ম্মের সেবা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর কর, এই রাজকুমারী যাহা কহিলেন—ধর্ম্মানুসারে তাহার উপযুক্ত অনুষ্ঠান করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

ভীষ্ম কহিলেন, "রাজকুমারীর অভিলাষ পূর্ণ হইবে; ইনি আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন; আমি ইহাঁকে শাল্বরাজের হস্তে অর্পণ করিতে

মাতার নিকটে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া সত্যব্রত ভীষ্মদেব সেই দিনেই সৌভরাজ্যে শাল্বরাজের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, হস্তিনায় আগমনের আমন্ত্রণ। দূতমুখে ভীষ্মের আহ্বান অবগত হইয়া শাল্বরাজ অবিলম্বে হস্তিনায় আগমন করিলেন। প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম, সেরূপ যুদ্ধে জয় পরাজয়ে পরস্পর মনোমালিন্য জন্মে না; ভীষ্মদেব সমুচিত সমাদরে শাল্বরাজের অভ্যর্থনা করিয়া বিনীত বচনে বলিলেন, "রাজন্! কাশী-রাজকুমারী অম্বা তোমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, অতএব কন্যা হরণের সময় পথিমধ্যে তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল; তজ্জন্য আমি এখন অনুতপ্ত হইয়াছি। অম্বা এক্ষণে নিজমুখে তাঁহার অনুরাগ ও অভিলাষ আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, আমার বিজিতা সেই রাজনন্দিনীকে তুমি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রতিগ্রহ করিতে পার।"

ভীষ্মের সৎব্যবহারে প্রীত হইয়া, ভীষ্মকে ও সত্যবতীকে অভিবাদনপূর্ব্বক রাজকুমারী অম্বাকে নিজ রথে আরোপিত করিয়া, শাল্বরাজ স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন; অনন্তর যথোচিত সমারোহে অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত রাজা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুত্রের পরলোকে গমন বংশরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ।

রাজা বিচিত্রবীর্য্য পরম রূপবান্, যৌবনকালে নব যুবতী সুন্দরী কামিনী দ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নিরন্তর ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসে অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত সাত বৎসর এরূপ অনিয়মে রাজা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন এবং সেই রোগে অচিরাৎ তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। পুরবাসীগণ ও প্রকৃতি-পুঞ্জ মহাশোকাকুল হইলেন।

রাজা শান্তনু স্বর্গবাসী হইয়াছেন, গন্ধর্ব্বরাজের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্য্য লীলা সম্বরণ করিলেন, কুরুবংশ রক্ষার কি উপায়,—রাণী সত্যবতী দিবানিশি সেই চিন্তায় নিমগ্না।

সত্যবতী বিধবা, তাঁহার দুটি যুবতী পুত্রবধু বিধবা, ভীষ্মদেব ব্রহ্মচর্য্য নিরত, ভরতবংশ রক্ষার কি উপায় হয়, সর্ব্বক্ষণ তাহা চিন্তা করিয়া, সত্যবতী একদিন

ভীষ্ম কহিলেন, "মাতঃ! বংশরক্ষার একটি উপায় আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি। একজন সৎকুলোদ্ভব গুণবান ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন দান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করুন, তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপাদন করিবেন।"

লজ্জাবনত বদনে সত্যবতী কহিলেন, "হে ধর্ম্মব্রত! যাহা তুমি বলিলে তাহা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু তাদৃশ গুণযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্লভ, আমি আমার কুমারী কালের একটি গুহ্য কথা তোমাকে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। "আমি যখন যমুনা ঘাটে তরণী চালন্ করিতাম, সেই সময় মহর্ষি পরশর দৈবযোগে দর্শন দিয়া আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর প্রদান করেন। তাঁহার বরপ্রভাবে আমি একটি পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হই; চতুর্ব্বেদের বিভাগ কর্ত্তা হইয়া সেই পুত্র বেদ-ব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে তপস্যা করিতেছেন, আমি স্মরণ করিলেই এখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে দর্শন দিবেন, তাঁহার দ্বারাই আমাদের বংশরক্ষার উপায় হইতে পারিবে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি শাস্ত্রকুশল, তুমি সৎবিবেচক, তুমি ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষয়ে তোমার কিরূপ অভিপ্রায়?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভরতবংশ-রক্ষার্থ বেদব্যাসের পুত্রবর প্রদান।

বেদব্যাসের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মদেব কহিলেন, "মাতঃ! ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের সমাদর করিয়া ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ, এবং কাম ও কামানুবন্ধ অনুসারে যাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সংসারে তাঁহারাই বুদ্ধিমান এবং তাঁহারাই জনসমাজে শ্রেষ্ঠ। আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মানুগত, মঙ্গলকর এবং আমাদের কুলের বিশেষ হিতজনক; অতএব আমি তৎবিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।"

ভীষ্মের অনুমোদনে পরিতুষ্টা হইয়া সত্যবতী তৎক্ষণাৎ তাঁহার কানীন-পুত্র ব্যাসদেবকে স্মরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্রে তেজঃপুঞ্জ ব্যাসদেব তথায় আবি-র্ভূত হইলেন। সস্নেহে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসানন্তর সত্য-বতী কহিলেন, "বৎস! মহামতি ভীষ্মের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক আমি তোমাকে ধর্ম্মতঃ একটি অনুরোধ করিতেছি, তুমি সেই অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে তপোধন! আর্য্য ভরতকুল নির্ব্বংশ হইতেছে;

হইয়াছেন; কুরুবংশে এখন আর কেহ রাজা নাই, সত্যব্রত ভীষ্মদেব কুমার-ব্রহ্মচারী, তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে ভরতবংশ রক্ষা হয় তুমি তাহার উপায় বিধান কর। তোমার বিধবা ভ্রাতৃজায়ারা বংশরক্ষার্থ পুত্রার্থিনী হইয়াছেন; অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে রূপগুণ সম্পন্ন রাজ্য শাসনক্ষম সৎপুত্র প্রদান করিয়া কুরুকুল রক্ষায় যত্নবান হও। বৎস! রাজ্যে সৎপুত্র না হইলে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়,—প্রকৃতিপুঞ্জ নিঃসহায় হইয়া উৎসন্ন হইয়া যায়, দেবগণ ও পিতৃগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়া অপরিতৃপ্ত থাকেন, সংসার মধ্যে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। যাহাতে এই সকল বিপত্তি নিবারিত হইতে পারে, তুমি কৃপা করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর; ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ-রক্ষার সহায় হও।"

ব্যাস কহিলেন, "মাতঃ! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; বধূগণ যদি আমার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সম্বৎসরকাল শুদ্ধাচারে ব্রতবতী থাকিতে পারেন, আমার বিকটমূর্ত্তি দর্শনে যদি ভীতা না হন, আমার গাত্রের উৎকট দুর্গন্ধ সহ্য করিতে যদি তাঁহারা অসমর্থ না হন, তাহা হইলে কুলধর্ম্মানুসারে আমি তাঁহাদিগকে পুত্রবর প্রদান করিতে পারি।"

সত্যবতী কহিলেন. "সম্বৎসর প্রতীক্ষা না করিয়া অচিরে তুমি তাহাদের প্রতি সদয় হইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, অহোরাত্রি তাঁহারা সংযত হইয়া থাকিবেন. সেই ব্রতফলে তুমি তাহাদিগকে মন্ত্র প্রদান কর।"

"তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষি বেদব্যাস জননীর আজ্ঞা-পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর বধূদ্বয়কে সেই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া সত্যবতী তাঁহাদিগকে পবিত্রাচারে দিবা যামিনী যাপন করিবার উপদেশ দিলেন, বধূরাও তদনুসারে ব্রতবতী হইয়া থাকিলেন। জ্যেষ্ঠা-বধূ অম্বিকাদেবী; নিশাকালে বেদব্যাস বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিধিবিহিতরূপে তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিলেন; কিন্তু ঋষিবরের কৃষ্ণাবয়ব, মস্তকে বিপুল জটাভার ও দীর্ঘ শ্মশ্রু দর্শনে এবং গাত্রে দুর্গন্ধের আঘ্রাণে অম্বিকাদেবী ভয় পাইয়া নয়ন নিমীলন করিলেন। ব্যাসদেব কহিলেন, "কল্যাণি! তুমি অমিততেজা সর্ব্বগুণবান পুত্র প্রসব করিবে, কিন্তু তোমার দোষে পুত্রটি জন্মান্ধ হইবে।"

ব্যাসদেব সেই শয়ন গৃহ হইতে বহির্গত হইলে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ত?"

ব্যাসদেব কহিলেন. ভগবতি! জ্যেষ্ঠা বধূর গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী আমার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ভীতিপ্রযুক্ত

সত্যবতী কহিলেন, "ভরতবংশে অন্ধ রাজকুমার রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য হইতে পারিবেন না; অতএব তুমি দ্বিতীয়া বধূর গর্ভে সুলক্ষণ-যুক্ত আর একটি সুকুমার উৎপাদন কর।"

অতঃপর দ্বিতীয় রজনীতে অম্বালিকার শয়ন গৃহে বেদব্যাসের প্রবেশ। অম্বালিকাও তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণা হইয়া ছিলেন; তদ্দর্শনে ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন, "ভদ্রে! তুমি রূপগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিবে, কিন্তু পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে। গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া সত্যবতীকেও তিনি ঐ কথা বলিলেন। সত্যবতী কহিলেন, "তবে তুমি আর একটি সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রদান কর। অপ্সরা সদৃশী রূপবতী একটি দাসী অম্বিকার নিকটে ছিল সেই দাসীকে মন্ত্র প্রদান করিয়া ব্যাসদেব তাহাকে একটি পুত্র প্রদান করিলেন।

অম্বিকার গর্ভে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের, অম্বালিকার গর্ভে সর্ব্বগুণযুত পাণ্ডুর, দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাত্মা বিদুরের জন্ম।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজকুমারী গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করেন, গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্রের জন্ম হয়। অন্ধত্ব নিবন্ধন ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন নাই, অম্বালিকা নন্দন পাণ্ডুই রাজা হইয়া ছিলেন। পাণ্ডুর দুই পত্নী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ভে তিন পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন—মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব। এই পঞ্চপুত্রই মহাভারতে পাণ্ডব নামে সুবিখ্যাত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোধনের ঈর্ষা, সত্যবতীর স্বর্গারোহণ।

ঈর্ষাবশে দুর্য্যোধন স্বয়ং রাজা হইবার বাসনায় শৈশবাবধি পাণ্ডবগণের প্রতি ভীষণ শত্রুতাচরণ করিয়া ছিলেন, তাহার ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রাম। সেই মহাহবে কুরুকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যায়, কেবল পঞ্চ পাণ্ডব জীবিত থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান কাল পর্য্যন্ত সত্যবতী জীবিতা ছিলেন; অনন্তর সমর-নিহত যোধবর্গের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনান্তে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হস্তিনায় আগমন পুরঃসর সত্যবতীকে কহিলেন, "মাতঃ! কলিযুগ সমাগত হইবার আর বিলম্ব নাই, সমস্ত লোক কুকর্ম্মে রত হইবে, পৃথিবী শস্যহারা হইবেন, তরুগণ অল্প ফল-প্রসব করিবে, ধরণী মহাপাপভারে আক্রান্ত হইবে, অতএব সেই দুর্দ্দিন সমাগত হইবার পূর্ব্বে বনগমন পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করাই এক্ষণে আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" ব্যাসের বচনানুসারে যশস্বিনী সত্যবতী বধূগণের সহিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন।

নিশীথ--শয়ানে।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী।

জাগ্রতে আমার একান্তই যদি
নাহি আস প্রিয়তম,
(তবে) ঘুমের আড়ালে নীরবে আসিও,
ওগো—সুন্দর অনুপম।

চাহি নাই তব চির আলিঙ্গন,—
পলকের মাঝে সহস্র চুম্বন,
কণ্ঠ-ভূষণে গাঁথিয়া রাখিতে
মাধবী কুসুম সম।
ওগো—সুন্দর অনুপম।

যতটুকু মোর আছে অধিকার,—
তার বেশী কেন, চাহিব আবার,
বিশ্বের রাজে কেমনে রাখিব
ক্ষুদ্র হৃদয়ে মম।
ওগো—সুন্দর অনুপম।

স্বপনের মাঝে তোমার পরশ
লভিতে বাসনা মোর,—
তাহাই পাইলে সে সুখ-যামিনী—
জীবনে হবেনা ভোর।

আসিও হে নাথ আকুল পরাণে,—
নিশীথে আমার বিরাম শয়ানে,
নীরবে—গোপনে বারেক চুমিও
ঘুমান অধরে মম।
ওগো—সুন্দর অনুপম।

একটি চুম্বন সারাটি জীবনে,
বারেকের দেখা নিশীথ স্বপনে,
ক্ষুদ্র পরাণে কেমনে ধরিব—
এত সুখ প্রিয়তম।

ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্ব্বাসনো বুধঃ।
নৈব কিঞ্চিৎ কৃতং তেন লোকদৃষ্ট্যাপিকুর্ব্বতা ॥ ১৯ ॥
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুগ্রহঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্ ॥ ২০ ॥
নির্ব্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ ॥ ২১ ॥
অসংসারস্য তু ক্বাপি ন হর্ষো ন বিষাদিতা।
সুশীতলমনা নিত্যং বিদেহ ইব রাজতে ॥ ২২ ॥
কুত্রাপি ন জিহাসাস্তি নাশো বাপি ন কুত্রচিৎ।
আত্মারামস্য ধীরস্য শীতলাচ্ছতরাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

বাসনা ও বিকল্প-শূন্য, তৃপ্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে লোকে কার্য্য করিতে দেখিলেও, বস্তুতঃ তিনি কিছুই করেন না।—তিনি বিষয় ও ক্রিয়াদি অলীক ও স্বপ্নবৎ দেখিতেছেন, সুতরাং তিনি কর্ম্মক্ষয় জন্য যথাগত কর্ম্ম করিলেও, কর্ত্তৃত্ব ভাবের অভাবে ক্রিয়াশূন্য। ১৯।

ঐরূপ ধীর ব্যক্তির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই বৃথা আগ্রহ নাই, তিনি উপস্থিত মত কার্য্য করিয়াই সুখে অবস্থান করেন।—কার্য্যের চেষ্টাও নাই, এবং কর্ম্মশূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত হইবারও অভিলাষ নাই। যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা সম্পাদন করেন, অথচ তাহাতে আগ্রহ বা বিরক্তি প্রদর্শন করেন না। ২০।

উক্ত বাসনা ও অবলম্বন রহিত, স্বচ্ছন্দ এবং বন্ধমুক্ত ব্যক্তি, বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চালিত শুষ্ক পত্রের ন্যায়, সংস্কার বশে (ভোজন পানাদি) কার্য্য করিয়া থাকেন। ২১।

যিনি সংসারিক নহেন তাঁহার কোনও বিষয়ে হর্ষবিষাদ নাই, সুতরাং তিনি স্থিরচিত্তে, দেহশূন্যের ন্যায় অবস্থিত। ২২।

স্থির ও শান্তচিত্ত এবং আত্মানন্দ উপভোগকারী ব্যক্তির কোনও বিষয় ত্যাগেরও ইচ্ছা নাই এবং কোনও বিষয়ের আশাও নাই। ২৩।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তস্য কুর্ব্বতোহস্য যদৃচ্ছয়া।
প্রাকৃতস্যেব ধীরস্য ন মানো নাবমানিতা॥ ২৪॥
কৃতং দেহেন কর্ম্মেদং ন ময়া শুদ্ধচারিণা।
ইতি চিন্তানুরোধী যঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি ন॥ ২৫॥
অতদ্বাদীব কুরুতে ন ভবেদপি বালিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ সুখী শ্রীমান্ সংসরন্নপি শোভতে॥ ২৬॥
নানাবিচারসুশ্রান্তো ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
ন কল্পতে ন জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি॥ ২৭॥
অসমাধেরবিক্ষেপান্ন মুমুক্ষুর্ন চেতরঃ।
নিশ্চিত্য কল্পিতং পশ্যন্ ব্রহ্মৈবাস্তে মহাশয়ঃ॥ ২৮॥

স্বভাবতঃ শূন্যচিত্ত, এবং যদৃচ্ছাগত কার্য্যকারী, সরল, ধীর ব্যক্তির মানাপমানও নাই। ২৪।

আমি বিশুদ্ধ কিছুই করি না, এই মায়াময় দেহই কর্ম্মকারী; যাঁহার এই রূপ ধারণা আছে, তিনি কিছু করিয়াও করেন না।—যেহেতু কর্ম্মফল তাঁহাকে আশ্রয় করে না। ২৫।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুখী, শ্রীমান্; কোনও বিষয়ে কিছু বলেন না, অথচ কার্য্য করেন; বালকের ন্যায় স্বচ্ছন্দচারী, অথচ জ্ঞান পূর্ণ; সংসারী হইয়াও শোভা সম্পন্ন। ২৬।

ধীর ব্যক্তি, বিতর্ক বিচারাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিরাম লাভ করত, কিছুই কল্পনা করেন না, জানেন না, শুনেন না এবং দেখেন না। ২৭।

সমাধি ও বিক্ষেপ বিহীন ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষীও নহেন, এবং মোক্ষের অনভিলাষীও নহেন। তিনি এই মায়াময় বিশ্বকে প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শন করত কল্পনা মাত্র নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মবৎ অবস্থান করেন।—জ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষ দর্শক

যস্যান্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন করোতি করোতি সঃ।
নিরহঙ্কারধীরেণ ন কিঞ্চিদকৃতং কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
নোদ্বিগ্নং ন চ সন্তুষ্টমকর্ত্তৃস্পন্দবর্জ্জিতম্।
নিরাশং গতসন্দেহং চিত্তং মুক্তস্য রাজতে ॥ ৩০ ॥
নির্ধ্যাতুং চেষ্টিতুং বাপি যচ্চিত্তং ন প্রবর্ত্ততে।
নির্নিমিত্তমিদং কিন্তু নির্ধ্যায়তি বিচেষ্টতে ॥ ৩১ ॥
তত্ত্বং পদার্থমাকর্ণ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মূঢ়তাম্।
অথবা যাতি সঙ্কোচসংমূঢ়ঃ কোঽপি মূঢ়বৎ ॥ ৩২ ॥
একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢ়ৈরভ্যস্যতে ভৃশম্।
ধীরাঃকৃত্যং ন পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ স্বপদে স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কার (অর্থাৎ আত্মাভিমান) থাকে, তিনি কোনও কার্য্য না করিয়াও করেন; কিন্তু অহঙ্কার বর্জ্জিত ধীর ব্যক্তি কার্য্য করিয়াও কিছুই করেন না। ২৯।

মুক্ত ব্যক্তি উদ্বেগ, আনন্দ, কর্ত্তৃত্বাভিমান, স্পন্দ, আশা ও সন্দেহ বিহীন চিত্তে বিরাজমান। ৩০।

ধ্যান বা চেষ্টা করিতে চিত্তঃপ্রবৃত্ত হয় না, অথচ অনাসক্ত প্রবৃত্তিশূন্য চিত্তে ধ্যান বা চেষ্টা করিয়া থাকেন।—এই কারণে ইহা কর্ত্তব্য, ইহা মনে করিয়া কার্য্য করা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য নহে। ৩১।

তুমিই সেই ব্রহ্ম [illegible] নিগূঢ়তত্ত্ব; (তৎ-সেই, ত্বং-তুমি ইহা হইতেই তত্ত্ব শব্দ।) এই নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অধম ব্যক্তিরা স্তম্ভিত হয়; অথবা অজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই সঙ্কুচিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়। ৩২।

মূঢ়েরাই একাগ্রতা বা নিরোধ অত্যন্ত অভ্যাস করে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মপদে অবস্থিত, সুতরাং বিশ্বকে স্বপ্নবৎ দেখায়, নিজ কর্ত্তব্য কিছুই দেখেন না। ৩৩।

অপ্রযত্নাৎ প্রযত্নাদ্বা মূঢ়ো নাপ্নোতি নির্বৃতিম্ ।
তত্ত্বনিশ্চয়মাত্রেণ প্রাজ্ঞো ভবতি নির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
শুদ্ধং বুদ্ধং প্রিয়ং পূর্ণং নিস্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্ ।
আত্মানং তং ন জানন্তি তত্রাভ্যাসপরাজড়াঃ ॥ ৩৫ ॥
নাপ্নোতি কর্ম্মণা মোক্ষং বিমূঢ়োঽভ্যাসরূপিণা ।
ধন্যো বিজ্ঞানমাত্রেণ মুক্তস্তিষ্ঠত্যবিক্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
মূঢ়ো নাপ্নোতি তদ্‌ব্রহ্ম যতো ভবিতুমিচ্ছতি ।
অনিচ্ছন্নপি ধীরোঽপি পরব্রহ্মস্বরূপভাক্ ॥ ৩৭ ॥

মূঢ় ব্যক্তিরা যত্ন করিয়া অথবা যত্ন ত্যাগ করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াই শান্তি লাভ করেন। —জ্ঞানোদয় না হইলে কর্ম্মাচরণ বা কর্ম্মত্যাগ উভয়ই সমান, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, কার্য্যের অনুষ্ঠানেও চেষ্টা, অননুষ্ঠানেও ত্যাগেচ্ছা রূপ চেষ্টা; যদিও ঐ ত্যাগেচ্ছা বিরাম লাভ জন্য, কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে, প্রবৃত্তি হেতু, বিরাম লাভ হয় না। ৩৪।

জড় ব্যক্তিরা অভ্যাস পরায়ণ হইয়া সেই বিশুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ, প্রিয়, পূর্ণ, মায়াতীত, ও নির্ম্মল আত্মাকে জানিতে পারে না।—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহাই যোগ। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী নিষ্কাম জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অভ্যাস যোগই বা কেন করিবেন? ৩৫।

বিমূঢ় ব্যক্তি অভ্যাসরূপ কর্ম্ম করায় মোক্ষ লাভে অসমর্থ; মুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান মাত্রেই ক্রিয়াশূন্য হইয়া অবস্থান করেন।—অভ্যাসে যত্ন আছে; "স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" যত্ন থাকিলেই মুক্তি হইল না; বদ্ধেরই যত্নাদি সম্ভব, মুক্তের নহে। ৩৬।

মূঢ় ব্যক্তিরা ব্রহ্মপদে অবস্থান করিবার ইচ্ছা করে বলিয়াই তৎপদে কদাচ অবস্থিত হইতে পারে না; অথচ ধীর ব্যক্তি ইচ্ছা বিহীন হইয়াও পরব্রহ্ম স্বরূপ। —ঐ ইচ্ছাই বন্ধন। সংসারের সকল কার্য্যের ন্যায়, ব্রহ্মপদ লাভেও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রহ্ম পদে অবস্থিত থাকে। ৩৭।

নিরর্থরাগহব্যগ্রা মূঢ়াঃ সংসারপোষকাঃ।
এতস্যানর্থমূলস্য মূলচ্ছেদঃ কৃতো বুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥
ন শান্তিং লভতে মূঢ়ো যতঃ শমিতুমিচ্ছতি।
ধীরস্তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য সর্ব্বদা শান্তমানসঃ ॥ ৩৯ ॥
ক্বাত্মনো দর্শনং তস্য যদ্দৃষ্টমবলম্বতে।
ধীরাস্তং তং ন পশ্যন্তি পশ্যন্ত্যাত্মানমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥
ক্ব নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্ব্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ ॥ ৪১ ॥
ভাবস্য ভাবকঃ কশ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভাবকোহপরঃ।
উভয়াভাবকঃ কশ্চিদেবমেব নিরাকুলঃ ॥ ৪২ ॥

উদ্দেশ্যশূন্য, আগ্রহে ব্যস্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ সংসারেরই পোষক; জ্ঞানীগণ এই অনর্থের মূলস্বরূপ বাসনার মূলচ্ছেদ করিয়া থাকেন। ৩৮।

মূঢ় ব্যক্তি শান্তি লাভের ইচ্ছা করেন বলিয়াই তাহা লাভে অসমর্থ; আর ধীর ব্যক্তি তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াই শান্ত। ৩৯।

যে ব্যক্তি দৃষ্ট বস্তু অবলম্বনকারী, তাঁহার আত্মদর্শন কিরূপে সম্ভব? ধীর ব্যক্তি আত্মাকেই অদ্বিতীয় জানায় সে সকল দেখেনই না।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন দ্বৈত জ্ঞানই বন্ধন। সমস্ত আত্মা, এই জ্ঞান হইলে অন্য বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। ৪০।

যে মূঢ় নির্ব্বন্ধ করে, তাহার নিরোধ কি রূপে হইবে? আত্মানন্দ উপভোগকারী ধীরের নিরোধই অকৃত্রিম। ৪১।

কেহ সংসারের অস্তিত্ব কল্পনা করেন, কেহবা কিছুই নাই, এইরূপ কল্পনা করেন, যিনি এই উভয় ভাবনা হইতে নিবৃত্ত, তিনিই নিশ্চিন্ত।—সংসার কিছুই নহে, জগৎ প্রপঞ্চ অনিত্য এবং মায়াময়, এরূপ চিন্তাও থাকে না। সংসারের

শুদ্ধমদ্বয়মাত্মানং ভাবয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ।
নতুজানন্তিসংমোহাৎযাবজ্জীবমনির্বৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
মুমুক্ষোর্বুদ্ধিরালম্বমন্তরেণ ন বিদ্যতে।
নিরালম্বৈব নিষ্কামা বুদ্ধির্মুক্তস্য সর্ব্বদা ॥ ৪৪ ॥
বিষয়দ্বীপিনো বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ।
বিশন্তি ঝটিতি ক্রোড়ং নিরোধৈকাগ্র্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥
নির্ব্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ।
পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥ ৪৬ ॥
ন মুক্তিকারিকাং ধত্তে নিঃশঙ্কো মুক্তমানসঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৪৭ ॥
যস্তু শ্রবণমাত্রেণ শুদ্ধবুদ্ধির্নিরাকুলঃ।
নৈবাচারমনাচারমৌদাস্যং বা প্রপশ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মন্দধী ব্যক্তিগণই আপনাকে শুদ্ধ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ ভাবনা করে; কিন্তু মোহবশে স্বরূপ অবগত হইতে না পারায়, যাবজ্জীবন শান্তি লাভে অসমর্থ হয়। ৪৩।

মোক্ষাভিলাষীর চিত্ত অবলম্বন বিহীন নহে, (কারণ মোক্ষরূপ অভিলাষই ত রহিয়াছে,) কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বদাই বাসনা ও অবলম্বন শূন্য। ৪৪।

বিষয়রূপ ব্যাঘ্র সন্দর্শনে ভীত ব্যক্তিগণ শরণার্থী হইয়া 'নিরোধ ও একাগ্রতা সিদ্ধির নিমিত্ত অবিলম্বে শান্তিরূপ গিরি ক্রোড়ে প্রবেশ করেন। ৪৫।

বিষয়-বারণ, নির্ব্বাসনারূপ সিংহ অবলোকন করত তুষ্ণী অবলম্বন করত পলায়ণই করে; অথবা অশক্ত হইয়া তোষামোদ সহকারে সেবা করে। ৪৬।

মুক্তচিত্ত নিঃশঙ্ক ব্যক্তি, মুক্তিসাধক সাধনাদির অনুষ্ঠান করেন না। এবং দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণাহার করিয়াও যথাসুখে অবস্থান করেন। ৪৭।

যিনি তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াই বিশুদ্ধ চিত্ত ও নিরাকুল হন, তিনি আচার, অনা-

যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তদা তৎ কুরুতে ঋজুঃ।
শুভংবাপ্যশুভংবাপি তস্য চেষ্টা হি বালবৎ ॥ ৪৯ ॥
স্বাতন্ত্র্যাৎ সুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যাল্লভতে পরম্।
স্বাতন্ত্র্যান্নির্বৃতিংগচ্ছেৎস্বাতন্ত্র্যাৎপরমং পদম্ ॥ ৫০ ॥
অকর্ত্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাত্মনো মন্যতে যদা।
তদা ক্ষীণা ভবন্ত্যেব সমস্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৫১ ॥
উচ্ছৃঙ্খলাপ্যকৃতিকা:স্থিতির্ধীরস্য রাজতে।
ন তু সস্পৃহচিত্তস্য শান্তির্মূঢ়স্য কৃত্রিমা ॥ ৫২ ॥
বিলসন্তি মহাভোগৈর্বিশন্তি গিরিহ্বগরান্।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৫৩ ॥

শুভ বা অশুভ কার্য্য যখন উপস্থিত হয়, সরল ভাবে তখনই বালকের ন্যায় তাহা সম্পাদন করেন। ॥ ৪৯ ॥

স্বাতন্ত্র্য দ্বারাই (অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনাসক্ত ভাবে আত্মা মাত্রে অবস্থিতিতেই) সুখ, শ্রেষ্ঠত্ব, শান্তিলাভ ও পরম পদে অবস্থান হয়। ৫০।

যখন আত্মার অকর্ত্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব অনুভব হয়, খনত সমস্ত চিত্তবৃত্তিই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৫১।

স্থিতপ্রজ্ঞ ধীর ব্যক্তির অকৃত্রিম শান্তি উচ্ছৃঙ্খল রূপে অনুভূত হইলেও শোভমানা, কিন্তু কৃত্রিম শান্ত বেশধারী মূঢ়ের স্পৃহাযুক্ত চিত্ত কখনই শান্তি লাভে সমর্থ হয় না।—অর্থাৎ প্রকৃত ধীর ব্যক্তি উন্মত্তবৎ আচরণই করুন অথবা যথেচ্ছা বিচরণই করুন, তাঁহার চিত্ত স্খলিত হয় না। ৫২।

ধীর, বন্ধমুক্ত, কল্পনাবিহীন ব্যক্তি, কখনও মহা ভোগসুখে কখনও বা গিরি গহ্বরে বাস করেন।—অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান। কর্ম্মক্ষয় জন্য

শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থম্ অঙ্গনাং ভূপতিং প্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা সংপূজ্য ধীরস্য ন কাপি হৃদি বাসনা ॥ ৫৪ ॥
ভৃত্যৈঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ দৌহিত্রৈশ্চাপি গোত্রজৈঃ।
বিহস্য ধিক্কৃতো যোগী ন যাতি বিকৃতিং মনাক্ ॥ ৫৫ ॥
সন্তুষ্টোপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোহপি ন চ খিদ্যতে।
তস্যাশ্চর্য্যদশাং তাং তাদৃশা এব জানতে ॥ ৫৬ ॥
কর্ত্তব্যতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
শূন্যাকারে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিকারা নিরাময়াঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রোত্রিয়, দেবতা, তীর্থ, যোষিৎ, নৃপতি অথবা প্রিয় বস্তু দর্শন ও তৎসেবা করিয়াও ধীর ব্যক্তি কামনা শূন্য থাকেন।—সাধারণ লোকের অভ্যাসই এই যে, দেবতা ব্রাহ্মণাদি দর্শনে সুখ মোক্ষাদি, নৃপতি প্রভৃতি দর্শনে পদমর্য্যাদাদি, নারী বা প্রিয়দর্শনে সঙ্গ কামনা করিয়া থাকে। সকলেই সকলের কামনা না করুন, কোনটি না কোনটির কামনা অন্ততঃ অন্তরে প্রায়ই থাকে, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির কোন কামনাই কেন থাকিবে? তিনি সকলেই উদাসীন। ৫৪।

তদ্রূপ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্যাতি, বা দুষ্টের উপহাস ও ধিক্কারেও যোগীর চিত্ত-বিকার জন্মে না।—আপামর সাধারণ ইতর লোকের সৎ বা অসৎ সকল প্রকার ব্যক্তিকেই উপহাস করা অভ্যাস; অনাসক্ত যোগীর, বিষয়ে অনাসক্তিই তাহাদের উপহাসের হেতু হয়, কিন্তু হেয়োপাদেয়-জ্ঞান-শূন্য আত্মজ্ঞের, তাহাতে চিত্তাবসাদ বা পূর্ব্বোক্ত প্রকার লাভে সুখবোধ, এরূপ কোন পক্ষেই মনোযোগ হয় না। ৫৫।

সন্তুষ্ট অথচ সুখী নহেন, খিন্ন অথচ খেদ যুক্ত নহেন, যোগী ব্যক্তির তাদৃশ অবস্থা তাঁহারাই জানেন।—সাধারণে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা বোধে অসমর্থ। ৫৬।

কর্ত্তব্যতাই সংসার; তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্য কিছুই দেখেন না; নির্ব্বিকার

বহুমুত্র তথ্য ও চিকিৎসা।

লেখক,—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু আই, এস, এবং এম্, বি, এফ্, সি, এস্, মহোদয়ের ইংরাজী প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ দ্বারা অনুবাদিত।

(নিদান শাস্ত্র Pathology.)

রাত্রিকালীন আহার সময়ে রোগী ইচ্ছানুসারে বিশুদ্ধ ময়দার চাপাটী, পুরি, বা রুটি, কোন কোন প্রকার মাংস, গোল আলু, মাখন বা ঘৃত শাক সব্জী এবং কিছু ঘোল খাইতে পারেন।

যাঁহারা নিরামিষাহারী, তাঁহারা মৎস্য মাংস বা ডিমের পরিবর্ত্তে ডাল ও ছানা খাইতে পারেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ডাইলের মধ্যে ছানাকর (Proteid) দ্রব্য ব্যতীত বহুল পরিমাণে শ্বেতসার আছে। সেই জন্য খুব সাবধান হইয়া ডাইল খাইতে হইবে, অর্থাৎ রোগী ২৪ ঘণ্টায় যতটা শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারে, মোটের উপর শ্বেতসারের পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিরামিষ-ভোজীদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই পীড়ার কঠিনাবস্থায় আরও বাঁধাবাঁধি পথ্য-নিয়ম পরিপালন করা কর্ত্তব্য। তখন কিছু দিনের জন্য যাবতীয় শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্যই বন্ধ করিবার আবশ্যক হয়। কঠিন অবস্থায় কোন কোন স্থলে রোগীর পথ্য তালিকা হইতে শ্বেতসার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইলেও শর্করা-নিঃস্রাব কিছু মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে যে, শর্করা নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহা শ্বেতসারজ নহে; তাহা সম্ভবত ছানাকর ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য হইতেই উৎপন্ন। বহুমুত্র রোগীর পথ্য হইতে হঠাৎ শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া মাংসাদির ব্যবস্থা করা কার্য্যটী বিপদ জনক। ডাঃ ব্রাউন বলেন, এরূপ করিলে রোগী সাধারণতঃ বিবমিষা, বমি ও দৈহিকভার-লাঘবে পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহার নিশ্বাসে অ্যাসিটোনের গন্ধ পাওয়া যায়। তাহার প্রস্রাবে ঐ সকল এসিড্ নির্গত হইতে থাকে; এবং প্রস্রাবের মধ্যে অ্যামোনিয়া (amonia) অত্যধিক

পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহাতে বহুমূত্রজ অসাড়াবস্থাও আনয়ন করে, দেখা গিয়াছে। রোগীর পথ্যের মধ্যে আবার যেই শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়, অমনি প্রাগুক্ত লক্ষণ নিচয় তিরোহিত হইতে থাকে।

বহুমূত্র রোগীরা সাধারণতঃ চর্ব্বি উত্তমরূপে পরিপাক করিয়া থাকে। উহাদের পথ্য-তালিকা হইতে শ্বেতসারযুক্ত আহার্য্য পরিবর্জ্জিত হইলে উহাদের দৈহিক তাপের অপচয় হইয়া থাকে। সেই অপচয় দূর করণার্থ শ্বেতসারের অভাবে চর্ব্বি আহার করা বহুমূত্র রোগীর কর্ত্তব্য। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে চর্ব্বি খাওয়া অনুচিত; কেননা, ইহাতে মেদ বৃদ্ধি রোগ দেখা দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আহার্য্যে চর্ব্বির আধিক্য হেতু অম্ল-রসস্রাবও (acetonuria) ঘটিয়া থাকে। যেখানে অ্যাসিটোন্ ও ডাই-অ্যাসেটিক্ এসিড্ মূত্র মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া দৃষ্ট হইতে থাকে, কিম্বা অসাড়াবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে বুঝা যায়, সেখানে যবক্ষার বহুল ও তৈলাক্ত খাদ্য যথা সম্ভব পরিহার করিয়া শ্বেত-সারযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। তাহাতে শর্করা স্রাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও ভয় করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা, শর্করা-স্রাব অপেক্ষা অসাড়াবস্থাই অধিকতর সাংঘাতিক।

দুগ্ধ ভারতবাসীদিগের একটী প্রধান খাদ্য। তাঁহারা উহা হইতে নানা-প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আহার করেন। যাঁহারা মৎস্য মাংস আহার করেন না, উহা তাঁহাদিগের নিতান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ দুগ্ধের অত্যন্ত গুণকীর্ত্তন করতঃ বলিয়াছেন যে, উহা বহুমূত্র রোগের মহৌষধ। আবার অনেকে বহুমূত্র রোগে উহার ব্যবহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মাখন তোলা দুগ্ধ দ্বারা বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা করা হইয়া থাকে; কিন্তু ইদানীন্তন ডাক্তারগণ ঈদৃশী চিকিৎসার বড় পক্ষপাতী নহেন। এখনকার ডাক্তারেরা বলিয়া থাকেন যে, বহুমূত্র পীড়ায় দুগ্ধের কোনই প্রয়োজন নাই, এতদ্ব্যতীত, রোগীকে মাত্র মাখনতোলা দুগ্ধ সেবন করাইয়া রাখা অতীব নিষ্ঠুরের কার্য্য। আমরা ভারতে দেখিতে পাই, অধিকাংশ বহুমূত্র রোগীরই দুগ্ধ বেশ সহ্য হইয়া থাকে; তবে খুব বেশী খাইলে অপকার করে। রোগীকে যদি শুধু দুগ্ধ খাইয়াই থাকিতে হয়, তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে ১॥০ হইতে ৩ সের পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধপানে তৃষ্ণা দমিত থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য বিদূরিত হয় এবং শর্করা নিঃস্রাব কমিয়া যায়। সুতরাং পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের সহিত আমাদিগের এই স্থানেই মতানৈক্য। সান্নিপাতিক অবস্থায় যখন অত্যন্ত অণ্ডলালিকস্রাব

দেখা দেয়, তখন মাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিলে রোগী মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, অনেক কঠিন কঠিন স্থলে রোগী মাত্র দুগ্ধ খাইয়া আরোগ্যের পথে আসিয়াছে। অনেকে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। এই টুকুই দুগ্ধ পানের অসুবিধা। আবার অনেকে মাত্র দুগ্ধ খাইয়া অনেক দিন থাকিতে চায় না; তাহারা বলে, প্রত্যহ দুধ ভাল লাগে না। বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতিরেকে রোগীর জন্য মাত্র দুগ্ধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু যদি পরিপাকের ব্যাঘাত না থাকে, তবে ভারতীয় রোগীদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

যাহারা দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারেন না, তাঁহাদের অনেকে দধি বা ঘোল বেশ পরিপাক করিতে সক্ষম। দুগ্ধকে যখন ঘোলে পরিণত করা যায়, তখন দুগ্ধান্তর্গত শর্করা দুগ্ধাম্ল রসে (Lactic acidএ) পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতন্নিমিত্ত ঘোল বহুমুত্র রোগীর পক্ষে বড় উপকারী পানীয়। একটা কথা আছে যে, দুগ্ধাম্লরস শর্করা-স্রাব বৃদ্ধি করে; কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

বহুমুত্র রোগীকে নানাবিধ ফল খাইতে দেওয়া সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। বহুমুত্র রোগীকে সুমিষ্ট ফল খাইতে দেওয়া যে, কর্ত্তব্য নহে, তাহা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সকল চিকিৎসকই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল কোন কোন ডাক্তার বলেন যে, ফল খাইলে রোগী বেশ উপকার পাইয়া থাকে। বিগত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যে, ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির (Indian Medical congress) অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে মহীশূর রাজ্যের ডাক্তার ই, এস, কে, আয়ার বলেন যে, তাঁহার চিকিৎসাধীন একটী রোগীকে তিনি শুধু ফল খাইতে দিয়া রাখেন, ইহার ফলে রোগীর শর্করা-স্রাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই রোগী যতদিন মাত্র ফল খাইয়া ছিল, ততদিন তাহার প্রস্রাবে আদৌ শর্করা নির্গত হয় নাই, কিন্তু যেই সে ভাত ও শাক্ শব্জী খাইতে আরম্ভ করিল, অমনি তাহার প্রস্রাবে পুনরায় শর্করা দেখা গেল।

যত প্রকার শর্করা আছে, তন্মধ্যে ফলজ শর্করা-স্রাবে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ও আঙ্গুর-শর্করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপকারী। দুগ্ধ শর্করা ও ইক্ষু শর্করা মধ্যম গুণাবলম্বী। ফলের মধ্যে ফলজ-শর্করা ও আঙ্গুর-শর্করা উভয় প্রকারই বিদ্যমান আছে; কিন্তু উহাতে ফলজ শর্করার অংশই অধিক। রোগীকে আম্র, লীচু, কমলা লেবু, আপেল প্রভৃতি ফল অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়. কিন্তু

কষ্টার্ডআপেল নামক সুস্বাদু ফল, পেয়ারা, খেজুর, কিস্‌মিস্, মিষ্ঠ কমলা, পেঁপে, কাঁঠাল, প্রভৃতি অতীব মিষ্ট। এই কারণে রোগীকে উহা না দেওয়াই ভাল। আনারস (সিঙ্গাপুরের নহে) ডালিম বেদানা, পিউমিলচ্ নামক ফল, (Pumelles) সাধারণ কমলা, পিয়ারা ফল, পিচ্ ফল, কালো জাম প্রভৃতি ঈষদম্ল ফল রোগীকে দেওয়া যায় ; কেননা, উহাতে তৃষ্ণা দূর করে এবং রক্তের ধাতব গুণ বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত উহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে।

জৈ-চূর্ণ দ্বারা আরোগ্য :—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বহুমূত্র রোগীরা সকলে সমান ভাবে সকল প্রকার শ্বেতসার পরিপাক করিতে সক্ষম নহে। ভন্ নুর্‌তেন্ কয়েকটী গুরুতর বহুমূত্র রোগে রোগীকে অন্য শ্বেতসার আদৌ না দিয়া মাত্র জৈ-চূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া অত্যব সুন্দর ফল পাইয়া ছিলেন। কয়েকটী গুরুতর অসাড়াবস্থায়ও জৈ-চূর্ণ পথ্য দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈদ্যগণ বলেন যে, বহুমূত্র রোগীর পরিপাক পক্ষে গোল আলুই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ; তার পরই, জৈ-চূর্ণ। অন্য শ্বেতসার তেমন নহে। ভারতীয় বহুমূত্র রোগীকেও জৈ-চূর্ণ দেওয়া যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য বিধি পালন বিষয়ক চিকিৎসা।—বহুমূত্র রোগীর পক্ষে পথ্য নিয়ম পালন যেমন আবশ্যক, পরিমিত ব্যায়ামও তদ্রূপ। উহাতে শর্করা স্রাব হ্রাস পায় ; শ্বেতসার পরিপাকের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং চর্ম্মের ক্রিয়াশীলতার বৃদ্ধি হওয়ায় মুত্রগ্রন্থির উপর চাপাধিক্য হইতে পারে না। যাহাদের সামান্যরূপ শর্করা স্রাব হইতেছে, তাহারা যদি প্রত্যহ কয়েক মাইল করিয়া ভ্রমণ করে তবে পথ্যের পরিবর্ত্তন ব্যতীতও তাহাদের স্রাব বিদূরিত হইয়া থাকে ; আমি অনেক রোগীকেই এরূপ ভাবে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। বঙ্গদেশের ব্যক্তিগণ আদৌ শারীরিক পরিশ্রম করিতে রাজী নহেন। এই কারণে রোগীকে পীড়াপীড়ি করিয়া ব্যায়াম করান প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য। সাধারণ রোগীর পক্ষে প্রত্যূষে ৫।৬ মাইল ভ্রমণই যথেষ্ট। রোগী যদি তরুণ বয়স্ক হয়, তবে ভ্রমণের পর তাহাকে ১৫ হইতে ৩০ মিনিট কাল ডম্ বেল ভাঁজা অভ্যাস করান যাইতে পারে। সন্ধ্যাকালে রোগীকে ২।১ ঘণ্টা টেনিস্ খেলিতে কিম্বা অন্যূন ৪ মাইল ভ্রমণ করিতে হইবে। কলিকাতাবাসী যদি রোগী হয়েন, তবে ধূলিময় ও জনতাপূর্ণ সহরের রাস্তায় ভ্রমণ না করিয়া তাঁহাকে গাড়ী বা ট্রামযোগে ময়দানে যাইয়া মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে হইবে।

বহুমূত্র রোগীর সম্ভবমত মুক্ত বায়ুতে থাকিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংকীর্ণ ও জনতাপূর্ণ গৃহ তাঁহার পক্ষে পরিত্যাজ্য। কার্য্য-ব্যপদেশে যদি বহুমূত্র রোগীদিগকে বাধ্য হইয়া জনতাপূর্ণ গৃহে অনেকক্ষণ থাকিতে হয়, তবে নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের অল্পক্ষণের জন্যও বাহিরে আসা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের অনেকেই রুদ্ধ গৃহে নিদ্রা যান : তাঁহাদের ভয়, পাছে সর্দ্দি লাগে। এই অভ্যাসটী অতীব মন্দ। এক মুখে ইহার নিন্দা করিয়া শেষ করা যায় না। আমি প্রাণপণে এই বিষয়ের প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি; কেননা, আমার বিশ্বাস—সারা রাত্রি রুদ্ধ ও জনতাপূর্ণ গৃহে নিদ্রা যাওয়ায় অনেকের শর্করা স্রাব ঘটিয়া থাকে।

যবক্ষারজান জনিত বিষে যাঁহারা পীড়িত তাঁহাদিগের মুত্র মধ্যে শর্করা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যে প্রশ্বাস ত্যাগ করি, তাহা যবক্ষার জানে পূর্ণ। সুতরাং আমরা যখন রুদ্ধ ও জনতাপূর্ণ শয়ন গৃহে নিদ্রা যাই তখন সেই পরিত্যক্ত যবক্ষার-জানপূর্ণ প্রশ্বাস পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পথে গ্রহণ করিয়া থাকি। সম্ভবতঃ ইহাই আমাদিগের বহুমুত্রের প্রধান কারণ। এতদঞ্চলের কৃষিজীবি ও শ্রমজীবীগণ বৎসরের মধ্যে অনেক দিন হয় মুক্ত বায়ুতে নয় তৃণাচ্ছাদিত গৃহে নিদ্রা যায়। ঐ গৃহ এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, উহার মধ্যে অতি সুন্দররূপে বায়ু গমনাগমন করে। এই কারণেই উহাদের মধ্যে এই পীড়া অপেক্ষাকৃত অল্প। শীতকালেও, বায়ু গমনাগমনের জন্য শয়ন গৃহের বাতায়নাদি মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য; কেবল বায়ু স্রোত শরীরে আসিয়া না লাগে, সেই দিকে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অতি যত্নের সহিত গাত্র পরিষ্কার রাখিবে কিন্তু তোয়ালে দ্বারা গাত্রে খুব জোরে ঘর্ষণ করিবে না। অধিকাংশ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে প্রত্যহ স্নান করা আবশ্যক; কেননা ইহাতে গাত্রদাহ নিবারিত হয় এবং চর্ম্মের ক্রিয়া শীতলা বৃদ্ধি পায়। অতিশয় শীতলজলে স্নান অকর্ত্তব্য। যখন মুত্রগ্রন্থি অসুস্থ হইয়া পড়ে, তখন শরীরের উত্তাপ অনুযায়ী স্নানের জল গরম করিয়া লওয়া উচিত। স্নানের জলে স্কুব্‌স্ লিকুইড্ অ্যামোনিয়া (Schubb's Liquid ammonia) অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যদি সহ্য হয় তবে বারমাসই রোগীর গাত্রোপরে গরম কাপড় থাকিলে ভাল হয়। ঐ কাপড় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন করা ও কাচান আবশ্যক। ময়লা গামোছা ব্যবহার করায় রাশি রাশি বিষ ফোঁড়া হইয়া থাকে। মলিন পোষাকে উহা আরও বৃদ্ধি

শারীরিক হউক আর মানসিক হউক অত্যধিক পরিশ্রম করিবে না। যে, সকল পুস্তক পড়িতে স্ফূর্ত্তি লাগে তাহাই পড়িতে হইবে, যেরূপ দলে মিশিলে বেশ মনের আনন্দজন্মে সেইরূপ দলে যোগ দিতে হইবে। সঙ্গীতাদি আমোদ প্রমোদে মিশিবে। ইহাতে মনের দুশ্চিন্তা উদ্বেগ বিদূরিত হইবে। যতদূর সম্ভব এ সকল করিতে হইবে।

নিমন্ত্রণ খাওয়া ত্যাগ করিতে হইবে। এমন দেখা গিয়াছে যে, বহুকাল পথ্য নিয়ম পালন করিয়া রোগী যে, উপকারটুকু পাইয়াছিলেন, তাহা একদিনের নিমন্ত্রণ খাওয়াতেই সব ভস্মীভূত হইয়া গেল। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অতি ভোজন বা অনিয়মিত আহার অপেক্ষা অনিষ্টকারী আর কিছুই নহে।

যদি সম্ভবপর হয়, তবে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক মাসের জন্যও স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাইতে যাওয়া কর্ত্তব্য। পার্ব্বত্যস্থানে যাওয়াই অধিকতর প্রশস্ত। দেখা যায়, বহুমূত্র রোগীরা পার্ব্বত্য স্থানে যাইয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। শর্করা স্রাব কমিয়া যায় ও দেহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

বহুমূত্র রোগে বিশেষতঃ যখন প্রস্রাবের সঙ্গে অণ্ডলালিক স্রাব হইতে থাকে, তখন যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ে খুব সতর্ক হইতে হইবে।

অস্ত্রোপচার।— এ পর্য্যন্ত আমি সংক্ষেপে বহুমূত্র রোগের সাধারণ চিকিৎসার বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি। পৃষ্ঠব্রণ, গলিতক্ষত, অণ্ডলালিক স্রাব, ক্ষয়কাশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উপসর্গের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, উহাতে বহুমূত্র রোগীর বিশেষ উপকার হয় না এবং উহাদের ক্ষতও শীঘ্র সারিতে চায় না। কিন্তু অনেক স্থলে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয় এবং অনেকের পক্ষে ইহাই শেষ চিকিৎসা। প্রস্রাবে যদি অধিক পরিমাণে অণ্ডলালিক পদার্থ অন্য প্রকার স্রাব বিদ্যমান থাকে তবে সেটী খুব ভুল ক্ষণ। সেরূপ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। পৃষ্ঠব্রণে যদি প্রথমেই অস্ত্রোপচার করা হয়, তবে বেশ সুফল পাওয়া যায়। এরূপ ঘটনার পর প্রায়ই শর্করা স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। পৃষ্ঠব্রণ পচিতে আরম্ভ করিলে বা গলিত, ক্ষত উৎপন্ন হইলে, শর্করা স্রাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কেননা, শরীরে পচন ক্রিয়া দেখা দিলে রোগীর শ্বেতসার পরিপাকের শক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের "চিকিৎসক"

ছিলেন। ঐ প্রবন্ধ প্রাগুক্ত কথারই পোষণ করিয়াছেন; ওয়ালেচ্ দুইটী লিপিবদ্ধ বিবরণ রোগীর করিয়াছেন। উহাদের পৃষ্ঠব্রণের পচা অংশ কাটিয়া ফেলিবার পর উহাদের শর্করা-স্রাব বন্ধ হইয়া ছিল।

হস্ত ও পদের অগ্রভাগে গলিত ক্ষত দেখা দিলে সাধারণতঃ অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন স্থলে উপকার পাওয়া যায় এবং কখন কখন ইহাই শেষ চিকিৎসা। এই জন্য যদি কোন অসুবিধা না থাকে, তবে অস্ত্রোপচার করিয়া দেখাই ভাল।

বহুমূত্র পীড়া ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শাস্তি স্বরূপ। কথাটি ঠিকই। আমি এই পীড়ার একটা মোটামটি আলোচনা করিলাম। আমার প্রবন্ধে বিস্তর ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমার এই প্রবন্ধ আন্থন্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ভ্রম প্রমাদ গুলির সংশোধন করিয়া দিবেন। আমি অনেক স্থলে সংশয় পীড়িত হইয়াছি। ভরসা করি, তাঁহারা সেই সমুদয় সংশয় দূর করিয়া দিবেন। যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে আমার এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

এই প্রবন্ধ রচনা কার্য্যে আমি ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি, ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি, এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম, বি, মহোদয়গণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

দীনদয়ালের বাটির কক্ষ।

প্রকাশ। নিশ্চেষ্ট অলস জল্পনায় দিনের পর দিন তো বেশ কেটে গেল। এদিকে অবাধে বিসর্জ্জনের ঢাকও বেজে উঠ্‌ল। ডালা সাজান হচ্ছে,

শুভদৃষ্টির সুখময় শিশিরে পিপাসিত নয়নের পাতাদুটি যখন আবেশে মুদে যায়, কে ভেবেছিল, পাঁচ বৎসর পরে আবার শুভদৃষ্টির ছায়ায় সে নয়ন মেলিতে হইবে? ফুলশয্যার নিশিটা যখন উদ্দেশ্য হীন মধুর আলাপে ক্ষণেকে কেটে যায়, কে মনে করেছিল, প্রথম জীবনের মধুর ছবিখানি ভেঙ্গে চুরমার করে, আবার নূতন ছবিতে ঘর সাজাতে হবে। অগ্নি, দেবতা, ধর্ম্ম সাক্ষী করে গঙ্গাজল হস্তে যখন উষাকে চির জীবনের সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করি, কে বুঝেছিল, আমি মিথ্যাবাদী, শঠ, জুয়া-চোর—প্রতিজ্ঞা করি, রাখ্‌বার জন্য নয়, সুবিধামত ভাঙ্গবার জন্য। দেবতারা কি খেলার পুতুল? গঙ্গাজল কি অপবিত্র? উদ্বাহ বন্ধন কি জলের আঁচড়, গায়ে বস্‌লেই মুছে ফেল্‌তে হবে। আমরা না হিন্দু? আমরা কথায় কথায় বলি, আমাদের বিবাহের উৎকর্ষ দেহের আলিঙ্গনে নয়, আত্মার মিলনে। আমরা না গুমোর করি, আমাদের পরিণয় সুবিধা অসুবিধার ভিত্তিতে গঠিত, সামাজিক চুক্তি নয়, ধর্ম্মের পবিত্র বন্ধন। কেন তবে সে বন্ধন খুলে ফেল্‌ব? সে অঙ্গীকার, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব? যে আমার জীবনের সাথী, সুখ দুঃখের সঙ্গিনী কেন তাকে চিরদিনের মত ভাসিয়ে দো'ব। (ক্ষণেক ভাবিয়া) আমি কি তাকে ভাসিয়ে দিচ্ছি? সে ত আমার ভালবাসা, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে গেছে। এতেও ত সে ক্ষ্যান্ত হয় নাই। যাঁরা আমায় শৈশবে লালন, কিশোরে পালন করিয়াছেন, যাঁরা অকপট যত্নে ত্যাগশীল স্নেহে আশৈশব আমায় আদরে ঘিরে রেখেছেন, যাঁহা আমার ইহকালের গুরু পরকালের দেবতা, সে তাঁদের অগ্রাহ্য করেছে, অপমান করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। সে অপরাধিনী, বড় অপরাধ করেছে।——তার অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই? অনুতাপে ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, অশ্রুজলে ত অপরাধের কালিমা মুছে যায়, প্রার্থনায় ত শয়তানও ভগবানের কোলে স্থান পায়। তবে তার অপরাধের কেন মার্জ্জনা হবে না? আমি তাকে ক্ষমা করব, বলব "যা হ'বার হয়ে গেছে, আমরা সে সব ভুলে গেছি। তুমি এসো, আবার দুজনে সুখী হই।" সে কি শুনবে না? নিশ্চয়ই শুনবে, আমার কথা সে নিশ্চয়ই রাখ্‌বে।

নিস্তারিণী। প্রকাশ, তোমার জলখাবার দেওয়া হয়েছে, খাবে চলো।

প্রকাশ। মা! আমি পারবো না মা! বাবাকে বলে এ বিয়ে বন্ধ করে দাও।

নিস্তারিণী। এত দিন ত এ কথা বলো নাই বাবা! এখন আর কি করে বন্ধ হবে? সব ঠিক্ ঠাক্ হয়েছে, আজ সন্ধ্যাবেলা তারা পাকা দেখ্তে আস্বে। এখন কি আর ওকথা বলা চলে?

প্রকাশ। এখনও সময় আছে মা! এখনই লোক পাঠিয়ে দিলে সব ঠিক হবে। মা, মা, বাবাকে বলো আমি এ বিয়ে কর্‌ব না।

নিস্তারিণী। প্রকাশ, তুমি ত আমাদের অবাধ্য ছেলে নও, বাবা! কেন তবে আজ এ কথা বল্‌ছ। আমরা কি আর সাধ করে তোমার আবার বে দিতে যাচ্ছি। কুটুম কুটুম্বিতা, সাদ আহ্লাদ ত হলোই না। তার উপর ওঁকে অপমান সইতে হলো, বুড়ো বয়সে আমি বউকাঁটকি হলুম। তোমার ন'মাসীর কাছে ত শুন্‌লে তোমার শাশুড়ী লোকের কাছে বলে বেড়ায় সে ভাব্‌বে তার মেয়ে বিধবা হয়েছে। এ সবের পর, আর কি সে বউয়ের সে কুটুমের মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে?

প্রকাশ। সব জানি মা! কিন্তু তবুও সে তোমার দয়া, তোমার অনুকম্পার পাত্রী। মা, মা, তোমার পায়ে পড়ি, তাকে ক্ষমা করো, আবার তাকে আশ্রয় দাও।

নিস্তারিণী। আমাদের কি তাকে আন্‌তে অসাধ। উনি নিজে গেছলেন, সে এলোনা। তারপর তুমি গেলে, শুখ্‌নো মুখে ফিরে এলে।

প্রকাশ। সে অপরাধিনী, বড় অপরাধিনী। কিন্তু ক্ষমা যে মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তোমায় তাকে ক্ষমা কর্‌তে হ'বে। সে যে তোমার আদরের কন্যা, স্নেহের বউ। মনে করে দেখ মা সেই বিয়ের পর দিনের কথা। বাপ মায়ের স্নেহময় বিদায়ে কাতর সজলনয়নে সে যখন তোমার আশ্রয়ে আসে, কত যত্নে, কত স্নেহে, তুমি তাকে কোলে নিয়েছিলে। তারপর কতদিন তুমি তার চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিলে। মা, তোমারি হস্তে রোপিতা, তোমারি যত্নে লালিতা তোমারি স্নেহে পালিতা সে—লতাকে কেন ছিঁড়ে ফেল্‌বে। মা, আমার ভিক্ষা, আমার প্রার্থনা তাকে জন্মের মত ভাসিয়ে দিয়ে তোমার প্রকাশকে কাঁদিওনা।

নিস্তারিণী। প্রকাশ, ———

প্রকাশ। মা, এখনি বাবাকে বল, নইলে দেরী হয়ে যাবে।

(নিস্তারিণীর প্রস্থান)

প্রকাশ। মা, চলে গেল, মনে কি ব্যথা দিলুম ?

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। (সুর করিতে করিতে)

"লুচি দরশনে পেটুক বামন ধায় রে।
তোরা কে সঙ্গে যাবি আয় রে॥"

(প্রকাশকে দেখিয়া) এই যে, প্রকাশ ভায়া, আর বার বড় ফাঁকিতে পড়েছিলুম। এবার আর তা হচ্ছে না। পাকা দেখায় খাওয়া থেকে আরম্ভ কর্‌ছি।

প্রকাশ। রমেন ? তুমি কখন এলে ?

রমেন। কেন, পেটের বহর দেখে ভয় পাচ্ছ নাকি ?

প্রকাশ। তামাসা রাখ। বলতে পার, আবার বিয়ে করা আমার উচিত হবে কি ?

রমেন। এতদিন বিরহ বটিকা সেবনেও যখন বউ গিন্নির আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেল না, তখন আর কি করবে বল।

প্রকাশ। কেন তুমি ত বলেছিলে, বিবাহ জলের আচড় নয়, ধর্ম্মের পবিত্র বন্ধন, ইচ্ছা কর্‌লেই খুলে ফেলা যায় না।

রমেন। গেরোই যখন লাগে নাই, তখন আর খোলার কষ্টটা হচ্ছে কি করে ? মিছে দুর্ভাবনা করো না। ক'দিন জোলাপ নিচ্ছি আজ নিশ্চিন্ত মনে খেতে দাও। আমি বেশ ভেবে চিন্তে দেখেছি—এ বিয়ে করা তোমার অন্যায় হ'বে না।

প্রকাশ। কেন তাকে পরিত্যাগ কর্‌ব ?

রমেন। তোমার দেখ্‌ছি মূলে মাগ নেই পুত্রশোক হলো। যে তোমাকে ধরা অবধি দিলে না, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে কি করে ?

প্রকাশ। সে অপরাধিনী বটে, কিন্তু অশ্রুজলে পাপ অবধি ধুয়ে যায় ? আমি তাকে ক্ষমা করবো।

রমেন। এত কালমেঘেও যখন ঠাণ্ডা হাওয়া অবধি আন্‌তে পারে নাই, জলের আশা আর নাই।

(দীনদয়াল, নিস্তারিণী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

দীনদয়াল। প্রকাশ, তুমি নাকি বলেছ, এ বিয়ে করবে না।

প্রকাশ। ববা,—বাবা!——

দীনদয়াল। এতদিন ত কোন কথা বলো নাই! এখন আমি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি। একথা জেনেও কি বিয়ে করতে চাও না?

প্রকাশ। বাবা, এ বিয়ে কি বন্ধ করা যায় না?

দীনদয়াল। তা যাবে না কেন, বেশ যায়। আমার কথার খেলাপ হয়, তা হলই বা। শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে ছেলের মর্য্যাদা ত রক্ষা হয়। আমায় তারা অপমান করেছে, সে ত উচিত কাজই করেছে। তোমার গর্ভধারিণীকে তারা লাঞ্ছনা করেছে, তা ত তার উপযুক্ত পুরস্কার হয়েছে। আর তোমায়, তোমায় না তারা দরওয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়েছিল?

প্রকাশ। বাবা, আমায় ক্ষমা করবেন। আবার বিবাহ করলেই কি অপমানের জ্বালা জুড়ুবে?

দীনদয়াল। না। তা জুড়ুবে না। আবার গলাধাকা খেলে বিষে বিষক্ষয় হবে। (প্রকাশের কাছে গিয়া) প্রকাশ, প্রকাশ, তাদের আস্‌বার সময় হয়ে আস্‌ছে, আমি তাদের কথা দিয়েছি। তোমার স্ত্রীকে যত্ন করতে গিয়ে তোমার মা লাঞ্ছিতা হয়েছে, তাকে আনতে গিয়ে আমি অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছি, তবুও কি তুমি এ বিয়ে করতে প্রস্তুত নও?

প্রকাশ। বাবা,—বাবা,! আমায় ক্ষমা করুন। আমি এ বিবাহ করতে পারব না।

ক্ষেত্রমণি। প্রকাশ, তুই কি একেবারে অধঃপাতে গেছিস্। বাপের মুখের উপর এ কথা কি করে বল্‌লি।

দীনদয়াল। ঠাকুরঝি, শুধু শুনে যাও; কিছু বলো না। তাহ'লে আমাদের ছেলের মাননীয় শ্বশুর মহাশয়ের, স্নেহময়ী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর মর্য্যাদার হানি হবে। আমাদের মান অপমানে ত কিছু এসে যায় না। প্রকাশ, কবে আবার আমায় তোমার শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে বলো।

রমেন। আপনি রাগ্ করবেন না। আমি প্রকাশকে বুঝিয়ে বল্‌ছি।

দীনদয়াল। কি আর বোঝাবে রমেন। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার বিবাহ

দিয়া, ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘরে এনে কষ্ট দিবার আমার কি অধিকার আছে? রমেন বড় মুখ করে লোকের কাছে বল্‌তাম প্রকাশ আমাদের কর্ত্তব্য পরায়ণ সন্তান। এখন বুঝেছি সে আমাদের——

প্রকাশ। (পিতার পদপ্রান্তে গিয়া) বাবা, বাবা! আমি আপনার অধম সন্তান, আমায় ক্ষমা করুন। বুঝ্‌তে না পেরে আপনার চরণে আমরা অপরাধ করেছি. অপরাধ করে বড় ব্যথা পেয়েছি, বড় কেঁদেছি। আমায় ভিক্ষা দিন, আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করুন। বাবা আপনি যাকে কন্যা বলে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার আদেশে যে আজ আমার সহধর্ম্মিণী, আপনার স্নেহে লালিতা, আপনার যত্নে পালিতা, আপনার আদরে গর্ব্বিতা, আপনার পুত্রবধূকে কি করে জীবনের মত ভাসিয়ে দো'ব।

দীনদয়াল। প্রকাশ, আর আমি তোমায় বিয়ে কর্‌তে বল্‌ব না। যদি আগে বল্‌তে এতদূর এগুতেম্ না। শত অপমান সহ্য করেও তোমার সহধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূকে নিয়ে আস্‌তুম্।

প্রকাশ। বাবা,—বাবা! আমায় ক্ষমা করুন, আমার উপর রাগ কর্‌বেন না।

দীনদয়াল। আমি ত রাগ কর্‌ছি না। ছেলের আব্‌দার বাপ্‌মাকে চিরকালই রাখ্‌তে হয়। গিন্নি আর কি শুন্‌ব? এখন যে করে পার মনকে প্রবোধ দাও।

(দীনদয়ালের প্রস্থান)

ক্ষেত্রমণি। লেখাপড়া শিখে একেবারে জন্তু হলি প্রকাশ। বাপ্‌মায়ের চেয়ে শ্বশুর শাশুড়ী বড় হলো। তোমার এ লেখাপড়াকেও ধিক্ তোমাকেও ধিক্।

নিস্তারিণী। ক্ষেতি, ক্ষেতি, প্রকাশকে কিছু বলিস্ নি। সে বড় কষ্ট পেয়েছে।

ক্ষেত্রমণি। বল্‌ব না ত কি? তোমরা আদর দিয়ে আস্পর্দ্ধা বাড়িয়েছ নইলে কি আর তোমাদের উপর কথা কয়। একটুও লজ্জা কর্‌ছে না প্রকাশ! দশমাস দশদিন গর্ব্ভে ধরে, বুকের রক্ত দিয়ে যে তোমায় মানুষ কর্‌লে সে হলো পর, আর তোমার মাগ হলো আপনার। এইবার সেই মাগের পাদক জল খাও গে। আর——

নিস্তারিণী। ক্ষেতি ক্ষেতি আয়। প্রকাশকে ঠাণ্ডা হতে দে।

প্রকাশ। রমেন, কি বলুম ?

রমেন। আমার সাধের খাওয়াটা মাটি করলে। মনে যদি এই ছিল, এত দিন কেন চুপ্ করে গুম্‌রে ছিলে। যাক্ এখন তোমাদের দেশের গঙ্গার হাওয়া একটু খাওয়া যাক। তাতে যদি জোলাপের খিদেটা কমে।

(প্রকাশকে সঙ্গে লইয়া রমেনের প্রস্থান।)

ভারতীয় ধাত্রীবিদ্যার প্রাচীনত্ব।

লেখক;—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Hippocratesকে যেমন সর্ব্ববিধ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎপত্তির মূলে সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট, তেমনি তাঁহাদের বিশ্বাস Midwiferyর ও উৎপত্তি তাহা হইতে। তাঁহাদের মতে Hippocratesএর উদয় কাল, খৃষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে। Hippocrates এর রচনা এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যদিগের বিরচিত পুস্তক সকল পাঠ করিলে, যদিও আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে স্ত্রীলোকের আর্ত্তব, গর্ভাধান, সন্তানপ্রসব এবং বিবিধ গর্ভিণী ও সূতিকারোগের বিষয় অল্প বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল পুস্তকে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই, যাহাতে আমরা জানিতে পারি, বস্তিদ্বারে বিপন্ন হইলে কি উপায়ে জীবিত সন্তান উদ্ধার করিতে পারা যায়। তাঁহাদের উপদেশ হইতে আমরা এইমাত্র জানিতে পারি, গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে কোন্ যন্ত্র বা কোন শাস্ত্র প্রয়োগ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ডশঃ বিভাগ করিয়া প্রসূতিকে রক্ষা করিতে পারা যায়।

গ্রীশের এই প্রাচীন যুগে পুরুষ দ্বারা গর্ভিণীর মূঢ় গর্ভ উদ্ধার করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না;—চিকিৎসক সেখানে বিদ্যমান থাকিতেন মাত্র। স্ত্রীগণ গর্ভ উদ্ধার কল্পে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন। এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই "Father of Medicine" নিজ হস্তে গর্ভশল্য উদ্ধার করিয়াছেন, (accouchur) তিনি যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন,—এমন মনে করা অযৌক্তিক নহে, যে

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কোন রচনা হইতে এ সকল বিষয় সংগৃহীত। Plimy প্রভৃতি অনেক পুরাতত্ত্ববিদের মত যে Pythagaras ভারতবর্ষে আগমন করিয়া এখানকার দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া গ্রীশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেখানে যে সকল বিদ্যা প্রচার করেন। Hippocrates এর শিক্ষা Pythagaras এর উপদেশের অনুকরণ মাত্র।

তাহা ছাড়া আর একটী যুক্তি এই যে, সম্প্রতি মিশর হইতে যে Eberspapyrus আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে Midwifery বিষয়ক এমন সকল উপদেশ আছে, যাহা Hippocrates এর উপদেশেরই মত। Ebers papyras এর কাল ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে Hippocrates এর উপদেশ এবং এই পাপিরস বর্ণিত উপদেশ, এমন কোন প্রাচীন রচনা বা উপদেশ হইতে গৃহীত, যাহা ৪০০ B. C. ত সামান্য ;—১৫৫০ B. C.এর বহু পূর্ব্বে বিরচিত।

এখন যদি আমরা পুরাতত্ত্ববিৎ প্রধান প্রধান মনীষিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া বলি,—রোমের শিক্ষা গ্রীশের নিকট, গ্রীশের শিক্ষা মিশরের নিকট. —মিশরের শিক্ষা ভারতের নিকট,—তাহা হইলে ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ যে, ভারতের আয়ুর্ব্বেদ—প্রাচীন Midwifery বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞানের আত্মভূমি। এ ছাড়া এই আয়ুর্ব্বেদে Midwifery এবং Gynocology সম্বন্ধীয় এমন সকল কথা আছে, যাহাই পাপিরস কিম্বা Hippocrates এর রচনা হইতে বহু বিস্তৃত। গৌরবের সহিত আমরা বলিতে পারি, এই Midwifery দুই চারি পৃষ্ঠায় লিখিত নহে। ইহা আট ভাগে বিভক্ত, সুবিস্তৃত আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অঙ্গ। কুমারের উৎপত্তি হইতে ইহার জন্ম ও প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এমন ধারাবাহিক রূপে ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বর্ণিত, যে যখন এই সকল বিবরণ আমরা মনোযোগের সহিত পাঠ করি, তখন আমাদের মনে হয়, যেন বর্ত্তমান সময়ের একখানি পাশ্চাত্য Midwifery আমরা পাঠ করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদে এই Midwiforyর নাম "কুমার ভৃত্য তন্ত্র।" এই কুমার ভৃত্য তন্ত্রের প্রকরণ গুলি, যথা—

১। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতু নিরোধ পর্য্যন্ত বিধি নিষেধ।

২। গর্ভধান প্রকরণ।

৩। গর্ভিণী প্রকরণ।
৪। সন্তান প্রসব বা জাতিসূত্র।
৫। মূঢ়গর্ভ—মৃতগর্ভ।
৬। সূতিকা—সূতিকারোগ বিজ্ঞান।
৭। ধাত্রীনিয়োগ—সন্তানের প্রতিপালন।

ইয়ুরোপে পূর্ব্বে বলিয়াছি—স্ত্রীলোকগণ সন্তান প্রসব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। পুরুষের ইহাতে তেমন সংস্রব থাকিত না। কিন্তু আমরা আয়ুর্ব্বেদে দেখি, সন্তান প্রসবে যতক্ষণ কোন গোলযোগ উপস্থিত না হইত, ততক্ষণ তাহাতে চিকিৎসক কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না; কিন্তু একটু গোলযোগ বোধ হইলেই শল্যহস্তার সাহায্য গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। সন্তান জীবিত থাকিলে তাহাকে শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করা নিষেধ ছিল, চিকিৎসক নিজ বুদ্ধির সাহায্যে যন্ত্রাদি কল্পনা করিয়া গর্ভ উদ্ধার করিতেন। ইয়ুরোপে সপ্তদশ সতাব্দীতে tarningএর প্রথম উল্লেখ দেখি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে Tarningই সন্তান প্রসবের উপায় স্বরূপ প্রথম হইতে প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ডে Chamberlaim যে forceps এর সাহায্যে গোপনভাবে যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহা আয়ুর্ব্বেদের অনুকরণ না হইলেও আকৃতি ও আয়তনে প্রায় একরূপ। ফলতঃ জগতের যাবতীয় নূতন ও পুরাতন ধাত্রীবিদ্যার উৎপত্তির মূলে যে ভারতীয় ধাত্রীবিদ্যা একান্ত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ রায়।

আলেয়া—যৎ।

আমার গৌর স্থানে মন্ত্র এবার করেছি গ্রহণ।
তাই নোদেয় এসে হরি ব'লে ডাকি সর্ব্বক্ষণ॥
"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন," হরি-সংকীর্ত্তন। (সদা)
এই মহামন্ত্রে হয়ে দীক্ষা, আমরা নূতন সাধন করেছি শিক্ষা,
করি দ্বারে দ্বারে প্রেম ভিক্ষা জুড়াব জীবন।
(ছাড়ি উজীরি,—ভিক্ষারী হ'লেন রূপসনাতন।)
ত্যজি বিলাস হব যোগী, সাধ জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বত্যাগী,
রব সংসারে বৈরাগী, পদ্ম পত্রে জল যেমন।
গ্রাম্য কথা আর না শুনিব, আর গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিব
এখন বলবো কেবল "হরি-কথা" আর করবো

সমালোচনা।

কোষ্ঠী-প্রদীপ ঃ—শ্রীশ্রীনাথ ভট্ট বিরচিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষাদি শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থকৃত টীকা ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

পুস্তকের ভূমিকা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, কোষ্ঠী-প্রদীপ একখানি অতি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ। এই পুস্তকে লগ্ন, ষড়্‌বর্গ সাধন, নানাপ্রদেশের লগ্নমান, ষণ্নাড়ীচক্র, গণ্ডরিষ্ট, যামার্দ্ধ ও দণ্ড নির্ণয়, শিশু পতাকী, শিশুরিষ্ট, মাতৃরিষ্ট; পিতৃরিষ্ট, ত্রিপাপ, সপ্তশূন্য, পঞ্চস্বরা, তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের ফল ও তাহার অধিপতি অনুসারে ফল নির্ণয়, শয়নাদি দ্বাদশ ভাব বিচার, রাশি, লগ্ন, নক্ষত্র, যোগ, করণ, তিথি, মাস, বার, ক্ষেত্রাদি ষড়্‌বর্গের ফল, রাজযোগ—দারিদ্র্য যোগাদি নানাপ্রকার যোগ, অষ্টবর্গ, দশা, অন্তর্দ্দশা, প্রত্যন্তর্দ্দশা, গ্রহগণের দৃষ্টি, মিত্র, অধিমিত্রাদি গণনা, সূতিকাগৃহের নানাপ্রকার গণনা, শিশু-ভূমিষ্ঠ কালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানাপ্রকার চিহ্ন, স্ত্রীপুরুষাদি ভেদে নানাপ্রকার ফলাফল বিচার প্রভৃতি কোষ্ঠী বিচার সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিত ভাবে এই "কোষ্ঠী-প্রদীপ"—গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "কোষ্ঠী-প্রদীপ" পুস্তকের সাহায্যে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আপনাপন ভাগ্যের শুভাশুভ ফল বিচারে সক্ষম হইবেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই উৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব "কোষ্ঠী-প্রদীপ ঃ"—পুস্তকখানি ইতিপূর্ব্বে আর মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় বহু পরিশ্রমে কোষ্ঠী-প্রদীপ পুস্তকের প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়া অদৃষ্টবাদী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরাও পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সচিত্র যুদ্ধের ইতিহাস।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ, প্রণীত, ৩৮নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত প্রতি খণ্ডের মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এই সচিত্র যুদ্ধের ইতিহাসের অষ্টম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাস সঙ্কলনে লেখক অসীম অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রম ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণের নিকটে এতাদৃশ বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের যথেষ্ট সমাদর হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সং

সত্য-মাহাত্ম্য।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ।

মানবের সর্ব্বদা এইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য যে, যখনই কথা কহিবে তখনই সত্য অথচ মিষ্ট বাক্য কহিবে। কখনো যেন সত্য হইলেও মর্ম্মস্পর্শী সত্য কহিবে না। সে স্থলে "ভাল ভাল" বলিয়া "আম্‌তা আম্‌তা" করিয়া মাথা চুলকাইয়াই থাকিবে।

এ জগতে সত্যের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। মহাভারতে আছে,—

"অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥"

অর্থ—এক সময়ে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সত্যবচনের ফল তুলা দণ্ডে পরিমাণ করা হইয়াছিল, তাহাতে অশ্বমেধ সহস্রের ফলাপেক্ষায় সত্যের ভারই অতিরিক্ত হইয়াছিল।

সত্যবচন মুখের অলঙ্কার, সত্যই ইহ ও পরলোকে পরম বন্ধু। সত্যবাদী লোক পৃথিবীর ভূষণ। অধিক কি বলিব—দেবতারাও সত্যবাদীকে সম্মান করেন। সকলেই সত্যবাদীকে বিশ্বাস করে। যিনি সত্যকে ব্রতরূপে আশ্রয় করেন, কখনো তাঁহার বিপদ হয় না। চণ্ডালও যদি সত্যবাদী হয় তবে সে ব্রাহ্মণাপেক্ষায়ও সমধিক মানার্হ। অধিক কি বলিব—সত্যই সাক্ষাৎ "পরব্রহ্ম" জানিবে। যে সত্যকেই আশ্রয় করে, তাহার কখনো অধঃপতন হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। পিতা যেমন শিশু পুত্রকে পালন করে; একমাত্র সত্যই তদ্রূপ মানবকে অনবরত অনর্থ হইতে রক্ষা করে। তাঁহাকেই প্রকৃত সত্যবাদী বলা যায়, যে সততই সত্যই বলে। সত্য কথন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, গুরু বা শিষ্য তীর্থ স্থানই হউক আর পায়খানাই হউক, সংক্রান্তি অমাবস্যা ইত্যাদি পুণ্যকাল বা অপুণ্য কালের পরিগণনা করে না। তাঁহাকেই সকলশাস্ত্র একবাক্যে সত্যবাদী বা সত্য প্রতিষ্ঠ বলিয়াছে। যে স্বপ্নেও মিথ্যা কথা কহে নাই, ক্রীড়া কৌতুকেও মিথ্যা ব্যবহার করে নাই, তাহাকেই সত্যপ্রতিষ্ঠ বলা হয়।

সত্যপ্রতিষ্ঠ মানবকে দেবতাগণ ভয় করেন। উক্ত প্রকার সত্যবাদী যখন যাহা বলে,—তখনই তাহা ফলে পরিণত হয়, তাহাতে লৌকিক কোনও সামগ্রীর অপেক্ষা করে না।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং" সত্য বাক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সে তখনই ক্রিয়াফলের আশ্রয় হয়। সে যদি বলে, এখনই চন্দ্রটা ভূমিতে পড়ুক, তখনই চন্দ্র ধুপ্ করিয়া মাটিতে পড়িবেই। ইহার নাম যোগ মাহাত্ম্য। সত্য বাক্য অষ্টাঙ্গ-যোগের মধ্যে অন্যতম যোগ।

ইহা সকলেই জানেন যে, পূর্ব্বকালে দুষ্মন্ত নামক এক ধার্ম্মিক রাজা গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলা নামিকা কণ্বঋষির পালিত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত রাজধানী যাইবার সময় শকুন্তলাকে বলিয়া যান যে, আমি দুই বা তিন দিন পরেই তোমাকে লইয়া যাইব, এই বলিয়া চলিয়া যান। এরূপ আশ্বাস বাক্যে শকুন্তলাও আশ্বস্তা হইয়া দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন। দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, দুষ্মন্তের লোক আসিল না। এদিকে পতি পরায়ণা শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইয়া কণ্বাশ্রমে বাস করিতে ছিলেন।

সেই সময় কোপন স্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া সেই আশ্রমে আতিথ্য ভাবে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইলেন, "আমি একজন অতিথি উপস্থিত হইলাম।" এদিগে দুষ্মন্তের চিন্তায় অপহৃতচেতনা শকুন্তলার শ্রবণেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বা-

সার বাক্য প্রবেশ করে নাই। সুতরাং যথাযথ দুর্ব্বাসার আতিথ্যও করা হয় নাই। তখনই দুর্ব্বাসার কোপানল জ্বলিয়া উঠিল। এবং "তুমি যাহার চিন্তায় নিমগ্না হইয়াছ, সে তোমাকে বিস্মৃত হউক" এই অভিশম্পাত করিলেন।

দুর্ব্বাসার মুখ হইতে যে এরূপ শাপ বাক্য বাহির হইয়াছিল, তাহার বিন্দু-বিসর্গ দুষ্মন্ত বা শকুন্তলা কেহই অবগত ছিল না। কিন্তু সত্যবাদী সত্য-প্রতিষ্ঠ-দুর্ব্বাসার শাপ বাক্য প্রভাবেই প্রাণপ্রিয়তমা শকুন্তলাকে তৎক্ষণাৎ দুষ্মন্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ইহাই "সত্য মাহাত্ম্য।"

যে ব্যক্তি সততই সত্যবলে তাহার সমীপেও কোনও পাপ উপস্থিত হইতে পারে না। যে, "আমি সত্যই বলিব" এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তাহার অন্তঃকরণে কোনরূপ দুষ্কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবেশই করিতে পারে না। সত্যবাদীর নিকট হইতে সকল অধর্ম্মই দূরে পলাইয়া যায়। এজন্য সকলের সত্যবাক্য বলা উচিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—"সত্য" কাহাকে বলে? যাহাতে লোক সত্য বাদী হইতে পারে। তদুত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন,—

"যথার্থে বাঙ্‌মনসী সত্যম্।"

অর্থ—বাক্য ও মনের যে যাথার্থ্য, তাহাকেই সত্য কহে। অর্থাৎ মনে যাহা, বাক্যেও তাহা, ইহারই নাম সত্য। যেমন দেখিয়াছ, যেমন শুনিয়াছ বা যেমন অনুমান করিয়াছ, ঠিক্ ঠিক্ পরের অন্তরে সেই সেই দৃষ্ট শ্রুত বা অনুমিত বিষয়কে অবিকল রূপে সংক্রামিত করিবার জন্য যে মনের মত বচন প্রয়োগ তাহারই নাম সত্য।

যেমন প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্য্য রক্তবর্ণ, একথা যে ব্যক্তি বলিয়াছে, সে যেমন দেখিয়াছে, তেমনই বলিয়াছে—ইহা যথাদৃষ্ট সত্যই হইল। যদি কেহ বলে যে, এই কলিকাতায় আমেরিকা হইতে একটি মানুষ আসিয়াছে, তাহার মস্তক নাই, কিন্তু অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারে। এইরূপ মানুষ সে কখনো দেখে নাই, ইহা তাহার মনে আছে বটে, কিন্তু মুখে বলিতেছে, অন্যরূপ সুতরাং তাহার সেই বচন যথাদৃষ্ট সত্য নহে।

যদি কেহ বলে, আমি শুনিয়াছি, কোনও একজন ঋষিকল্প ধার্ম্মিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে "গঙ্গাজল পবিত্র নহে" এই কথা সত্য নহে, কেননা এমন কথা সে কখনই শুনে নাই সুতরাং ঐ কথা যথাশ্রুত সত্য হইতে পারে না।

তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ কণ্টকেরই হইয়া থাকে, তাহাই সকলের দৃষ্ট, কিন্তু তীক্ষ্ণ-গ্রতা হংসডিম্বে নাই। মরুদেশে বিচরণশীল উষ্ট্রেরই গলদেশে চর্ম্মময় জালের

থলে থাকে, হিমালয়ের প্রান্তে তুহিন স্থলীতে বিচরণশীল ভল্লকগণেরই চতুষ্পাদে বহুরোমযুক্ত কম্বলের চর্ম্ম পাদুকা থাকে, অপরের ঐরূপ থাকে না। অতএব ইহাই অনুমান হয় যে, ঈশ্বরই যেখানে যেমন প্রয়োজন তথায় তদনুরূপই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপ যদি কেহ নিজের যথানুমিত বলিয়া থাকে, তাহা সত্যই হইবে।

আর যদি কেহ বলে যে, "আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি," ঈশ্বর কিরূপ? কোথায় দেখিয়াছ? যদি কেহ প্রশ্ন করে;—তদুত্তরে সে যদি বলে ঈশ্বর ব্যাঙের গর্ত্তে বসিয়া ফড়িং ধরিয়া খান, আর জগৎ সৃষ্টি করেন, ঈশ্বরের দুখানা ন্যাজ আছে, একটা শিং আছে, আর ঈশ্বরের নাকটা কুত্তার ন্যাজের মত পাকান। উক্ত ব্যক্তির কথা অনুমান সিদ্ধ নহে, সুতরাং সত্যও নহে।

লোকে কথা বলে কেন? না নিজে যাহা বুঝিয়াছে, তাহা অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই কথা কহিয়া থাকে। সেই কথাই যথার্থ সত্য। সেই কথাটা যদি বঞ্চনার অভিপ্রায়ে কতকগুলি অবুদ্ধ বা দ্ব্যর্থক শব্দ প্রয়োগ করিয়া বুঝিবার অযোগ্য করিয়া না বলে, তবেই তাহা সত্য হইবে।

যেমন—যুধিষ্ঠির নামক এক রাজা সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কখনো মিথ্যা কহেন নাই। সেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দুর্য্যোধনের পক্ষে দ্রোণাচার্য্য ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনাদি ও যুধিষ্ঠিরাদি উভয় পক্ষেরই ধনু-র্ব্বিদ্যার গুরু ছিলেন। সেই মহাযুদ্ধে যখন দ্রোণাচার্য্যকে পাঁচদিন যুদ্ধ করিয়া কিছুতেই পরাস্ত করিতে যধিষ্ঠিরাদি সমর্থ হইলেন না, সুতরাং জয়াশায় নিরাশ হইয়া তখন মহাচক্রী কূটনীতি নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দিয়াছিলেন:—

হে যুধিষ্ঠির! দেখিতেছি, দ্রোণাচার্য্য এপক্ষীয় সকলেরই অজেয়। দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে এ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আপনি দ্রোণাচার্য্যের নিকটে যাইয়া বলুন যে, "অশ্বত্থামা হত ইতি" তাহা হইলে পুত্রশোকানলে অন্তর্দ্দগ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে কৃষ্ণ! আমি কিরূপে মিথ্যা কথা কহিব? তাহা কখনই হইবে না। কৃষ্ণ কহিলেন,—কেন? অদ্য ত অশ্বত্থামা নামে এক ভীষণ হস্তী নিহত হইয়াছে, অতএব এস্থলে কেন আপনি মিথ্যার আশঙ্কা করিতেছেন?

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের নিকটে কহিলেন, হে গুরু-দেব, অদ্য অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, আর কেন যুদ্ধ করিতেছেন? ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের এবাক্য দ্রোণাচার্য্য বিশ্বাস করিয়া প্রিয়পুত্রের শোকে কাতর হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের উক্ত বাক্য সত্য হয় নাই, প্রত্যুত মিথ্যা হইয়াছে। কেননা অশ্বথামা বলিলে, সকলেই দ্রোণপুত্রকেই বুঝিয়া থাকে। যে হেতু "অশ্বথামন্" শব্দটা দ্রোণপুত্রেই প্রসিদ্ধ, হস্তিতে নহে। কেবল দ্রোণকে বঞ্চনার অভিপ্রায়ে অপ্রসিদ্ধ পদদ্বারা সেই কথাটা কহিয়াছেন, অতএব তাহা সত্য নহে।

যুধিষ্ঠির মনে মনে জানে নামক অশ্বথামা গজই মরিয়াছে। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে বুঝাইতে গিয়াছেন—অশ্বথামা দ্রোণপুত্র। এস্থলে গুরু দ্রোণাচার্য্যের মনে নিজের মনে যাহা আছে তাহা সংক্রামণ যুধিষ্ঠিরের কথায় হয় নাই, এজন্য যুধিষ্ঠিরের সেই কথা সত্য হয় নাই।

অতএব নিজের মনে যেরূপ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানটাই বাক্যদ্বারা পরের অন্তঃকরণে অবিকল প্রবেশ করানর জন্য যাহা বলা হয়, তাহাকেই সত্য বলা যায়। নচেৎ নিজের মনে আছে এক, অপরকে বুঝাইতেছি, তাহার বিপরীত, উহা সত্য হইবে না। অতএব সেই প্রকারই অকপট সত্য বাক্য বলিবে।

মায়া সরোবর।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী

রাগিণী আলেয়া—তাল ঠুংরী।

নিত্যধন সাধনকর কি হবে অনিত্য ধনে ;
নিত্য সত্য পরমার্থ ধর্ম্মধন এক ত্রিভুবনে।
স্বজন হ'য়ে বীতস্নেহ পরিহরে মৃত দেহ ;
পরত্র দেহীর সঙ্গী এক ধর্ম্মসুহৃৎ হন নিধনে।
ধর্ম্মধন বিশ্ব বাঞ্ছিত পরম তত্ত্ব তাই নিশ্চিত ;
শীঘ্র হও আগ্রহান্বিত প্রাণপণে তৎ সঞ্চয়নে।
সোণা, রূপা, হীরক, মাণিক উপাসনা করে বণিক্ ;
সে ক্ষণিক ধন, সাধক রতন তৃণের মতন তুচ্ছ গণে।
বহুপুণ্য ফলে তবে জীব মনুষ্য জনম লভে ;

যে অবিবেচকাগ্রণী, তথা মূঢ়ের শিরোমণি ;
সেই ব্যক্তি হয় চিন্তামণি কাচমূল্যে বিক্রীণনে।
'তুদিনতরে দেশান্তরে থেকে' ফিরে' য'াবে ঘরে ;
এ চিন্তা ধ্যান ভাই! জাগে হৃন্মন্দিরে সর্ব্বক্ষণে।
তা'হলে অসার ভুবনে বিরাগ উপজিবে মনে ;
অনুরাগ জন্মিবে বিভু নিরঞ্জনের শ্রীচরণে ॥

(নান্দীর অন্তে)

সূত্রধার। (* চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পুরঃসর সহাস্য বদনে) অদ্য সবিশেষ ভাগ্যোদয় হওয়াতে নানাদিগ্দেশ বাস্তব্য অসংখ্য কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তান বহুমান পূর্ব্বক মাদৃশ ক্ষুদ্র ন-গণ্য ব্যক্তিকে কোনও নূতন নাটকের অভিনয় ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ উপরোধ অপরিহরণীয় ; ইহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেই হইবে। এক্ষণে কোন্ নাটকের অভিনয় কার্য্য দ্বারা বিদ্বৎ সমাজের চিত্তরঞ্জন করা যায় ইহাই বিবেচ্য। বোধ করি ন্যায় ভূষণোপাধিক শ্রীআলোকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মায়া সরোবর নাটক অভিনীত হইলে গুণিগণের হৃদয় বিনোদন হইতে পারে। অতএব অচিরাৎ গৃহিণীকে আহ্বান পূর্ব্বক উক্ত নাটকেরই অভিনয় করা যা'ক্। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্যে! যদি নেপথ্যবিধান সমাপ্ত হইয়া থাকে, তবে এদিকে আসুন। এই আমি উপস্থিত কার্য্যানুরোধে পাণ্ডবগণের সমসাময়িক অর্থাৎ তুল্য কালীন হইলাম।

(প্রবিষ্ট হইয়া)

নটী। আর্য্য পুত্র! এই আমি সমুপস্থিত। কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে অনুজ্ঞা করুন।

সূত্রধার। আর্য্যে! মায়া সরোবর নামক অভিনব নাটকের অভিনয় করিতে হইবে। অতএব শিষ্ট পরম্পরা যেরূপ প্রারব্ধ কার্য্যের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির উদ্দেশে পুণ্য দেবতার নাম উচ্চারণ করেন, আমিও তদ্রূপ সুধীবৃন্দের আরাধনার্থ নাট্যারম্ভ করিবার অগ্রে আপনাকে ভগবদ্বিষয়ক একটী গান করিতে অনুরোধ করি।

নটী। তথাস্তু। (নৃত্য করিতে করিতে)

রাগিণী বারোয়াঁ—তাল ঠুংরী।

মন! ক্যান ভাব অকারণ;
এই ব্যালা লও হরিপদে পরম শরণ।
শ্রীহরিই তৃষ্ণার জল, তথা দাঁড়া'বার স্থল;
দ্বিতীয় সম্বল জীবের আর নাই অ্যামন।
অপার করুণাসিন্ধু হন সেই দীনবন্ধু;
তাঁ'রি কৃপাবিন্দু-লাভে হও সযতন।
অনিত্য বিষয় ত্যজ, তাঁ'কে ভজ, তাঁ'তেই মজ;
পরত্র যদ্যপি চাও, অনন্ত জীবন।
তিনি মাতা, তিনি পিতা, হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা;
মুক্তিদাতা, ভয়ত্রাতা, বিপত্তি-ভঞ্জন।
তিনি ধ্যান জ্ঞান যার, কি ভয় বা ভাবনা তার;
সে জনার সহচর যখন, নিত্য নিরঞ্জন।
যে তাঁহার শরণাগত, তথা সদা পদানত;
নিশ্চিত তার করগত মুক্তি-নিকেতন।।

সূত্রধার। আর্য্যে! সাধু সাধু। আর্য্যার সুললিত গীত রাগ ও সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে যখন সমস্ত রঙ্গস্থল আলেখ্য সমর্পিতবৎ নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ লক্ষিত হ'তেছে, তখন অসংশয় ভগবৎ কৃপায় শ্রোতৃবর্গের হৃদয় রঞ্জিত, আবর্জিত ও উদ্বেল ভক্তিরসের প্রবলস্রোতে আপ্লুত হইয়াছে। অতএব অধুনা আমাদের আর প্রকৃত নাট্যারম্ভের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া রঙ্গভূমি আবদ্ধ করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। আসুন আমরা গৃহে গমন করি। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা।

যৎকালে যুধিষ্ঠির অপহৃতা দ্রৌপদীকে বহু ক্লেশে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কাম্যকবন পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভ্রাতৃগণের সহিত সুস্বাদু ফলমূল সনাথ বিচিত্র পাদপ-রাজি বিরাজিত দ্বৈতবনে বাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে বৃক্ষে বদ্ধ কোনও তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণী সনাথ অগ্নি মন্থনদণ্ড এক মৃগের শৃঙ্গে সংসক্ত হওয়াতে মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া তৎপ্রাপ্তি কামনায় ত্বরিতপদে অজাতশত্রুর সমীপে সমাগমন পূর্ব্বক কহিলেন; হে রাজন্! আমার অরণী সংযুক্ত অগ্নি মন্থনদণ্ড এক বনস্পতিতে বদ্ধ ছিল; কোনও

মৃগ আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংলগ্ন হইবামাত্র সে তাহা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ত্বরায় তাহার পদ চিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র সাধন বিনষ্ট না হইতে হইতে আনয়ন করুন।

যুধিষ্ঠির তৎশ্রবণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন সহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া তদুদ্দেশে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু কোনও মতেই তাহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে তাঁহারা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া এক গহনবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীতল ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্ষভরে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে কহিলেন, হে রাজন্! আমাদিগের বংশে কখনও আলস্যবশতঃ ধর্ম্ম বা অর্থ লোপ হয় নাই, তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপদের সীমা নাই, নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পুণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দ্যায়।

ভীমসেন। যৎকালে দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল; তখন যে আমি তাহাকে সংহার করি নাই এই নিমিত্ত এরূপ ক্লেশ সমূহ সহ্য করিতেছি।

অর্জ্জুন। আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতিতীব্র অন্তর্ভেদী বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি।

সহদেব। হে ভারত! যৎকালে শকুনি অক্ষক্রীড়ায় আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল, তখন যে আমি তাহাকে বিনষ্ট করি নাই; এই নিমিত্ত এরূপ অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি।

যুধিষ্ঠির। (নকুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক) হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ কর; দ্যাখ, কোনও নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান আছে কিনা।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অভিবীক্ষণ পূর্ব্বক)

নকুল। মহারাজ! আমি দেখিতেছি এক স্থানে সলিলাশ্রিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সারসকুল কলরব করিতেছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির। তবে সেই স্থানে যাইয়া এই সকল তূণদ্বারা পানীয় আনয়ন কর।

(নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকার পূর্ব্বক জলাশয়ের উদ্দেশে যাইয়া সারসকুল পরিবৃত এক বিমল সরোবর অবলোকন পূর্ব্বক জলপান কামনায় অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষগামী এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।)

"বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও।"

(নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, এই নিমিত্ত যক্ষ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া জলপান করিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন।)

যুধিষ্ঠির। (এদিকে নকুলের বিলম্ব দেখিয়া সহদেবকে কহিলেন) সহদেব! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন, তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর।

সহদেব। যে আজ্ঞা। (বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন।) তথায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী দেখিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিলপান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, "বৎস! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও।"

(পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া জলপান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।)

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নকুল ও সহদেব বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক; তুমি দুঃখ ভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয়।

ধনঞ্জয় তদ্দ্দেশে সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ...

সরোবর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এইবাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না, যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলেই সলিল পানও গ্রহণ করিতে পারিবে।"

ধনঞ্জয় এইরূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিষেধ করিতেছ, কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ বাণসমূহ দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব, তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পারিবে না। ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দভেদী বাণপ্রদর্শন পূর্ব্বক দশদিকে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "হে পার্থ! বৃথা শর বর্ষণ করিতেছ, অগ্রে মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জলপান কর, নতুবা বলপূর্ব্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।" ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক জলপান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! নকুল সহদেব ও ধনঞ্জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যে স্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত রহিয়াছেন, সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভ্রাতৃগণের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা কোনও যক্ষ বা রাক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে জল পানানন্তর যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে যক্ষ কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও।" ভীমসেন যক্ষের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া জলপান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তা পরায়ণ ও দগ্ধ হৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ মাত্র নাই, কেবল রুরু, বরাহ ও কৃষ্ণসার বিচরণ করিতেছে, নীল ভাস্বর পাদপ সকল শোভমান হইতেছে, পক্ষিগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে, ভ্রমরগুঞ্জিত ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে সিন্ধুবার, সুরেন্দ্র, কেতক, করবীর ও পিপ্পল পাদপ শ্রেণীতে সুসংবৃত নলিনীসনাথ এক সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছেন; ধনুর্ব্বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তাহা দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র শোকে অভিভূত হইয়া গলদশ্রুলোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হে মহাবাহু বৃকোদর! তুমি যে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে! আজি নিপতিত হইয়া সেই প্রতিশ্রুতি বিফল করিলে! হা মহাত্মন্! হা মহাবাহো! হা কুরুকুল কীর্ত্তি বর্দ্ধন! মনুষ্যের অঙ্গীকৃত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে, কিন্তু তোমাদিগের দিব্য বাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না।

হা ধনঞ্জয়! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবগণ জননীকে কহিয়াছিলেন, "অয়ি কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রাক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।" আর তৎকালে উত্তর পারিপাত্রক পর্ব্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, "ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীরে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বাধিকারে আনয়ন করিবেন। সমরে ইহাঁর জেতা কেহই নাই এবং অজেয়ও কেহই নাই।" আজ সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন! আমরা যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া এতাদৃশ দুঃখ-পরম্পরা সহ্য করিতেছি, আজি সেই পার্থ আমাদের সমুদায় আশা উন্মূলিত করিয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিয়াছেন!

যে বীরদ্বয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমরাঙ্গণে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দ্দলন করিতেন, যাঁহাদের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা ছিলনা, কোনও অস্ত্রই যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না, যাঁহারা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, আজি তাঁহারা শত্রু বশতাপন্ন হইলেন। হা নকুল! হা সহদেব! তোমরা দুই সহোদরে ভুমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না,—তখন ইহা পাষাণের সারাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালাভিজ্ঞ, তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশালী; অতএব তোমরা আপনাদের অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ? তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রমৃষ্ট দেখিতেছি, তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ?

"মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখপ্রসুপ্ত দেখিয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন এবং কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর নানাবিধ বিলাপ করিয়া বহুক্ষণের পর আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া বুদ্ধিদ্বারা এই ব্যাপারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যখন ইহাঁদিগের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এইস্থানে কোনও ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; তখন বোধ হয় কোনও দুষ্ট ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিয়াছে। যাহা হউক একাগ্র চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি। বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, বিশ্বাস ঘাতক, কুটিলমতি দুরাত্মা দুর্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জ্জনে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোনও মারাত্মক দ্রব্য সংযোগে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, অথবা ঐ দুরাত্মা গূঢ়চর প্রেরণ করিয়া এই জল বিষ মিশ্রিত করিয়াছে; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই, মুখবর্ণ যেরূপ প্রসন্ন সেইরূপই রহিয়াছে। আহা ইহাঁরা এক একজন প্রচুর বলশালী, কালান্তক যম ব্যতীত কে ইহাঁদিগকে সংহার করিতে সমর্থ! এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

(যুধিষ্ঠির সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন:—)

"রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, আমিই তোমার অনুজগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছি। যদি তুমি মদীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমাকেও ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বেই এই সরোবর অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও।"

যুধিষ্ঠির। "হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই—অবিচলিত গিরি চতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পক্ষীর কর্ম্ম নহে; বোধ হয়, এই মহৎ কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন! অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্গণের অধিপতি?, কি আশ্চর্য্য! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদিগের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না, আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন। ভগবন্! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার যে কি অভিলাষ কিছুই জানিনা, অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও কৌতুহল আবির্ভূত হইয়াছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?"

যক্ষ। তোমার মঙ্গল হউক, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি; আমিই তোমার মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এইরূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণ কর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ, মহাকায়, তালতরু সমুন্নত, সূর্য্যাগ্নি সদৃশ, দীপ্তিশালী পর্ব্বতোপম এক প্রাণী মহা ঘন ঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করতঃ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন;—

রাজন্! আমি তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া বল পূর্ব্বক জলগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত উহাদের প্রাণ সংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমারেও কহিতেছি, যদ্যপি প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে জল পান করিতে সাহস করিও না। আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও।

যুধিষ্ঠির। হে যক্ষ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে বল, আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, কারণ সাধু পুরুষেরা সতত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব আমি এইমাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধি বিদ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

যক্ষ। কে আদিত্যকে উন্নত করেন? কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন? কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির। ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন; দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

যক্ষ। কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়? কিসের দ্বারা মহত্ত্বলাভ হয়? কিসের দ্বারা পুত্রবান্ হয় এবং কিসের দ্বারাইবা বুদ্ধিমান্ হয়?

যুধিষ্ঠির। শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যা দ্বারা মহত্ত্ব লাভ, যজ্ঞদ্বারা পুত্রবান্ এবং বৃদ্ধ সেবায় বুদ্ধিমান্ হয়।

যক্ষ। ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি? তাঁহাদিগের কোন্‌ধর্ম্ম সাধুধর্ম্ম? তাঁহাদিগের মনুষ্য ভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব?

যুধিষ্ঠির। বেদপাঠ তাঁহাদের দেবভাব; তপস্যা সাধুধর্ম্ম; মৃত্যু মনুষ্য ভাব এবং পরীবাদ (পরনিন্দা) অসাধুভাব।

যক্ষ। ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব এবং অসাধু ভাবই বা কি?

যুধিষ্ঠির। অস্ত্র শস্ত্র: দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্য ভাব এবং পরিত্যাগ অসাধু ভাব।

যক্ষ। কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখানুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান্, লোক পূজিত ও সর্ব্ব প্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?

যুধিষ্ঠির। যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ (উদ্দেশেদান) না করে; সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।

যক্ষ। পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষা বহুতর?

যুধিষ্ঠির। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

যক্ষ। কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়।

যুধিষ্ঠির। মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত হয় না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদীবেগে বর্দ্ধিত হয়।

যক্ষ। প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে এবং

যুধিষ্ঠির। প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক, মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।

যক্ষ। কে সর্ব্ব ভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি এবং সমুদায় জগৎ কি পদার্থ?

যুধিষ্ঠির। অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি; জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম; সলিল ও যজ্ঞের শেষ অমৃত এবং বায়ু-সমুদায় জগৎ।

যক্ষ। কে একাকী বিচরণ করেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন? হিমের ঔষধ কি এবং কি প্রধান বপন ক্ষেত্র?

যুধিষ্ঠির। সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন; চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন; অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র।

যক্ষ। ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির। দাক্ষ্য ধর্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

যক্ষ। মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? উপজীবিকা কি? এবং প্রধান আশ্রয়ইবা কি?

যুধিষ্ঠির। পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।

যক্ষ। ধন্যের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?

যুধিষ্ঠির। ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।

যক্ষ। প্রধান ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্? কাহারে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির। আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্, মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।

যক্ষ। কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করিলে শোক যায়? কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?

যুধিষ্ঠির। অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই

যক্ষ। ব্রাহ্মণ নট ও নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা ইহাদিগকে দান করিবার প্রয়োজন কি?

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে, কীর্ত্তির নিমিত্ত নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্ত ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে।

যক্ষ। লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে? কি জন্য মিত্রগণকে ত্যাগ করে, এবং কি জন্যইবা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়?

যুধিষ্ঠির। লোক সকল অজ্ঞানে আবৃত, তমো দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে ত্যাগ করে এবং সঙ্গ হেতু স্বর্গগমনে অশক্ত হয়।

যক্ষ। মৃত পুরুষ কে? মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞইবা কি?

যুধিষ্ঠির। দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃতশ্রাদ্ধ এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই মৃতযজ্ঞ।

যক্ষ। দিক্ কি? জল কি? অন্ন কি? বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালইবা কি?

যুধিষ্ঠির। সাধুগণই দিক্, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।

যক্ষ। তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

যক্ষ। জ্ঞান, শম, দয়া, এবং আর্জ্জব কাহাকে বলে?

যুধিষ্ঠির। তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমচিত্ততাই আর্জ্জব।

যক্ষ। পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়? কোন ব্যাধি অনন্ত? কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকইবা অসাধু?

যক্ষ। ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

যক্ষ। মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।

যক্ষ। ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির। স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান; এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

যক্ষ। পণ্ডিত কে? নাস্তিক কে? মূর্খ কে? কাম কি? মৎসরইবা কি?

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসার হেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।

যক্ষ। অহঙ্কার, দম্ভ, দৈন্য এবং পৈশুন্য কি?

যুধিষ্ঠির। অজ্ঞান রাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দীনের ফলই দৈন্য এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।

যক্ষ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয়?

যুধিষ্ঠির। যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয়, তখনই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম, এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।

যক্ষ। তুমি শীঘ্র বল, কোন্ কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়?

যুধিষ্ঠির। যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে; যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে; এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।

যক্ষ। কুল, ব্রত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুতির মধ্যে কোন্‌টী ব্রাহ্মণত্বের কারণ?

যুধিষ্ঠির। ব্রতই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপন বা শাস্ত্র-চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই ব্যসনীও মূর্খ; যিনি ব্রতী তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

যক্ষ। প্রিয় বচন কহিলে, বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলে, বহুমিত্র হইলে এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলে কি লাভ হয়?

যুধিষ্ঠির। প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়; বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয়লাভ করে, বহুমিত্রশালী সদা সুখে বাস করে, এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি সদগতি লাভ করিয়া থাকে।

যক্ষ। সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি এবং বার্ত্তাইবা কি?

যুধিষ্ঠির। যিনি ঋণ শূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন, তিনিই সুখী। প্রাণিগণ প্রত্যহ শমন সদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোক যে চির জীবী হইতে ইচ্ছা

নাই; বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; নানা মুনির নানামত, ধর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞান গিরি গুহায় বিলীন হইয়াছে, অতএব মহাজন যে পথে গমন করেন, সেই পথই পথ। কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিদিবা স্বরূপ ইন্ধন প্রজ্বালিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাস স্বরূপ দর্ব্বী (হাতা) পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণীদিগকে যে পাক করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা।

যক্ষ। রাজন্! তুমি যথার্থরূপে আমার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনী কে স্থির কর।

যুধিষ্ঠির। মানবের নাম পুণ্য কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যতদিন থাকে, ততদিন সেই ক্ষণজন্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখদুঃখে অবিচলিত থাকেন বা প্রিয় অপ্রিয় বস্তুকে তুল্য জ্ঞান করেন, তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।

যক্ষ। তুমি পুরুষ ও শ্রেষ্ঠধনী শব্দের অর্থ করিলে, এই জন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনমাত্র জীবিত হইবে।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

যুধিষ্ঠির। (অতি বিনীতভাবে কহিলেন) হে যক্ষ! আপনকার প্রসাদে এই শ্যাম কলেবর, লোহিত লোচন, বিশালবক্ষাঃ মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শাল তরুর ন্যায় সমুত্থিত হউন।

যক্ষ। হে রাজন্। তুমি দশসহস্র মাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের আশ্রয় ভূত ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃ পুত্র নকুলের প্রাণ দান প্রার্থনা করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না এবং ধর্ম্মও য্যান আমাকে কখনও পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম, আমি আনৃশংস্য অবলম্বন করিতে সতত অভিপ্রায় করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোনও ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে

পারিব না। কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা আমার জননী, উভয়েই পুত্রবতী থাকেন, এই আমার কামনা। আমার পক্ষে উভয়েই সমান, অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।

যক্ষ। রাজন্! আপনি অর্থতঃ ও কামতঃ আনৃশংস্য পরায়ণ, এই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জীবিত হউক।

(যক্ষ বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এদিকে অপরাজিত যক্ষ একচরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না, আপনি বসু, রুদ্র কিংবা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান একজন অথবা দেবরাজ হইবেন, সন্দেহ নাই; নতুবা এ প্রকার ঘটিত না। এই ভূতলে এরূপ যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ ব্যাপারে যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করে। ইহাঁরা যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন এবং ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকৃত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।

যক্ষ। তাত! তুমি ঠিক্ অনুমান করিয়াছ; আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যশঃ সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপঃ শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন, তুমি পঞ্চ যজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ এবং পাপ কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সে কখনও দুর্গতি ভোগ করে না।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

যুধিষ্ঠির। যে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড মৃগ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।

র্ম্ম। আমি তোমার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছি, তাহা অর্পণ করিতেছি; তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির। আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; ত্রয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত; অতএব এক্ষণে আমরা যে একবর্ষ বাস করিব, কেহ যান উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, এই বর প্রদান করুন।

ধর্ম্ম। প্রদান করিতেছি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া ও সমস্ত ধরণীমণ্ডল ভ্রমণ কর, তথাপি ত্রিলোক মধ্যে কোনও লোকই তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ়বেশে বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ বেশ ধারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন। আর এই অরণী সংযুক্ত মন্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর। হে প্রিয় দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ; আমি তোমাকে বর প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছিনা; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির। হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি; হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যান লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই; আমার অন্তঃকরণ যান তপঃ, দম ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।

ধর্ম্ম। বৎস! তুমি স্বভাবতঃই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ, এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান হইবে। এই কথা কহিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

যবনিকা পতন।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

উপসংহার।

(নেপথ্যে) রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

পাণ্ডবগণ-সমুত্থান হ্যান পুণ্য উপাখ্যান;

লয় পাবে রিপু ছয়, ঘটিবে ইন্দ্রিয় জয় ;
হৃদয় হ'বে শান্তিময় পাপাশয় পা'বে তিরোধান।
মতিমান্ হ'য়ে সাবধান যদি ইহা করেন ধ্যান ;
লভেন ইহ তত্ত্বজ্ঞান, পরত্র মহানির্ব্বাণ।

অত্রৈব শিবম্।

শুভমস্তু। শ্রীরস্তু। ব্রহ্মার্পণ মস্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

পুষ্পমালা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

(১)

কে দেখেছে হেন শোভা বিরাজিতে বিরলে!
বিজন কানন দেশ,
কে তাহাতে সন্নিবেশ
করিল এ সুষমার, কে আনিল ভূতলে?
এ রূপ সামান্য নয় ;
মুনিমন মুগ্ধ হয়,
দেবতার হৃদে যাহে প্রেম বারি উথলে,
মাধুরী কুসুম তোর জগৎ যে মাতালে!

(২)

যথা গ্রহ রবি শশী তারকার নিকরে
নিয়ত রুচির বেশে
কি রজনী কি দিবসে
সুনীল অম্বরে নিত্য কিবা শোভা বিতরে!

তেমতি কুসুম মালিকা
[illegible] প্রফুল্ল কি কলিকা
সাজায় পৃথ্বীর দেহে, শোভে তার চিকুরে,
তেঁই হেন রূপবতী ধরণীতে বিহরে।

(৩)

বিকশিত শতদলে কিবা আছে তুলনা।
কিবা বর্ণ সমুজ্জ্বল,
কি মধুর পরিমল,
কিঞ্জল্কের শোভা তার কি অতুল বলনা।
কমল অপর জাতি,
রক্ত হিঙ্গুলের ভাতি,
যতেক জলজ মাঝে কুসুমিকা প্রবীণা,
হেরি যার রূপ শোভা কুমুদিনী মলিনা।

(৪)

মল্লিকা যুথিকা যাতি বেলা আর চামেলি,
মলয়ে মিলিত হয়ে,
বসন্তে বিকাশ পেয়ে,
সৌরভে আকুল করে; মিলে তাহে গুধেলি,
অশোক মধু মাধবী,
শিরীষ রুচির ছবি,
কাঞ্চন বকুল চাঁপা মনোহারী পিয়ালি,
হেমন্তের ফুল রত্ন শোভে তাহে শেফালি।

(৫)

কতেক লতার লতা কুসুমের জননী।
সুন্দরী রাধিকা লতা,
আর সে অপরাজিতা,
যার শোভা মনোলোভা উপবন শোভিনী।

ঝুমুকার মৃদুহাস
উল্লাসে বিতরে বাস,
কর্ণের ভূষণ করি কিবা শোভে অবনী,
সৌরভ বরণ গুণে সেই বহু মানিনী।

(৬)

কামিনী কেতকী কুন্দ আর কত কাননে!
চারিদিকে কত ফুল,
মাতাইছে অলিকুল,
সমুজ্জ্বল করে দিক্ বহুবিধ বরণে।
মধুর মাধুরীময়
মনোহর পুষ্পচয়,
কেবা এতরূপ শোভা করে দিল যতনে!
অদ্ভুত তাঁহার সৃষ্টি! প্রণমি সে চরণে।

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর।

লেখক,—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

এক গ্রামে বনমধ্যে এক ভিক্ষোপজীবী নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী একটী পুত্র প্রসব করিবার অব্যবহিত পরেই ইহ-ধাম পরিত্যাগ করেন। আত্মীয় পরিজন-বিহীন ব্রাহ্মণ সদ্যঃপ্রসূত বালকটীকে ফেলিয়া রাখিয়া স্থানান্তরে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সমাপন করতঃ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এবং ভাবিলেন, "এ সংসারে কেহ কাহারও নয়, যদি পরস্পরের সম্বন্ধ দৃঢ় হইত, তাহা হইলে কখনই আমার স্ত্রী আমাকে ও এ ক্ষুদ্র শিশুকে ফেলিয়া যাইত না।" এরূপ নানাবিধ বিষয় চিন্তা করতঃ ঈশ্বর আরাধনার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু এ সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের দশা কি হইবে? এ চিন্তাও তাঁহার উপস্থিত হইল।

এমন সময়ে গৃহের প্রাচীর হইতে একটী টিক্‌টিকি ডিম্ব প্রসব করিল; ডিম্বটী ভূতলে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে একটী ছানা বাহির হইয়া ক্ষণকাল পরে এক লম্ফে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা ভক্ষণ করিল; পরে আর এক লম্ফে আর একটী পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শয়ন করিয়া রহিল। এ দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন এ সংসারে কেহ কাহারও আহার দাতা বা প্রতিপালক নহে; যে ঈশ্বর জীবের জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন, তিনিই জন্মাইবার পূর্ব্বেই আহার প্রস্তুত রাখিয়া দেন; প্রমাণ ত প্রত্যক্ষই করিলাম। তবে আমি এই শিশুর জন্য চিন্তা করিতেছি কেন? যিনি জীবন দিয়াছেন,—তিনিই আহার দিবেন এই স্থির বিশ্বাসে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন।

এ দিকে শিশু পুত্রটি একাকী কক্ষে পড়িয়া রহিল। পরদিবস প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এক বাদসাহ শিকারে বহির্গত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্র শিশুর কোমল কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বাদসাহ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হইলে একটী ধাত্রীর হস্তে বালকের রক্ষণ ও পোষণ ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণকুমার একটু বড় হইলে বাদসাহ তাহার থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র একটী বাটী এবং ভরণ পোষণের জন্য যথেষ্ট আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিলেন। বহু দিবস গত হইলে ব্রাহ্মণ নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদন্তে সমস্ত অবগত হইলেন, এবং জগদীশ্বরের প্রতি অপার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইলেন এবং পুত্রের নিকট গিয়া তাহাকে সন্দর্শন করতঃ তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া এবং তাহার নিকট নিজের পরিচয় না দিয়া পুনরপি স্থানান্তের যাইয়া ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অকুর্ব্বন্নপি সংক্ষোভাদ্ব্যগ্রঃ সর্ব্বত্র মূঢ়ধীঃ।
কুর্ব্বন্নপি চ কৃত্যানি কুশলো হি নিরাকুলঃ ॥ ৫৮ ॥
সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়াতি যাতি চ।
সুখং বক্তি সুখং ভুঙ্‌ক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ ॥ ৫৯ ॥
স্বভাবাদ্ যস্য নৈবার্ত্তির্লোকবদ্ব্যবহারিণঃ।
মহাহ্রদ ইবাক্ষোভো গতক্লেশঃ সুশোভতে ॥ ৬০ ॥
নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরূপজায়তে।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী ॥ ৬১ ॥
পরিগ্রহেষু বৈরাগ্যং প্রায়ো মূঢ়স্য দৃশ্যতে।
দেহে বিগলিতাশস্য ক রাগঃ ক বিরাগতা ॥ ৬২ ॥

মূঢ়মতি ব্যক্তি যখন কিছু করে না, তখনও ক্ষোভাদি হেতু সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু ব্যাকুলতা-শূন্য জ্ঞান-নিপুণ পুরুষ, কার্য্য কালেও নিরুদ্বেগ। ৫৮।

তিনি সুখে অবস্থান করেন, সুখে শয়ন করেন, সুখে ভোজন করেন, এবং কার্য্য কালেও শান্তপ্রকৃতি। ৫৯।

যিনি সাংসারিকের ন্যায় আচরণ করিলেও, স্বভাবতঃই মনে কষ্ট পান না, তিনি, অক্ষুব্ধ মহাহ্রদের ন্যায়, বিগতক্লেশ হইয়া বিরাজ করেন—বাসনাই সুখ দুঃখের হেতু, বাসনা না থাকিলে ক্লেশ ও কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়। ৬০।

মূঢ়ের কর্ম্ম নিবৃত্ততেও প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, কিন্তু ধীর ব্যক্তির প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির ফলভাজন—প্রবৃত্তি অর্থাৎ কেবল কর্ম্মে প্রবৃত্তি মাত্র। বাসনা শূন্য হইয়া কায়িক কর্ম্ম মাত্র করায় নিবৃত্তির সমানই হয়। নিবৃত্তির ফল কি? কিছুই নয়। ৬১।

মূঢ় ব্যক্তিগণ, গ্রহণযোগ্য বিষয়ে প্রায় বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু যে মহাশয়ের নিজ দেহেও স্পৃহা নাই, তাঁহার আবার অনুরাগ অথবা বিরাগ কি?—লোকে মনে করে, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করত বনে গেলেই সাধু হওয়া যায়; কিন্তু তাহা হয় না। দেহাদি কোথায় রাখিয়া যাইবে? অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না

ভাবনাভাবনাসক্তা দৃষ্টির্মূঢ়স্য সর্ব্বদা।
ভাব্যভাবনয়া সাতু স্বস্থস্যাদৃষ্টিরূপিণী ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বারম্ভেষু নিষ্কামো যশ্চরেদ্বালবন্মুনিঃ।
ন লেপস্তস্য শুদ্ধস্য ক্রিয়মাণেঽপি কর্ম্মণি ॥ ৬৪ ॥
স এব ধন্য আত্মজ্ঞঃ সর্ব্বভাবেষু যঃ সমঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নিস্তর্ষমানসঃ ॥ ৬৫ ॥
ক্ব সংসারঃ ক্ব চাভাসঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্।
আকাশস্যেব ধীরস্য নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বদা ॥ ৬৬ ॥
স জয়ত্যর্থসন্ন্যাসী পূর্ণস্বরসবিগ্রহঃ
অকৃত্রিমেঽনবচ্ছিন্নে সমাধির্যস্য বর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥

হইলে সর্ব্বত্রই সমান। ৬২।

মূঢ়ের দৃষ্টি, চিন্তা অথবা অচিন্তাগত, (অর্থাৎ হয় চিন্তা না হয় চিন্তা ত্যাগে চিত্ত রত,) কিন্তু শান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি চিন্তাগত থাকিলেও সেই দৃষ্টিই অদৃষ্টি স্বরূপা। তাঁহার চিত্ত চিন্তা বা অচিন্তা কিছুতেই থাকে না। ৬৩।

যে বালবৎ মুনি, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্মের আরম্ভ করেন, সেই বিশুদ্ধাচারী, কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। ৬৪।

যে সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবাপন্ন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণাহার করিয়াও তাহাতে বীততৃষ্ণ থাকেন, তিনিই ধন্য। ৬৫।

আকাশবৎ সর্ব্বদা ধীর ও নির্ব্বিকল্প ব্যক্তির নিকট সংসারই বা কোথা আর সংসারের ভাবই বা কোথা? (তপস্যাদি) সাধনই বা কোথা আর তৎসাধ্য (মোক্ষাদিই বা) কোথা? ৬৬।

যে বিষয়বিরাগী পূর্ণ স্বভাবাপন্ন দেহধারীর অকৃত্রিম ও অনবচ্ছিন্ন সমাধি হইয়াছে, তিনিই জয়ী। ৬৭।

বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাততত্ত্বো মহাশয়ঃ।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী সদা সর্ব্বত্র নীরসঃ ॥ ৬৮ ॥
মহদাদি জগদ্দ্বৈতং নামমাত্রবিজৃম্ভিতম্।
বিহায় শুদ্ধবোধস্য কিং কৃত্যমবশিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥
ভ্রমভূতমিদং সর্ব্বং কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিশ্চয়ী।
আলক্ষ্যস্ফুরণং শুদ্ধঃ স্বভাবেনৈব শাম্যতি ॥ ৭০ ॥
শুদ্ধস্ফুরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ।
ক্ব বিধিঃ ক্ব চবৈরাগ্যংক্বত্যাগঃক্বশমোঽপিবা ॥ ৭১ ॥
স্ফুরতোঽনন্তরূপেণ প্রকৃতিঞ্চ ন পশ্যতঃ।
ক্ব বন্ধঃ ক্ব চ বা মোক্ষঃ ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদিতা ॥ ৭২ ॥
বুদ্ধিপর্য্যন্তসংসারে মায়ামাত্রং বিবর্ত্ততে।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিষ্কামঃ শোভতেবুধঃ ॥ ৭৩ ॥

অধিক কি বলিব, সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা অনাসক্ত এবং ভোগ ও মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা শূন্য মহাশয়ই তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন। ৬৮।

মহত্তত্ত্বাদি দ্বৈত জগৎ নাম মাত্র; শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করায়, তাঁহার আর কি করিতে অবশিষ্ট আছে? ৬৯।

সমস্তই ভ্রম, (পরিদৃশ্যমান বস্তু) কিছুই নাই, ইহা নিশ্চয়কারী বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি, বিশ্ব সংসারাদি আত্মার বিকাশমাত্র জানিয়া স্বভাবতঃই শান্ত হন। ৭০।

বিশুদ্ধ বিকাশ স্বরূপ, পরিদৃশ্যমান বিশ্বাদর্শীর নিকট বিধি, বৈরাগ্য, ত্যাগ বা বা শান্তি কিসের? ৭১।

অনন্ত স্বরূপে বিকাশমান স্বভাবাদর্শীর বন্ধই বা কি? মোক্ষই বা কি? হর্ষ বিষাদই বা কিসের? ৭২।

বুদ্ধি মাত্র কর্ত্তৃক বিবেচিত সংসারে মায়াই বিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু (আত্ম-জ্ঞানে) জ্ঞানী ব্যক্তি মমত্ব, অহঙ্কার ও বাসনা শূন্য হইয়া বিরাজ করেন। ৭৩।

অক্ষয়ং গতসন্তাপমাত্মানং পশ্যতো মুনেঃ।
ক বিদ্যা কচবাবিশ্বংকদেহোঽহং মমেতি বা ॥ ৭৪ ॥
নিরোধাদীনি কর্ম্মাণি জহাতি জড়ধীর্যদি।
মনোরথান্ প্রলাপাংশ্চকর্ত্তুমাপ্নোতিতৎক্ষণাৎ ॥ ৭৫ ॥
মন্দঃ শ্রুত্বাপি তদ্বস্তু ন জহাতি বিমূঢ়তাম্।
নির্ব্বিকল্পা বহির্যত্নাদন্তর্বিষয়লালসঃ ॥ ৭৬ ॥
জ্ঞানাদ্গলিতকর্ম্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কর্ম্মকৃৎ।
নাপ্নোত্যবসরং কর্ত্তুং বক্তুমেব ন কিঞ্চন ॥ ৭৭ ॥
ক তমঃ ক প্রকাশো বা ক হানঃ ক চ কিঞ্চন।
নির্ব্বিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সর্ব্বদা ॥ ৭৮ ॥

আত্মদর্শী বিগতক্লেশ, অবিনাশী মুনির নিকট বিদ্যা, বিশ্ব, দেহ, আমি বা আমার এ সকলের জ্ঞান কোথায়? ৭৪।

জড়বুদ্ধি ব্যক্তি, নিরোধাদি ক্রিয়া যদি একবার মাত্র পরিত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ অভিলাষ ও প্রলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়।—ইহাতে নিরোধ নিমিত্ত যোগ-ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীর সহিত জ্ঞানযোগে জীবন্মুক্তের প্রভেদ দেখাইতেছেন। ৭৫।

মন্দধী ব্যক্তি, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও মোহবর্জ্জিত হইতে পারে না, বাহ্যিক যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পস্বরূপ দৃষ্ট হইলেও অন্তরে বিষয়বাসনা পূর্ণ। ৭৬।

কিন্তু যিনি জ্ঞান-যোগে কর্ম্মশূন্য হইয়াছেন, লোকে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে দেখিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিছু মাত্র বলিতে অথবা করিতে অবকাশ পান না।—তাঁহার চিত্ত আত্মাময়, সুতরাং বাহ্যিক কথা বার্ত্তা বা কর্ম্ম, যাহা তিনি করেন, তাঁহার মনে সে সকল আদৌ স্থান পায় না। ৭৭।

নির্ব্বিকার, স্থিতপ্রজ্ঞ, ও সর্ব্বদা নিঃশঙ্ক ব্যক্তির নিকট তমঃ কোথা? প্রকাশই বা কোথা? কোনও বিষয়ই বা কোথা? এবং তাহার বিনাশই বা কোথা? ৭৮।

ক্ব ধৈর্য্যং ক্ব বিবেকিত্বং ক্ব নিরাতঙ্কতাপি বা।
অনির্ব্বাচ্যস্বভাবস্য নিঃস্বভাবস্য যোগিনঃ ॥ ৭৯ ॥
ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবন্মুক্তির্ন চৈব হি।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥ ৮০ ॥
নৈব প্রার্থয়তে লাভং নালাভে চানুশোচতি।
ধীরস্য শীতলং চিত্তমমৃতেনৈব পূরিতম্ ॥ ৮১ ॥
ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি ॥ ৮২ ॥
ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি।
হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি ॥ ৮৩ ॥
নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ।
নিশ্চিন্তঃস্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতেবুধঃ ॥ ৮৪ ॥

অকিঞ্চন ও অনির্ব্বচনীয়স্বভাব-যোগীর ধৈর্য্য, বিবেকিত্ব বা নির্ভয়তাও নাই।—যেমন অধৈর্য্য, শঙ্কাদি নাই, তদ্রূপই আবার ধৈর্য্যাদিরও অভাব। ৭৯।

স্বর্গ, নরক, জীবন্মুক্তি প্রভৃতিতেও লক্ষ্য নাই। অধিক বলা বাহুল্য, যোগ দৃষ্টিতে কিছুতেই লক্ষ্য থাকে না। ৮০।

লাভেরও প্রার্থনা নাই অলাভেও অনুতাপ নাই; ধীর ব্যক্তির প্রশান্ত চিত্ত অমৃতপূর্ণ। ৮১।

নিষ্কাম ব্যক্তি, শান্ত ব্যক্তির প্রশংসা বা দুষ্টের নিন্দা করেন না। তিনি (আকাঙ্ক্ষা রহিত) তৃপ্ত, দুঃখ ও সুখে সমদর্শী, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই দেখেন না। ৮২।

ধীর ব্যক্তি সংসারকেও দ্বেষ করেন না, আত্মদর্শনেও বাসনাশূন্য; হর্ষ ও বিষাদ শূন্য, মৃতও নহেন জীবিতও নহেন। ৮৩।

জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র কলত্রেও মমতা নাই, বিষয় কামনাও নাই, নিজ দেহ সম্বন্ধেও চিন্তা নাই; তিনি সকল আশাই ত্যাগ করিয়া বিরাজ করেন। ৮৪।

তুষ্টিঃ সর্ব্বত্র ধীরস্য যথাপতিতবর্ত্তিনঃ।
স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রাস্তমিতশায়িনঃ ।। ৮৫ ॥
পততূদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তিবিস্মৃতাশেষসংসৃতেঃ ।। ৮৬ ॥
অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
অসক্তঃ সর্ব্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ ।। ৮৭ ॥
নির্ম্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
সুভিন্নহৃদয়গ্রন্থির্বিনির্ধূতরজস্তমাঃ ।। ৮৮ ॥
সর্ব্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্বাসনা হৃদি।
মুক্তাত্মনো বিতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ।। ৮৯ ॥

যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে জীবন ধারণকারী, স্বচ্ছন্দবিহারী, এবং সায়ংকালে উপস্থিত মত প্রদেশে শয়নকারী ধীর ব্যক্তি সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট। ৮৫।

আত্মামাত্রে বিশ্রাম লাভ হেতু সমগ্র সংসার-বিস্মৃত মহাত্মার দেহের পতন বা অভ্যুদয়ে কোনও চিন্তাই নাই। ৮৬।

জ্ঞানী ব্যক্তি অকিঞ্চন, যথেচ্ছাবিহারী, দ্বন্দ্বশূন্য, সংশয়বিহীন, সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি শূন্য, এবং কৈবল্য পদে অবস্থিত হইয়া সুখে বিরাজমান। ৮৭।

যে মমতাশূন্য ধীর ব্যক্তি, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করত রজঃ ও তমো গুণাতীত, এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চনে সমদৃষ্টি হইয়াছেন, তিনিই শোভা পান। ৮৮।

সর্ব্ব বিষয়ে অমনোযোগী, হৃদয়ে অনুমাত্র বাসনাশূন্য, বিষয়বিতৃষ্ণ, মুক্তাত্মার কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে? ৮৯।

বাসনাশূন্য ব্যক্তি ভিন্ন আর কে জানিয়াও জানে না, দেখিয়াও দেখে না, এবং বলিয়াও বলে না?—ইন্দ্রিয় সকল থাকায় তৎকার্য্য হয় মাত্র, কিন্তু বাসনাভাবে কার্য্যের ফল হয় না। ৯০।

জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
ব্রুবন্নপিনচব্রুতে কোঽন্যো নির্ব্বাসনাদৃতে ॥ ৯০ ॥
ভিক্ষুর্ব্বা ভূপতির্ব্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে।
ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনাশোভনা মতিঃ ॥ ৯১ ॥
ক স্বাচ্ছন্দ্যং ক স্বঙ্কোচ্য ক বা তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
নির্ব্ব্যাজার্জ্জবভূতস্ত চারতার্থস্য যোগিনঃ ॥ ৯২ ॥
আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথ্যতে ॥ ৯৩ ॥
সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌচ স্বপ্নেঽপি শয়িতোঽপি চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্ত্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে ॥ ৯৪ ॥
জ্ঞঃসচিন্তোঽপিনিশ্চিন্তঃসেন্দ্রিয়োঽপিনিরিন্দ্রিয়ঃ।
সুবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥

যে নিষ্কাম ব্যক্তির সুন্দর বা অসুন্দর চিত্ত সমগ্র বিষয়ে অনাসক্ত, তিনি ভিক্ষুকই হউন অথবা ভূপতিই হউন, সমভাবেই শোভমান।—অর্থাৎ তিনি যেরূপ আচরণই করুন না কেন, এবং তাঁহার ধনাদি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ৯১।

অনুর্ব্বর সরল চিত্ত, এবং কৃতার্থ যোগী ব্যক্তির স্বচ্ছন্দতা, সঙ্কোচ, বা তত্ত্ব নিশ্চয় এ সকলও কিছুই থাকে না।—সঙ্কোচ, স্বচ্ছন্দতাদি প্রাকৃতিক কার্য্য, এবং তত্ত্বনিশ্চয় করা সাধকের কার্য্য, কিন্তু সিদ্ধ ব্যক্তির সরল চিত্ত প্রসব শূন্য। ৯২।

আত্মাতে বিশ্রাম লাভ হেতু পরিতৃপ্ত, আশা ও ক্লেশানুভব বিহীন মহাত্মা, অন্তঃকরণে যে বিমল শান্তি অনুভব করেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ৯৩।

পদে পদে পরিতৃপ্ত ধীর ব্যক্তি সুষুপ্ত থাকিয়াও সুষুপ্তি সুখানুভব করেন না, নিদ্রিতাবস্থাতেও শয়ন সুখানুভব করেন না, এবং জাগ্রত থাকিয়াও বিষয়ানুভব করেন না। ৯৪।

জ্ঞানী ব্যক্তি, চিন্তিতবৎ কার্য্য করিলেও নিশ্চিন্ত; (অর্থাৎ কোনও কার্য্য

ন সুখী নচ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন রাগবান্।
ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্তো ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন ॥ ৯৬ ॥
বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপিনজড়োধন্যঃপাণ্ডিত্যেঽপিনপণ্ডিতঃ ॥ ৯৭ ॥
মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্ত্তব্যনির্বৃতঃ।
সমঃ সর্ব্বত্রবৈতৃষ্ণ্যাৎ ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ৯৮ ॥
ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥ ৯৯ ॥
ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে ব্যবতিষ্ঠতি ॥ ১০০ ॥

ইতি শমশতকমষ্টাদশপ্রকরণং সমাপ্তম্।

করিলেই আনুসঙ্গিক চিন্তা ও নিপুণতার আবশ্যক, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ঐ চিন্তাতেও চিত্তের আশক্তি না থাকায় তিনি নিশ্চিন্ত;) ইন্দ্রিয়সমূহ বর্ত্তমানেও ভোগ লালসা না থাকায় নিরিন্দ্রিয়; বুদ্ধিমান হইলেও ঐ বুদ্ধির কার্য্যে অনাসক্তি হেতু নির্ব্বুদ্ধি এবং অহঙ্কৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বা আমার এরূপ জ্ঞান শূন্য। ৯৫।

সুখীও নহেন, দুঃখীও নহেন, বিরাগীও অনুরাগীও নহেন, মুমুক্ষুও নহেন, মুক্তও নহেন, অকিঞ্চনও নহেন অথচ কিছুই নহেন। ৯৬।

চিত্ত বিষয়াদিতে রত হইলেও, আসক্তি না থাকায়, বিক্ষেপরিহীন সমাধিস্থ হইলেও সমাধিযুক্ত নহেন, জড়তা থাকিলেও জড় নহেন, এবং পাণ্ডিত্য থাকিলেও পণ্ডিত নহেন, সুতরাং তিনিই ধন্য। ৯৭।

মুক্ত ব্যক্তি নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, কৃত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিবৃত্ত, বিতৃষ্ণা হেতু সর্ব্বত্র সমদর্শী, (অর্থাৎ দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই) এবং অকৃত বা কৃত কার্য্য স্মরণ করেন না। ৯৮।

স্তবে সন্তুষ্ট বা নিন্দায় ক্রুদ্ধ হন না, এবং মৃত্যু জন্য উদ্বিগ্ন বা জীবনে আনন্দিত নহেন। ৯৯।

শান্তবুদ্ধি ব্যক্তি জনপদেও ধাবিত হন না, অথবা অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। সকল সময়ে সর্ব্বত্র অবস্থানপটু। ১০০।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সপ্তম-দৃশ্য।

বিপিনের বৈঠকখানা। কক্ষ পার্শ্বস্থ টেবিলের ধারে একখানি পত্র-হস্তে চিন্তাকুল চিত্তে বিপিন দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। সন্ধ্যা হয়ে এলো, জলখাবার খাবে না?

বিপিন। এখন থাক্। উকিলের আস্‌বার কথা আছে; এর পর খাব।

সুরমা। কেন, আবার কি কোন মোকদ্দমা পড়েছে নাকি?

বিপিন। না। ছোটবউমা যে উকিলের চিঠিখানা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌তে হ'বে।

সুরমা। আমার কথা ত তুমি শুন্‌বে না, তা কি বল্‌ব? তার বিষয় সে চেয়েছে, ছেড়ে দাও, বালাই যাক্।

বিপিন। তা কি হয়? পৈতৃক বিষয় ছেড়ে দেব? আমাদের বিষয় আমাদের বংশ থেকে চলে যাবে? না, তা আমি হ'তে দে'ব না।

সুরমা। মোকর্দ্দমা কর্‌লে ত দিতে হবে। সে কালামুখীর সঙ্গে মাম্‌লা করার চেয়ে আগে থেকে বালাই দূর করাই ভাল।

বিপিন। ছোটবউমা কি আমার সঙ্গে মোকদ্দামা কর্‌বে? না, তা তত সম্ভব বলে মনে হয় না। তুমি ত জান, সে আমাদের কত ভক্তি করে, ননীকে কত ভালবাসে।

সুরমা। ও সব ঠাট্ দেখান ত। নইলে অমন করে নিজের মুখ পোড়াবে কেন? যখন উকিলের চিঠি দিয়েছে, নিশ্চয়ই মাম্‌লা কর্‌বে।

বিপিন। ভায়ের পরামর্শে এ চিঠি দিয়েছে, মাম্‌লা কখনও কর্‌বে না।

সুরমা। ভায়ের পরামর্শে যদি চিঠি দিতে পারে, মাম্‌লা কর্‌বে না কেন? যারা নিজের ঘরে পরপুরুষ ডেকে আন্‌তে পারে, আদালতে দাঁড়ান তাদের কাছে কিছুই নয়।

বিপিন। একান্তই যদি মাম্‌লা করে, আমাকেও তার বিধান কর্‌তে হবে। দেখ, একবার মঞ্জুরীকে জিজ্ঞাসা করো ত, সে কি ——না মাম্‌লা কর্‌বে না, আমি মাম্‌লা কর্‌তে দে'ব না।

(ননীর প্রবেশ)

ননী। বাবা, বাবা, কাকীমাকে আন্‌তে যাব ?

সুরমা। তাকে আর কাকীমা বল্‌তে হবে না ; তার না আসাই ভাল।

ননী। মা, মা, তোমার পায়ে পড়ি, কাকীমার জন্য আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে।

বিপিন। তোর কাকীমা কি আস্‌বে ননী ?

ননী। হ্যাঃ বাবা। রাঙ্গামামী এতদিনে ঠিক্ সেরে গেছে।

বিপিন। তুই তোর কাকীমাকে আন্‌তে পার্‌বি ?

ননী। কাকীমা আমায় যেতে বলেছিল ; আমি গেলেই কাকীমা আস্‌বে।

বিপিন। আচ্ছা আমি পাঁজী দেখে, কবে আন্‌তে যাবি, বলে দে'ব।

সুরমা। তুমি কি ক্ষেপ্‌লে নাকি ? ছেলের কথায় তাকে আবার আন্‌তে যাবার ঠিক্ কর্‌ছ !

বিপিন। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। যদি আসে সব ভয় চুকে যায়।

সুরমা। তার স্বভাব চরিত্রের কথা শুনেও তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌তে চাও! তার কি ছায়া মাড়াতে আছে ?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আজ্ঞে উকিল বাবু এসেছেন।

বিপিন। আচ্ছা এখানে ডেকে দে। (ভৃত্যের প্রস্থান)

সুরমা। বিষয়ের জন্য তোমার যা ইচ্ছা হয় করো। কিন্তু তাকে আন্‌লে সবার মুখ পুড়্‌বে। ননী এখন আর——

(সুরমা ও ননীর প্রস্থান)

বিপিন। ননী গেলে আস্‌তেও পারে। তাহ'লে আর কোন ভয় থাকে না।

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ। নমস্কার বিপিন বাবু! কেমন আছেন ?

বিপিন। নমস্কার, নমস্কার! আসুন, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।

বিনোদ। মল্লিকদের বাড়ীতে দেরী হয়ে গেল। তাদের মেজ-বউয়ের কেসের আজ রায় বেরিয়েছে। কেসটা খুব জেতা গেছে।

বিপিন। বটে, বটে। হরেন কেসটা জিতেছে।

বিনোদ। হ্যাঃ। যে রকম রায় হয়েছে, তাতে আপিল কর্‌লেও আর কিছু হ'বে না।

বিপিন। চরিত্র হীনতার প্রমাণের উপর কি কেসটা গেছে?

বিনোদ। হ্যাঃ! এ সম্বন্ধে আপনার পরিবারের সাক্ষ্য বিশেষ কাজে লেগেছে।

বিপিন। হুঃ। হরেনদের বিষয় তাহ'লে হরেনদেরই রইল।

বিনোদ। বেশ ভালই হয়েছে। উপস্থিত আপনার কি দরকার বলুন?

বিপিন। হ্যাঃ। দেখুন ছোটবউমা বিষয়ের অংশ আর হিসাব চেয়ে আজ ক'দিন হ'ল একখানা উকিলের চিঠি দিয়েছেন। সেই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

বিনোদ। প্রবোধ বাবুর স্ত্রী আপনাকে উকিলের চিঠি দিলে! দিন কাল এই রকমই পড়েছে বটে।

বিপিন। ভায়ের কুপরামর্শেই ছোটবউমা এই কাজ করেছেন। তাঁকে আন্‌বার জন্য একবার ছেলেকে পাঠাব! তিনি এলেই সব ঠিক্ হয়ে যাবে।

বিনোদ। কিন্তু তাঁর ভাই কি তাঁকে আস্‌তে দেবে?

বিপিন। সে একটা ভাব্‌বার কথা বটে।

বিনোদ। চিঠি খানা দিন, দেখি। (চিঠিখানি বিপিনের হাত থেকে লইয়া পড়িতে পড়িতে) প্রবোধ বাবু উইল করে যান, না?

বিপিন। হ্যাঃ।

বিনোদ। সে উইলের সর্ত্তে কি আপনার ভাদ্রবধু বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ একেবারে পেয়েছেন?

বিপিন। হ্যাঃ। উইল সেই মর্ম্মেরই।

বিনোদ। তাহ'লে ত দেখ্‌ছি অর্দ্ধেক বিষয় ছেড়ে দিতে হয়।

বিপিন। না, বিষয়ের একটুকুও আমি হাত ছাড়া করব না। তা'হলেই ছোটবউমার ভাই বিষয় হাতাবে। যেমন করে পারি, সাধের বাগানে আগাছা গজাতে দে'ব না।

বিনোদ। আচ্ছা, একবার প্রোবেটখানা দিন ত। উইলে কি রকম স্বত্ব আছে দেখি। (বিপিন উইল বাহির করিয়া দিলে তাহা পড়িতে পড়িতে) উইলখানা ত বেশ Cleverly লেখা। নিব্যূঢ় স্বত্ব দেবার উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, অথচ দরকার পড়্‌লে বলা যেতে পারে এ উইলে শুধু জীবন স্বত্ব দিয়া গেছে। (পড়িতে পড়িতে) বাঃ, divesting Clause ও রয়েছে। অসচ্চরিত্রা হ'লে আর বিষয়ে কোন অধিকার বা স্বত্ব থাক্‌বে না। ঠিক্ এই রকমের স্বত্ব হরেন বাবুর

পিতার উইলে ছিল। এইরূপ স্বত্ব ছিল বলেই আজ হরেন বাবুদের বিষয় হরেন বাবুদের বংশেই রয়ে গেল।

বিপিন। কি বল্‌ছেন, কি বল্‌ছেন!

বিনোদ। এই রকমের স্বত্ব ছিল বলেই হরেন বাবু আজ কেস্ জিতেছেন। যদি হরেন বাবুর মত প্রমাণ দিতে পারেন, কিছুতেই আপনার হাত থেকে বিষয় বার ক'রে নিতে পার্‌বে না।

বিপিন। পার্‌বে না, পার্‌বে না।

বিনোদ। নিশ্চয়ই না। উইলের স্বত্ব এ সম্বন্ধে জলের মত পরিষ্কার। শুধু একটু প্রমাণ দরকার, বাস্ তাহলেই আপনার বিষয়——

বিপিন। না,—না, তার চেয়ে বিষয় যাক্। আগাছা জন্মে সব ছারখারে দিক্। প্রবোধকে দিয়া আগাছার বীজ রোপন করিয়েছি, ফল ত হওয়া চাই।

বিনোদ। অবশ্য আপনার ভাদ্রবধুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি হরেন বাবুর ভাজের মত নন। আমাদের এক ঝি—সে আগে আপনার বাড়ীতে কাজ করত—সে দিন মেয়েদের কাছে কি সব বলেছিল। আমি শুনে বল্‌লেম ও সব বাজে কথা।

বিপিন। বল্‌ছিল, বল্‌ছিল! তবে ত দেখ্‌ছি বেশ রটেছে। বিনোদ বাবু আপনি ঠিক্ বলেছেন, ওসব বাজে কথা, মিথ্যা কথা।

বিনোদ। তা আর আমায় বল্‌তে হ'বে না ঝিয়েদের স্বভাবই ঐ রকম মনিব বাড়ী একটু কিছু হলেই সহরে ঢাক পিটিয়ে দেয়।

বিপিন। দেখুন, আমি যখন উইলের এক্‌জিকিউটার, আমারই হাতে ত বিষয় থাক্‌বে। ছোটবউমা এখানে না থাকেন, তাঁর অংশের আয় তাঁকে দে'ব।

বিনোদ। এক্‌জিকিউটারের কাজ ত এখন শেষ হয়েছে। এখন আর আপনি এক্‌জিকিউটার বলে বিষয় রাখ্‌তে পারেন না। আর তা হ'লেও ত প্রবোধ বাবুর দুরভিসন্ধির ষড়যন্ত্র হ'তে বিষয় রক্ষা করতে পার্‌বেন না।

বিপিন। ছোটবউমা যাতে ভাইকে বিষয় না দিতে পারে, এরূপ কোন উপায় করা যায় না?

বিনোদ। Divesting Clause এর সাহায্যে তাঁর স্বত্ব নষ্ট করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

বিপিন। কি রে?

ভৃত্য। আজ্ঞে, ব্রজন বাবু এসেছেন!

বিপিন। কে বাবু?

ভৃত্য। আজ্ঞে, ছোটমায়ের ভাই, আর তাঁর সঙ্গে একজন বাবু আছেন।

বিপিন। বল, এখন দেখা হবে না।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে। (ভৃত্য দরজার নিকট অগ্রসর হইলে)

বিপিন। আচ্ছা,—ডেকে দে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে। (ভৃত্যের প্রস্থান)

বিপিন। বোধ হয় বিষয় সম্বন্ধেই এসেছে।

বিনোদ। আমারও তাই মনে হয়। দেখুন না, কি বলে।

(সতীশ ও শরতের প্রবেশ)

শরৎ। হ্যালো, বিনোদ যে?

বিনোদ। কি হে শরৎ নাকি? এখানে কি মনে করে?

শরৎ। বিপিন বাবুর সঙ্গে একটা দরকার আছে। (বিপিনের প্রতি) মহাশয় মাফ্ করবেন, আপনিই কি বিপিন বাবু?

বিপিন। হ্যাঁ। আপনার নাম কি?

শরৎ। আমার নাম শরৎচন্দ্র রায়। আমি আলিপুর কোর্টে প্র্যাক্টিস্ করি।

বিপিন। ওঃ! তা আপনার জন্য কি কর্‌তে পারি বলুন?

শরৎ। আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে।

বিপিন। বিনোদবাবু আমার উকিল, বিশেষ বন্ধু। তাঁর কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। বলতে পারেন।

শরৎ। দিন কতক আগে আপনার মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নী শ্রীমতী মায়া দেবীর তরফে আমি আপনাকে একখানা চিঠি দিই। তা বোধ হয় পেয়ে থাক্‌বেন?

বিপিন। হ্যাঃ।

শরৎ। সেই চিঠি অনুসারে বিষয়ের বকরা আর হিসাব দেবার কি ব্যবস্থা কর্‌বেন তা জান্‌বার জন্য আমরা আজ এসেছি।

বিপিন। সতীশ বাবু আড়ালে আড়ালে রয়েছেন কেন? বাড়ীর সব ভাল ত। আপনার স্ত্রী সেরে উঠেছেন?

সতীশ। হ্যাঃ। এখন অনেকটা ভাল আছে।

বিপিন। তা হলে ছোটবউমার আসার একটা দিন ঠিক্ করে ফেলুন!

শরৎ। এখানে আস্‌তে বা থাক্‌তে তাঁর ইচ্ছা নাই।

বিপিন। কেন?

শরৎ। এ কথার উত্তর আপনিই জানেন। উপস্থিত তিনি সতীশ বাবুর বাটিতে থাকাই স্থির করেছেন। সতীশ বাবুকে বিষয় আশয় দেখ্‌বার ক্ষমতা দিয়াছেন।

বিপিন। বটে! তা তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন!

শরৎ। সে বিষয় আপনারও বিচার্য্য নয়, আমারও নয়। পর্দ্দানশীল রমণী আপনার লোককেই বিষয়ের ভার দিয়া থাকে। এখন তার বিষয়ের বকরা দেবার কি কর্‌বেন?

বিপিন। সতীশ বাবু চাল চেলেছেন মন্দ নয়। কিন্তু আমি বিষয়ের বক্‌রা দিচ্ছি না।

শরৎ। তা হলে আমার মক্কেলকে বাধ্য হয়ে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে হবে।

বিনোদ। সেটা কি ভাল হবে শরৎ। এ সব পারিবারিক ঝগ্‌ড়া যত আদালতে না যায়, ততই ভাল!

শরৎ। তোমার মক্কেল আমার মক্কেলের ন্যায্য গণ্ডা বুঝিয়ে দিলেই আর আদালতে যেতে হয় না। আমার মক্কেল আপোষে মিটিয়ে নিতে প্রস্তুত।

বিপিন। ছোটবউমা তা হলে মাম্‌লা কর্‌বেন না?

শরৎ। বাধ্য না হলে তাঁর মাম্‌লা কর্‌বার ইচ্ছা নাই। আপনি আপোষে মিটিয়ে দেন, ভালই।

বিনোদ। শরৎ মেটামিটি সম্বন্ধে যা কথা হবে, সে সব "withovt prejuice"

শরৎ। নিশ্চয়ই। বিপিন বাবু, যদি আপনার কোন প্রস্তাব থাকে বলুন।

বিপিন। বিনোদ বাবু, আপনি একবার এদিকে আস্‌বেন।

(দুই জনের কক্ষের একপার্শ্বে গিয়া পরামর্শ)

বিনোদ। (অগ্রসর হইয়া) শরৎ, তোমার মক্কেল কি চান, তা বল্‌লে বোধ হয় মেটামিটির কথার সুবিধা হয়।

শরৎ। তুমি বোধ হয় জান, প্রবোধ বাবুর উইল অনুসারে আমার মক্কেল অর্দ্ধেক বিষয়ের হক্‌দার। তাই পেলেই আমার মক্কেল সন্তুষ্ট হ'বেন। এতদিন বিপিন বাবু যে আয় ভোগ করে আস্‌ছেন, তার হিসাব নিকাশ আমার মক্কেল ছেড়ে দিতে রাজী।

বিনোদ। আমার বোধ তুমি উইল পড় নাই।

শরৎ। সে সব না দেখে কি আর এখানে এসেছি। আমার মক্কেল চুল চিরে বক্‌রা নিতে চান না। সমস্ত বিষয়ের মোটামুটি আয় ধরে অর্দ্ধেক আয়ের সম্পত্তি পেলেই তিনি আর কিছু কর্‌বেন না।

বিনোদ। তোমার মক্কেলের দেখ্‌ছি গোড়াতেই ভুল ধারণা রয়েছে। প্রবোধ বাবুর উইলে তিনি অর্দ্ধেক বিষয়ের কেবল জীবন স্বত্ব পেয়েছেন। তোমার মক্কেলের জীবদ্দশা তক বিপিন বাবু তাঁকে সমস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেক আয় দিতে সম্মত আছেন। তোমরা যদি চাও, এ মর্ম্মে বিপিন বাবু লেখাপড়া করে দিতে পারেন। অবশ্য বিষয় বিপিন বাবু যেমন দেখে আস্‌ছেন তেমনি দেখ্‌তে থাক্‌বেন, বক্‌রা হ'বে না।

শরৎ। তাহ'লে দেখ্‌ছি মাম্‌লা কর্‌তে হবে।

বিনোদ। কেন, বিপিন বাবুর প্রস্তাব খুব ন্যায় সঙ্গত।

শরৎ। খুবই বটে! বিপিন বাবু নিজের সদাশয়তার আধিক্যে ভুলে যাচ্ছেন, আমার মক্কেল শুধু জীবন স্বত্বের অধিকারিনী নন, অর্দ্ধেক বিষয়ের সম্পূর্ণ মালিক।

বিনোদ। তোমার যখন মতে মিল্‌ছে না এ সম্বন্ধে বড় কৌন্‌সুলীর opinion লওয়া যাক্।

শরৎ। opinion এর দরকার কি? আদালতে এ কথা স্থির হবে।

বিনোদ মোকদ্দামা কর্‌লে যে তোমার মক্কেলের বিশেষ সুবিধা হ'বে তা ভেব না।

শরৎ। সব দিক বিবেচনা করেই আসরে নামা গেছে। বিপিন বাবু ভেবেছেন, অসহায়া স্ত্রীলোক, সতীশের মাম্‌লা কর্‌বার ক্ষমতা নাই, যা তা বলে বোকা বুঝিয়ে বিষয়টা গ্রাস্ কর্‌বেন, কিন্তু তা হচ্ছে না।

বিপিন। ফাঁকি দেবার চেষ্টা কর্‌ছেন আপনি, আর যিনি আপনার সঙ্গে আছেন। সতীশ বাবু, আপনার ভগ্নীকে প্রতারণা কর্‌বার আমার উদ্দেশ্য নাই, ইচ্ছাও নাই। তা যদি থাক্‌ত তা হলে আপনার বাড়ীতে তাঁকে পাঠিয়ে দিতাম না। বিষয় আমি ছাড়্‌ব না, বক্‌রাও দে'ব না; অর্দ্ধেক আয় আপনার ভগ্নীর জীবদ্দশায় আমি দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে যেরূপ লেখাপড়া বল্‌বেন সহি করে দিতে পারি। যদি ভগ্নীর ভাল চান এ প্রস্তাবে সম্মত হউন। নইলে কিছুই পাবেন না।

সতীশ। ও সব কথা বল্‌বেন আপনার বেতন ভোগী ভৃত্যদের। আমরা

নাই। ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আমার ভগ্নী যে সম্পত্তির অধিকারিনী তাহ আপনার কাছে চাইতে এসেছি।

বিপিন। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বোনের বিষয়ে ভায়ের কোন অধিকার নাই। এখন তাতে আপনার ভগ্নীরও কোন স্বত্ব নাই।

সতীশ। কেন? তা বল্‌তে পারেন?

বিপিন। কেন, কেন! উপযুক্ত সময়ে তা জান্‌তে পার্‌বেন।

শরৎ। বেশ, তাই হ'বে। এস সতীশ, আমরা যাই।

(সতীশ ও শরতের প্রস্থান)

বিপিন। বিনোদ বাবু, বুঝেছি মাম্‌লা হ'বে। ঢাক ত বেজেছে, হাঁড়ি ত ভেঙ্গেছে, তবে আর কিসের ভাব্‌না, কিসের লজ্জা। আমাদের বংশের মেয়ে ত নয়, আমাদের কোন বংশধরের ত কলঙ্ক হ'বে না। তবে কেন বিষয় ছেড়ে দে'ব। আপনি চিঠির জবাবে বলে পাঠাবেন সতীশের ভগ্নী দুশ্চরিত্রা, বিষয় পেতে পারে না। বেশ গুছিয়ে জবাব দেবেন, যেরূপ ভাল বিবেচনা হয় লিখ্‌বেন। কিন্তু "সতীশের ভগ্নী" এ কথাটি লিখ্‌তে ভুল্‌বেন না।

বিনোদ। আমি কালই জবাব দে'ব। চিঠিখানা আর প্রোবেট খানা নিয়া যাই।

বিপিন। হ্যাঃ। নিয়া যান। কাল সকালেই জবাব দেবেন। আমায় আর জিজ্ঞাসা কর্‌বার দর্‌কার নাই।

বিনোদ। আচ্ছা, এখন আসি।

বিপিন। আসুন, নমস্কার!

বিনোদ। নমস্কার!

(বিনোদের প্রস্থান)

বিপিন। বাস্‌ আর ভাব্‌তে হ'বে না। বিষয় রক্ষা হ'বে। প্রবোধকে দিয়া উইল করিয়েছিলাম, পাছে আমার অবর্ত্তমানে ছেলেরা কোন গোল করে। তা বেশ প্রতিফল পেয়েছি।

(বিপিনের প্রস্থান)



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, পৌষ। | ৯ম সংখ্যা।

রস ও অপ্।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

রস—আপ্য বা অপ্ হইতে জাত। অপ্ শব্দে জল, জল—সোম গুণ বিশিষ্ট বা শীতল, সোমগুণ ব্যতীত কোন বস্তু শীতল হইতে পারে না। সোম শব্দে চন্দ্র, চন্দ্র সোমগুণ বিশিষ্ট বা শীতল। রস শব্দে অম্লমধুরাদি ছয়রস ও ভুক্তান্নজাত রস। ভুক্তান্নজাত রস শরীরের জলীয় ধাতু। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি শরীরের ধাতু। ইহারা দেহকে ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত। তন্মধ্যে রস আদ্য ধাতু, ভুক্তান্ন পরিপক্ক হইয়া প্রথমে রসে পরিণত হয়, এই রস অম্লমধুরাদি ছয়রস বিশিষ্ট জলীয় পদার্থ, তজ্জন্য ইহাকে রসধাতু বা দেহের জলীয় ধাতু বলা হয়। খাদ্য দ্রব্য একরস বিশিষ্ট নহে, কারণ একরস বিশিষ্ট দ্রব্য জগতে নাই। জগতের যে কোন দ্রব্য ছয়রস বিশিষ্ট, অতএব ছয়রস বিশিষ্ট খাদ্য পরিপক হইয়া আবার

ছয়রসে পরিণত হয় ও তজ্জন্য সেই জলীয় পদার্থ রস নামে অভিহিত হয়। সংস্কৃতে উহা "অপাং রসঃ" বা জলের রস বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাকে বাঙ্গালায় জলীয় ধাতু বা রস ধাতু বলা হয়। রস শব্দের নিরুক্তি এই—

গত্যর্থো রস ধাতুর্যস্ততোঽভবদপাং রসঃ।
সদৈব সকলং দেহং রসতীতিরসঃ স্মৃতঃ॥

গত্যর্থক রস ধাতু হইতে রসশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রসশব্দে জলীয় ধাতু। রস সকল দেহে সঞ্চরণ করিয়া দেহকে রসযুক্ত করে, তজ্জন্য উহাকে রস বলা হয়।

যেমন জল গতিশীল, তদ্রূপ রসধাতু গতিশীল। অমৃত তত্ত্ব—চন্দ্র, জল হইতেই মেঘের সৃষ্টি হয় এবং মেঘ হইতেই বৃষ্টি নিপতিত হয়। চন্দ্র, জল ও দেহের রসধাতু এই তিনটি পদার্থই গতিশীল। চন্দ্র, জল, রসধাতু ও শ্লেষ্মার স্বরূপ এক। প্রত্যেকেই দ্রব পদার্থ, শুক্লবর্ণ, শীতল, স্নিগ্ধ ও গতিশীল। অপ্ ও শ্লেষ্মার স্বরূপাদি অপ্ ও শ্লেষ্মা নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, রসধাতুর স্বরূপ এই—

সম্যক্‌পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।
স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলোভবেৎ॥

ভুক্তার সম্যক্ পরিপক্ক হইলে, তাহার সার জলীয়াংশকে রস বলা হয়। সেই রস দ্রব বা তরল, শুক্লবর্ণ, শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ ও গতিশীল।

এই রস অম্ল মধুরাদি ষড়্‌রস বিশিষ্ট হইলেও মধুর রসাধিক, তজ্জন্য মধুর নামে অভিহিত।

রস শরীরে তিন প্রকারে সঞ্চরণ করে—

রসঃ শরীরে শব্দার্চ্চির্জল সন্তানবৎ ত্রিধা।
সঞ্চরত্যনুরূপোঽয়ং নিত্যমেব হি দেহিনাম্॥

রস শরীরে শব্দ প্রবাহবৎ, অগ্নিশিখা প্রবাহবৎ ও জলপ্রবাহবৎ সঞ্চরণ করে।

বলা বাহুল্য, অম্ল মধুরাদি ছয়রসও পঞ্চভূতাত্মক, তবে রসকে আপ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই—চন্দ্রের সোমগুণব্যতীত কখনও অপ্ বা জল উৎপন্ন হইতে পারে না, বায়ু সোমগুণকে আশ্রয় করিলেই জলে পরিণত হয় এবং জল ব্যতীত কখনও অম্ল মধুরাদি রসের বিকাশ হয় না, রসনা রস-বোধের যন্ত্র, রসনার সোমগুণে রসের আস্বাদ জানা যায়। তজ্জন্য রস আপ্য নামে অভিহিত হওয়াই সঙ্গত। সুশ্রুতে দেখিতে পাই—

আকাশপবনদহনতোয় ভূমিষু যথাসঙ্খ্যমেকোত্তরপরি-
বৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ; তস্মাদাপ্যোরসঃ পরস্পর-
সংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চে সর্ব্বেষু
সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যৎকর্ষাপকর্ষাত্তু গ্রহণম্। স খল্বাপ্যো
রসঃ শেষভূত সংসর্গাদ্বিদগ্ধঃ ষোঢ়া বিভজ্যতে। তদ্ যথা
মধুরোঽম্ললবণঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায় ইতি।

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি ইহাদের গুণ যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, কিন্তু আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, তজ্জন্য বায়ু আকাশের শব্দগুণ প্রাপ্ত হয় বলিয়া বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। আকাশ ও বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয় বলিয়া তেজ আকাশ এবং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ গুণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তেজের গুণ তিনটি, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। আকাশ, বায়ু ও তেজ হইতে জলের উৎপত্তি হয় বলিয়া জল আকাশাদি পদার্থত্রয়ের শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণকে প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য জলের গুণ চারিটি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। তদ্রূপ আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় বলিয়া পৃথিবী আকাশাদি পদার্থ-চতুষ্টয়ের গুণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ গুণ বিশিষ্ট।

এই পঞ্চভূতের পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য ও সংযোগহেতু সকল ভূতের অংশ সকল ভূতেই বিদ্যমান, সুতরাং বস্তুতঃ সকল পদার্থ ই পঞ্চভূতাত্মক, তবে যে পদার্থে যে ভূতের উৎকর্ষতা অধিক, সেই পদার্থ পার্থিব, আপ্য ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তদ্রূপ রস পদার্থ আপ্য নামে অভিহিত, কারণ তাহাতে অপের অংশ অধিক। প্রশ্ন হইতে পারে, রসে যে জলীয়াংশ অধিক তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ দেহের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন চক্ষের জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডলের জ্যোতির সমধর্ম্মা বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলের জ্যোতির সাহায্যে চক্ষুর দ্বারা কেবল মাত্র রূপ দর্শন হয়, অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দর্শন হয় না, তদ্রূপ রসনা রসের সমধর্ম্মী বা সোমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া কেবল মাত্র রসনাই রসের আস্বাদনে সমর্থ, অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় রসাস্বাদনে সমর্থ নহে। অন্যান্য অঙ্গে সন্দেশ রসগোল্লা বা তেঁতুল গোলা মাখাইয়া দিলেও তাহার মধুরত্ব বা অম্লত্ব জানা যায় না। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে, বায়ুতে আকাশ, তেজে বায়ু ও জলে তেজ নিহিত থাকিলেও তাহার পরিমাণ বড় অল্প এবং বায়ুতে বায়ুর, তেজে তেজের ও জলে জলের বা তাহাদের গুণ যথাক্রমে

স্পর্শ, রূপ ও রসের পরিমাণ সমধিক, তজ্জন্য দেহের স্পর্শগুণাধিকত্বকে বায়ুর, চক্ষে সূর্য্য-তেজের ও রসনায় ছয়রসের ক্রিয়ার বিকাশ হয়। অতএব রস আপ্য বা অপ্ হইতে জাত, তজ্জন্য সমধর্ম্মী সোমগুণ বিশিষ্ট রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রসের বিকাশ হয়। যেমন প্রাণহীন বা মৃত, বাহিরের প্রাণবায়ু গ্রহণে অসমর্থ, কিন্তু জীবিত, প্রাণ বায়ু গ্রহণে সমর্থ, তদ্রূপ কেবল মাত্র রসনেন্দ্রিয় রস গ্রহণে সমর্থ, অন্য কোনও ইন্দ্রিয় রস-গ্রহণে সমর্থ নহে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, রস জলেরই গুণ এবং সমধর্ম্মী ও অপ্ তত্ত্ব হইতে রস এবং জল উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে।

সত্য-প্রভাব।

(ক্ষুদ্র গল্প)।

কবিরাজ,—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

সে অনেক দিনের কথা। প্রায় দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী তটে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কালীঘাটে এক পরম নিষ্ঠাবান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ ত্রি-সন্ধ্যা সন্ধ্যা—আহ্নিক করিতেন। অহো! কিবা তাঁহার অসাধারণ মন্ত্রোচ্চারণ শক্তি—কিবা তাঁহার স্তব স্তুতি ও বিশুদ্ধ শব্দোচ্চারণ প্রাণের অনন্ত আসক্তি! লোকের বিশ্বাস,—স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পতিত-পাবনী দেবী ভাগীরথী স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এরূপ ভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে করিতে ব্রাহ্মণের যৌবন অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ ক্ষীণ রেখাটিও বার্দ্ধক্যের করে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া চির বিদায় পরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে সেই পতিত-পাবনী মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদেবীর রাতুলচরণ দর্শন-সুখ ঘটিল না; এমন কি তাঁহার নিত্য পূজার ভক্তি প্রদত্ত ফুলটি—সাদরে উৎসর্গীকৃত উপাদেয় ফুলটি, গঙ্গাদেবী একদিনও ত গ্রহণ করিলেন না! ইহাতে ব্রাহ্মণের প্রাণে অণু-মাত্রও দুঃখ নাই। কারণ তিনি সর্ব্বদাই দেখিতেছেন যে, ভাগীরথীর তটে প্রত্যহ এমনি শত-সহস্র লোক সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছেন, পূজা করিতেছেন, কত মনোহর সুরভি কুসুম-রাশি কত উপাদেয় ফলের ডালি উৎসর্গ করিতেছেন, পতিত-পাবনী ভাগীরথী কাহাকেও ত দর্শন দেন না—কাহারও হস্ত হইতেও

একটি পদার্থও দেবী স্বয়ং আসিয়া হস্ত পাতিয়া গ্রহণ করেন না। তবে আর সেজন্য তাঁহার দুঃখ হইবে কেন? *

কিন্তু আজ সাত দিন যাবৎ ব্রাহ্মণ বড় বিমর্ষ। কে যেন সহসা তাঁহার সুখের ঘরে দুঃখের অনল জ্বালিয়া দিয়াছে, কে যেন, তাঁহার সমস্ত শান্তি টুকু—বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রি-সন্ধ্যা সন্ধ্যা-পূজা করিবার আন্তরিক গর্ব্ব টুকু সবলে সব কাড়িয়া লইয়াছে। লোক-সমাজে সু-সম্ভ্রান্ত সমাজ পূজ্য মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আজ দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় একজন অস্পৃশ্য অতি নীচ জাতীয় গো-মূর্খের প্রতি উৎসুক প্রাণে পলকহীন নয়নে চাহিয়া আছেন! তাঁহার প্রাণে কে যেন এক অজ্ঞাত অচেনা দেশের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমিয় মধুর স্বর্গীয় পদার্থ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনল জ্বালিয়া দিয়াছে! প্রাণের অনন্ত পিপাসার—তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষম তাড়নায় ব্রাহ্মণ আজ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

গঙ্গার অপর তটে সলিলসিক্ত কর্দ্দম লিপ্ত সৈকত ঘাটে এক নিরক্ষর চণ্ডাল প্রত্যাহিক সান্ধ্য-ক্রিয়া করিয়া থাকে। চণ্ডাল ঘোর মূর্খ; না হয় তাহার শ্রীমুখে বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ, না জানে সে সন্ধ্যা-পূজার রীতি-পদ্ধতির হুতাস আস্ফালন। চণ্ডাল তাহার আনীত পূজার ফুল-ফলগুলি হাতে লইয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে "ধর মা গঙ্গে! অধমের এ সামান্য ফুল ফল গ্রহণ কর মা!" বলিয়া উহা গঙ্গার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দেয়। তাহার মুখের কথাটি শেষ হইতে না হইতেই—তাহার ভক্তি প্রদত্ত পবিত্র অর্ঘ্যটি পূত-সলিলা গঙ্গাবক্ষে পতিত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই যেন সুবর্ণ কঙ্কন পরিশোভিত একখানি ছায়া হস্ত ভাগীরথীরজল ভেদ করতঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সেই চণ্ডাল দত্ত ভক্তি প্রদত্ত সামান্য উপকরণ গুলি সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মিলাইয়া যায়। মহা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ আজ সপ্তাহ কাল যাবৎ এরূপ একটা প্রহেলিকাময় পবিত্র দৃশ্য—এরূপ—একটা—অতিলৌকিক অপরূপ ঘটনা দর্শন করিয়া আসিতেছেন! ইহাই তাঁহার মানসিক অশান্তির একমাত্র নিদান।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত করিলেন, চণ্ডালগৃহে যাইয়া যেরূপেই হউক, তাহাকে বশীভূত করিয়া তাহার নিকট হইতে গঙ্গা সিদ্ধির এ গূঢ় মন্ত্র শিক্ষা করিতেই হইবে। সে চণ্ডাল, আমি ব্রাহ্মণ; ঘৃণিত চণ্ডাল পুত্র কখনই মাদৃশ মহামান্য পণ্ডিতের অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার সে গঙ্গা সিদ্ধির সফল মন্ত্র আমি অবশ্যই শিখিতে পারিব। সে মন্ত্র প্রভাবে আমার গঙ্গা দর্শন লাভ অবশ্যই হইবে। কেহ

জানিবে না—কেহ বুঝিবে না যে এ চণ্ডাল দত্ত মন্ত্র। লোকে বুঝিবে আমি মহা সাধক, মহা উপাসক—মহা পণ্ডিত। তখন আমার যশঃসৌরভে আসমুদ্র হিমালয়—কুমারিকা হইতে বিন্ধ্যগিরি পরিপূর্ণ হইবে; এ বিশ্ব আমার বিজয় গৌরবের মধুর গাঁথা গাহিবে—পতিত-পাবনী ভাগীরথীর নিত্য দর্শনে আমি ধন্য হইব—আমার মানব জন্ম সার্থক হইবে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আজ সন্ধ্যা পূজার মন্ত্র সব ভুলিয়া অনিমিষ নয়নে সেই চণ্ডালের পানে চাহিয়া আছেন। চণ্ডাল আজও তেমনি গঙ্গাতীরে আসিয়াছে, মুহূর্ত্তে সে তাহার আড়ম্বরহীন দৈনিক পূজা সম্পন্ন করিয়া গৃহে চলিল, আজও গঙ্গাদেবী তেমনি তাঁহার কঙ্কন শোভিত দিব্য হস্ত উত্তোলন করিয়া ভক্ত দত্ত সাদর উৎসর্গীকৃত সামান্য উপহার অমূল্য উপাদেয় পদার্থ জ্ঞানে সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও এ দৃশ্য দেখিয়া তেমনি মুগ্ধ হইলেন। তারঁপর তিনি পূজার জন্য আনীত পুষ্পরাশি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া এক ক্ষুদ্র নৌকায় নদী পার হইয়া চণ্ডালের অনুসরণ করিলেন। মহামানী অধ্যাপক অধম চণ্ডাল গৃহে উপনীত হইলেন। চণ্ডাল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সাদরে বসিতে আসন প্রদান করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল, "এ অধমের গৃহে প্রভুর পদার্পণ কি মনে করিয়া?"

ব্রাহ্মণ।—তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমার নিকট যে জন্য আসিয়াছি, আমার সে বাসনা পূর্ণ করিবে; আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কিছু মাত্র গোপন না করিয়া অকপটে তাহার প্রকৃত উত্তর দিবে? আর প্রতিজ্ঞা না কর—আমার কথা না রাখ, এই প্রস্তরে মাথা খুঁড়িয়া আমি আত্ম-হত্যা করিব; তোমার দ্বারে ব্রহ্ম-হত্যা হইবে। সে মহাপাতকে তুমি রসাতলে যাইবে।

চণ্ডাল।—তা প্রভু, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কিছু মাত্র গোপন না করিয়া অকপটে তাহার উত্তর দিব; সে জন্য আপনাকে অত উতলা হইতে—এত কঠোর কার্য্য করিতে হইবে না; চণ্ডাল জাতীয় হইলেও মিথ্যা প্রবঞ্চনা এ অধমের অভ্যাস নহে।

ব্রাহ্মণ।—তাহা হইলে তুমি যে গুপ্তমন্ত্র প্রভাবে প্রত্যহ গঙ্গাদেবীর দর্শনলাভ কর, আমার নিকট সে গুপ্ত মন্ত্র ব্যক্ত কর।

চণ্ডাল।—তা প্রভু, আমি ত মন্ত্র—তন্ত্র কিছু জানি না; তবে আমি এই মাত্র জানি, আমি জীবনে কখনও মিথ্যাকথন বা মিথ্যা আচরণ করি নাই, আমি "ধর মা গঙ্গা" বলিয়া মাকে যাহা প্রদান করি, সেই সত্য-ধর্ম্ম প্রভাবে মা তাহাই স্বহস্তে গ্রহণ করেন—ইহাই আমার গুপ্ত মন্ত্র।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি বল কি?—ইহাই তোমার গুপ্ত মন্ত্র? —এই গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করিতে তোমার মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ হইতেছে না? অনুনয় করি, আদেশ করি—অনুরোধ করি, এখনও সেই গুপ্ত মন্ত্রটি বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর—প্রতিজ্ঞা পালন কর; অন্যথা তোমার ভীষণ অমঙ্গল অদূরবর্ত্তী।

চণ্ডাল হাসিয়া বলিল,—তা প্রভু! আপনি বৃথা রাগ করিলে কি করিব?—উহাই আমার এক মাত্র গুপ্ত মন্ত্র।

ব্রাহ্মণ।—আঃ! তুমি বল কি? আমরা আজীবন তপঃ জপ করিয়া যাহা করিতে পারিলাম না, তুমি একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম প্রভাবে অনায়াসে তাহাতে সিদ্ধকাম হইলে?

চণ্ডাল।—হাঁ প্রভু! সত্যের এমনি গুণ—এমনি অনন্ত প্রভাব।

ব্রাহ্মণ।—তবে আমিও সত্যবাদী হইব। আমি এই গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া তোমার নিকট মহা শপথ করিতেছি, যদি সত্যের এমনি অনন্ত প্রভাব হয়, তবে আমি এখন হইতে আর একটি মিথ্যা কথাও বলিব না। কেমন,—আমি সত্য বলিলে, গঙ্গাদেবী তোমার ন্যায় আমার হস্ত হইতে স্বহস্তে পূজার পবিত্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন ত?—তাঁহার রাতুলচরণ দর্শন করিতে পাইব ত?

চণ্ডাল।—হাঁ প্রভু! অবশ্য পাইবেন। শুধু তা কেন, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই সফল হইবে—আপনি বাক্-সিদ্ধ হইবেন। তবে এক দিনে, এক মাসে বা এক বৎসরে নহে; ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসরের সাধনায় এ সিদ্ধি লাভ ঘটিবে।

ব্রাহ্মণ।—আমি যদি এই মৃণ্ময় কলসীটাকে স্বর্ণ কলসীতে পরিণত হইতে বলি, তাহাই হইবে?

চণ্ডাল।—হাঁ মহাশয়! তখন তাহাই হইবে; সত্যবাদীর একটি কথাও ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব।

ব্রাহ্মণ।—বুঝিও আমি বলিলেই উহা স্বর্ণ কলসিতে পরিণত হইবে? তবেই বুঝিব তুমি আমাকে প্রতারণা কর নাই; তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।

চণ্ডাল।—আমি ত বলিয়াছি, এখন নহে—দ্বাদশ বৎসর পরে আপনার সে শক্তি হইবে।

ব্রাহ্মণ।—তবে তুমি বলিলে হইবে?

চণ্ডাল।—অবশ্যই হইবে। তবে প্রার্থনা প্রভু দয়া করিয়া এ অধমকে এরূপ আদেশ করিবেন না; বৃথা শক্তি ক্ষয় বা বাহাদুরী প্রদর্শন বড় অন্যায়। ইহাতে সাধকের অন্তরে অহঙ্কারের উদয় হইয়া অধঃপতন হয়।

ব্রাহ্মণ সর্ব বুঝিলেন। এতদিনে তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি চণ্ডালকে মনে মনে গুরু জ্ঞানে নমস্কার করিয়া বিষাদ মন্থর গমনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বহু পুণ্য ফলে—উপযুক্ত চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় এত দিনে অন্ধ চক্ষু দান পাইল।

উক্ত ঘটনার পর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এ দীর্ঘ কাল মধ্যে কেহই আর সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে ভাগীরথীর তটে কালীঘাটে সন্ধ্যা-পূজা করিতে দেখে নাই। তিনি আজ দশ বর্ষ কাল নিরুদ্দেশ। আজ এক বৎসর হইল সেই সত্যবাদী চণ্ডাল সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছে; সে কালীগঙ্গার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সাধ্বী চণ্ডালপত্নী পতি-সহমৃতা হইয়াছে। তাহাদের অতি জীর্ণ পর্ণ কুটীর খানিও মহাধ্বংসের ক্রোড়ে আত্ম-সমর্পণ করিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। চণ্ডালের একমাত্র যুবক পুত্র তৎকালে সেই ধ্বংসোন্মুখ পর্ণ-কুটীরে মরিয়া পড়িয়া আছে। যুবতী বধূ সেই সদ্য-মৃত স্বামী-শব ক্রোড়ে করিয়া অশ্রু প্রবাহে বক্ষ ভাসাইতেছে। তাহার দুঃখে সম বেদনা প্রকাশ করিতে—দুঃখিনীর ভীষণ দুঃখে আহা! বলিতে সে গৃহে আর কেহ নাই।

আজ বড় দুর্য্যোগ; ঝড়-বৃষ্টির আর বিরাম নাই। এমন ঝড়-বাদলের দিনে সহজে বড় কেহ ঘরের বাহির হয় না। এই মহাদুর্য্যোগের দিনে কালী-ঘাটে এক মৌনী বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। তিনি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। মহাপুরুষ মাতৃ-মন্দির দ্বারে প্রণাম করিয়া প্রথমেই সেই চণ্ডাল-কুটীরে উপনীত হইলেন। চণ্ডাল-বধূর করুণ আর্ত্তনাদ-বিলাপে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ার পরলোক গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া ক্ষণকাল চণ্ডাল-পুত্রের শবের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর আজ মহাপরীক্ষা। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র চাহিয়া এক উচ্চ হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঠ বৎস, উঠ। বাক্‌সিদ্ধ মহা পুরুষের বাক্য সফল হইল।" যুবক নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। সন্ন্যাসী নীরবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহার দর্শন পাইল না।

ইনিই সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। এতদিনে তাঁহার কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। সত্য-প্রভাবে এতদিনে তিনি তাঁহার সাধনার ধনের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

ঊনবিংশ প্রকরণম্।

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দেশমাদায় হৃদয়োদরাৎ।
নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ কৃতো ময়া ॥ ১ ॥
ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকতা।
ক্ব দ্বৈতং ক্ব চ বাদ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ২ ॥
ক্ব ভূতং ক্ব ভবিষ্যদ্বা বর্ত্তমানমপি ক্ব চ।
ক্ব দেশঃ ক্ব চ বা নিত্যং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৩ ॥
ক্ব চাত্মা ক্ব চ বানাত্মা ক্ব শুভং কাশুভং তথা।
ক্ব চিন্তা ক্ব চ বাচিন্তা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৪ ॥
ক্ব স্বপ্নঃ ক্ব সুষুপ্তির্ব্বা ক্ব চ জাগরণং তথা।
ক্ব তুরীয়ং ভয়ং বাপি স্বমহিম্নিস্থিতস্য মে ॥ ৫ ॥
ক্ব দূরং ক্ব সমীপং বা বাহ্যং ক্বাভ্যন্তরং ক্ব বা।
ক্ব স্থূলং ক্ব চ বা সূক্ষ্মং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৬ ॥
ক্ব মৃত্যুর্জীবিতংবা ক্ব লোকাঃ কাপি ক্বলৌকিকম্।
ক্ব লয়ঃ ক্ব সমাধির্ব্বা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৭ ॥

আমি হৃদয় হইতে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিরূপ কণ্টকের উদ্ধার করিলাম।—যখন আপনা হইতে মনে জ্ঞানোদয় হইল, তখনই যুক্তি, তর্ক, মীমাংসাদির অবসান হইল। ১।

আমি আত্মমহিমায় অবস্থিত (অর্থাৎ আমার আত্মজ্ঞান উদিত হওয়ায়, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা মাত্র দেখিতেছি,) সুতরাং আমার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব কোথায়? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানই বা কি? দেশই বা কোথায় এবং নিত্যই বা কি? আত্মাই বা কি? অনাত্মাই বা কি? শুভাশুভই বা কি? চিন্তাই বা কি এবং অচিন্তাই বা কি? জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিই বা কি? তুরীয় অবস্থাই বা কি এবং ভয়ই বা কোথায়? দূরই বা কি? নৈকট্যই বা কি? বাহ্যই বা কি, আভ্যন্তরই বা কি? এবং স্থূল বা সূক্ষ্মই বা কি? জীবনই বা কি? মৃত্যুই বা কি? লোক এবং লৌকিকই বা কি? সমাধি অথবা লয়ই বা কি? আমি আত্মাতে বিশ্রামযুক্ত, সুতরাং

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্ত কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি ॥ ৮ ॥
ইত্যাত্মবিশ্রান্ত্যষ্টকমূনবিংশ প্রকরণম্।

বিংশ প্রকরণম্।

শিষ্যঃ।

ক্ব ভূতানি ক্ব দেহো বা ক্বেন্দ্রিয়ানি ক্ব বা মনঃ।
ক্ব শূন্যং ক্ব চ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে ॥ ১ ॥
ক্ব শাস্ত্রং ক্বাত্মবিজ্ঞানং ক্ব বা নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
ক্ব তৃপ্তিঃ ক্ব বিতৃষ্ণত্বং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা ॥ ২ ॥
ক্ব বিদ্যা ক্ব চ বাবিদ্যা ক্বাহং ক্বেদং মম ক্ব বা।
ক্ব বন্ধঃ ক্ব চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক্ব রূপিতা ॥ ৩ ॥
ক্ব প্রারব্ধানি কর্ম্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক্ব বা।
ক্ব তদ্বিদেহকৈবল্যং নির্ব্বিশেষস্য সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥

আমার ধর্ম্মার্থকাম-রূপ ত্রিবর্গ, অথবা যোগ কি ব্রহ্ম জ্ঞান, কোনও কথারই প্রয়োজন নাই। ২-৮।

আমি আত্মস্বরূপ নিরঞ্জন, আমার নিকট পঞ্চ ভূতাদি কোথা? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন্যাদিই বা কোথা? শূন্যই বা কি? এবং নৈরাশ্যই বা কিসের? ১।

আমি সর্ব্বদা দ্বন্দ্বাতীত, আমার নিকট শাস্ত্র, বিজ্ঞান, তৃপ্তি, বিতৃষ্ণা অথবা বিষয়শূন্য মন কোথায়? ২।

বিদ্যা, অবিদ্যা, অহং, ইদং অথবা আমারই বা কি? বন্ধন, মোক্ষই বা কি? এবং রূপই বা কি? ৩।

প্রারব্ধ কর্ম্মই বা কি? জীবন্মুক্তিই বা কি? এবং বিদেহ-কৈবল্যই বা কি? আত্মা সর্ব্বদাই নির্ব্বিশেষ, অর্থাৎ ভেদরহিত। ৪।

ক্ব কর্ত্তা ক্ব চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়স্ফুরণং ক্ব বা।
ক্বাপরোক্ষং ফলং বা ক্ব নিঃস্বভাবস্য মে সদা ॥ ৫ ॥
ক্ব লোকঃ ক্ব মুমুক্ষুর্ব্বা ক্ব যোগী জ্ঞানবান্ ক্ব বা।
ক্ব বন্ধঃ ক্ব চ বা মুক্তঃ স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥ ৬ ॥
ক্ব সৃষ্টিঃ ক্ব চ সংহারঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্।
ক্ব সাধকঃ ক্ব সিদ্ধির্ব্বা স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥ ৭ ॥
ক্ব প্রমাতা প্রমাণং বা ক্ব প্রমেয়ং ক্ব বা প্রমা।
ক্ব কিঞ্চিৎ ক্ব নকিঞ্চিদ্বা সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥ ৮ ॥
ক্ব বিক্ষেপঃ ক্ব চৈকাগ্র্যং ক্ব নিরোধঃ ক্ব মূঢ়তা।
ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদো বা সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়স্য মে ॥ ৯ ॥
ক্ব চৈব ব্যবহারো বা ক্ব চ সা পরমার্থতা।
ক্ব সুখং ক্ব চ বা দুঃখং নির্ব্বিশেষস্য মে সদা ॥ ১০ ॥
ক্ব মায়া ক্ব চ সংসারঃ ক্ব প্রীতির্ব্বিরতি ক্ব বা।
ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥ ১১ ॥

আমি সর্ব্বদাই প্রকৃতি হইতে পৃথক, সুতরাং আমার নিকট কর্ত্তা, ভোক্তা, ক্রিয়াশূন্য বিকাশ স্বরূপ, অথবা অপরোক্ষ ফল এসকল কোথা? ৫।

অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপ আমার নিকট লোক, মুমুক্ষু, জ্ঞানবান্, বন্ধন বা মোচন কি? ৬।

সৃষ্টি, সংহার, সাধ্য, সাধন, সাধক, এবং সিদ্ধি, এসকলই বা কোথায়? ৭।

আত্মা সতত বিশুদ্ধ, সুতরাং তাহাতে আবার প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমা, বিষয় ও অবিষয় এসকল কিছুই কোথা? ৮।

আমি ক্রিয়াবিহীন, সুতরাং আমার চিত্তবিক্ষেপ, একাগ্রতা, নিরোধ, মূঢ়তা, হর্ষ, বিষাদই বা কোথা? ৯।

নিয়ত ভেদজ্ঞানবিরহিত আত্মার ব্যবহার, পরমার্থতা, সুখ বা দুঃখ কোথা? ১০।

আমি নির্ম্মল, আমার নিকট মায়া সংসার, প্রীতি, বিরতি, জীব অথবা সেই ব্রহ্মই বা কোথা? ১১।

ক্ব প্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্বা ক্ব মুক্তিঃ ক্ব চ বন্ধনম্।
কূটস্থনির্ব্বিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥
ক্বোপদেশঃ ক্ব বা শাস্ত্রং ক্ব শিষ্যঃ ক্ব চ বা গুরুঃ।
ক্ব চাস্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য মে ॥ ১৩ ॥
ক্ব চাস্তি ক্ব চ বা নাস্তি ক্বাস্তি চৈকং ক্ব বা দ্বয়ম্।
বহুনাত্র কিমুক্তেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্ঠতে মম ॥ ১৪ ॥

ইতি জীবন্মুক্তচতুর্দ্দশকং বিংশপ্রকরণম্।

একবিংশ প্রকরণম্।

দশ ষট্ চোপদেশে স্যুঃ শ্লোকাশ্চ পঞ্চবিংশতি।
সত্যাত্মানুভবোল্লাসে উপদেশাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১ ॥
ষড়ুল্লাসে লয়ে চৈব উপদেশে চতুশ্চতুঃ।
পঞ্চকং স্যাদনুভবে বন্ধমোক্ষে চতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥
নির্ব্বেদোপশমোজ্ঞান মেবমেবাষ্টকং ভবেৎ।
যথাসুখ সপ্তকঞ্চ শান্তৌস্যাদ্বেদ সংস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা কূটবৎ স্থির, অনবচ্ছিন্ন, ও সুস্থ আত্মার আবার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, মুক্তি ও বন্ধন কিসের? ১২।

উপাধিশূন্য মঙ্গলস্বরূপ আত্মার পক্ষে উপদেশ, শাস্ত্র, গুরু, শিষ্য, অথবা পুরুষার্থ কি? ১৩।

অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈতাদিই বা কি? অধিক কি বলিব, আমার হৃদয়ে কোনও ভাবই উত্থিত হয় না। ১৪।

উপদেশ নামক প্রথম প্রকরণে ১৬টি শ্লোক, সত্যাত্মানুভবোল্লাস নামক দ্বিতীয় প্রকরণে ২৫ শ্লোক, ৩য় প্রকরণেও উপদেশ, তাহাতে ১৪টি, উল্লাস নামক ৪র্থ প্রকরণে ৬টি শ্লোক, লয় নামক পঞ্চম প্রকরণে ৪টি, ষষ্ঠ প্রকরণে উপদেশ, তাহাতে ৪টি, অনুভব নামক সপ্তম প্রকরণে ৫টি, বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থা

তত্ত্বোপদেশে বিংশৈকাদশ জ্ঞানোপদেশকে।
তত্ত্ব স্বরূপে বিংশ চ শমে চ শতকং ভবেৎ ॥ ৪ ॥
অষ্টকঞ্চাত্মবিশ্রান্তৌ জীবন্মুক্তৌ চতুর্দ্দশ।
ষট্ সংখ্যাক্রম বিজ্ঞানে গ্রন্থৈকাত্ম্যনতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥
বিংশত্যেকমিতৈঃ খণ্ডৈঃশ্লোকৈরাত্মাগ্নি মধ্যগৈঃ।
অবধূতানুভূতিশ্চ শ্লোকঃ সংখ্যাক্রমা অমী ॥ ৬ ॥

ইতি সংখ্যাক্রম কথনমেকবিংশ প্রকরণম্।

ইত্যষ্টাবক্র সংহিতা সম্পূর্ণা।

নামক ৮ম প্রকরণে ৪টি, নির্ব্বেদ নামক নবম প্রকরণে ৮টি, উপশম নামক দশম প্রকরণে ৮টি, জ্ঞান নামক একাদশ প্রকরণে ৮টি, এবমেব নামক দ্বাদশ প্রকরণে ৮টি, যথাসুখ নামক ত্রয়োদশ প্রকরণে ৭টি, শান্তি নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণে ৪টি, তত্ত্বোপদেশ নামক পঞ্চদশ প্রকরণে ২০টি, জ্ঞানোপদেশ নামক ষোড়শ প্রকরণে ১১টি, তত্ত্বস্বরূপ নামক সপ্তদশ প্রকরণে ২০টি, শান্তিশতক নামক অষ্টাদশ প্রকরণে ১০০টি, আত্মবিশ্রান্তি নামক উনবিংশ প্রকরণে ৮টি, জীবন্মুক্ত নামক বিংশ প্রকরণে ১৪টি, ও এই সংখ্যাক্রম-বিজ্ঞান নামক একবিংশ প্রকরণে ৬টি; সর্ব্বশুদ্ধ ২১টি প্রকরণে ৩০১টি (৩০০?) শ্লোক, তন্মধ্যে কতকগুলি অবধূত ও কতকগুলি,অনুভূতি স্বরূপে কথিত। অবধূতানুভূতি অর্থে কতকগুলি শ্লোক অবধূতের এবং কতকগুলি অনুভূতি অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানের।

অবধূত অর্থে—সন্ন্যাসী বিশেষ,—পরমহংস। যিনি সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়া, পরিণত বয়সে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ সংসার বিরাগী হন, তিনিই পরমহংস অবধূত। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা অথবা আত্মরক্ষণে অশক্ত শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে নরকস্থ হইতে হয়। নিজ কর্ত্তব্যের দায় হইতে সকলের নিকট মুক্ত হইতে হইবে। তাহার পর প্রকৃত অবধূতাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার মানসিক ভাব যেরূপ হইয়া থাকে, এবং তিনি যেরূপে অবস্থান করতঃ কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকেন, তাহা এই সংহিতার শেষ ভাগে, বিশেষতঃ শান্তিশতকে

বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে অবধূত অষ্টাবক্র মুনি। তিনি রাজর্ষি জনককে জ্ঞানোপদেশ দিলে, উক্ত রাজর্ষির যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল, অর্থাৎ যে ভাবে তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়, তাহারই বর্ণনা লইয়া এই সংহিতা লিখিত। জনক মুক্তিকাম, ভক্ত এবং শুশ্রূষু। উপযুক্ত পাত্রে উপদেশ বিতরিত হইয়া সফল হইল। অপাত্রে প্রদত্ত উপদেশ নিষ্ফল হয়। এই জন্য ভগবদ্গীতার শেষে বলিয়াছেন, যে এই জ্ঞান তপস্যা ও ভক্তি বিহীনকে এবং যাহার শুনিতে ইচ্ছা নাই, বা আমার প্রতি অসূয়া পরবশ, তাহাকে বলিবে না; কিন্তু শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া আমার ভক্তকে বলিবে।' যে শুশ্রূষু নহে, সে তোমার উপদেশ শুনিবেই বা কেন? যে পিপাসু নহে, সে জলপান করিতে চাহে না।

এখানে পাত্রের কথা বলা আবশ্যক। কেহ পূর্ব্ব জন্মাদির সাধন বশে, কেহ বা ভক্তির পরাকাষ্ঠা হেতু বা সাধনান্তর দ্বারা পাত্রত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানপিপাসু বা মুমুক্ষু, তিনি যে একেবারে অপাত্র তাহা কখনই নহে। তাঁহার প্রকৃতি যখন তাঁহাকে সেই পথে লওয়াইতেছে, তখন তাঁহার সুকৃতি অবশ্যই আছে। তিনি একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন করিলে অবশ্যই অচিরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যিনি ভক্ত ও জ্ঞানপিপাসু, তাঁহার গুরুর জন্য ভাবিতে হয় না। ভগবান্ তাঁহাকে তাহা যথা সময়ে আপ-নিই দেন। গুরু কি অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়? লোকে গুরু অন্বেষণ করিতে গিয়া প্রায়ই সকল দিক নষ্ট করে। যাহারা সত্ত্ব বুদ্ধিযুক্ত তাঁহারা যেমন তেমন উপদেশেই কৃতার্থ হন। (১৫ প্রং ১); যে কোনও লোক যে কোন সদুপদেশ দেন, তিনিই সেই বিষয়ের গুরু। সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি তাহাতেই অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ করেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধের চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়া যাও; ইহাই তোমার কার্য্য। সংসারে থাকিয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে ভীত বা পরাঙ্মুখ না হইয়া, হেয়োপাদেয়তা শূন্য হইবার চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। মহর্ষি জনক সংসারে থাকিয়া এই রূপেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরোক্ষ জ্ঞানের অভ্যাসে তাহা সংস্কারগত হইয়া ক্রমে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। তাহাই জীবন্মুক্তি।

অষ্টাবক্র সংহিতায় প্রথম, তৃতীয় পঞ্চম প্রভৃতি প্রকরণে, অষ্টাবক্রের উপ-দেশ দ্বারা যেরূপে জনকের জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, এবং (বিংশ প্রকরণে) যেরূপে সেই জ্ঞান চরমাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, এই সংহিতা তাহারই বিবৃতি মাত্র।

পাতকীর-পূজা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী।

ডাকি' লহ মোর—প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণ তলে,
সে যে ঘৃণ্য তুচ্ছ—চির লাঞ্ছিত—
আকুল নয়ন জলে।

মলিন বসনে, মলিন পরাণে,
মন্দির দ্বারে যাইব কেমনে,
তোমার মোহন-রূপ দরশনে
চরণ নাহিক চলে;
ডাকি লহ মোর প্রাণের দেবতা—
তোমার চরণ তলে।

শিশির সিক্ত কুসুম তুলিয়া—
সাজায়ে পূজার ডালা,
মালতীর ফুলে, তুলসীর দলে
যতনে গাঁথিয়া মালা,
কত নিশী জাগি' নীরবে—গোপনে,
গিয়েছিনু প্রভু, তব দরশনে;—
ভরসা-নিরাশা-আশা-অশ্রু ল'য়ে
তব মন্দির তলে।
সে যে ঘৃণ্য তুচ্ছ—চির লাঞ্ছিত—
আকুল নয়ন জলে।

সে পূজা আমার হয় নাই সারা
এসেছিনু ঘরে ফিরি'—
সে মালা আমার লাগে নাই কাজে
বাসি হয়ে ছিল পড়ি'!

শঙ্কিত হৃদি আপনি কি জাগে,
যদি তুমি নাথ—নাহি ডাক তাকে—
যদি নাহি ওগো কর সিঞ্চিত—
তোমার প্রেমের জলে।
ডাকি লহ মোর প্রাণের দেবতা—
তোমার চরণ তলে।

গীত।

লোফা।

কি করিলাম রে, আসিয়া ভব সংসারে, অমূল্যধন,
মানব জীবন, বৃথা কাজে হায় কাটাইলাম রে।
হায় আমার কি হইল, একুল ওকুল দুকুল গেল,
ভাবিতেছি ভবের কুলে না দেখি কাহারে।
কে লয়ে যায় কোথায়, বলেনা কেহ আমায়,
স্বপনের মতন রে, আবার মোহ ভাঙ্গিলে দেখি,
আঁধারে আছি, কোথায় যাব পথ দেখি না রে।
কি দুখে কাটাই জীবন, ভুলে হৃদয় রতন,
পাপানলে পুড়ে মরি, নয়নের জলে ভাসিরে ;
কেহ কাছে থাকেনা, কারেও আমি দেখি না,
একা বসে কাঁদিরে ; কারও কথা শুনবো না আর ;
সকলের সার হরিনাম, গাইব এবার প্রাণ ভরে।

বভ্রুবাহন।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

বাউল—খ্যামটা।

তোমার অন্ত পাওয়া ভার হরি!
কখন্ কিরূপ ধর, নটবর! কিছুই বুঝিতে নারি।
তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বভূপ! কংস-মধু-মুরারি,
আমি নিত্য সত্য তোমার তত্ত্ব বোধের শক্তি না ধরি।
তুমি বিশ্বব্যাপী হও, তথাপি এ পাপ চক্ষে না হেরি,
যাই ধরি ধরি, মনে করি, লুকাও হে বংশীধারী!
হ্যান লুকোচুরি ভৃত্যসনে সাজে কি প্রাণের হরি!
যখন্ কি বিপদে কি সম্পদে শ্রীপদে নির্ভর করি।
এই আমি ধর, বলে শ্রীধর! মাতাও তাই খুঁজে' মরি;
আবার হতাশ হলে, লীলাচ্ছলে টু দাও গোলোক-বিহারী!
ওহে দীনবন্ধু! কৃপাবিন্দু এ দীন হীনে বিতরি',
দাও চরণেন্দু, ভবসিন্ধু হ্যালায় পামর যায় তরি।
নাই সাধন ভজন, তাই অভাজন ঐ চরণের ভিখারী,
যাহা ভব পারের অভয় তরি, হে ভবার্ণব কাণ্ডারী!

(নান্দীর অন্তে)

সূত্রধার। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপুরঃসর সস্মিত মুখে) অদ্য দীন হীন অতীব যৎসামান্য মাদৃশ ক্ষুদ্র ন-গণ্য ব্যক্তির পক্ষে কি শুভ সুযোগ সমুপস্থিত! বহুকাল রঙ্গভূমিতে আমার গতিবিধি চলিতেছে; কিন্তু কদাপি অ্যাতগুলি কৃতবিদ্য ভদ্র সন্তানের একত্র সমাগম নয়ন গোচর হয় নাই। সবিশেষ সৌভাগ্যোদয় হওয়াতেই এরূপ সুবিধা ঘটিয়াছে। তা' আজি ন্যায়ভূষণোপাধিক শ্রীআলোকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত বভ্রুবাহন নাটকের অভিনয় ক্রিয়া দ্বারা সভ্য মহোদয়গণের আরাধনা করা যা'ক্। অতএব অবিলম্বে গৃহিণীকে আহ্বান করি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক) আর্য্যে! যদি নেপথ্যবিধান সাঙ্গ হইয়া

থাকে, তবে অ্যাকবার এদিকে আসুন। এই আমি কার্য্যানুরোধে মণিপুর-প্রদেশবাসী এবং মহারাজ বভ্রুবাহনের সমসাময়িক অর্থাৎ তুল্য-কালীন হইলাম।

(প্রবিষ্ট হইয়া)

নটী। আর্য্যপুত্র! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি। কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে অনুমতি করুন।

সূত্রধার। আর্য্যে! অদ্য বভ্রুবাহন নামক অভিনব নাটকের অভিনয় দ্বারা পুরোবর্ত্তী বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে হইবে। তা' ঈপ্সিত কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বিঘ্ন বিঘাতের নিমিত্ত শিষ্ট পরম্পরা চিরদিনই অভীষ্ট দেবতার পুণ্য নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন; আমিও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বোধ করিয়া নাট্যারম্ভের প্রাক্‌কালে আপনাকে ভগবদ্বিষয়ক একটী পবিত্র গান দ্বারা সভাসদ্‌বৃন্দের পরিতোষ বিধান করিতে অনুরোধ করি।

নটী। তথাস্তু। আপনকার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

(নৃত্য করিতে করিতে)

রাগিণী আলেয়া—তাল ঠুংরী।

শ্যামাধন সাধন কর সতত অনন্যমনে;
নিধনে যা' পায় অদর্শন কি কাজ সে সামান্য ধনে।
সোণারূপা হীরক মাণিক উপাসনা করে বণিক্;
ওসব বিত্তের স্থিতি ক্ষণিক, সুদুর্ল্লভ হয় প্রয়োজনে।
কি ছার বস্তু স্পর্শমণি, ধন বলে তা'কে না গণি;
সাধক-রতন তৃণমানি', ঘৃণা করেন হ্যান ধনে।
নিত্য সত্য ধন মা শ্যামা, না মেলে শ্যামার উপমা;
বাহ্যমূর্ত্তি হেরে' ভয়ে ছেড়না অভয় চরণে।
হরি বল হর বল, মার কাছে কা'র খাটে বল;
মার বলে অখিলের বল, মার তুলনা নাই ভুবনে।
শ্যামা মাই ক্ষীরোদ-মন্থনে বিষপায়ী পঞ্চাননে;
বাঁচা'লেন তাই সবাই আজি মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুকে ভণে।

সূত্রধার। আর্য্যে! সাধু সাধু। আর্য্যার গীতরাগ এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর উভয়ই তুল্যরূপ প্রশংসার যোগ্য। ফলতঃ একত্র মণিকাঞ্চনের যোগ

হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তা' যখন আর্য্যার মনোহর সঙ্গীত-শ্রবণে সৌভাগ্যক্রমে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আবর্জ্জিত হইয়াছে, তখন বিলম্বে কি প্রয়োজন? প্রকৃত নাট্যারম্ভের জন্য সত্বর আমাদের রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব আসুন আমরা গৃহে গমন করি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রস্তাবনা।

—•—

প্রথম অঙ্ক।

(মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধু দেশীয় বীরগণকে রণে পরাজিত করিয়া পুনরায় সেই কামচারী মেধ্য অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়মান যজ্ঞের অনুসরণকারী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর স্বেচ্ছাবিহারী ঐ তুরঙ্গম নানাস্থান বিচরণ পূর্ব্বক মণিপুর রাজ্যে সমুপস্থিত হইলে অর্জ্জুন তৎসঙ্গে তথায় গমন করিলেন। তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীত ভাবে পিতার সম্মুখীন হইলেন। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া সমাদর করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অতি রূক্ষস্বরে কহিলেন:—

(বৎস! সম্প্রতি ঈদৃশ বিনীত ভাব আশ্রয় করা তোমার কদাচ উচিত নহে। যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ-কামনায় তোমার অধিকার মধ্যে আসিয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রধর্ম্ম বিবর্জ্জিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; তোমাকে ধিক্। যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীত ভাব ধারণ করিয়াছ. তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। তোমাতে অণুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীজাতির ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি নিরস্ত্র হইয়া আসিতাম, তা'হলে এরূপ বিনম্র ভাব শোভা পাইত।)

বভ্রুবাহন ভাবিয়াছিলেন তিনি বিনীত ভাবে সম্মুখীন হওয়ায় অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক্, তাঁহার বিনম্র ভাব, সামান্য বেশ ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনে পিতা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হওয়ায় তিনি নিতান্ত হতাশ হইলেন। সম্প্রতি তিনি পিতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করি-

বেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিষম সন্দেহে দোলায়মান চিত্ত হইয়া ভূমি-শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্র হইয়া পরম পূজ্য পিতার দেহে কি প্রকারে বাণ পরিত্যাগ করিবেন এবং শস্ত্রাঘাতে যদ্যপি পিতার প্রাণ বিয়োগ হয়, তা' হ'লেই বা কি উপায় হইবে, ইদানীং ইহাই একমাত্র তাঁহার হৃদ্গত প্রধান ভাবনার বিষয়। তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পিতৃ প্রমুখাৎ তিরস্কার শ্রবণে ভগ্নহৃদয় বভ্রুবাহনকে অধোবদনে কর্ত্তব্যাবধারণে চিন্তাকুল পরিজ্ঞাত হইয়া তদীয় বিমাতা নাগরাজ দুহিতা উলুপী পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক সে স্থলে আসিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলুপী তোমাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিতে আসিয়াছি। তুমি পিতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; ইহাতে তোমার ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, ত্বদীয় পিতাও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।)

উলুপীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া বভ্রুবাহন যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীর সম্পন্ন স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত, দ্রুতগামী অশ্ব চতুষ্টয় যুক্ত, হিরণ্ময় সিংহধ্বজ পরিশোভিত বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্ব শিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল। তখন পিতা পুত্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কখনও অর্জ্জুন কখনও বা বভ্রুবাহন জয় লাভ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বভ্রুবাহনের অ্যাক সুপুঙ্খ নিশিত বাণে হৃদয়ে সন্তাড়িত হইয়া তাল তরুর ন্যায় মহাবীর পার্থ ভূতলে নিপতিত হইলেন। পিতাকে নিহত দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গণে নিপতিত হইলে বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সমর ভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইলেন।

(কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ হইলে সম্মুখে নাগরাজ নন্দিনী উলুপীকে দর্শন করিবামাত্র)

চিত্রাঙ্গদা। (উলুপি! ঐ স্থাখ, সমর বিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্তৃক নিহত হইয়া সমর শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এইতো তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আমি তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকটে অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনীত বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজি উহাঁর জীবন প্রদান কর। হায়! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়া তুমি কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইতেছ না? এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তুমি ত্রিলোক মধ্যে ধার্ম্মিকা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ? সমর নিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্র দ্বারা যাহাকে আজি শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই জন্য খেদ করিতেছি। ভগিনি! প্রিয় পতিকে বাচাও।)

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন; আর্য্যপুত্র। তুমি কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়পাত্র। এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। এ সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ধরা শয্যায় শয়ান থাকা তোমার মত বীরের কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে তো মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত শত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?

তৎপরে পুনরায় উলুপীকে কহিলেন, ভদ্রে! বহুসংখ্যক রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি পতির প্রতি অনাদর করিওনা। বহু দার পরিগ্রহ করা পুরুষদিগের পক্ষে দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয় কার্য্যের সংঘটন কর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজি যদি পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। শোক বিহ্বলা চিত্রা-

স্বদা ইহা বলিয়া স্বামীর চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনমতি হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

ইত্যবসরে বভ্রুবাহন লব্ধসংজ্ঞ হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সমর ভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

(হায়! আজি আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমর বিজয়ী পিতার প্রাণ সংহার করিয়া কি ভীষণ দুষ্কর্ম্মই করিলাম! পুত্র হইয়া যে স্বহস্তে পিতার বিনাশ সাধন করে তাহার জীবনে ধিক্! হে বিপ্রগণ! আপনারা দয়া করিয়া এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মাকে কি ঘোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন। হে নাগনন্দিনি উলুপি! আমি পিতৃহন্তা হইয়া জগতে মুখ প্রদর্শন করিব না; অতএব তুমি পতির সহিত পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব কর।)

এই কথা বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া পুনরায় কহিলেন:—(হে চরাচর নিবাসী ভূতগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, এই আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনর্জীবিত না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজি এই সমর ভূমিতে স্বীয় কলেবর শোষণ করিব।)

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই বলিয়া আচমন পূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজ কন্যা উলুপী নাগলোকস্থিত সঞ্জীবন মণি ধ্যান করিলেন। উলুপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণ পূর্ব্বক বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

(বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উহাঁর নিকট পরাভূত হন। তোমার পিতার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়া ছিলেন; এই নিমিত্ত আমি

তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়া ছিলাম। বৎস! তুমি এ বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় পার্থ ও পুরাতন ঋষি। কা'র সাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে উহাঁকে পরাস্ত করে? আমি এই দিব্য মণি আনিয়াছি। তুমি ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলে উনি পুনরুজ্জীবিত হইবেন।)

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিত-পরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে সেই দিব্য মণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবা-মাত্র মহাবীর অর্জ্জন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন রণক্ষেত্রে পিতাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মেঘ-গম্ভীর-নিস্বন দুন্দুভি সকল সন্তাড়িত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং মহোচ্চ সাধুবাদ শব্দে নিখিল গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

মহাবাহু ধনঞ্জয় গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্র পথে নিপতিত হইলে তিনি বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি সমর ভুমিস্থ সমুদায় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি ক্যান? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্র-নন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন? আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এস্থলে আসিবার প্রয়োজন কি? মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীত-ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আপনি এই বৃত্তান্ত জননী উলূপীকে জিজ্ঞাসা করুন।

বীরাগ্রণী পার্থ তখন নাগকন্যা উলূপীকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! তুমি বা চিত্রাঙ্গদা এখানে আসিয়াছ ক্যান? আমি বা বভ্রুবাহন তো অজ্ঞান বশতঃ তোমাদের কোনও প্রকার অপ্রিয়

কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা তো তোমার নিকট অপরাধিনী নহেন?

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া—

উলুপী।—(সহাস্য মুখে) নাথ! আপনি আমার কোনও অপরাধেই অপরাধী নহেন, এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উহাঁর জননী প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোনও অপরাধ করেন নাই। চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বভ্রুবাহন আপনকার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনকার হিত সাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারত-যুদ্ধে শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিয়া উপরত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে নিরয়গামী হইতে হইত। এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে সে পাপের মোচন হইল। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনকার পাপ শান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদায় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও গঙ্গাজস্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিরত হইলে সব্যসাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া অধর্ম্ম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক,তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন আজি আমরা উহাকে শাপ প্রদান করি। বসুগণ এই কথা কহিলে ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে অভিসম্পাত করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে পিতৃ-ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার নিকটে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসুদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক বারংবার আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পিতাকে

বভ্রুবাহন উহাঁকে রণস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই উহাঁর শাপ হইতে মুক্তি লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এই কথায় প্রীত হইয়া পিতা স্বীয় ভবনে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয় এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ ঘটে নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে মুক্ত না হইলে অসংশয় আপনাকে নরক ভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মস্বরূপ এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

(নাগরাজনন্দিনী উলুপী এই কথা কহিলে অতীব প্রীত হইয়া)

ধনঞ্জয়। প্রিয়ে! তুমি ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মহোপকার করিয়াছ। অনন্তর বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপীকে লইয়া অমাত্য-গণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও। এই আমি তোমাদিগকে মৌখিক নিমন্ত্রণ করিলাম। মদীয় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইও। তোমরা সকলে উপস্থিত না হইলে সাতিশয় দুঃখিত হইব। দেখিও য্যান অন্যথা না হয়।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণ লোচনে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ;—

পিতঃ! আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনকার এই মণি-পুরের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া অদ্যকার রজনী অতিবাহিত করেন এই

আমার আন্তরিক ইচ্ছা। কল্য প্রভাতে আবার যজ্ঞীয় তুরঙ্গমের অনুসরণ করিবেন।

বভ্রুবাহনের কথা শুনিয়া মহাবীর অর্জ্জুন সহাস্য মুখে তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন ;—

বৎস ! আমাকে যেরূপে নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব স্বেচ্ছানুসারে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে। এ যেখানে গমন করিবে, আমাকেও সেই স্থলেই ইহার অনুগমন করিতে হইবে ; সুতরাং আজি আমি কোনও ক্রমেই তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক ; আমি চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা বলিয়া তৎকর্ত্তৃক অভ্যর্চিত হইয়া প্রিয়তমা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে শুভদিন দেখিয়া মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত মহাসমারোহ সহকারে হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়াতত্রত্য বৃদ্ধ কৌরব ও অন্যান্য ভূপতি বৃন্দকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরব কামিনীগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং সুভদ্রা ও যদুবীরগণের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতি সাধনার্থ তাঁহা-দিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী এই রূপে শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে পরম সুখে তথায় অবস্থান করিতে লাগি-লেন।

অবশেষে মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ সস্নেহে প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় অতি বিনম্র ভাবে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে হেম খচিত দিব্যাশ্ব সংহিত অ্যাকখানি উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

যবনিকা পতন।

উপসংহার।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কৃপা কর কাতরে ;
না হেরি কিনারা হরি! ভবসাগরে।
কি ভীষণ মুর্ত্তি ধরি', বিরাজে শমন পুরী,
মানস-নয়নে হেরে প্রাণ শিহরে।
কৃতান্ত ধরিয়া পাশে, ফিরিতেছে আশে পাশে,
তাই সভয়ে সময় হরি জীয়ন্তে মরে'।
চৌদিকে পাতকী কাঁদে ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদে,
পাষাণের অশ্রুঝরে, বজ্র বিদরে।
যবে হে পশিনু ভবে, কে জানিত এরূপ হবে,
কভু শান্তি না মিলিবে, পাপ অন্তরে।
এ সংসার-কারাগার, নাথ হে অতি অসার,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরে।
হ্যালায় হারা'নু কাল, না ভাবিনু পরকাল,
বিনা আয়োজনে পারে যা'ব কি করে'।
দীন হীন পাতকী আমি, জান তুমি অন্তর্য্যামী,

একিস্বরে হতাশ্বাস, কর'না হে শ্রীনিবাস!
প্রাণনাথ! এ প্রাণ দিয়ে নিওনা হরে' ॥

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

ধুলাখেলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

(১)

কমলা সারাদিন পুতুল লইয়া খেলা করিত। পাড়ার ছেলে মেয়ে সকলেই খেলায় যোগদান করিত। ছেলে বেলার দিনগুলি সকলের যেমন যায়,—তাহারও তেমনি যাইতে লাগিল।

হাসি, কান্না, হর্ষ বিষাদ শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষের সহচর। ছেলে বেলাটা যে শুধুই আনন্দে কাটিয়া যায় তাহা নহে; তখনও বিষাদ ও কান্নার একটা পালা আছে। পুতুলটি হারাইয়া গেলে ছেলে মেয়েরা কাঁদিতে থাকে; যেমনটি যায়, ঠিক তেমনটি না পাইলেও একটি পুতুল পাইলেই আবার হাসিতে তাহাদের মুখ ভরিয়া উঠে। আমরাও হারাণ জিনিষের জন্য কাঁদি; কিন্তু কাঁদিয়া পাইনা। তাহাদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই-মাত্র। খেলার ছলে শিশুরা অনেক সময়ে অকারণ কাঁদিয়া উঠে; আর কাহার প্রাণে না লাগিলেও মায়ের প্রাণে তখনই বাজিয়া উঠে। মায়ের প্রাণটা যে তখন সন্তানের অভাব মোচনের জন্যই নিযুক্ত থাকে, শিশু তাহার কিছুই বুঝে না। আর কেহ না আসিলেও মা তাহার চোখের জল মুছাইতে আসেন। সংসারের কাঁদিবার এত কারণ রহিয়াছে যে, অকারণ কাঁদিবার সুযোগ ত জোটেই না, আকুল প্রাণে কাঁদিলেও কেহ শুনেনা, কাহারও প্রাণে বাজে না; নিজের চোখের জল নিজেকেই মুছাইতে হয়। বিশেষত্ব এই-খানে; নতুবা হাসি কান্নার এক একটা পালা মানুষের জীবনে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এক ভাবে না এক ভাবে আছেই।

কমলা সকলকে লইয়াই খেলিত; কিন্তু সুকুমার না আসিলে যেন আসরটা জমিত না। সুকুমার বয়সে কিছু বড় সেই জন্য অনেক সময়ে কমলার খেলায়

যোগ না দিয়া তাহার সমবয়স্ক দিগের সহিত খেলিতে যাইতে বাধ্য হইত। যে দিন কমলা খেলিতে পারিত না, তাহার মুখে হাসি ফুটিত না। গভীর রজনীতে আকাশে মেঘ উঠিলে তদানীন্তন বিদ্যুল্লতা যেমন একবার কাঁদে, একবার হাসে, একবার লুকায়, একবার আসে, একবার পাঁচ সাতটি সাপ একত্র হইয়া খেলা করে, আবার জলদের গায়ে জড়ীভূত হইয়া যেমন সৌদামিনী সাজে দেখা দেয়, কমলার মুখখানিও সেইরূপ হর্ষ ও বিষাদে কখন বা সুন্দর রূপ কখন বা মলিন ভাব ধারণ করিত।

আজ কমলা, সুকুমার প্রভৃতি সকলেই খেলিতে আসিয়াছে। পুতুল খেলা ছাড়িয়া 'বউ বউ' খেলা আরম্ভ হইল। কমলা প্রতিদিনই সুকুমারের বউ সাজে। আজ মৃণালকান্তির বউ সাজিতে হইবে, সেই জন্য তাহার এত আপত্তি। খেলার ভিতরও 'সত্যি বউ' 'মিথ্যা বউ' আছে। এখানে 'সত্যি বউ' মানে বউ স্বামীর নাম করিতে পারিবে না, ঘোম্‌টা দিয়া লোকের অন্তরালে বসিয়া থাকিবে, ভাত রান্না করিবে অর্থাৎ তাহাদের সংসারে তাহারা স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ চোখে যেরূপ দেখে সেইরূপ। 'মিথ্যা বউ' মানে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিবে, একত্র বসিয়া খেলিতে পারিবে, মারামারি করিতে পারিবে অর্থাৎ কিছুতেই বাধা নাই—নামে মাত্র বউ। আজ কমলাকে মৃণালকান্তির বউ সাজিতে হইবে—সত্যি বউ। কমলা শিশু হইলেও এটুকু তাহাদের সংসারে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, একদিন যাহার বউ হয়, পুনরায় আর কাহারও বউ হওয়া যায় না। আজ 'সত্যি বউ' সাজিতে হইলে মৃণালকান্তির বউ সাজিতে পারে না—সুকুমারের বউই সাজিতে হয়, কেন না এতদিন তাহার বউ সাজিয়া আসিতেছে। কমলা আপত্তি করিল, সেই জন্য সুকুমারই স্বামী হইবে স্থির হইল। কমলা সুকুমারের বউ সাজিয়া খেলিয়া আসিল।

(২)

এখন সুকুমারের বয়স তের বৎসর, কমলার বয়স আট বৎসর। এখনও তাহারা মাঝে মাঝে খেলা করে; সুকুমার স্বামী হয়, কমলা বউ হয়।

একদিন খেলার সাথী জুটিল না—মাত্র সুকুমার ও কমলা খেলা স্থানে। অগত্যা তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। কমলা—বউ, সুকুমার স্বামী, আর কেহ সেখানে নাই। তাহাদের মধ্যে নূতন রকমের কথা হইতে লাগিল।

সুকুমার। আমি কার্ত্তিক বাগানে পড়্‌তে যাব। মামাবাড়ী থেকে সেখানকার স্কুলে পড়ব। তখন তুই কার বউ সাজ্‌বি?

কমলা। কাকাবাবু কলিকাতায় পড়েন! কাকীমা এখন কার বউ সাজেন?

সুকুমার। তোর কাকীমাকে যে তোর কাকাবাবু বিয়ে করেছেন—পুরুতে মন্ত্র পড়িয়েছে; কত লোক্‌জন নিয়ে গিয়েছিল। রতনদীয়া হইতে তোর কাকীমাকে বাড়ীতে এনে বউ পরিচয় করে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। তোকে'ত আমি মন্ত্র তন্ত্র পড়ে বিয়ে করি নাই, খেলানে বিয়ে করেছি মাত্র।

কমলা। না, তা হবে না। আমাকেও লোকজন নিয়ে, পুরুত ডেকে, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে বিয়ে করে, তোদের বাড়ী নিয়ে যেতে হবে; আমাকে সত্যি সত্যি বিয়ে কর্‌তে হবে। আমি আর কারও বউ সাজ্‌তে পার্‌ব না।

সুকুমার। আমি যখন কলিকাতা পড়তে যাব তখন তুই কার বউ হবি?

কমলা। কাকীমা যেমন আমাদের বাড়ীতে থাকেন, কাকাবাবু আস্‌লে খাওয়ায়ে ঘোম্‌টা টেনে বউটি সেজে ঘরে যান, আমিও সেইরূপ তুই যখন বাড়ী আস্‌বি তোর বউ সেজে ঘরে যাব। আমাকে সত্যি সত্যি বিয়ে কর্‌তে হবে বল্‌ কর্‌বি কি না? না করিস্‌ত বেড়েদের বাগান হতে তুই যে ফুল চুরি করেছিস, ঠাকুর ঘর থেকে যে, পুতুল এনে জলে ফেলে দিয়েছিস্‌ তা'বলে দেব।

সুকুমার। আচ্ছা, তোকে বিয়ে করে বাড়ী নিয়ে যাব, গোপন কথা বলে দিবি না ত?

কমলা। না, আর বল্‌ব না। কবে আমাকে নিয়ে যাবি বল্‌?

সুকুমার। কবে নিয়ে যাব তা বল্‌তে পারি না।

কমলা। আর কাকেও বিয়ে কর্‌বি না ত?

সুকুমার। না।

কমলা। নিয়ে যাবি ত ঠিক্‌? প্রতিজ্ঞা কর্‌লি?

সুকুমার। কর্‌লাম।

কমলা। তিন সত্যি করলি?

সুকুমার। কর্‌লাম।

(৩)

সুকুমার মামাবাড়ী পড়িতে গিয়াছে। কমলার খেলাও বন্ধ হইয়াছে। এখন আর মা বাপ: তাহাকে ধূলাখেলা করিতে দেন না। সংসারের কাজ

হয়, কিন্তু ধূলাখেলা হয় না। সুকুমারের সহিত দেখা হইলেই কমলা বলে, "তোদের বাড়ীতে আমাকে নিলি কই?" সুকুমার বলে, "কাজ কর্ম্ম শিখে নে তবে নেব।"

এই ভাবে দুবৎসর চলিয়া গেল। কমলাও মামাবাড়ী গিয়াছে, সুকুমারের সহিত আর দেখা হয় না। কমলার বিবাহের জন্য ছেলের অনুসন্ধান চলিতেছে, কমলা তাহার কিছুই জানে না।

* * * *

এখন কমলার বয়স প্রায় বার বৎসর। অনেক অনুসন্ধানের পর জামাই মিলিল—কমলপুরের জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নিশিকান্ত। নিশিকান্ত স্কুলে পড়ে। ছেলেটি দেখিতে খুবই ভাল,—পড়া শুনায় নিতান্ত মন্দ নহে।

কমলা শুনিল। তাহার বুকের ভিতর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিতে লাগিল।

কমলা সুকুমারকে বলিয়াছিল, সে আর কাহারও বউ হইতে পারিবে না। ইহা তাহার বেশ মনে ছিল।

ছেলে বেলায় খেলার সময়ে কে, কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা আমরা আদৌ মনে রাখি না—সেটা একটা মিথ্যা খেলা বলিয়াই মনে করি। কমলা কিন্তু সেরূপ মনে করে নাই—ছেলে বেলাটাকে বাস্তব জীবনেরই একটা অংশ মনে করিয়াছে। চারি বৎসর পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তাহার বেশ মনে আছে। এতদিন সে যাহার বউ সাজিয়া আসিয়াছে, সে তাহারই বউ সাজিবে স্থির করিল।

সুকুমার সে প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে—কিন্তু কমলাকে ভুলে নাই। তাহার ছেলে বেলার খেলার সাথী, যৌবনেও খেলার সাথী হয়, এটা তাহারও যে ইচ্ছা না ছিল তাহা নহে। সুকুমারের সহিত কমলার বিবাহের সম্বন্ধ হয় নাই, কিরূপে সুকুমার তাহাকে বিবাহ করে? বিশেষতঃ বিবাহ করিবার ভার সুকুমারের নিজের উপর নয়।

কমলা দেখিল, সুকুমারের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয় নাই। সঙ্গিনীদের নিকট কমলা সুকুমারকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কথাটা মা বাপের কাণে পৌছিল। কমলা আদুরে মেয়ে তাই সুকুমারের সহিত বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। সুকুমারও আনন্দে অধীর হইল।

সুকুমারের পিতা হারানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। সুকুমার একটু বিষণ্ণ হইল। কিন্তু মা বাপের কথার উপর কথা [illegible]

সেই জন্য হারানন্দ বাবু যাহা করিলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিল। বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সুকুমার ততটা আঘাত পাইল না—কমলা পাইল! কমলা আত্মহারা হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। প্রণয় ও ঘৃণা উভয় ব্যাপারেই স্ত্রীলোক সীমা ছাড়াইয়া যায়। যখন তাহারা কাহাকে ভালবাসে—বুকের রক্তদিয়া, প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রত্যাখ্যান কণ্ঠের ভূষণ করিয়া ভালবাসে; যখন ঘৃণা করে—কুকুরের ন্যায় ঘৃণা করে, ক্রুদ্ধ ফনিণীর ন্যায় গ্রীবা বাকাইয়া দংশন করিতে উদ্যত হয়।

কমলা বুঝিল, সুকুমার তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। নইলে অন্ততঃ প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়াও তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিত। সুকুমার চেষ্টা করিলে হয়তঃ বিবাহটা হইয়া যাইত।

পিতা সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা কমলার দুঃখটা বুঝিলেন। কিন্তু কি করিবেন? অগত্যা অন্য ছেলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নিশি-কান্তের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অন্য ছেলে পাইতেও বিলম্ব হইল না।

যাদব পুরের নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতচন্দ্রের সহিত কমলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল।

এখন কমলার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। তাহার জীবনে যৌবন, অনঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। তাহার এই রূপ রাশি লইয়াও তাহার সুখ নাই। তাহার বুকের ভিতর একটা আগুণ! মহাসমুদ্রের বুকে যেন অন্যের অদৃশ্যে একটা বাড়বাগ্নি দিন রাত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সে অগ্নি নিবাইবার নহে—দশাননের চিতার ন্যায় চিরকাল একই ভাবে জ্বলিবে।

কমলার দগ্ধ-জীবনের যন্ত্রণা মূলক ইতিহাস কেহ বুঝিবেনা, কাহাকে দেখাইবারও ইচ্ছা নাই। সকলকেই প্রাণ খুলিয়া দেখাইয়াছে, কেহই প্রাণের লেখা পড়িতে পারিল না। সে পরকালের জন্য আশায় বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে পারিত বটে, কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল? তাহাতেও সুখের সীমা ছিল না, যদি সেই নিরবচ্ছিন্ন মিলনের সময়ে বর্ত্তমানের ছুটাছুটির ও প্রতিজ্ঞার কথা মনে উঠিত! পরকালের জন্য অপেক্ষা করিবেই বা কিরূপে? কমলা যদি পুরুষ ছেলে হইত, তবে না হয়, পরকালের জন্যই অপেক্ষা করিত। সে যে, যুবতী কাহাকে বিবাহ না করিলে যে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

কমলার মানসিক অবস্থা বড়ই ভীষণ! কমলা গভীর নিশীথে তাহার সেই

স্মরণ সঞ্চালনে নিরাশ প্রাণ হাহাকার করিতে থাকে। উঠিয়া বসে, সংসারের সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে এক ছায়াময় রাজ্যে উপনীত হয়। অনায়ত্ত তন্দ্রা ধীরে ধীরে নয়ন প্রদেশে আবির্ভূত হয়। তখনও সমীরণে কি যেন এক নিরাশ-গীতি ভাসিয়া আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

মানব জীবনে সহানুভূতি এরূপই বটে—একটা কণ্ঠশোষক পিপাসামাত্র। পিপাসা লইয়া ছুটিবে শান্তি জল মিলিবে না। এ ত মন্দাকিনী ধারা নহে, এ আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম!

কমলা চিরদিনের মত সুকুমারকে ভুলিয়া যাইবে এরূপ সংকল্প করিল।

(৪)

সুকুমার শুনিল, ২৮ শে ফাল্গুন প্রভাত বাবুর সহিত কমলার বিবাহ হইবে। সুকুমার এখন জয়ন্তী নগর স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সেখানকার হেড্ মাষ্টার সুবোধবাবু—কমলার পিতা। সুকুমারকে তখনও সুবোধ বাবু খুব ভাল বাসেন। সুকুমারও ছেলে মন্দ নয়।

সুকুমার তাহার ছেলে বেলার সাথী কমলার বিবাহের জন্য "হৃদোয়াচ্ছ্বাস" শীর্ষক একটি প্রীতি উপহার রচনা করিয়া করিয়া ছাপাইয়া আনিল। কমলা তখন মামারবাড়ী হইতে তাহার বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সুকুমার "হৃদয়োচ্ছ্বাস"টি কমলার দাদা বিমল চন্দ্রের সহিত পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিল; সে নিজে উপস্থিত না থাকিতেও পারে। "হৃদয়োচ্ছ্বাসে"র ভিতর দিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছিল—কমলার বিবাহে সুকুমার কতটা আনান্দত, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

সুবোধ বাবু জয়ন্তী নগরে কমলার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিয়া ছিলেন। ২৭শে তারিখেও সমস্ত অলঙ্কার কর্ম্মকার দিতে পারিল না। ২৮ শে তারিখে সুকুমারের কাছে অলঙ্কার দিতে সুবোধ বাবু কর্ম্মকারকে বলিয়া বাড়ী গেলেন। বাড়ী জয়ন্তী নগর হইতে ৪ মাইল মাত্র।

সুকুমার বিবাহে যাইতে বাধ্য হইল। ২৮শে তারিখে সন্ধ্যার সময় বাকী অলঙ্কার গুলি পাইল। পাইবামাত্র সুবোধ বাবুর বাটীতে ছুটিল।

এদিকে বিমল বাবু "হৃদয়োচ্ছ্বাস" আনিয়া কমলাকে একখানা দেখাইল। আবার আগুণ জ্বলিল! কমলা অনেক কষ্টে সুকুমারকে ভুলিতে বসিয়াছিল!

নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, আজ আনন্দোচ্ছ্বাস পাঠাইয়া ঘৃণার পরাকাষ্ঠা দেখাইল!

গোধুলি লগ্নে কমলার বিবাহ। কিন্তু তখনও অলঙ্কারাদি লইয়া সুকুমার পৌঁছে নাই। সে জানিত রাত্রি দশটায় বিবাহ হইবে, সেই জন্য সে দেরী করিয়া আসিতেছে। তাহার ইচ্ছা কমলার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত দেখা করিবে না, ঠিক নয়টায় পৌঁছিয়া অলঙ্কারাদি সুবোধ বাবুর হাতে দিয়া বিবাহ সভায় যাইয়া বসিবে।

গোধূলি লগ্ন চলিয়া গেল। জামাই, বরকর্ত্তা, পুরোহিত, বরযাত্রগণ সকলই বিবাহ সভায় উপস্থিত। সুবোধ বাবু কেবল পথের দিকে তাকাইতেছেন। স্থির হইল, দশটায় বিবাহ হইবে।

পৌনে নয়টায় সুকুমার পৌঁছিল। অন্দর মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সবই প্রস্তুত, অলঙ্কার গুলি পরাইয়া মেয়ে লইলেই হয়।

কমলার ইচ্ছা হইল, বিবাহের পূর্ব্বে সুকুমারকে কয়েকটি কথা শুনায়।

কমলার মামা হরিদাস বাবু ও সুকুমার দক্ষিণ ঘরে বসিয়া অলঙ্কার মিলাইতেছে। সুবোধ বাবু আসিয়া সুকুমারকে বলিলেন, "অলঙ্কার গুলি নিয়ে তুমিই কমলাকে বেশকরে পরিয়ে দিয়ে এস। অন্ততঃ গহনা পরাইবার সময়ে তুমি কাছে থেকে দেখে শুনে দিয়ো যেন কেউ ঠাট্টা না করতে পারে। তারপর পীড়ির উপর ক'রে কমলাকে নিয়ে যেয়ো—তুমি আর হরিদাস।" সুবোধ বাবুর স্ত্রী দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের কারও সেখানে যেতে হবে না, কমলাই দক্ষিণ ঘরে যাচ্ছে, তোমাদের মনমত করে পরিয়ে দাও—আমরা ত কেউ গহনা পরিয়ে দিতে জানিনা।"

সুবোধ বাবুর বাড়ীতে তখনও সুকুমারের একাধিপত্য—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভালবাসে যেন বাড়ীর ছেলেপিলের সামিল।

সুবোধ বাবুর স্ত্রী কমলাকে দক্ষিণ ঘরে যাইতে বলিলেন। কমলা সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "মামাকে ওঘর হইতে যেতে বলুন—আমার লজ্জা করে।"

মামা হরিদাস বাবু দক্ষিণ ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। সুকুমার ভাবিল, "যা হোক্, আজ কমলাকে গহনা পরিয়ে দিতে দিতে একটু রহস্য করে নেব; ছেলে বেলায় তার সঙ্গে কত খেলেছি, আজ কার সঙ্গে খেল্‌তে যাচ্ছে শুনে নেব। তার সঙ্গে আর ত কথা কহিতেও পাব না।"

কমলা সাজিয়া গুজিয়া দক্ষিণ ঘরে গেল। সুকুমারের সঙ্গে কত মারামারি

করিয়াছে, আজ সাজিয়া বিবাহ আসরে যাইতেছে; সহসা একটা লজ্জার হাসি ফুটিল। সুকুমার বলিল, "কি রে কম্‌লি, হাস্‌ছিস্ যে বড়! আজ সেজে গুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" কমলা বলিল, "কেন তুমি কি জাননা পুরুত ডেকে, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছে?"

সুকুমার বলিল, এমন লোকের ছেলের সহিত তোমার বিয়ে হবে যে, গহনা পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে বোলে বিয়ের লগ্ন বোয়ে গেল তাও স্বীকার। তুমি ওমন লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে কোরনা আমার কথা শোন।

কমলা।—"বল্‌তে লজ্জা করুল না? তুমিই না প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমায় বিয়ে করবে—আর কাকেও বিয়ে কর্ব্বে না? আমার এখনকার অসম্বন্ধ অর্থহারা প্রলাপ শুনে তুমি হয়ত হাস্‌বে, ঐ হাস্‌ছ। হাস, হাস্‌তে থাক। কয়দিন হাস্‌বে? যেদিন বুঝ্‌বে কি করেছ, সে দিন কাঁদ্‌তে হবে। আমিও একদিন হেসেছি; সে দিন স্বর্গ আর ইহলোক অভিন্ন বোধ হ'ত এ প্রাণেও সে দিন স্বর্গের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস পূর্ণ মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হত। তখন তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে যদিও স্বর্গ ব'লে কিছু আছে বোধ হ'ত তথাপি সে স্বর্গ আমার স্বর্গ অপেক্ষা অতি তুচ্ছ বোধ হত। তখন রজতকৌমুদীস্নাত স্নিগ্ধ ধরণী বক্ষে সুখে ভ্রমণ করতাম কুসুম সৌরভে, মলয় পবন হিল্লোলে, কোকিল ঝঙ্কারে প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হ'ত। তারপর, তোমাকে ভাল বেসে প্রাণের ভিতর একটা আগুন লাগিয়েছি। তোমাকে এত ভালবাসি কেন বল্‌তে পারি না। তোমার দিকে চাহিলে স্মৃতির গভীর অন্ধকার গহ্বরে না জানি কি যেন হা হা করে উঠে, ধারণা করতে পারি না। তোমার বুকের ভিতর একটা আনন্দোচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে, বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি; আমার বুকের ভিতর আছে মাত্র ধু,—ধু,—ধূ! যদি হৃদয় থাকে, তবে আজ হ'তে একটু একটু অনুভব করবে। তুমি নীচ, তুমি পাষণ্ড, তোমাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিয়েই বা কি হবে? দাও, গহনা পরিয়ে দিয়ে এ জন্মের মত আমাকে ভুলিয়া যাও।"

ছেলে বেলায় খেলার সময়ে কি প্রতিজ্ঞা করা হয়, তা' কে মনে করে রেখে থাকে? দুদিন আগে কেন প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলে না কমলা?" এই বলিয়া সুকুমার বাহিরে গেল। সুকুমার কোথায় গেল, কেহ

কমলার বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিরাগমনাদি করিয়া প্রভাত বাবু কমলাকে লইয়া বাটীতে গেল।

(৫)

কিছুদিন পরে সুকুমার বাড়ী আসিল। এখন আর তাহার পড়া শুনায় মন লাগে না। আর এক খানা বুকের ভিতর সে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাপ নিজেও অনুভব করিতেছে।

সুকুমার আদুরে ছেলে। তাহার উদাসীন অবস্থা দেখিয়া মা বাপ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও বলেনা। কমলার বিবাহের দিনে দক্ষিণ ঘরে কমলা তাহাকে যে তিরস্কার বাক্য বলিয়াছিল, তাহা এখনও তাহার মনে উঠে; জীবনে আর কি তাহা ভুলিতে পারিবে? সেই দিন হইতে তাহার কবি-হৃদয়ে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল। সে ভাবিল, জীবনে আর বিবাহ করিবে না।

সুকুমারের বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। ভাল ভাল মেয়েও অনেক জুটিল। কিন্তু সুকুমার বিবাহ করিবে না। পিতা মাতা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে কমলার সহিত প্রভাত বাবুর ভালবাসা দৃঢ় হইয়াছে। সুবোধ বাবুর সহিত নীলকান্ত বাবুর মনান্তর ঘটিয়াছে—কমলাকে বাপের বাড়ী পাঠান হয় না। কমলা প্রভাত বাবুকে খুব আদর যত্ন করে, কিন্তু এত আদরের মধ্যে যে, একটা হতাশ ভাব রহিয়াছে, তাহা প্রভাত বাবু বুঝিতে পারিল। এমন গভীর প্রেমের ভিতরও প্রভাতবাবু বেশ বুঝিতে পারিত যে, কমলার প্রাণে কিসের যেন একটা অভাব লাগিয়া রহিয়াছে। প্রভাত বাবু যখনই কারণ জিজ্ঞাসা করে, কমলা বলিয়া উঠে. "কেন, আমি কি তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি না যে, কেবল ঐ একটা কথা? আমার হাসিতে আমার আলিঙ্গনে কি তোমার অবিশ্বাস হয়? তুমি আমাকে এত ভালবাস আমার আবার দুঃখ কিসের?" প্রভাত বাবু নীরব থাকে, কমলার উত্তরে সন্তুষ্ট হয় না।

সুকুমার প্রভাত বাবুর পরম বন্ধু। কমলার বিষয় জানাইতে প্রভাত বাবু সুকুমারদের বাড়ীতে গেল—সুবোধ বাবুদের বাড়ীতে নহে।

বৈকালে প্রভাত বাবু ও সুকুমার মাঠে বেড়াইতে গেল। প্রভাত বাবু সুকুমারের হাঠর উপর মাথা রাখিয়া, কোলের উপর দেহটাকে হেলাইয়া

প্রভাত বাবু বলিল, "দেখ ভাই, তোমাদের কমলাকে এত ভালবাসি তবুও যে তার মনে কি একটা আঘাত লেগে রয়েছে কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তোমার একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে, আমার কাছে মনের কথা গোপন করে কেন জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে।"

সুকুমারের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল—সামলাইতে পারিল না। সে বুঝিল কমলার অবস্থাও তাহারই মত—প্রতিকার নাই। প্রভাত বাবুর বুকের উপর তিন চারি ফোঁটা জল পড়িতে না পড়িতেই সুকুমার মুছিতে গেল, প্রভাত বাবু ধরিয়া ফেলিল। প্রভাত বাবু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন? ওজল এত গরমই বা কেন? জানিনা তোমার প্রাণে কতটা আঘাত দিলাম! তোমার কাছে কাঁদ্‌তে এসেছিলাম, তোমাকেই কাঁদাইলাম! কেন কাঁদ্‌লে বল?" সুকুমার উত্তর করিল, "কই, না। আমিত কাদ্‌ছিনা! আমার চোখ যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছে, অনেক সময়ে ওরূপ অকারণ জল পড়ে।" প্রভাত বলিল, "না, তোমার চোখের জলটা বড়ই গরম লাগ্‌ল। ওজলটা যেন বুক ফেটে বের হয়েছে। সুকুমার আমার কাছেও বল্‌তে দ্বিধা?" সুকুমার আসল কথা গোপন করিয়া বলিল, "তবে শোন। কমলা আমার ছেলে বেলার খেলার সাথী, যদিও আমি তার চেয়ে বড়। কমলাদের বাড়ীতে আমাকে কেহ অন্য বাড়ীর ছেলের মত দেখেন না। কমলার মত অমন হাসিখুসী মেয়ের মনে দুঃখ লেগেছে, তাই বড়ই বেদনা লাগ্‌ল—চোখের জল রাখ্‌তে পারলাম না।"

প্রভাত বাবু বলিল, "যা হোক্ তোমায় একবার যেতে হবে।" সুকুমার উত্তর করিল, "দেখাযাবে, তারসঙ্গে আবার আমার বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল; তাই তার কাছে যেতে এখন লজ্জা করে।"

সুকুমার ও প্রভাত বাড়ী ফিরিল। রাত্রিতে সুকুমারের পিতা প্রভাতকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "সুকুমারের জন্য তিনটি পাত্রী ঠিক কর্‌লাম, সে কিছুতেই বিয়ে কর্‌বে না। তুমি বুঝিয়ে তাকে মত করত?" প্রভাত বলিল, "আমিত এতদিন তা' শুনি নাই। আমি আজই তাকে বল্‌ব।"

প্রভাত সেখান হইতে সুকুমারের কাছে আসিল। সুকুমারের বিবাহ লইয়া প্রভাত বাবুও সুকুমারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সুকুমার দৃঢ় সংকল্প—"সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না, বিবাহে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা।"

সুকুমারকে প্রভাত বাবু তাহাদের বাড়ীতে লইতে চাহিল। সুকুমার তখন গেলনা। পরে যাইবে বলিয়া ছিল। প্রভাত বাবু বাড়ী গেল।

৬

কমলা শুনিল, সুকুমার বিবাহ করিবে না,—চার পাঁচটি সম্বন্ধ সে নিতান্তই হাকাইয়া দিয়াছে।

কমলা বুঝিল, একটু আনন্দিতও হইল। আমরা যাঁহাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি সে যদি আমাদিগকে পাইবার জন্য কাঁদে, তাহার চোখের জল দেখিয়া আমরা যতটা দুঃখিত হই, তাহা অপেক্ষা আনন্দের ভাগই যেন বেশী বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ কাঁদিতে দেখিলে প্রাণ যেন নাচিয়া উঠে,—ঐ চোখের জলের ভিতর দিয়া যেন একটা অবাধ অগাধ, অস্থির উচ্ছ্বাস রহিয়া যায়, নিরাশার মন্দিরে যেন একটা আশা শিশু উঁকি মারিয়া যায়। আমরা তাহাকে ভালবাসি না ভাবিয়া সে যে কাঁদে, ঐ কান্নাতেই আমরা একটু আনন্দ অনুভব করি, অন্য কোন কারণে কাঁদিলে আমরা দুঃখিত হই, সন্দেহ নাই। প্রেমের ব্যাপারে কান্নাটা অপর পক্ষের আনন্দের বিষয় হয়, এটা মানব জীবনে স্বাভাবিক। কমলাও আনন্দিত হইল। আবার ভাবিল, "আমার নিজের বুক ভেঙ্গেছে বলে তার বুকখানা কেন ভাঙ্গলাম? যখন অন্যের হ'তে যাচ্ছি তখন কেন তাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলাম? না, তাকে বিয়ে করতে অনুরেধে করব।" কমলা সুকুমারের নিকট লিখিল, "অনেক দিন পরে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। তোমার নিকট কি পাঠ দিব ঠিক করিতে পারিলাম না। তোমার শৈশবের সহচরী তোমার দ্বারে উপস্থিত, তার অনুরোধ ফেলিওনা, এইটুকু তোমার কাছে চাহিতেছি। আমার অনুরোধ তুমি বিবাহ করিয়া আন, আমি তাহাকে তোমার মনের মত করিয়া দিব—তাহাতেই আমার শান্তি হইবে। তাহা না হইলে এ জীবনটা একটা দুর্ব্বহ ভার হইবে। অনুরোধ রাখিও। ইতি তোমার ছোটবেলার—

খেলার সাথী।"

পত্র সুকুমারের নিকট পৌছিল। সুকুমার কমলার অনুরোধ রক্ষা করিবে

(৭)

আজ সুকুমার বিবাহ করিতে যাইতেছে। বরযাত্রগণ বাড়ীতে উপস্থিত, প্রভাত বাবুও আসিল। সুকুমার প্রভাত বাবুর নিকট কমলার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। সন্তোষজনক উত্তর পাইল না। সুকুমার চিন্তিত হইল।

বিবাহ করিতে যাইবার সময় সুকুমার কমলার নিকট সম্বোধন শূন্য একখানা চিঠি লিখিয়া ডাক বাক্সে ফেলিয়া গেল। সুকুমার বিবাহ করিতে গিয়াছে, কমলার হাতে চিঠি পৌঁছিল, কমলা পড়িল, "আজি তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে যাচ্ছি—বিয়ে কর্‌তে নয়। আমি বেশ জানি বিয়ে করে সুখী হ'তে পার্‌ব না। তোমার অনুরোধ রক্ষা করে তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌ব ইচ্ছা আছে। এখন আসি।"

(৮)

সুকুমার বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বউ মৃণালিনী রূপে ও গুণে দেশের সেরা বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিন্তু সুকুমারের তাহা ভাল লাগে না। সুকুমারের বুকের ভিতর যে আগুণ জ্বলিতেছে! কবি প্রাণ সুকুমার সৌন্দর্য্য পিপাসু ছিল, তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না কেন, কেহই বুঝিতে পারেনা। বুঝিল মাত্র কমলা।

মৃণালিনী রূপে গুণে সেবা যত্নে সুকুমারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। কোন কোন সময়ে মৃণালিনীকে সুকুমার খুব আদর করে, এত গভীর ভালবাসা জানায় যে, মৃণালিনী তাহা ধারণাও করিতে পারে না। পর মুহূর্ত্তেই আবার হয়ত ঘৃণা ও ঔদাসিন্য আসিয়া জোটে। মৃণালিনীর কাছে সুকুমার যেন একটা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুকুমারের প্রাণে শান্তি নাই—যাহার এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী তাহার বুকে একটা আগুণ জ্বলিতেছে! তাপটা মৃণালিনীরও বেশ একটু লাগিতেছে। বাহিরে সুকুমারও মৃণালিনী যেন আদর্শ স্বামী স্ত্রী। প্রভাত বাবু ও কমলার অবস্থা এইরূপ। কমলার বুকের ভিতর একটা আগুণ জ্বলিতেছে—প্রভাত বাবু তাপ অনুভব করিতেছে।

সুকুমার ও কমলা—একটি বালক ও একটি বালিকা শৈশবে মিলিয়া ধূলা খেলা করিত, তাহারই এই পরিণাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত ও মৃণালিনী—অপর দুইটি জীবন চিরকালের জন্য অশান্তি ভোগ করিতে চলিল। চারিটা জীবন নষ্ট হইল।

কমলার কোলে এখন পাঁচ বৎসরের একটি ছেলে। তাহার গত জীবনের কথা মনে করিয়া সে আর মেয়েছেলেদের সহিত তাহার ছেলেকে ধূলা খেলা করিতে দেয় না। পাড়ার পুরুষ ছেলেদের সহিত ধূলা খেলা করে।

সুকুমারের একটি মেয়ে হইয়াছে—আজ ছয় বৎসর। মেয়েটি পাড়ার মেয়েদের সহিতই খেলা করে, পুরুষ ছেলেদের সহিত সুকুমার কখন খেলা করিতে দেয় না।

সুকুমার ও মৃণালিনী, প্রভাত বাবু ও কমলা কাহারও প্রাণে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি জুটিল না।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক।—আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাতীর্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস; বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। ২৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী দ্বারা প্রকাশিত। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা ও ভক্তাধরামৃত এবং তৎসহ বৈষ্ণব জগতের বিজয় কেতন শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাপবিত্র গ্রন্থের সটীক সানুবাদ সহ অভাবনীয় সুলভ মূল্যে প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য পাঁচ টাকা। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা মাত্র।

প্রথমখণ্ড "শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক" বিশুদ্ধ সংস্করণ মূল, টীকা পদ্যানুবাদ ভাবার্থ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই "শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক" গ্রন্থের মহাত্ম্য বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই,—তবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার প্রথামত গ্রন্থের দুইটি মাত্র ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক গ্রন্থের মহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম :—

"প্রভুশিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিতার বাড়ে দিনে দিনে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যেরূপ শ্রীশ্রীমদ্ভগবতদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যাষ্টক পুস্তকখানি ভক্তিধর্ম্ম পিপাসু ভক্তমহাত্মাগণের নিকট—প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের নিকটে অমূল্য নিধিরূপে সমাদৃত হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা কবিরাজ–গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। } ১৩২২ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

দোষ ও গুণ

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি দ্বিবিধ, দোষময়ী ও গুণময়ী। দোষময়ী প্রকৃতি অমঙ্গলময়ী ও গুণময়ী প্রকৃতি মঙ্গলময়ী। গুণময়ী প্রকৃতির স্বভাব শরীরকে সুস্থ রাখা ও দোষময়ী প্রকৃতির স্বভাব শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করা। প্রকৃতি—পদার্থ। মূল পদার্থ অষ্টবিধ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই অষ্টবিধ পদার্থে দোষগুণ উভয়ই বিদ্যমান, পদার্থ তত্ত্বের আলোচনা করিলে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। অপিচ উদ্ভিদ, জড় ও জীব-জগৎ ঐ অষ্ট পদার্থ হইতেই জাত, অতএব মূল পদার্থের দোষগুণ উভয়ই উদ্ভিদ, জড় ও জীবে বিদ্যমান। তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার্য্য উদ্ভিদ ও জড়ের শোধন ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র ও পারদাদি পদার্থ শোধন না করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে

কখনও ব্যবহৃত হয় না। ঈর্ষা, দ্বেষ, লম্পটতা, চৌর্য্য, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, এই সকল মানুষের দোষ এবং সাধুতা, সত্যবাদিতা, স্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি মানুষের গুণ। প্রশ্ন এই—মানুষের এই দোষ গুণ কোথা হইতে আইসে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই—যে প্রকৃতির অভ্যন্তর হইতে জীব জগৎ জাত, সেই প্রকৃতি হইতেই জীব দোষ ও গুণ উভয়ই প্রাপ্ত হয়। অপিচ মানুষ যে সকল দ্রব্য সর্ব্বদা ঔষধার্থ সেবন করে, সেই সকল দ্রব্যের দোষ গুণও তাহার শরীরে অবস্থান করে এবং দোষের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তদ্দ্বারা শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। তজ্জন্য যেমন বালকদিগের চরিত্র কলুষিত হইলে চরিত্র দোষ সংশোধনের জন্য তাহাদিগকে চরিত্র-শোধনাগারে প্রেরণ করা হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদে ঔষধার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি এবং লৌহ, অভ্র ও পারদাদি পদার্থ শোধন করিয়া পরে তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা হয়, একারণ ব্যবস্থার দোষে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে উপকার না হইতে পারে, কিন্তু অপকারের সম্ভাবনা অত্যল্প। প্রাচীন ভারতে ঋষিরা যোগ-বলে দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়া যেমন অবগত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কোন্ দ্রব্যের কি দোষ, তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেন, তজ্জন্য সেই সকল দ্রব্যের দোষ-শোধন করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এই তত্ত্ব অবগত নহেন ও তজ্জন্য তাঁহারা কোনও দ্রব্য শোধন করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভব করেন না।

এদেশের কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন জাতির ঔষধান্ন-বিহার সকলই আমাদিগের অনুকরণীয়, কিন্তু এমন বিশ্বাস যে আমাদিগের উন্নতির পরিবর্ত্তে ধ্বংসেরই কারণ, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন কি? দেশ-ভেদে বা জলবায়ুভেদে যে আহার বিহার ও ঔষধেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে তত্ত্ব তাঁহারা কি অবগত নহেন? অবশ্য সৎভাব বা সাধুর ভাব ও সৎগুণ সাধুর গুণ, কাহারো অনুকরণ নিষিদ্ধ নহে, বরং তাহার অনুকরণই বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য, কিন্তু অসৎভাব ও অসৎগুণের অনুকরণ আমরা কেন করিব? কেহ কি কখনও দোষের অনুকরণ করে না দোষীকে স্থান দান করে? কেন করে না? যদি সে চোর হয়, চুরী করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। যদি সে বদ্‌মাইশ হয়, বদ্‌মাইশি করিয়া আশ্রয় দাতাকে চিরদিনের মত কলঙ্ক সাগরে নিক্ষেপ করিবে, তদ্ব্যতীত আরও ভয় আছে, তাহার সেই চুরি বিদ্যা ও বদ্‌মাইশি বালক বালিকা ও অন্যান্য পরিবার পরিজনের মধ্যে সংক্রামিত হইতে

পারে। কারণ, ভাব ঘনীভূত হইয়া গুণে গুণ ঘনীভূত হইয়া কার্য্যে পরিণত হয়। অতএব অন্যান্য জাতির আচার ব্যবহার তাঁহাদিগের আহার বিহারের অনুকরণ এদেশের লোকের প্রকৃতির উপযোগী নহে, অপিচ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কারণ ভিন্ন দেশীয় আহার বিহার গ্রহণ ও তাঁহাদের ঔষধ সেবনে দেশের লোকের প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। দেশের লোক দিন দিন কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। অতএব প্রকৃত সুখ শান্তি, যাঁহার কাম্য, তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করুন, তদ্ব্যতীত প্রকৃত সুখ শান্তি মিলিবে না।

এক্ষণে দুই চারিটি পদার্থের দোষ গুণ প্রদর্শন করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

স্বর্ণের গুণ এই—

সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকেচ স্বাদু পিচ্ছিলম্।
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্।
হৃদ্য মায়ুষ্করং কান্তিবাগ্ বিশুদ্ধি স্থিরত্বকৃৎ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ ত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ।

স্বর্ণ—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, গুরু, রসায়ন, মধুর, তিক্ত, কষায়রস, মধুর, বিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও শরীরের স্থিরতাকারক, অপিচ স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও যক্ষ্মা-নাশক।

অশোধিত স্বর্ণের দোষ—

বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকার্য্যেব সদা সুবর্ণ
মশুদ্ধ মেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

অসম্যঙ্মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্ যত্নতস্ততঃ॥

অশুদ্ধ ও অসম্যক্ মারিত স্বর্ণ বলবীর্য্য নাশক, বহু রোগের জনক এবং গ্লানি ও মৃত্যু জনক।

রৌপ্য।

রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ॥
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্॥

শোধিত রূপার গুণ। রূপা—শীতবীর্য্য, অম্ল কষায় মধুর রস, মধুর-বিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন গুণযুক্ত এবং বায়ু পিত্ত ও প্রমেহনাশক।

অশোধিত রূপার দোষ—

তারং শরীরস্য করোতি তাপং
বিধ্বংসনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্।
বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চপুষ্টিং
মহাগদান্ পোষয়তিহ্যশুদ্ধম্॥

অশোধিত রূপা—শরীরের ধ্বংসকর ও তাপজনক, অপিচ শুক্র, বল, বীর্য্য ও শরীরের পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনক এবং মহারোগোৎপাদক।

পারদ।

পারদঃ ষড্রসঃ স্নিগ্ধ স্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ।
যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদাদৃষ্টিবলপ্রদঃ।
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ॥

শুদ্ধ পারদের গুণ। শোধিত পারদ—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক, সদা দৃষ্টি ও বলপ্রদ, সকল রোগ-নাশক, বিশেষতঃ সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ নাশক।

অসাধ্যো যো ভবেদ্রোগো যস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্॥

যে সকল রোগ অসাধ্য, কোন চিকিৎসাতেই প্রশমিত হয় না, একমাত্র পারদ মানুষ, হস্তী ও অশ্ব সমূহের সেই সকল রোগ বিনাশ করে।

বহ্নির্বিষং মলঞ্চেতিমুখ্যা দোষাস্ত্রয়োরসে।
এতে কুর্ব্বন্তি সন্তাপং মৃতিং মূর্চ্ছাংনৃণাং ক্রমাৎ॥
অন্যেঽপি কথিতা দোষা ভিষগ্ ভিঃ পারদে যদি।
তথাপ্যেতে ত্রয়ো দোষা হরণীয়া বিশেষতঃ॥

পারদে বহ্নি, বিষ ও মল এই তিনটি দোষ বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান, ইহারা যথাক্রমে সন্তাপ, মৃত্যু ও মূর্চ্ছা জন্মায়। বৈদ্যগণ পারদের অন্যান্য দোষও

কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তিনটি দোষই বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক পারদকে শোধন করিবে।

সংস্কারহীনং খলু সূতরাজং যঃ সেবতে তস্য করোতি বাধাম্।
দেহস্য নাশং বিদধাতি নূনং কষ্টাংশ্চ রোগাঞ্জনয়েন্নরাণাম্॥

যে ব্যক্তি পারদের উক্ত দোষ শোধন না করিয়া উহা সেবন করে, তাহার অতি কষ্টকর ব্যাধি উৎপন্ন হয় বা শরীরের বিনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

গন্ধক।

গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডুবীসর্পজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহকফবাতান্ রসায়নঃ॥

গন্ধক—কটু তিক্ত কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কটু বিপাক, রসায়ন, এবং কণ্ডু, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক।

অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং
করোতি তাপং বিষমং শরীরে।
সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ
শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্॥

অপরিশুদ্ধ গন্ধক—কুষ্ঠ জনক, দেহের তাপ জনক, এবং সৌখ্য, রূপ, বল, ওজো ধাতু, শুক্র ও রক্ত নাশক।

মন্তব্য।

এস্থলে কেবল মাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পারদ ও গন্ধকের দোষ ও গুণ আলোচিত হইল। অন্যান্য ধাতু উপধাতু, রস ও উপরস এবং বৃক্ষ, লতা গুল্মাদি উদ্ভিদেও এইরূপ দোষ গুণ উভয়ই বিদ্যমান। মানুষেও যেমন দোষ গুণ বিদ্যমান, পদার্থেও তদ্রূপ দোষ গুণ উভয়ই বিদ্যমান, কারণ মানুষের অবয়ব বহির্জগতের ঐ সকল পদার্থেই গঠিত। অন্যথা ঐ সকল পদার্থ দ্বারা দেহের পুষ্টি হইতে পারে না। সমধর্ম্মী বা সজাতীয় পদার্থের সংযোগ দেহ পুষ্টির কারণ। বহির্জগতে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান, সেই সকল পদার্থের অণু পরমাণু ও শক্তি মানব-দেহে বিদ্যমান। তজ্জন্য সমধর্ম্মী বা সজাতীয়ের আকর্ষণে বহির্জগতের পদার্থ সমূহ আকৃষ্ট হয় ও সমধর্ম্মী বা সজাতীয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার শক্তি ও বল বৃদ্ধি করে এবং তাহার ফলে শরীরের পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন দেহের প্রাণ, বহিঃপ্রাণকে, দেহের তেজ, বহিস্তেজকে, আকর্ষণ ও

গ্রহণ করে, পদার্থও তদ্রূপ, অপিচ পদার্থ ও সেই ক্ষিত্যাদি অষ্টতত্ত্ব বহির্ভূত নহে। অতএব ক্ষিত্যাদি যেরূপে সজাতীয়ের দ্বারা আকৃষ্ট ও সজাতীয়ের সহিত সংযুক্ত বা মিলিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দেহের ক্ষিত্যাদিও তদ্রূপ বহির্জগতের ক্ষিত্যাদিকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বহির্জগৎ ও দেহ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ হইলে বহির্জগতের পরস্পর বিরোধী পদার্থের প্রভাবে দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পদার্থে যে দোষ অবস্থান করে, তাহা এখন পর্য্যন্তও অনেকে অবগত নহেন, কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা যোগবলে তাহা অবগত হইয়া দোষ-শোধনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতব পদার্থ যে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহা শরীরের পরম উপকারী পাশ্চাত্য জাতি তাহা অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ জানিতে পারিয়াছেন। তাই অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ স্বর্ণ গোল্ড-পাউডার রূপে এদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই সকল অশোধিত ঔষধ দোষ বিশিষ্ট কিনা ও তজ্জন্য উহা সেবনে দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। কুচিলা প্রভৃতি মারাত্মক বিষ শোধন না করিয়া ব্যবহার করিলে শরীরের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করে। গুণই অনুকরণীয়, দোষ অনুকরণীয় নহে, কারণ দোষই বিষে পরিণত হইয়া মারাত্মক বা জীবন নাশক হয়। ধুস্তুর বা গাঁজা সেবনে মানুষ পাগল হয়, ইহাই দোষাধিক গুণের ক্রিয়া, কিন্তু ঐ সকল পদার্থ শোধন করিয়া সেবন করিলে, গুণাধিক্যের জন্য বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। দোষ গুণেরই বিকার, গুণ প্রকৃতিজ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। গুণ কিরূপে দোষে পরিণত হইয়া প্রাণ নাশ করে ও জগৎটাকেই বা কেন প্রকৃতির বিকৃতি বলা হয়, তাহা পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। তমোগুণের ক্রিয়া অজ্ঞানতা, জীব কখনও সংজ্ঞাহীন না হইলে মৃত্যু-মুখে পতিত হয় না, অতএব তমোগুণাধিক্যে জীবের মৃত্যু এবং যে সকল পদার্থ তমোগুণাধিক, সেই সকল পদার্থই বিষ, অপিচ তমোগুণই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিষে পরিণত হয়। পদার্থ জগৎ হইতে জাত এবং জগৎ প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে জাত, অতএব সত্ত্ব, রজঃ ও তমের বিকৃতিই যে জগৎ ও পদার্থ-সৃষ্টির কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিকৃতি শব্দে বিকার, বিকার গুণেরই বৈষম্য বা ন্যূনাধিক অবস্থা, সুতরাং বিষ তমোগুণাধিক এবং সেই গুণাধিক্যই জীবের মৃত্যুর কারণ। পদার্থ শোধন করিলে, তাহার যে বর্দ্ধিত গুণ দোষে পরিণত হয়, তাহা হ্রাস হইয়া দোষ নষ্ট

হয়। উদাহরণ স্থলে এখানে পারদের বহ্নিগুণ উল্লেখযোগ্য। অশোধিত পারদ সেবন করিলে দেহের, সন্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে গাত্র-দাহ উপস্থিত হয়, এই যে দাহ ইহাই দোষের লক্ষণ। পারদ শোধন করিয়া সেবন করিলে তাহাতে দাহ প্রকাশ পায় না।

আমার বিধাতা পুরুষ।

লেখক,—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(গল্প)

রাঢ়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সামান্য বৃত্তি বিধানে অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহিত হইত। সংসারে তাঁহার পত্নী ও একটী মাত্র কন্যা। কন্যাটীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। একে নিঃস্ব, তাহাতে কুলিন ব্রাহ্মণ, কন্যাটীর বিবাহের জন্য বড় চিন্তান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী প্রিয়ভাষিণী হইলেও কন্যার জন্য পতিকে দুই কথা বলিতে ক্ষান্ত হইলেন না। ক্রমেই সংসারের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সংসারকে ধিক্কার দিয়া ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোন স্থানেই সাহয্যোপযোগী অর্থ পাইলেন না। অনন্তর স্থানীয় রাজার শরণাপন্ন হইবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দরিদ্রের রাজ দর্শন, দুর্লভ। অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজ দর্শন ঘটিল না। শুনিলেন রাজা গঙ্গা স্নান করিতে আসিবেন। দর্শনের সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা স্নান করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ প্রহরীগণকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে কম্পিত কলেবরে রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নেত্রে নিজের সাংসারিক অবস্থা জানাইলেন। কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা দিবার আদেশ দিয়া খাজাঞ্চির উপর একখানি হুকুম নামা দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজভবনে খাজাঞ্চির নিকট উপস্থিত হইলেন ও রাজার হুকুম দেখাইলেন। খাজাঞ্চী হুকুম-নামা দেখিবা মাত্র কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! রাজকোষ শূন্য কাল বাদে পরশু নবাব দরবারে অনেক টাকা কর দিতে হইবে। সেই টাকা কি প্রকারে সংগ্রহ করিব আমরা ভাবিয়া ব্যাকুল। মহারাজ এ সকলের খপর

কিছুমাত্র রাখেন না। এখন যান, কিছু দিন পরে আসিবেন ;" এই বলিয়া হুকুম-নামা খানি ফিরাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রায়ই যাওয়া আসা করেন। কিন্তু কোন সুবিধা করিতে পারেন না। পুনশ্চ রাজদর্শনের আশাও দুরাশা। অনন্তর একজন আমলা কহিলেন, "কেন বৃথা অনুনয় বিনয় করিতেছেন। আমাদের সকলকেই কিছু কিছু না দিলে আপনার হুকুম নামার টাকা পাওয়া দুর্ঘট।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহাশয় যাহাতে গরীব কন্যা দায় হইতে মুক্তি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।" আমলা কহিলেন, "মহাশয় আমি যথা-সাধ্য আপনার সাহায্য করিব। খাজাঞ্চী মহাশয়কে ২৫০৲ টাকা দিতে হইবে, কারণ তিনি মোটা মাহিনার চাকর অল্পে মন উঠিবে না। অন্য অন্য আমলার বেতন অনুসারে নজরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যাহা করিতে হয় আপনি করুন, আপনার উপর ভার দিলাম, আমি কিছু পাইব ত!" আমলা বলিলেন, "সে কি পাইবেন বৈ কি।" তাহাই হইল কাহাকে ১০৲ কাহাকে ১৫৲ এইরূপ দিয়া শেষে ব্রাহ্মণের ১০৲টি মাত্র টাকা থাকিল। আমলা কহিল, "মহাশয় এই ১০৲ টাকার বেশী আর বাঁচাইতে পারিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া "হা ঈশ্বর" বলিয়া ১০টী টাকা গ্রহণ করিলেন। রাজবাটীর ৪।৫টী দুয়ার পার হইয়া আসিতে হইবে। দ্বারবানগণও কিঞ্চিৎ পাইবার আশা করে, ব্রাহ্মণ টাকা পাইয়াছেন জানিয়া তাহারাও পারিতোষিক প্রার্থনা করিল। এরূপে সকলকে দিয়া একটী মাত্র টাকা থাকিল। ব্রাহ্মণ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া হা অদৃষ্ট বলিয়া রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ভাবিলেন, এ মায়াময় সংসারে কেহ কাহাকে প্রতিপালন করে না। সকলেই আপনার আপনার অদৃষ্টের ফলভোগ করিয়া থাকে। আমার মত ভাগ্যহীন ব্যক্তির সংসার বাসনা বিড়ম্বনা মাত্র। আমি আর সংসারে প্রবেশ করিব না। আমার বিধাতা পুরুষ কে? তাহাই দেখিব। এই ভাবিয়া হিমালয় প্রান্তে তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। বহুদিন কঠোর তপস্যার পর দেবাদিদেব ভগবান আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন ; ব্রাহ্মণ সাষ্টাঙ্গে চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "অন্যবর প্রার্থনা করি না, আমি আমার বিধাতা পুরুষকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ভগবান তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, "ঐ স্বর্গের পথ, যাও, একটী পুরী দেখিতে পাইবে, সেই পুরীকে বিধাতা পুরুষদিগের নিবাস ভূমি বলে। আমার বলে তোমার গতি অপ্রতিহত হইবে," এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন, ব্রাহ্মণও দৈব শক্তি

বলে বিধাতা পুরুষদিগের প্রদেশে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন,—কোথাও সুরম্য হর্ম্ম, কার্ত্তিকেয় সদৃশ সুন্দর পুরুষ, কোথাও সুন্দর প্রমোদোদ্যান অপ্সরীগণ নৃত্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার বিধাতা পুরুষ কোথায়, জনৈক বিধাতা পুরুষ উত্তর করিলেন, যাও এখানে তোমার বিধাতা পুরুষ কোথা ? এ পুরীর প্রান্ত ভাগে এক আম্র বৃক্ষের তলে তোমার বিধাতা পুরুষ বাস করিতেছেন, দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মণ তদনুসারে স্বর্গের অপরূপ সৌন্দর্য্য ও বিধাতা পুরুষ অবলোকন পূর্ব্বক আম্রবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, একটী লোক বসিয়া একটা ডাবা হুঁকাতে তামাক খাইতেছেন। কেশ-রুক্ষ, পরিধান জীর্ণ মলিন বসন। কলেবরের শির সমুদয় উন্নত। চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত। সম্মুখে গোটা কত মৃত্তিকা ভাণ্ড। তাহাতে তামাক জল প্রভৃতি তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু। দুই চারিটী গাঁজার কলিকা। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভাবিলেন, বোধ হয় ইনিও আমার বিধাতা পুরুষ হইবেন, নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিবা মাত্র বিধাতা পুরুষ কহিলেন, "ওরে বেটা একটী বার চোক মুদেছি, আর একটী টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ," ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার দুঃখ আর মনে নাই, আপনাকে দেখিয়া অধিক দুঃখ হইতেছে। অনেক বিধাতা পুরুষ দেখিলাম, আপনার অবস্থা এরূপ কেন ?" বিধাতা পুরুষ কহিলেন, "সংসারে অনেক লোক দেখিয়াছ, তোমার অবস্থাইবা এরূপ কেন ? তুমি যে কর্ম্ম ফলে আমায় লাভ করিয়াছ, আমিও সেই কর্ম্ম ফলে তোমাদের মত লোকের বিধাতা পুরুষ হইয়াছি।" ব্রাহ্মণ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন, কাহাকেও দোষ না দিয়া আপনার কর্ম্মপাশ ছেদনের জন্য তপস্যা ও লোক হিতকর কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গীত।

খট্ ভৈরবী পোস্তা।

নিজে ক্ষুদ্র হয়েছিস্ বলে, মনে করিস্ সকলই ক্ষুদ্র,
নীচ বাসনায় ঘুরে বেড়াস দেখিস্ কেবল সকলের ছিদ্র।
ভক্তি আঁখি খোল দেখি, দেখবি সকলই হবে সুন্দর;
পুণ্যমায়ের আবির্ভাবে হবে সকলই পবিত্র।
সংসার নরকে পাপের স্থান, এ যে জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্র,
তাঁরি সৃষ্ট সকলই, তাঁরি, প্রেমের পাত্র।
দেখ যদি তাঁরে কেবলই আছেন তিনি একমাত্র,
চরাচরে সকল জীবে, সকলই তোর হবে মধুর।

পঞ্জিকা সংস্কার।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার উদ্যোগে পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য "পঞ্জিকা-সমিতি" নামক এক সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করাই ব্রাহ্মণ-সভার উক্ত সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই মহৎ কার্য্যে বঙ্গীয় পণ্ডিত অভিজাত ভূস্বামীবর্গের অভিপ্রায় জানিতে অভিলাষিত হইয়াছেন। পি, এম্, বাক্‌চি প্রতিষ্ঠিত ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার তত্ত্বাবধায়ক সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত জ্যোতিভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার পঞ্জিকা-সমিতির নির্ব্বাচিত প্রশ্ন গুলির কিরূপ সুযুক্তি পূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের মঙ্গল কামনায় তাহা আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা পঞ্জিকা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া যে, প্রশ্ন গুলির সুমীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সবিনয় নিবেদন—

ভবদীয় বিগত ১৭ই মাঘ তারিখের পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় অনুগ্রহ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার মুখবন্ধ পাঠেই বুঝা যায় যে, প্রচলিত পঞ্জিকার তিথ্যাদির ও গ্রহ সংস্থানের মতানৈক্য দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া পঞ্জিকা করা গেলে উক্ত সন্দেহ দূর হইতে পারে বলিয়া অনেকের মত হওয়ায় কতিপয় বিষয় বিচার্য্য হইয়াছে। সুমীমাংসায় উপনীত হওয়ার সাধু উদ্দেশ্যে, এই বিচার্য্য বিষয়গুলি প্রশ্নাকারে লিপি করিয়া উত্তর প্রসঙ্গে অভিমত আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রশ্নগুলি কথঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইলেও, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্থূলতঃ যাহা বক্তব্য আছে, সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম। অনুপযুক্ত হইলেও, ভরসা করি ইহা পঞ্জিকা সমিতিতে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইবে।

প্রথম প্রশ্ন,—দৃগ্‌গণিতানুসারে গণিত পঞ্জিকায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কিরূপ বিরোধের সম্ভাবনা? পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত গ্রহাদির সায়ন অবস্থায় যে দৃগ্‌গণিতৈক্য, ইহা অতর্কিত। কেহ কেহ নিরয়ণে পরিবর্ত্তিত উক্ত সংস্থানকে দৃগ্‌গণিতৈক্য বলিয়া থাকেন। যে প্রণালীতে গণনা করিলে, দৃক্‌তুল্য হইবে বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদবলম্বনে গণিত ফলকে কখন কখন দৃক্ তুল্য বলা হয়।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মধ্য রেখাগত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ভেদের সুবিধার জন্য, সংস্থান সমূহ বিষুবদ্ রেখোপরি গণনা করিয়া পঞ্জিকায় সন্নিবেশ করেন। ইহাই বিশুদ্ধ দৃক্‌সিদ্ধ গণনা। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে ইহার ব্যবহার নাই বলিয়া, প্রকৃত দৃগ্‌ গণিতৈক্য হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্যগণ তারকাবলী খচিত গগনের কোন স্থির বিন্দু হইতে রবি বর্ত্মোপরি সংস্থান নির্ণয় পূর্ব্বক গণনা করিয়া আসিতেছেন। ইহাকেই নিরয়ণ প্রণালী বলে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিষুবদ্রেখা ও রবিমার্গের সম্পাত বিন্দু হইতে সংস্থান নির্ণয় করেন। এই সম্পাত বিন্দু ধ্রুব নহে বলিয়া ইহাকে সায়ন বলে। ঐ সম্পাত বিন্দু হইতে রবি বর্ত্মোপরি সংস্থানও কোন কোন পাশ্চাত্য পঞ্জিকায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সাধারণতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিরয়ণ সংস্থানের উপরেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করার বিধান করা হইয়াছে। কাজেই দৃগ্‌গণিতৈক্য হইলেও সায়নগ্রহ সংস্থান মূলক পঞ্জিকার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধ রহিয়াছে! এই বাধা অতিক্রম করা ব্যতীত প্রকৃত দৃগ্‌গণিতৈক্য মত প্রচলিত হইতে পারে না। সায়ন মতের পোষকে যে একেবারে শাস্ত্র প্রমাণ নাই ইহাও বলা যায় না। তবে প্রচলিত ধারণার বিরোধী বলিয়া সমাজ উহা গ্রহণ করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দৃগ্‌ গণিতৈক্য সায়ন সংস্থানকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নিরয়ণে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে কি না? কৃতকার্য্য হইলেও উহার সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরোধের সম্ভাবনা আছে কি না? এই দুইটী প্রশ্নের বিশ্লেষণে পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলি গঠিত হওয়ায় এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিব। এতদ্দেশে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনার সময় হইতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই অনুসন্ধিৎসুগণ গুরুতর প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিয়াছেন। সংস্কারপ্রয়াসীগণ তখন হইতেই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রথম পক্ষ অনেক স্থলে সংস্কার করিয়াও একটী বিষয়ে প্রচলিত ধারণার বিরোধী হইবে আশঙ্কায় ভ্রম জানিয়াও সমর্থন পূর্ব্বক সামঞ্জস্য করার চেষ্টা পাইয়াছেন। যাহা সাধারণ বিজ্ঞান অনুমোদন করে না, উহা যে ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুমোদিত নহে, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। অপরদল, ইহার মৌলিক অযৌক্তিকতা দৃষ্টে কতকটা নির্ভীকতার সহিত সায়নাশ্রিত পথ গ্রহণের পরামর্শ দিতেছেন। ইহাতে বৃদ্ধিশীল ভ্রম বিদ্যমান না থাকিলেও, আদি বিন্দু নির্ণয় সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ থাকায় কেবল তজ্জন্যই যে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরোধী হইবে না

কে বলিল? এই উভয় প্রণালীতেই আবার একটী আপত্তি আছে। শাস্ত্রকারগণ গণনা কালে যে সকল সংস্কার পূর্ব্বে প্রয়োগ করেন নাই, বর্ত্তমানে অভিনব রূপে তৎসমুদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ঋষিমণ্ডলী ও পরবর্ত্তী আচার্য্যবৃন্দ, ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াও, যে সকল স্থূল সংস্কার উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আবার গ্রহণ করা স্বতই শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ফলতঃ এই শ্রেণীর দৃগ্‌ গণিতানুসারে গণিত পঞ্জিকার ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় শ্রেণীর দৃগ্‌-গণিতৈক্যেরও দুইটী বিভাগ। কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রীয় গণনা প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক্ষণে কেবল মাত্র সংখ্যা সমূহ শুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ এইরূপ সংশোধন সময়ে সময়ে করিয়াছিলেন এবং হিন্দু সমাজও উহা স্বীকার পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আর যাহাই হউক, এতদ্দ্বারা আধুনিক মতের দৃক্‌ তুল্যতা লাভ হইবে না। বৈজ্ঞানিক যুগে এইরূপ আয়াস আদৃত হওয়ার আশা অতি বিরল। যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রের পথ প্রদর্শক দেব সদৃশ কোন মহাত্মা ঐশী শক্তিতে কোন সংস্কারে আদেশ দিলে, নতশিরে সমগ্র হিন্দু সমাজ গ্রহণ করিলেও আমাদের স্বার্থ জড়িত, অসম্পূর্ণ প্রস্তাবকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিতে অপরকে বাধ্য হইবে? বরং অনভিপ্রেত বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া সন্দেহ করিবে। পরিশেষে রক্ষণশীল সম্প্রদায় মীমাংসার সদুপায় উদ্ভাবনে অক্ষম হইয়া বলিবেন যে ঋষি ও আচার্য্যবৃন্দ যে প্রণালীতে ও যে সকল অঙ্ক ব্যবহার করিয়া দৃক্‌ তুল্য হইবে বলিয়া শাস্ত্রে লিপি করিয়াছেন উহার দ্বারা যে সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই শাস্ত্রীয় দৃক্‌তুল্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রানুগ অথচ চিরাচরিত ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী নহে। তথাপি ইহাকে পাশ্চাত্য মতের দৃগ্‌ গণিতৈক্য বলা যাইতে পারে না। এই প্রণালীতে গণিত গ্রহণাদি প্রকৃত ঘটনার সহিত ঐক্য হইতে পারে না। ইহা ধর্ম্ম কর্ম্মের উপযোগী কাল নির্ণয়ের উপায় হইলেও প্রকৃত দৃশ্য বিষয়ের সহজ নির্দ্দেশক নহে। এই সকল আন্দোলন মূলে, নিরপেক্ষ বিশাল হিন্দু সমাজ সম্প্রতি গ্রহণাদি কয়েকটী দৃশ্য বিষয়ে পাশ্চাত্য গণনার ফল গ্রহণ করিয়াও, শাস্ত্রানুসারে গণিত-পঞ্জিকা অবলম্বনে ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সমাধা করা নিরাপদ বিবেচনা করিতেছেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত ছয়টী মতের কে কোন্‌টী সমর্থন

করেন এবং ব্যবহার করিতেছেন, এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি।

প্রথমোক্ত মতটী পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহের শাসন প্রণালীর অবলম্বিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রবিবর্ত্মোপরি সংস্থান সর্ব্বদা পরিদর্শনের সহজ উপযোগী নহে বিবেচনায়, সরকারী নাবিক পঞ্জিকা সমূহে ভৌমাদি গ্রহের ও নক্ষত্রাদির বিষুবৎ সংস্থানই দিয়া থাকেন। সর্ব্বদা গ্রহ ভেদের প্রয়োজনে ইহাই সুগম এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃক্‌সিদ্ধ। স্ব স্ব পথে গ্রহ সংস্থান নির্ণয় করতঃ রবি-বর্ত্মোপরি পরিণত করিয়া সংস্কার দ্বারা প্রত্যক্ষের সুবিধার জন্য বিষুবতে আনীত হইয়াছে। মান মন্দির ও অর্ণব পোত সমূহে প্রত্যক্ষ কার্য্যে ইহাই ব্যবহৃত হয়। সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে ইহারই আদর অধিক।

দ্বিতীয় মতের গণনা পাশ্চাত্য ভূমিতে সামাজিক ব্যাপারে বিশেষতঃ ফলিত জ্যোতিষের জন্যই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সায়ন মতে রবিবর্ত্মোপরি গ্রহাদির সংস্থান প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সরকার হইতে প্রচারিত নাবিক পঞ্জিকা সমূহ হইতে ইহা গণিত হয়। কোন কোন স্থানে মূল সারিনী হইতেও গণনা করা হইয়া থাকে।

তৃতীয় মতটী উপরোক্ত দ্বিতীয় মতের সায়ন অঙ্ককে কল্পিত নিরয়ণে পরিণত করতঃ ভারতে প্রচলন করার উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী এই মতের পোষকতায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার মূল নীতি এই যে, সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে গণিত নিরয়ণ মেষ সংক্রমণ সময়ের সায়ন রবিস্ফুটকেই অয়নাংশ কল্পনা করিতে হইবে। এই বিধান অনুসারে এতদ্দেশে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনেকদিন হইতেই গণিত হইয়া আসিতেছে। বিগত ১৯০৪ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বোম্বাই সহরে যে পঞ্চাঙ্গ শোধন সভার অধিবেশন হয় অনেকেই সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমান স্বীকার করিয়া প্রকৃত অয়ন-গতি বার্ষিক ৫০'২ বিকলা স্থলে কিঞ্চিদধিক ৫৮ বিকলা বলিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও এই মতের পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে।

চতুর্থ মতাবলম্বীগণ তৃতীয় মতের ভ্রমপূর্ণ অয়নগতি দৃক্ বিরুদ্ধ, এমন কি নিরয়ণ আদি বিন্দুকে গতিশীল কল্পনা করা একান্ত বিসদৃশ বোধে ধ্রুব আদি বিন্দু নির্ণয় পূর্ব্বক, পাশ্চাত্য অয়নগতি স্থিরতর রাখিয়া সায়ন হইতে নিরয়ণ গণনার প্রস্তাবনা করেন। বেঙ্কটেশ কেতকর এই মতের সূচনা করিলেও সংস্কারপ্রিয় অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উহার পোষকতা করিয়া থাকেন। বস্তুত নিরয়ণ মত রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য গণনা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইলে

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায়, যেহেতু ইহার গতিত পাশ্চাত্য জ্যোতিষের প্রতিকূলতা নাই—ইহাতে ভ্রম অয়নগতি স্বীকার করিতে হয় না।

হিন্দু জ্যোতিষে অব্যবহৃত অভিনব সংস্কার গুলি যাঁহারা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে মনে করেন অথচ সময়ের পরিবর্ত্তনে যাহা স্থূল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সূক্ষ্মতর করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পঞ্চম মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। বিগত ১৯১০ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীমদাদি শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি কালটি গ্রামে যে পঞ্জিকা সভা আহূত হয়, তথায় ত্রিবাঙ্কুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজ রাজ বর্ম্মা এম, এ, মহাশয় এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। ইহারা বলেন যে হিন্দু জ্যোতিষে আবহমান কাল হইতে মান্দ্য ও শৈঘ্র্য ফল সংস্কার ব্যতীত অন্য কোন সংস্কার করা হয় নাই। বৃহত্তিথি চিন্তামণি প্রভৃতিতে যে সংস্কারের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে উহা কেবল কালগত স্থূলতার জন্য। সত্য বটে মধ্যাদিতে বীজ সংশোধন করা হইয়াছে, অথবা কোন কোন অঙ্ক কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, কিন্তু কোন সময়েই নূতন সংস্কার সংযোগ করা হয় নাই।

এক্ষণে নূতন সংস্কার করা হইলে, শাস্ত্র ও সনাতন আচার বিরুদ্ধ হইবে। তাঁহাদের মতে আচার্য্যগণ এই শ্রেণীর গণনাই ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রযোজ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মের উপযোগী কাল নির্ণয় করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইহারা অঙ্ক ও সংখ্যাগত স্থূলতাই কেবল সংস্কার করিতে চাহেন।

সর্ব্বশেষে রক্ষণশীল সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ঋষি ও ঋষিতুল্য আচার্য্যগণের প্রণালী ও সংখ্যা সমূহ অবলম্বনে গণিত পঞ্জিকাই অবলম্বনীয়। ইহাই ষষ্ঠ মত। বর্ত্তমানে ঋষিকৃত সিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারে পঞ্জিকা গণিত হয় না এক্ষণে করণ গ্রন্থানুসরেই প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি গণিত হয়। ধর্ম্মবিশ্বাসে ও সামাজিক ব্যবহারে হিন্দু মধ্যে যেরূপ স্বাতন্ত্র্যতা আছে, জ্যোতিষ সম্বন্ধেও কতকটা সাম্প্রদায়িকতা হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গ্রহলাঘব মতের পঞ্জি দক্ষিণাপথে আর্য্যভট্টানুগ বররুচি মতের বাক্য পঞ্জিকা ও বঙ্গদেশে রাঘবানন্দ প্রণীত সারিণী অবলম্বনে পঞ্জিকাই অধিক প্রচলিত। সম্প্রদায় ভেদে হিন্দুগণ ইহাই ব্যবহার করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—"বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" এই মতটী কোন আর্ষ গ্রন্থোক্ত কি না?

ঋষি প্রণীত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা প্রণালী হইতেই এই সূত্রটী উত্থিত হইয়াছে। এবং ঋষিতুল্য পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে উহা ব্যবহার করায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। কেবল কয়েকটী কথায় উহা লিখিত না থাকিলেও

উহা আর্ষ গ্রন্থোক্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের দৈনিক গতি উর্দ্ধে ৮৬০ কলা ও নিম্নে ৭২১ পর্য্যন্ত হয়। সূর্য্যেরও ঐরূপ ৬১ ও ৫৭ কলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব তিথিদণ্ডে পরম বৃদ্ধি ৫ দণ্ডের কিছু অধিক ও পরম হ্রাস বা ক্ষয় ৬ দণ্ডের কিছু অধিক হইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রণেতা লিখিয়াছেন "বৃদ্ধিক্ষয়ৌস্তঃ পরমৌতিথৌ সদা ব্যব্ধিরসা সাব্ধি রসাশ্চ নাড়িকা"। "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" পরিভাগাটী সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে উহা কোন দেবতা বা ঋষি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যখন অঙ্ক শাস্ত্রের অকাট্যনিয়মের উপর ইহা স্থাপিত তখন শাস্ত্রে কেবল বর্ণমালার বর্ণ সংযোগে ঐ কথাগুলি লিখিত না হইলেও গণনা দ্বারা স্থির করা আশ্চর্য্য নহে পরন্তু অতীব সরল সাধ্য উহাকেই সংক্ষেপে "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" বলিয়া স্মার্ত্তগণ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব এই মত নিশ্চয়ই আর্য গ্রন্থোক্ত না বলিয়া উপায়ন্তর নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন—বর্ত্তমান সময়ে দৃক্‌সিদ্ধ গণনানুসারে তিথ্যাদির "সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় হয়।" সেই অনুসারে পঞ্জিকা গণিত হইলে ভবিষ্যতে তিথ্যাদির এতদপেক্ষাও বৃদ্ধি হ্রাসের সম্ভাবনা আছে কি না? হেনসেন কৃত চন্দ্রসারিণী ও নিউকোম্ব প্রণীত সৌরসারিনীহইতে পাশ্চাত্য তিথিমান গণিত হয়। সম্প্রতি ইহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না; এই হ্রাস বৃদ্ধি প্রায় সমভাবেই ঋষি কালেও ছিল তথাপি তৎকালে শাস্ত্র শাসন মতে কতিপয় সংস্কার উপেক্ষিত হওয়ায় তিথিতে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় মতটীই গৃহীত হইয়াছিল। ইউরোপীয় মতে চন্দ্রের পরম গতি ১৫.২ অং ও অত্যল্প গতি ১১.২ অং ধরিলে ৯॥০ দণ্ড হ্রাস ও ৭॥০ দণ্ড বৃদ্ধি হইতে পারে ভগ্নাংশ ফেলিয়াদিলে মোটামুটী সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় হয়। এতৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রের টীকাকারদিগের মতামত সংগ্রহ করিবার কোন আবশ্যক নাই। অতি প্রাচীন কালেও সেই সপ্ত বৃদ্ধি দশক্ষয় তিথ্যাদিতে দৃষ্ট হইত এখন বর্ত্তমানেও সেই সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় সমভাবে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু তবে কেন ঋষিগণ— বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় প্রচলন করিয়াছিলেন? ইহা পাঞ্জকা সমিতির সদস্যগণ একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

চতুর্থ প্রশ্ন,—পাশ্চাত্য প্রণালী ব্যতীরেকে আর্য উপায়ে দৃক্ সিদ্ধ গণনা হইতে পারে কি না? আর্য্য ঋষিগণ যাহাকে দৃক্ তুল্য বলিতেন, আর্য উপায়ে তদ্রূপ গণনা পূর্ব্ব যেরূপ হইত এখনও তদ্রূপই হইতেছে। আচার্য্যগণের সময়ে বর্ত্তমান প্রণালীর অর্থাৎ পাশ্চাত্য মতের দৃক্ সিদ্ধ হইত,

তাহাদের সূর্য্যগ্রহণ পাশ্চাত্য মতে গণিত গ্রহণের ন্যায় মিলিয়া যাইত ইহা বলিতে যাওয়া কতকটা অনভিজ্ঞতার পরিচয় অথবা বিশুদ্ধ প্রতারণা মাত্র। অতএব পাশ্চাত্য প্রণালীর দৃকসিদ্ধ কখনই আর্য উপায়ে হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া বর্ত্তমানে দৃক্‌গণিতৈক্য আখ্যা দিতেছেন, এই সকল সংস্কার ঋষিগণ কখনই প্রয়োগ করিতেন না। মৌলিক উপায়ে এই শ্রেণীর সংস্কার করিয়া দৃকসিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া পরলোকগত চন্দ্রশেখর সিংহ সিদ্ধান্তদর্পণ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি ব্যতীত উহা প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই; বরং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের কতকটা বিকৃত ছায়াবলম্বনে তদীয় গ্রন্থ রচিত। কেহ কেহ পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকার পরিবর্ত্তে দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা গণনার জন্য নিরর্থক সারিনী প্রস্তুতের পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইহাতে অযথা পুনঃ পরিশ্রম ও তজ্জনিত ব্যয় বাহুল্য হইবে মাত্র পাশ্চাত্য সারিনী গুলিকে কেবল প্রচ্ছন্নে ভাষান্তরিত কিম্বা রূপান্তরিত করিলে আর্য উপায় হইবেনা; উহা যে পাশ্চাত্য সেই পাশ্চাত্যই থাকিয়া যাইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন,—নিরয়ণ রাশি নক্ষত্র গণনার জন্য রাশি চক্রের কোন্ বিন্দু আদি বিন্দু স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে? অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে কি পরিমাণ অয়নাংশ গ্রহণ করা শাস্ত্র সম্মত?

প্রকৃত প্রস্তাবে রাশি চক্রের আদি বিন্দু ঋষিগণ কোথায় স্থির করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া সংস্কার প্রয়াসীপক্ষ কতকগুলি সন্দিগ্ধ ও ভ্রান্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ১৭৭২ শকাব্দে কেরো লক্ষণছত্রে সায়নমতে সমস্ত গণনা করিয়া শেষে নিরায়ণের জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত কি গ্রহলাঘব মতের অয়নাংশ ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নগতি বার্ষিক ৫৪ বিকলা, কিন্তু গ্রহলাঘবের ৬০ বিকলা, পাশ্চাত্য মতের অয়নগতি কিঞ্চিদধিক ৫০ বিকলা বলিয়া দৃগ্‌সিদ্ধবাদী ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। ইহাতে প্রচলিত বর্ষমানের অনৈক্য হইতেছে দেখিয়া পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে গণিত মেষ সংক্রমণ সময়ের সায়ন সূর্য্য স্ফুটকেই অয়নাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অয়নগতি বার্ষিক ৫৮·৭ বিকলা হয়, অর্থাৎ প্রকৃত

উপরোধে আদি বিন্দু প্রতিবর্ষেই পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা ঐ পরিমাণ দূরে সরিয়া গিয়াছে কল্পনা করিতে হইতেছে। ইহা দৃকসিদ্ধ নহে শাস্ত্রেও উহা সমর্থন করেন না। বস্তুত এই মিথ্যা অঙ্ক প্রয়োগে সমগ্র গণনাই কলুষিত হয়। বেঙ্কটেশ কেতকর ইহার সারহীনতা উপলব্ধি করিয়া রেবতী যোগতারা হইতে শাস্ত্রোক্ত দূরে কিম্বা চিত্রানক্ষত্রাবস্থান জনিত রাশিচক্রের আদি বিন্দু নির্ণয় করিতে বলেন। রেবতী যোগতারা বলিতে জিটাপিসয়ম্ বুঝিলেও, চিত্রার তুলনায় ৪ অংশের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কাজেই এইরূপে প্রকৃত নিরয়ণ আদি বিন্দু নির্দ্ধারণ করার সুবিধা ঘটে না। এই দুইটী ব্যতীত সূর্য্যসিদ্ধান্তে আরও অনেকগুলি নক্ষত্রের অবস্থান প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকলের অবস্থানের সহিত বর্ত্তমান সংস্থানের তুলনা করিয়া কেহ কেহ অয়নাংশ স্থির করিতে বলেন। এইরূপে নিঃসন্দেহে ও সূক্ষ্মরূপে যে আদি বিন্দু নির্ণীত হইতে পারে না ইহা সহজেই অনুমেয়; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে যে ভ্রম থাকিবে তাহার কলেবর আর বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তারকাবস্থান নির্দ্দিষ্ট অয়নাংশ বৈজ্ঞানিক জগত যে স্থলে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন পাশ্চাত্য গণিত বিরুদ্ধ সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষমানাশ্রিত ভ্রান্ত অয়নগতি যে উপহাসের সহিত বর্জ্জন করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রোক্ত অয়নাংশ ব্যতীত অন্যকোন কল্পিত অঙ্ককে শাস্ত্রসম্মত অয়নাংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

মূল প্রশ্ন কয়েকটী প্রচলিত দৃগগণিতৈক্য মতের সাপেক্ষ সূচক বলিয়া মতানৈক্য স্থলে সমালোচিত হইলে স্বভাবতঃ কতকটা প্রতিবাদব্যঞ্জক হয়। ইহাতে দোষ ধরা পড়িয়া পরিত্যাগের সুযোগ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন সংস্থাপন হয় না। সম্ভবতঃ এই অসুবিধা অপনোদনের জন্যই অতিরিক্ত প্রশ্ন তিনটী সংযোজিত হইয়াছে। উহার প্রথম দুইটী প্রশ্নের উত্তর বিশেষ দুরূহ এবং অনেকটা ব্যক্তিগত অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমাদের নিকট বর্ত্তমান আলোচনা নূতন নহে। চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে "বঙ্গে পঞ্জিকা সংস্কার" পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া তাৎকালিক পঞ্জিকা সংস্কারকারীগণকে প্রকৃত ভ্রম সমূহ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। তৎপরে জ্যোতির্গণনা ও অয়ন মীমাংসা প্রবন্ধে কতকটা সমালোচনা করিবার অবসর পাই। উক্ত পুস্তকখানি ও প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কার করা যে কত দুরূহ তাহা সহজেই প্রতীতি হইবে। আমরা ন্যায় সঙ্গত শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের বিরোধী নহি;

কিন্তু বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কিংবা সন্দিগ্ধ নূতন কথায় সততই বীতশ্রদ্ধ। হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা উপস্থিত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; ব্যক্তিগত মত প্রচার করার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই। একমাত্র উক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতিরিক্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিব।

প্রথম অতিরিক্ত প্রশ্ন ;—সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে আবশ্যক সংস্কার পূর্ব্বক গণনা করিলে গ্রহণাদির সময় নিরূপিত হইতে পারে কি না—যাঁহারা পাশ্চাত্য গণিতের সহিত প্রাচীন গণনার তুলনা করিবার সুবিধা পাইয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে আমূল সংস্কার না করিলে সূক্ষ্মকালে গ্রহণাদি কখনই মিলিবে না। কেবল যে সংখ্যা সমূহ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা নহে, গণনা প্রণালী ভিন্নরূপে গঠন করিতে হইবে। সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইলে, উহাকে সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি অভিধা দিয়া কোন লাভ হইবে না। ইহাতে অকারণে সত্যের অপলাপ করা হইবে মাত্র।—এই প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশ এই যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে আবশ্যকীয় সংস্কার দ্বারা গ্রহণাদির সময় নিরূপিত হইতে না পারিলে কি প্রণালীতে তাহার নিরূপণ করিতে হইবে? যদি প্রকৃতই দৃক্‌তুল্য করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা এই যে এই সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকাই অবলম্বিত হওয়াই সঙ্গত। পাশ্চাত্য সূক্ষ্ম গণনাপ্রণালী বহুল শ্রমসাধ্য, তাহাতে সংশোধিত সারিনী হইতে পুনরায় ঐ সকল গণনা করা বৃথা শক্তিক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরম সৌভাগ্য-বলে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের আশ্রয়লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের সর্ব্ব-সমুদ্রব্যাপী বিশাল রণতরি পুঞ্জের ও অসংখ্য বাণিজ্যোপযোগী অর্ণবযানের সহজ সুগমকল্পে রাজকোষ হইতে বহু অর্থব্যয়ে কয়েকবর্ষ পূর্ব্বেই প্রতি বৎসরে নাবিক পঞ্জিকা অতি বিশুদ্ধভাবে সূক্ষ্মতার সহিত গণিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া সারিনী অন্বেষণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। গ্রহণাদি পরিদৃশ্যমান বিষয়ে এই শ্রেণীর অঙ্ক গ্রহণ সম্বন্ধে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী যে সকল যুক্তি ও প্রমান দিয়াছিলেন তাহা গ্রহণে কোন আপত্তি থাকিবার নাই মনে করি।

দ্বিতীয় অতিরিক্ত প্রশ্ন,—আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের উপযুক্ত কাল নিরূপণ সমস্তই দৃগ্‌গণিতৈক্যের বিষয়ীভূত কি না? ধর্ম্মকর্ম্মের কালনিরূপণই হিন্দু জ্যোতিষের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ; এই কারণেই ইহাকে বেদের চক্ষু বলা হইত। বেদাঙ্গজ্যোতিষ অনুশীলনে ইহাই প্রকাশ পায়। ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত

তদুদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ কোন গুহ্য প্রক্রিয়া মূলে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীগণ আজ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। ব্রতাদির সহিত গ্রহাবস্থানের যে কোন প্রকৃত সম্পর্ক আছে তাহা বিশ্বাস করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সর্ব্বদাই পশ্চাদ্‌পদ। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসিদ্ধ দৃগগণিতের সহিত ঋষি প্রণীত গ্রন্থানুসারে গণিত গণনার পার্থক্য দৃষ্ট হইলে, হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মে প্রথমটী ব্যবহার করিয়া কোন হিন্দু সন্তান নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আদৌ ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন; পরে ঋষিতুল্য আচার্য্য বৃন্দ স্মার্ত (সিদ্ধান্ত ও করণ বাক্য) গ্রন্থাদি সঙ্কলন পূর্ব্বক ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন। তদ্বিপরীতে কোন কার্য্য করিলে ইহা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ হইবে ইহাই হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যে বর্ত্তমান দৃকতুল্য গণনায় কতকগুলি সংস্কার নূতন সংযোগ করা হইয়াছে, অথচ সায়ন হইতে অনির্দ্দিষ্ট অয়নাংশ বিয়োগ করিয়া নিরয়ণ করা হইতেছে। ইহা স্বীকার করার পূর্ব্বে একটি প্রশ্ন স্বতই উদিত হয়। আর্ষ গণনা প্রণালী তাঁহাদের সময়ে দৃকতুল্য ছিল কিনা? উত্তরে অভিজ্ঞতা বলিয়া দিবে, ঐ সময়েও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় দৃকতুল্য—হইতে পারিত না, যেহেতু তাঁহারা তৎকালে নূতন সংস্কারগুলি সংযোগ করেন নাই। ইহার পরেই প্রশ্ন হইবে যে ঋষিগণ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ঐরূপ করিয়াছিলেন, কি ইচ্ছা পূর্ব্বক উহা উপেক্ষা করিয়াছেন? যাঁহারা ঋষিকুলকে আদিম কৃষকশ্রেণী ভুক্ত করেন তাঁহারা হয়ত বলিবেন, ঋষিরা উহা জানিতেন না। ইহা সত্য হইলে যে ঋষি অজ্ঞতা প্রযুক্ত সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে এইরূপ সাধারণ ভ্রম করেন, তাঁহাদের আদিষ্ট ধর্ম্মকর্ম্মরূপ অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের অনুশাসন সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। তখন আর হিন্দু পঞ্জিকা লইয়া বিব্রত হইতে হইবে না। অপর দিকে যাঁহারা তাঁহাদিগকে ত্রিকালজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী, অমিতধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন ঋষিগণ জানিতেন কিন্তু উহা ধর্ম্মকর্ম্মের উপযোগী নহে বলিয়া একবারেই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই সকল নূতন সংস্কার পূর্ব্বেই অনাদৃত হইয়া থাকিলে এক্ষণে আবার ধর্ম্মকর্ম্মে উহার ব্যবহার করিলে কি প্রত্যবায় হইবে না? অতএব দৃক্ গণিতৈক্য গণনা নির্ব্বিবাদে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশ—এই যে, কোন কোন গণনায় দৃক্‌গণিতৈক্যের আবশ্যকতা এবং তাহার প্রমাণ

কি ? পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী বলিয়াছিলেন, কেবল পরিদৃশ্য গ্রহণাদি ঘটনা বিষয়ে দৃক্‌গণিত গৃহীত হইতে কোন বাধা নাই। তাঁহার যুক্তি প্রমাণ এই যে, যাহা দেখিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হয় তাহা দৃক্‌তুল্য করাই সঙ্গত। এই সকল গণনার জন্য নিরয়ণে কিংবা বিষুবদ্রেখাস্থ সংস্থান হইতে রবিবর্ষে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা নাই। এই প্রশ্নের তৃতীয়াংশ— সেই দৃক্‌-গণিতৈক্য কোন মতানুসারে কর্ত্তব্য ? এই সকল বিষয় বিষুবৎ সংস্থান হইতে যখন সহজেই গণিত হইতে পারে, তখন বৃটিশ নাবিক পঞ্জিকা হইতেই গণনা করা সঙ্গত। ইহার সহিত শাস্ত্র বিরোধ নাই।

তৃতীয় অতিরিক্ত প্রশ্ন— বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" এই নিয়মটী সময় বিশেষের জন্য কি না ? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ইহা সিদ্ধান্তোক্ত গণনাপ্রসূত। অতএব ইহা সময় বিশেষের জন্য কেন হইবে বুঝা গেল না। অতএব ইহা শাস্ত্রসম্মত সকল সময়ের জন্য নির্ব্বিবাদে ব্যবহৃত। প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর হইতেই দ্বিতীয়াংশের আবশ্যকতা না থাকায় আলোচিত হইল না।

প্রশ্ন ও অতিরিক্ত প্রশ্ন সমূহ আলোচনা কালে দৃষ্ট হইয়াছে যে সংস্কার প্রয়াসী সম্প্রদায় বহুশ্রেণীর এবং বিভিন্ন প্রণালীতে সংস্কারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। উপেক্ষনীয় সামান্য সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ প্রণালী পরিবর্ত্তনের জন্য নানাপ্রকারের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই যেন সংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এক পঞ্জিকাকার বলিতেছেন "প্রচলিত পঞ্জিকা যে অভ্রান্ত নহে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত অতএব সংস্কারের জন্য হিন্দু মাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত।" অপর পঞ্জিকাকার লিখিয়াছেন "এ পর্য্যন্ত আমাদের পঞ্জিকার গ্রহস্ফুট গণনা সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুযায়ী সিদ্ধান্তরহস্য নামক সারিনী অনুসারে গণিত হইয়া আসিতেছিল। উক্ত সারিনী গ্রন্থে ৩।৪৫ তিন অংশ পঁয়তাল্লিশ কলা হিসাবে গ্রহের মন্দ ও শীঘ্র ফল সাধন করা আছে। তদনুসারে গ্রহস্ফুট গণিত হইলে কিছু স্থূলহয় এজন্য এ বৎসর আমাদিগের পণ্ডিত-গণ বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া রবিচন্দ্রের প্রতি অংশের সূক্ষ্ম মন্দ ফল প্রস্তুত করতঃ তদনুসারে গ্রহস্ফুট গণনা করিয়াছেন।" ইহা অতি সামান্য হইলেও ইতিপূর্ব্বে কোনদিন ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া অন্যান্য নূতন সংস্কারের ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত কিনা, প্রশ্নের বিষয় হইবে। এবম্প্রকারে পঞ্জিকা সমিতির সমক্ষে অনেকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রস্তাব সমূহ, আলোচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে।

(১) কাহার জন্য ও কি উদ্দেশ্যে সংস্কারের প্রস্তাব করা হইয়াছে?

(২) সংস্কারের প্রকৃত প্রয়োজন আছে কিনা?

(৩) প্রস্তাবটী শাস্ত্রসম্মত ও শিষ্টাচার অনুমোদিত কিনা?

(৪) প্রকৃতপক্ষে অন্যপ্রকারেও উহা দোষ বিহীন কিনা?

যদি হিন্দু সমাজের জন্য না হয় কিম্বা হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রয়োজনে সংস্কারের আবশ্যকতা না থাকিলে উহা গৃহীত হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কারের আবশ্যকতা না থাকিলে, সংস্কারের দরকার কি? সংস্কার শাস্ত্র সম্মত কিংবা শিষ্টাচার অনুমোদিত না হইলে পরিত্যক্ত হইবে এবং পরিশেষে দোষযুক্ত কোন সংস্কারই আদরনীয় হইবে না। দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর হিন্দু আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেশবিদেশে সভা সমিতি করিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মমহামণ্ডলী সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এবং আমাদের সহৃদয় প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সুপ্রতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রদানে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের সম্পূর্ণ আশা আছে, হিন্দুর এই শুভ সময়ে সনাতন হিন্দু ব্যবহারে পঞ্জিকা বিভ্রাটে কেহ কোন বিপ্লব বিপর্য্যয় ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। দৃক্‌গণিতের সহিত শাস্ত্রীয় গণিত মিলিতেছে না বলিয়া আজ ঋষিগণকে তিরস্কার করার কোন নূতন কারণ সমুদিত হয় নাই। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে যে এইরূপ পার্থক্য রাখিয়াছিলেন তাহা কি কেহ দেখাইতে পারিয়াছে? হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের নিত্যফলস্বরূপ অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে যাহারা জড়বৈচিত্র প্রতিফলিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কি আত্মপ্রতারিত নহেন? ফলে পাশ্চাত্য সায়ন হইতে হিন্দুমতের নিরয়ণ করিতে গিয়া এতকষ্ট ও লজ্জা পাইতেছেন। তাঁহারা কি একবার ভাবিতে পারেন না, যে, নাবিক পঞ্জিকোদ্ধৃত সায়ন বিষুবদ্রেখাগত সংস্থান বিশুদ্ধ দৃক্‌গণিতৈক্য এবং হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যতীত অপর সকল কার্য্যেই সহজেই ব্যবহার যোগ্য। এমন কি, কয়েকটি বিষয়ে ব্যবহৃত। তবে কেন, ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী কেবল মাত্র কালে নিরূপণের জন্য নিয়োজিত গণনা প্রণালীতে চিরানভ্যস্ত দৃগ্‌গণিত আরোপ করিয়া আচার্য্যমণ্ডলীকে হেয়জ্ঞান করিতেছেন। আমাদে আশা আছে যে পঞ্জিকাসমিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা পূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বিদ ও পণ্ডিত সমাজের মন্তব্য সারগ্রাহিতার সহিত অনুধাবন করিয়া দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হইবেন। তাহারা একদিকে যেমন সংস্কারের হুজুগে বিচলিত

হইবেন না, অপর দিকে প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কার করা প্রয়োজন বোধ করিলে দোষ শূন্য ও নিঃসন্দেহরূপে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিবেন না। অবশেষে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন বর্দ্ধমান ও আদিবিন্দু এই বিষয় দুইটি বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভার ন্যায় ভবিষ্যতে বিচার্য্য বলিয়া রাখিয়া না দেন।

শ্রীচৈতন্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামপদ রায়।

(১)

তরুণ অরুণ, বরণ ধরিয়া, বিরাজে কে গো সঙ্গে সঙ্গে।
নর নারী যত, হইয়া মিলিত, গাহিছে কে গো নাম রঙ্গে॥
গুঞ্জরে অলি কমল ভ্রমে ঘুরিয়া চরণ খানি।
নদীয়ার মহাপ্রাণী সে যে গো নদীয়ার মহাপ্রাণী॥

(২)

ভকত সঙ্গে হইয়া বিভোর যখন গোরা গাহে।
স্তব্ধ হইয়া, যতেক প্রাণী, মুগ্ধ নয়নে চাহে॥
হৃদয় বিদারী প্রবেশে মরমে, তাহার মধুর বাণী।
নদীয়ার মহাপ্রাণী সে যে গো নদীয়ার মহাপ্রাণী॥

(৩)

মহান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলা দীক্ষা দিলা, মহান মন্ত্র।
স্থাপিয়া অন্তরে ইষ্ট মূর্ত্তী, বাজাও তব মহাযন্ত্র॥
নির্ম্মল করি রাখিতে বলিলা হৃদয় আসন খানি।
নদীয়ার মহাপ্রাণী সে যে গো নদীয়ার মহাপ্রাণী॥

(৪)

দেখ গো মানসে যেন সে গোরা নদীয়ার রাজ পথে।
ভাবাবেশে বলি হরি হরি ধুলি নাচিছে ভকত সাথে॥
প্রেমাশ্রু ঝরিয়া নয়ন হইতে ভাসিছে বক্ষ খানি।
নদীয়ার মহাপ্রাণী সে যে গো নদীয়ার মহাপ্রাণী॥

মায়া ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

অষ্টম-দৃশ্য ।

গঙ্গাতীরস্থ স্নানঘাট । চাতালের উপর চিন্তাকুল চিত্তে প্রকাশ উপবিষ্ট ;—পার্শ্বে রমেন ।

রমেন। "শালা" বল্লে স্ত্রীর ভাই না বুঝিয়ে গালাগাল বোঝায় কেন তা তোমার আজিকার ব্যবহারে বেশ বুঝেছি। উঃ এক কথায় কি কল্লে বল দেখি!—ছ'ছটা খাওয়া মাটী করে দিলে। ওঃ ছ'ছটা ফলার, মনে হলে কান্না পায়। আচ্ছা মনে যদি এই ছিল, আগে প্রকাশ করে বল্তে পারতে—ব্যাপারটা এতদূর গড়াতনা আর গরীব বামুনের গঙ্গা পেরনীর পয়সা কটা বেঁচে যেত।

প্রকাশ। রমেন সত্যি বলছি যেদিন উষার বাপের বাড়ী থেকে বাবা অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন, সেদিন ভেবে ছিলুম তাকে পরিত্যাগ করবো, তারপর তাকে আনতে গিয়ে যখন বিতাড়িত হয়ে চলে আসি, তখন স্থির করে ছিলাম, আবার বিবাহ করে তার সহিত সম্পর্ক একেবারে মুছে ফেলবো. তারপর দিনের পর যতই দিন চলে যেতে লাগলো কি জানি কেন আমার সে প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে গেল, কে যেন কেবল আমার কাণে কাণে বল্তে লাগলো "প্রকাশ, অন্যায় করোনা!" অনেকবার মনে করেছিলাম তোমায় বলবো, মাকে বলবো, কিন্তু পারি নাই। শেষে আজ যখন দেখলেম বিদায়ের ডালা সাজান হচ্ছে আর থাকতে পারলেম না।

রমেন।—তখন মনে হয় নাই আমার অসম্মতিতে বাবার মনে এত কষ্ট হবে। রমেন, রমেন! বলতে পারো কাজটা কি ভাল করলুম।

রমেন। শালার মতনই কাজ করেছ বটে, আর যখন করেই ফেলেছ তখন আর ভাল মন্দ ভেবে কি হবে। তবে কথাটা হচ্ছে এই যে, এইবার কোন্ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চুম্বকের আকর্ষণ যেরকম দেখছি শীগ্গির না ডুব দিয়ে গঙ্গা পার হও। তা মন্দ হবে না, এখন ভাবছি

শালা বাবু বলে, তখন যদি রাস্তায় কখনও দেখা পাই জামাই বাবু বলে নমস্কার করবো।

প্রকাশ। রমেন! তুমি কি আমায় এতই নীচ মনে কর যে, আমি আবার সেখানে যাব, গিয়া তাদের আশ্রয় ল'ব। না রমেন, আমি এই গঙ্গাতীরে প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন না সে অনুতপ্ত হৃদয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবে, বাবার কাছে করুণা ভিক্ষা করবে, ততদিন সে আমার কেউ নয়।

রমেন। বাস্ তাহ'লেই এ জন্মের মিলন এক রকম চুকে গেছে বলতে হবে। কিন্তু চাঁদমুখ খানা যখন এখনও বুকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন যে দিনের পর দিন গেলে এ প্রতিজ্ঞা শিথিল হবে না তা বলতে পারি না। দেখা যাক্ কতদূর গড়ায়—

[একটি বালক ও বালিকার প্রবেশ।]

বালিকা। ভোঁদা, তুই খেলবি না।

বাল। না ভাই, আজ কি করে খেলবো।

বালিকা। তা হ'লে, তোর সঙ্গে আড়ি।

বালক। কেন ভাই আড়ি দিচ্ছিস্, রোজত তোর সঙ্গে খেলি। বাবার অসুখ করেছে, তার কাছে বসে থাকবো, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো, নইলে যে, বাবার ভারি কষ্ট হবে।

বালিকা। না, তোকে আমার সঙ্গে খেলা করতেই হবে।

বালক। আজ থাক্, বাবার অসুখ সেরে গেলে আবার তোর সঙ্গে খেলবো আজ তুই আর কারুর সঙ্গে খেলা কর।

বালিকা। আর কারুর সঙ্গে খেলা করতে আমার ভাল্ লাগে না। তোকে আমার সঙ্গে খেলতেই হবে।

বালক। না আজ খেলতে পারবো না, আমি এখন যাই।

বালিকা। খেলবি না?

বালক। না, আজ খেলতে পারবো না।

বালিকা। খেলবি না?

বালক। না।

বালিকা। খেলবি না?

বালক। না।

বালিকা। তা হ'লে, তোর সঙ্গে আড়ি,—আড়ি,—আড়ি।

[বালিকার প্রস্থান, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বালিকার গন্তব্য পথে
বালকেরও প্রস্থান।]

প্রকাশ। রমেন! মানুষ যদি চিরকাল শিশু থাক্‌তো—তা হ'লে আর সংসারে স্বার্থপরতা থাক্‌তো না।

রমেন। সংসার থাকতো না, তার আর স্বার্থপরতা।

[নবীন ও দ্বিজেনের প্রবেশ।]

দ্বিজেন। পান্‌সী নাই দেখ্‌ছি, আবার বস্‌তে হ'ল।

নবীন। আর পান্‌সী, ইচ্ছে হচ্ছে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরি, সতীশের উপর মেয়ে দিতে গেলুম্ তাতেও এই কারচুপি খেল্লে, লোকটা কথা দিয়ে কথা রাখ্‌লে না!

দ্বিজেন। যে রকম বাজার পড়েছে, আর কি আশা করবে বল, আমি হাঁ করতেই সব বুঝে নিয়েছিলুম। ঐ যে বল্‌ছে যে ছেলের মতনেই. ওসব বাজে কথা, শুধু টাকা নেবার ফিকির, ছেলের যদি না মতছিল তা এতদিন ধরে কথা বার্ত্তা কইলে কেন?

নবীন। আজ বড় আশায় এসে নৈরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, মেয়েটা মরে ত হাড় জুড়োয়।

দ্বিজেন। মেয়ের কি দোষ বল, লোকটা কথা দিয়ে শেষ কালে এমন করবে কে জানতো, ছেলে আশীর্ব্বাদ করতে এসে এ রকম করে ফিরে যাব এ স্বপ্নেও ভাবিনি, ওঃ লোকটা কি ধড়িবাজ। দেখ, আমার বোধ হয় ছেলের শ্বশুরের ঠেঙ্গে কিছু আদায় করবে বলে তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বার্ত্তা কয়েছিল, এখন টাকাটা পেয়েছে, কাজেই তোমায় ফিরুলে। আবার যখন টাকার দরকার হবে তোমার মতন আর এক জনকে ফিরুবে। ওই একখানা পান্‌সী আস্‌ছে না? এই মাঝি ভিড়ো ভিড়ো এদিকে ভিড়ো—

[নেপথ্যে পারে যাবেন নাকি বাবু]

দ্বিজেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে আয়, ভিড়ো ভিড়ো শীগ্‌গীর ভিড়ো।

[ঘাটে পানসী আসিয়া লাগিলে দ্বিজেন ও নবীন তাহাতে উঠিল।]

নবীন। এই ছেড়ে দে।

প্রকাশ। রমেন! শুনলে।

রমেন। কাণে ত ছিপি এঁটে ছিলুম্ না।

প্রকাশ। কি বুঝ্‌লে?

রমেন। বুঝ্‌লুম্‌ স্বদেশ প্রিয় স্বজাতি ভক্ত বাঙ্গালী আজ বিধবা বিবাহ প্রচার করতে উন্মত্ত হ'য়ে, ভুলে গেছে যে, কুমারী বিবাহের রাস্তা পরিষ্কার না রাখ্‌লে বিধবাই হবে না।

প্রকাশ। না রমেন। আমি বুঝেছি আমি কুলাঙ্গার। রমেন! রমেন! ওদের যেতে দিওনা ওদের ফিরতে বল। মাঝি পান্‌সী ফিরো। মহাশয়গণ যাবেন্‌ না ফিরুন। বাবা কথা দিয়েছেন, তাঁর কথার কখনও খেলাপ হয় না. রমেন! ওরা যে ফিরচে না চলো সাঁতার দিয়ে গিয়ে ওদের ধরে আনি। রমেন! রমেন!

পাপের পরিণাম।

লেখক,---ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

[গল্প]

জনশূন্য পল্লীপথের মধ্যস্থলে রামজীবনকে দেখিয়া ঘোষেদের বৌ কমলা জড়সড় ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন বেলা অবসান প্রায়। অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণালোক বনরাজি ভেদ করিয়া স্বর্ণবর্ণ রেখার মত আসিতেছিল। একটী পাখী অনেকক্ষণ ডাকিয়া বৃক্ষান্তরে উড়িয়া গেল।

সেই নির্জ্জন স্থানে অভিলষিত বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়া রামজীবনের বুকটা যেন পাঁচ হাত হইয়া উঠিল। সে মনে করিল—আজ আমি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম। যাহার সহিত গোপনে দুইটি কথা কহিব বলিয়া এতদিন চেষ্টা করিতেছি, আজ ভগবান্‌ তাহাকেই মিলাইয়া দিলেন।

রামজীবন আহ্লাদে গুণ গুণ স্বরে গীত গাহিতে গাহিতে কমলার নিকটবর্ত্তী হইল।

কমলা ভয়ে কাঁপিতেছিল। তাহার প্রতি রামজীবনের যে লক্ষ্য পড়িয়াছে, তাহা সে পূর্ব্বেই জানিত।

গীত সমাপ্ত করিয়া রামজীবন বলিল—"কমলা! একবার ফিরে চাও না। আমি ত আর বাগ নই, যে খেয়ে ফেল্‌বো।"

কমলা নির্ব্বাক। সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামজীবন ইহাতে দমিবার পাত্র নহে। কিন্তু সেই সময় কয়েকজন কৃষক

হালে গরু লইয়া সেই পথে আসিতেছিল। দূরে তাহাদের দেখিয়া সে একটু থতমত খাইল। পরে কি ভাবিয়া বাগানের পথ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কমলার দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আমি তোমাকে সহজে ছাড়ব না। আমার নাম রামজীবন রায়। আমার অবাধ্য হয়ে তুমি কি করে গ্রামে বাস কর—তা একবার দেখ্‌ব।"

কমলা নয়নজল মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

(২)

রামজীবন গ্রামের নায়েব। তাহার ভ্রমর কৃষ্ণদেহখানির ভড়ং বেশ আছে। বাল্যকালে মা সরস্বতীর সহিত রামজীবনের বড় একটা আলাপ পরিচয় হয় নাই,—কিন্তু তথাচ প্রজামহলে তিনি একজন জ্ঞানবান লোক বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গ্রাম কম্পিত। আমরা এমনও শুনিয়াছি। ভথায় বাঘ ও ছাগে এক ঘাটে জলপান করিত।

রামজীবন ইতোপূর্ব্বে একটি ছোট মহলে নায়েবি করিতেন। একবার দেশে অনাবৃষ্টি হয়। তাহার ফলে সে বৎসর শস্য জন্মিল না। কৃষক মহলে হাহাকার পড়িয়া গেল। দরিদ্র প্রজার কষ্ট চরমে উঠিল। তাহারা এক পয়সা খাজনা দিতে পারিবে না, বলিয়া জমিদার সমীপে আবেদন করিল। জমিদার রাজস্বের টাকার জন্য ভাবিয়া আকুল। তখন রামজীবন প্রভুকে আশ্বস্ত করিয়া বিভীষণ মূর্ত্তিতে প্রত্যেক মহলে গিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"হয়, হাল গরু বিক্রয় করিয়া খাজনা দাও, নতুবা ভিটামাটী সমভূমি করিব।" এই কড়া হুকুম শুনিয়া কোন কোন প্রজা তৈজস পত্র বন্ধক দিয়াই খাজনা মিটাইল। কিন্তু কেহ কেহ এই হুকুমে চলিল না। তখন রায় মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য মল্লকচ্ছ পিয়াদা পাঠাইলেন। দলে দলে প্রজা আসিয়া রায় মহাশয়ের সমীপে দণ্ডায়মান হইল। রায় মহাশয়—"জুতা মারিয়া খাজনা আদায় করিয়া লও" বলিয়া হুঙ্কার দিলেন। সে কঠোর ধ্বনি "গঙ্গাজল ও আম্রবন" কাঁপাইয়া তুলিল। এইরূপে সেই ঘোর দুর্ব্বৎসরে জমিদারের সমস্ত টাকা কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইয়া গেল। নায়েব মহাশয়ের যশঃসৌরভও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে বিলম্ব করিল না। তদবধি তিনি বাবুর প্রধান মহল এই বিলাসপুরের নায়েবি পাইয়াছেন।

বিলাসপুরে আসার কয়েক বৎসর পরে একদিন কোন তদন্ত উপলক্ষে রামজীবন ঘোষ পাড়ায় যায়। তথায় সে কমলাকে দেখে। তাহাকে প্রথম

দর্শন করিয়াই সে পলকহীন নয়নে তাহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সেই দিন হইতে কমলাই তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। কি করিয়া কমলাকে লাভ করিবে, তাহাই এখন তাহার প্রধান চিন্তা। রামজীবন যে প্রকৃতির লোক তাহাতে সে অনায়াসেই ঐ দুঃখিনী কুলকামিনীর প্রতি জোর জবরদস্তি করিতে পারিত, কিন্তু তাহার মনিব শ্যামাচরণ বাবু এই সকল কুকার্য্যের প্রতি বড়ই বিরক্ত ছিলেন। পাছে গণ্ডগোল হইয়া পড়ে—পাছে বাবুর কর্ণগোচর হয়—এই ভয়ে পিশাচ রামজীবন হঠাৎ কিছু করিতে পারে নাই। পদার মা নামে কমলার এক দুষ্টা প্রতিবেশিনী ছিল। রামজীবন প্রথমে তাহার দ্বারাই কমলাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়। কমলা পদার মার মুখে ঐ কুৎসিত প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। আজ পথের মধ্যে কমলাকে একাকিনী পাইয়া রামজীবন সুবর্ণসুযোগ মনে করিয়াছিল। কিন্তু কমলার দুর্ব্যবহারে সে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

(৩৩)

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। রামজীবন ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। একদিন বড়ই দুর্য্যোগ। সমস্ত দিনই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর। রামজীবন আহারাদির পর বৈকালে পাইক ছমির সেখের দ্বারা সেই পদার মাকে ডাকিল। পদার মা গৃহকর্ম্ম সারিয়া আসিতে সন্ধ্যা করিয়া ফেলিল। সে জানিত রামজীবন যতই দুর্দ্দান্ত লোক হউন না কেন, পদ্মলোচনের মাতাকে কিছু বলিবার সাধ্য তাঁহার নাই। সন্ধ্যার পর কাছারি বাড়ীর এক নিভৃত কক্ষে দুইজনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। শেষে পদার মা বলিল,—

"সে বড় দুষ্টু; আমি ডাক্‌লে সে দরজা খুল্‌বে কেন?"

রামজীবন।—তুই বল্‌বি কমলা শীগ্‌গীর ওঠ্, তোর গরু মরে গেল। কেমন—পার্‌বিনে?"

পদার মা।—পার্‌ব না কেন? তোমার আশীর্ব্বাদে পদ্মলোচনের মা সব পারে। তবে ভাব্‌চি কি, সে বড় দুষ্টু—পাছে বুঝ্‌তে পারে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, সেই দিনই নিশীথ সময়ে রামজীবন পদার মার সহিত কমলার বাড়ী যাইবে। পদার মা কোন একটা ছল করিয়া কমলাকে ডাকিবে।

ঘোর রজনী; মনুষ্যের শব্দ মাত্র নাই। সকলেই সুষুপ্ত—সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। উপরে ঘন-মেঘ আকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; নিম্নে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীপথগুলি গভীর তমসাচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। সেই আলোক সহায়ে রামজীবন ও পদার মা কমলার গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। পথে দুই একটি কুক্কুর মানুষ দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। রামজীবনের গা টা এক একবার ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

কমলার খড়ের ঘর, বাড়ীর চতুষ্পার্শে বেড়া দিয়া ঘেরা—সম্মুখে একখানি ঝাঁপের দরজা। তাহার স্বামী ত্রিলোচন ঘোষ আজ তিন চারি বৎসর হইল মারা গিয়াছে। কমলা কয়েকটি গাভী ও একটি শিশু পুত্র লইয়া এই বাড়ীতে বাস করে। গো-সেবা করিয়া ও দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সে কোন গতিকে দিন কাটায়।

পদারমার পরিচিত পথ। সে ঝাঁপের দরজা খুলিয়া প্রাঙ্গন বহিয়া কমলার দাওয়ায় উঠিল। এমন সময় পশ্চাতে ঝুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। পদার মা শঙ্কিত বক্ষে নীচে নামিল। সে রামজীবনকে আর দেখিতে পাইল না। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে মনে করিল কোন উপদেবতা নিশ্চয়ই নায়েব মহাশয়কে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন সে ক্ষণকালও তথায় অপেক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধমুখে স্বগৃহাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। গ্রামের শান্তিরক্ষক পানা উল্লা চৌকিদার এই সময় পাহারায় বাহির হইয়াছিল। সে অনেক দিন হইতে চোর ধরিয়া বকৃসিস্ লইবে বলিয়া মনস্থ করিয়া আছে; কিন্তু চোরের সে বিবেচনা নাই। তাহারা চিরদিনই পানা উল্লার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। আজ সম্মুখে একটি মানুষ দৌড়াইতেছে দেখিয়া পানাউল্লা একবার কম্পিত হস্তে লণ্ঠনটি উত্তোলন করিল। সে আলোকের সাহায্যে দেখিল চোর পুরুষ নহে—স্ত্রীলোক। তখন পানা উল্লার আনন্দ আর ধরে না। সে অদম্য সাহসের সহিত দৌড়াইয়া গিয়া বৃদ্ধা-চোরের হস্ত ধারণ করিল এবং নিজ স্কন্ধস্থিত বংশ দণ্ডটি দুই চারি বার মৃত্তিকায় আঘাত করিয়া বল বিক্রম দেখাইতে লাগিল। পদার মা ধৃত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহার স্বর্গগত পুত্র পদ্মলোচনের নাম করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদতে লাগিল। তাহার মাতৃভক্ত পুত্র পদ্মলোচন একবার তাহাকে শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইয়াছিল, একথাও সে ক্রন্দনের স্বরে বলিতে ত্রুটি করিল না। পানা উল্লার প্রহারের ভয়ে সে সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তখন পানা উল্লা বৃদ্ধাকে লইয়া ভূতাবিষ্ট

নায়েবের অনুসন্ধানে কমলার গৃহে উপস্থিত হইল এবং লণ্ঠনের সাহায্যে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। কমলার প্রাঙ্গনস্থিত কূপ মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া পানা উল্লা দেখিল, নায়েবের প্রাণ হীন দেহ তন্মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। সে নিশ্চয় বুঝিল, রায় মহাশয় অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া কূপে পড়িয়া গিয়াছেন।

এইবার পানা উল্লার চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হইল—কমলাও জাগিয়া উঠিল। সে এ সকল ঘটনার কিছুই জানিত না। হঠাৎ এই অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই ভীত হইল। পাপাত্মা রামজীবনের নীচ অভিসন্ধি মনে উঠিবামাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—হে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমিই আজ এ অভাগিনীর রক্ষা করিলে। অনাথ নাথ! আমি একাকিনী—এ গৃহে ত আর কেহই ছিল না। তুমি উদ্ধার না করিলে আমার কি না দুর্গতি হইত, দয়াময় যে তোমার মহিমা বুঝিতে পারে সেই ধন্য কমলার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অতীতের স্মৃতি।

অতীতের স্মৃতি মোর কেন অনুক্ষণ!
সহসা আসিয়া শুধু দহিতেছে মনে?
হৃদয় তন্ত্রীতে কেন স্মৃতির নিক্কন—
বাজি' শুধু নাশে প্রাণ অন্তর পীড়নে?

বাল্য-কালে কত সুখে খেলেছি সতত,
হৃদয় উদ্বেগ হীন, নাহি চিন্তা ভয়;
আনন্দ মনেতে শুধু, সাধ অবিরত—
কত আশা, কত স্নেহ, কত মধুময়!

করেছি কত যে খেলা কত সঙ্গী সাথে,
কিন্তু, আর এক সাথী সবারে ত্যজিয়া
মোরে যে করিত স্নেহ, সতত তাহাতে
শৈশবের সুখহৃদি থাকিত মজিয়া।

কিন্তু পরে সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা—
অনন্ত যে প্রেমাকারে হ'ল পরিণত।
তখন যে কত সাধ, কত সুখ আশা
থাকিত অন্তর মাঝে জাগিয়া নিয়ত!

দেখিয়া তখন তা'রে মরিতাম লাজে;
নাহি ছিল কোন দুঃখ প্রাণের যাতনা;
হেরিলে সে মুখ খানি, হতো হৃদি মাঝে—
সুধাময়ী স্বপ্নময়ী সুখের বাসনা।

এখনো সে পূর্ব্বকথা হয়ে' জাগরিত,
হৃদয়েতে, পীড়িতেছে মোরে ক্ষণে ক্ষণে,
স্মরিলে সে সব কথা হই জর্জ্জরিত,—
অতীত স্মৃতি বিষ দশন দংশনে।

সমালোচনা।

ভবসিন্ধু-তরণী।—এই পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদিগের বিরচিত শ্লোক, স্তব, স্তোত্র ও কীর্ত্তনাদি সংগৃহীত হইয়াছে; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নাম-মাহাত্ম্য ও লীলাদি কীর্ত্তন প্রচার করাই এতৎ গ্রন্থ প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকাশকের উদ্দেশ্য যে, সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। পুস্তকের প্রত্যেক বিষয় ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস। বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী প্রেম ও ভক্তি পিপাসু নরনারীদিগের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ।

ঝঙ্কার।—সচিত্র মাসিক পত্র বার্ষিক মূল্য ২।৵৹ দুই টাকা ছয় আনা মাত্র। ঝঙ্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপন্যাসাদি পূর্ণ মাসিক পত্র। আমরা দুই সংখ্যা মাত্র "ঝঙ্কার" প্রাপ্ত হইয়াছি। ঝঙ্কারের ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, চিত্রগুলিও চিত্তাকর্ষক। আমরা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

জীবন-প্রদীপ।—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় কাব্যভূষণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রের প্রণীত, মূল্য ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

মানব জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য কি?—এই পুস্তকে লেখক মহাশয়, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পঞ্চদশ ক্রমে সমাপ্ত। আলোচ্য পুস্তকের বিষয় গুলি উচ্চ ও মহৎ, মানব জীবনে আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য;

লেখক ধর্ম্ম ও সমাজের মঙ্গল ও হিতাকাঙ্ক্ষী সরল ও স্বার্থত্যাগী মহানুভব সাধু সজ্জনগণের গ্রন্থ ও বাক্য হইতে ভাব ও ভাষা প্রমণার্থে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিষয় গুলির আলোচনা করিলে আনন্দ, শিক্ষা ও প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। জীবন-প্রদীপ পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।

হিন্দু সমাজের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন।—শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় মহোদয়ের সুলিখিত সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই এতৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। এরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য এক আনা ধার্য্য না করিয়া রাজা বাহাদুর বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত।

শ্রীমাতৃশ্লোক-শতকম্।—বঙ্গানুবাদ রসোদ্দীপনী—টীকা সমন্বিতম্। তত্রচ শ্রীশ্রীজগদাশস্তোত্রম। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টরাজেন বিরচিতম্ মূল্য চারি আনা মাত্র। সংস্কৃত শ্লোক রচনায় লেখকের ক্ষমতা ও দক্ষতা অসাধারণ। গ্রন্থকার ভাবুক ও কবি, সংস্কৃত ও সরল বাঙ্গলা গদ্য রচনায় কিরূপ মধুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—উৎসর্গ পত্রের কয়েক ছত্র মাত্র একবার পাঠ করিলে পাঠক গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও গ্রন্থকারের উচ্চ ভাবের পরিচয় পাইবেন। গ্রন্থকার উৎসর্গ পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"একবার উদ্বেলিত হৃদয়ে কল্পনা বলে জগতের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম কোথায় কোথায় মাতৃভক্তি—তরঙ্গিনীর উৎস ছুটিয়াছে! যাহা দেখিলাম হৃদয় ভরিয়া গেল; দেখিলাম জগতের প্রতি অণু পরমাণু সেই মাতৃপ্রেমরসে সিঞ্চিত; দেখিলাম শৈলে অনিলে, বনে সলিল, কান্তারে ভূধরে,—সর্ব্বস্থানেই মাতৃমহিমার মহিমাময়ী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। দেখিলাম আমার সেই পুণ্যপ্রবাহিণী পূতসলিলা ত্রিতাপহারিনী মাতৃপ্রেমজাহ্নবী কালের বক্ষে চির বিরাজমানা; তাহার পবিত্রতাময়ী—করুণা—সলিলে কত ভাগ্যবান্ সুখে সন্তরণ করিতেছেন, তীরে বসিয়া কত দেব দেবী মাতৃনামের জয়গান করিতেছেন; কত ভক্ত সন্তান মাতৃপ্রেমমদিরা পানে বিভোর হইয়া সেই নদী-সৈকতে দাঁড়াইয়া অমরত্ব লাভ করিতেছেন। কিন্তু অহো! হতভাগ্য আমি, সংসারের বিষম বন্ধনে সে নদীতে অবগাহন করিতে পারিলাম না, তীর হইতে ক্ষুদ্র হৃদয় খানি মাতৃভক্তিরসে সিক্ত করিলাম। হৃদয় নিষ্পেষিত সেই অমৃত বিন্দুই আমার একমাত্র অবলম্বন।" মাতৃভক্তের "শ্রীমাতৃ শ্লোক-শতকম্ ভক্ত গাথা পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, ফাল্গুন। | ১১শ সংখ্যা।

সকাম ও নিষ্কাম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ—

পারলৌকিক সুখোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকাম। ঐহিক বা পারলৌকিক কামনাশূন্য কর্ম্মই নিষ্কাম। সকাম কর্ম্ম স্বর্গ ফলজনক। নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি ফলদায়ক। সকাম সর্ব্বসাধারণের জন্য নিষ্কাম অধিকারীর জন্য। অধিকারী ব্যক্তির সকাম কর্ম্ম নিজের জন্য করার আবশ্যক করে না, তবে পরের জন্য পরের কর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য করার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অধিকারী ব্যতীত অনধিকারীর নিষ্কাম কর্ম্ম কোন উপকারক ত নহেই, উপরন্তু অনিষ্টকারক। অনধিকারীর নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফল জ্ঞানের অনুৎপত্তি আর কর্ম্মের ধ্বংস। ঐহিক কামনায় বদ্ধ ব্যক্তি পারলৌকিক ফলভোগেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, নচেৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মেই তাহাদের আনুরক্তি জন্মিবে না। সকামই বল, আর নিষ্কামই বল, আপাততঃ অনুষ্ঠানে কিছু কষ্ট

পাইতেই হয়, ভোগেচ্ছা দমন করিতে হয়, সংযম অবলম্বনও কারতে হয়। সাধারণ কৃষ্যাদি ঐহিক কর্ম্ম সকাম বা নিষ্কাম নহে। বিবিবদ্ধ বৈদিক ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই সকাম ও নিষ্কাম।

কর্ত্তব্যবোধে ভগবানের তৃপ্ত্যর্থ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান। সাধারণতঃ নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনাদি নিষ্কাম মধ্যেই পরিগণিত। আর পুত্রেষ্টীযজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি সকাম। দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকাম নিষ্কাম দুইই হইতে পারে। কর্ত্তার মনে যদি পারলৌকিক কামনা থাকে, তবেই সকাম। আর যদি না থাকে, তবে নিষ্কাম। কর্ত্তার মনোবৃত্তির অনুসারেও অনেকস্থলে কর্ম্ম সকাম কি নিষ্কাম ঠিক করিতে হয়।

সকাম কর্ম্ম কখন জ্ঞান সহিত কখন বা জ্ঞান বর্জ্জিত। এই জ্ঞান—শব্দার্থজ্ঞান, দেবতত্ত্বে জ্ঞান; প্রকৃত অখণ্ড জ্ঞান এই জ্ঞানের অর্থ নহে। এই জ্ঞান সহিত কর্ম্মের ফল সম্পূর্ণ, জ্ঞান রহিত কর্ম্মের ফল অর্দ্ধেক। অর্থ না জানিয়া, দেবতার স্বরূপতত্ত্ব না জানিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল হয় না, তাহা নহে। না জানিয়া বিষপানেও লোক মরে।

কেবল কর্ম্মের ফল পিতৃলোক। জ্ঞান সহিত কর্ম্মের ফল দেবলোক। পিতৃলোকগামী ব্যক্তিরা ধূমযান মার্গের, দেবলোকগামী ব্যক্তিরা অর্চ্চিরাদি গতির অধিকারী। পিতৃলোক হইতে সকলকে মর্ত্তে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। দেবলোক হইতে সাধারণতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় বটে, কিন্তু তথা হইতে কাহারও ফিরিতে হয় না। দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক, তথায় দহরাদি উপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তি লাভও ঘটিয়া থাকে।

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রবর্ত্ত সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং॥"

দহরাদি উপাসনা দ্বারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত ক্রমমুক্তিলাভ দেবলোক-গামীর ঘটে বলিয়া পিতৃলোক হইতে দেবলোকের শ্রেষ্ঠতা।

"কর্ম্মনা পিতৃলোকঃ কর্ম্মদ্বারাই পিতৃলোক।"

"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপর পক্ষাদ্যান্ ষড় দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সংবৎসরমভি প্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশং আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

"বিদ্যায়া দেবলোকঃ" এই বিদ্যা দেবতত্ত্বজ্ঞান বা শব্দার্থ জ্ঞান। তত্ত্বইথং

চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমান পক্ষমাপূর্য্যমান পক্ষাদ্‌ যান্‌ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসানস্তান্‌। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যাস্বক্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঃ মানবঃ স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকারী ব্যক্তি ধূমযানের, পঞ্চাগ্নিবিদ্‌ জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়কারী ব্যক্তি অর্চ্চিরাদি গতির অধিকারী। ইষ্টপূর্ত্ত কর্ম্মই কেবল কর্ম্ম।

দেবযান গতির নামই শুক্লগতি, ধূমযানগতির নামই কৃষ্ণগতি।

"শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জাগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥"

অর্চ্চিরাদিযান যথা—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষন্মাসা উত্তরায়নং।"

* * * *

ধূমযান গতি যথা—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নং।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥"

নিষ্কামকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধ্যর্থ অনুষ্ঠেয়। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই জ্ঞানমার্গের প্রকৃত অধিকারী। তজ্জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মকে জ্ঞানোৎপত্তির পরম্পরাকারণ বলা হইয়া থাকে। নিষ্কামকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মুক্তির কারণ "কর্ম্মনা সংসিদ্ধিং গতাঃ"। সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে কাহারও নিষ্কামকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, কাহারও বা স্বর্গফল লাভ হয়। উভয় লাভের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও "কিছুই না করা" বা "কুকর্ম্ম" করা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

সাধারণ ব্যক্তি অজ্ঞান, ঐহিক কামনার দাস। ঐহিক কামনা জয় না করিলে পারলৌকিক কামনা জয় করা যায় না। ঐহিক কামনা দুইদিনের জন্য পারলৌকিক কামনা বহুকালের জন্য ঐহিক কামনা দুঃখসমেত সুখ, পারলৌকিক কামনা দুঃখরহিত সুখ। ঐহিক কামনা জন্য সুখ বাহ্য, পারলৌকিক [illegible] অন্তের। কাজেই ঐহিক সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কিরূপে অতবড় পারলৌকিক সুখ কামনা ত্যাগ করিবে? অনধিকারী অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে নিষ্কাম তত্ত্বোপদেশ দিতে ভগবানের বারণ। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সকাম কর্ম্ম দ্বেষী হন, তবেই অজ্ঞ লোকও দ্বেষী হইবে।

এজন্য—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং॥"

গীতাকার মতে নিষ্কামকর্ম্মের অপর নাম সাত্ত্বিককর্ম্ম, সকামকর্ম্মের নাম রাজস্।

"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগ দ্বেষতঃ কৃতং।"
"অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুদাহৃতং॥

রাজস কর্ম্মই সকাম কর্ম্ম।

"যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজ সমুদাহৃতং॥"

আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্ম মাত্রকেই বন্ধের কারণ বলেন। তবে সাত্ত্বিক বা নিষ্কামকর্ম্মকে সুকৌশলে বন্ধন নাশের সহায়ক করাও যাইতে পারে। ইহার নাম কর্ম্ম কৌশল। দৃষ্টান্ত—বিষের বিষত্ব নাশ করিয়া তাহাকে ঔষধে পরিণত হয়। তৎপরে সেই ঔষধই আবার বিষের নাশক হইয়া থাকে। রামানুজ কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া মানিয়া গিয়াছেন। ভগবদুপাসনাত্মক নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানজনক। এতদ্ভিন্ন সকাম কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। অবশ্য এই বন্ধন সুবর্ণশৃঙ্খল বন্ধন হইলেও বন্ধন। স্বর্গ বা ধনিগৃহে জন্মৈশ্বর্য্যও বন্ধন। "কর্ম্মনা সংসিদ্ধিং গতাঃ॥ এ স্থলে রামানুজ গীতার শ্লোকটিকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রীয় অনেক কর্ম্মই প্রথমে পারলৌকিক কামনার প্রলোভন থাকে। আবার সকামকর্ম্মের শেষে নিষ্কামভাবের উপদেশও দেওয়া হইয়া থাকে। "সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পমস্তু" বলিয়া সমস্ত কর্ম্মফল শ্রীভগবৎচরণে সমর্পণ করিবার যে বিধি, তাহার উদ্দেশ্য সকাম কর্ম্মকে নিষ্কামেই পরিণত করা। প্রথমে আরম্ভ করিবার সময়ে সকাম ও নিষ্কাম উভয় প্রকারই পরিণত করা। প্রথমে আরম্ভ করিবার সময়ে সকাম ও নিষ্কাম উভয় প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে "যথা অমুক ফল কামনয়া" বা "শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামনয়া"।

আমার চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল হইবে, জ্ঞানলাভ যোগ্যতা জন্মিবে—এইরূপ কামনা-বশতঃ যাঁহারা নিষ্কামকর্ম্ম করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্কাম নহেন, অর্দ্ধনিষ্কাম মাত্র। প্রথমে অর্দ্ধনিষ্কাম শেষে কেবল শ্রীভগবৎ প্রীতিকামনা অবশিষ্ট থাকিবে। শ্রীভগবৎ প্রীতিকামনা নিষ্কাম। ভগবানের প্রীতিকামনা ও কর্ম্মীর নিজের কোন কামনা নহে। কর্ত্তার নিজের কি ঐহিক কি পারলৌকিক কামনা থাকিলেই তাহা নিষ্কাম। নচেৎ মুক্তিকামনা থাকিবে না, শ্রীভগবৎ প্রীতি

কামনা থাকিবে না, তবে কি উদ্দেশ্যে কি প্রয়োজনে লোকে কর্ম্ম করিবে? উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন না থাকিলে মন্দ ব্যক্তিও কর্ম্ম করে না।

সকামে উৎকৃষ্টতর স্বার্থের পরিপোষণ। নিষ্কামে উৎকৃষ্টতর স্বার্থেরও বলি। সকামে ঐহিক নিকৃষ্ট স্বার্থেরই বলি। ঐহিক নিকৃষ্ট স্বার্থ যে কর্ম্মে বিদ্যমান, তাহা কুকর্ম্ম। কুকর্ম্মের ফল পারলৌকিক দুঃখ, অপকৃষ্ট জন্ম কিম্বা ঐহিক অবনতি। পক্ষান্তরে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

হৃদয়ে স্থিত যাবতীয় কামনা যিনি ত্যাগ করিতে সক্ষম, তিনি মরণ ধর্ম্মশীল হইয়াও অমৃতত্ব লাভের অধিকারী। স্থূলদেহেই তাঁহার ব্রহ্মলাভ ঘটে। এই অমৃতত্ব মোক্ষ; দেবত্ব নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে কুকর্ম্ম, অকর্ম্ম, এবং কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, নিষ্কামকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। কিন্তু আমরা কামনাবশবর্ত্তী হইয়া ঐ নিত্যকর্ম্মকেও সকাম করিয়া লইয়াছি। পাপক্ষয় উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিষ্কাম কিনা, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। মোট কথা, কর্ত্তার মনোবৃত্তি অনুসারে সকামও নিষ্কাম, নিষ্কামও সকাম হইতে পারে। আমরা যাহাকে সকাম কর্ম্মী বলিয়া জানিতেছি, হয়তঃ তিনি লোক সংগ্রহার্থ সকাম কর্ম্মের ভাণ করিতেছেন! আবার যাঁহাকে নিষ্কামকর্ম্ম করিতে দেখিতেছি, হয়তঃ তাঁহার অন্তরে কামনার সূক্ষ্মবীজ রোপিত হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এমন লোকও আছেন, যাঁহারা পারলৌকিক কর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব বশতই সকাম বিতৃষ্ণ, নিষ্কাম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা সকামে বিতৃষ্ণও নন, নিষ্কামও নন। ত্যাগস্বীকার না থাকিলে, স্বার্থ বলি দিতে না পারিলে নিষ্কাম হওয়া যায় না। নিষ্কাম হওয়া সহজ কথা নহে। কত জন্ম-অভ্যাসের ফলে, কত সুকৃতির বলে, মানব তবে নিষ্কাম হইয়া থাকে। এই সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মের বিতৃষ্ণ, ঐহিক কামনার পূরণেই ব্যস্ত, ভোগ সুখে ব্যাপৃত ব্যক্তিই সংসারে অধিক। এই সকল ব্যক্তি সকামের নিন্দা করিয়া থাকে, নিষ্কামের অনুষ্ঠান অসম্ভব অন্ততঃ নিজেদের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য ভাবিয়া থাকে। ফলে কোন ধর্ম্মকার্য্যে মতি দেয় না, ভোগ সুখেই দিন কাটায়, স্বার্থের তরেই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা নিরন্তরই সংসারে আসিয়া জন্মমৃত্যু ভোগ করে, সংসারে অভিনেতা সাজিয়া খেলা করে। কাম

ক্রোধ ও লোভের সেবা করিয়া নরকের পথ প্রস্তুত করাই তাহাদের কার্য্য। ভগবান তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"আশাপাশ শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ।
দর্হন্তে কামভোগার্থম ন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্॥
*   *   *   *
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা-মোহজাল:সমাবৃতাঃ॥
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
*   *   *   *
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিং॥"

"নাড়া"।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় বাণীকণ্ঠ।

এই "নাড়া" শব্দটী কোন অভিধানে পাই নাই, কোন সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ নয়। এটি খাঁটি দেশজ ভাষা। কৃষিজীবি ব্যক্তিদের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়, যখন কোন রাখাল বা বিচালি বাহক হয় ত ভাত খাইবার জন্য গৃহস্থকে বিরক্ত করিতেছে, তখন গৃহস্বামী হয়ত বিরক্তি ভাবে ছড়া কাটিয়া বলিতেছেন,—"যে ঝুলো চ'ষে সে থাকলো বসে, আগে নাড়া কাটাকে ভাত দাও"। পাঠক এই যে নাড়া শব্দটি উল্লেখ করিলাম, এই নাড়াটি কি, তাহা পল্লীবাসী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তবে সহরবাসী পাঠক মহাশয়দের অবগত করাইবার জন্য, আমাকে ইহা কি বস্তু তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। ক্ষেত্রে ধান্য কাটিয়া লইবার পর, খড়ের গোড়া যাহা থাকে, চাষিগণ তাহাকেই নাড়া বলিয়া থাকেন, সেই নাড়া না কাটিলে আর চাষ দেওয়া যায় না। তবে ভূমি কর্ষণ করিতে যিনি লাঙ্গল ধারণ করেন, তাঁহারই পরিশ্রম অধিক, আর যিনি কাস্তে দিয়া আস্তে আস্তে নাড়াগুলি

কাটেন তাঁহার শ্রম তত অধিক নয়। এই জন্যই চাষির কাছে রাখাল ও কৃষকের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু আমি যে আজ নাড়া শব্দ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, এ শব্দটি আর ইতর ভাষা নয়। এ ভাষা সেই বোঝে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম পয়োধিতে যার প্রাণ ভাসিয়াছে, এ ভাষা সেই বোঝে, কি জন্য পূর্ণব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি বোঝেন এ ভাষা কার-ভাষা, ব্যাসদেবের অবতার শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের ভাগবত যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি বোঝেন, এ ভাষা কার মুখের ভাষা, এ শব্দাভিমানী সাহিত্যিকগণের সংশোধিত বৈয়াকরণিক ভাষা নয়, এ ভাষা ভায়ের ভাষা, এ ভাষা ভালোবাসার ভাষা, এ ভাষা বিশুদ্ধ প্রেমের ভাষা, জান ভাই! এ ভাষা কার মুখের ভাষা, ভাষায় যাঁর তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, বর্ণে বর্ণে যোগ হইয়া যে, ভাষা, ধারণ করে, বর্ণের স্বরূপা যিনি, তিনি যাঁর স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না, এ তাঁরই মুখের ভাষা, এ ভাষা বৈদিক কালের ভাষা নয়, পৌরাণিক কালের ভাষা নয়, এ তান্ত্রিক কালের ভাষা, যে সময়ে তন্ত্রের ব্যভিচারে জগৎ জ্বলিয়া যাইতেছিল, পঞ্চ-মকার পঞ্চ কন্যা লইয়া চক্র পশু বলিদান ভিন্ন সাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রায়ই লোপ পাইয়াছিল, সেই সময় যিনি অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডগণের হৃদয়রূপ মরুভূমিতে হরিপ্রেমের প্রস্রবন ফুটাইয়াছিলেন, বিধর্ম্মি যবনকে হরি প্রেমোন্মত্ত করাইয়াছিলেন, পাষাণকে গলাইয়া প্রেমের প্রস্থনরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তার প্রমাণ প্রকাশানন্দ হইতে প্রবোধানন্দ, প্রকাশানন্দকে যিনি প্রবোধানন্দ করিয়াছিলেন, এ ভাষা তাঁর মুখের ভাষা। ইনিকে,—ইনিই সেই নদীয়ানিবাসী জগন্নাথমিশ্রের গৃহিনী শচীদেবীর সোহাগের নিমাই, ভক্তগণের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ, গদাধরের গৌর, শ্রীনিবাসের বিশ্বম্ভর, নিতাইয়ের প্রাণ গোরা, ইনিই নাড়া নাড়া বলিয়া কাহাকে ডাকিয়াছিলেন, গৌরভক্তগণ অবশ্যই জানেন। বৈষ্ণবগণ অবশ্যই জানেন এ নাড়া কে? যিনি সদাশিব মহাবিষ্ণুর পূর্ণ অবতার, প্রথমে কমলাক্ষ শেষ জীবনে অদ্বৈতাচার্য্য। এই অদ্বৈতাচার্য্য নাড়া কেন?—ইহারই ডাকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন নড়িয়াছিল। তাই একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে ক্রোধের বশে অদ্বৈতকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন:—"আরে বুড়ো, ডেকে ডেকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন নড়িয়ে প্রেম দয়া বিতরণের জন্য আমায় ধরায় টেনে এনে আত্মজ্ঞানি হতে চাস্, জ্ঞানমার্গে যেতে চাস্, দাঁড়া দাঁড়া বুড়ো, তুই যেমন আমার বৈকুণ্ঠের সিংহাসন নড়িয়েছিস্ তখন ত আত্মজ্ঞান বৃক্ষের মূল ধরে আমি এমন নাড়া দেব, যে সে বৃক্ষ সমূলে তুলে ফেলে, সেইস্থানে প্রেম সরোবর

খনন করবো," এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যের জটা ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এই আমার নাড়া এই আমার নাড়া! নাড়া, নাড়া, এই নাড়া পাইয়া নিত্যানন্দ ছুটিতে ছুটিতে সেই স্থানে আসিতে আসিতে গৌরপ্রেম পারাবারে ভাসিতে ভাসিতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, এই সেই নাড়া, এই সেই নাড়া,—যার ডাকে বৈকুণ্ঠের নারায়ণের টনক নড়েছিল এ সেই নাড়া, ঐ অদ্বৈতাচার্য্য সেই নাড়া, যাঁর ডাকে নারায়ণের সিংহাসন নড়েছিল, এ সেই নাড়া, হায় হায় সেই নাড়া শব্দ এখন নেড়ানেড়ি শব্দে উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু আবার নাড়াকে চাই। ডাক ভক্তবৃন্দ আবার নাড়াকে ডাক, নেড়ানেড়ির দল হইতে নাড়া, জাগিয়া উঠিয়া গগনভেদি গভীর ডাকে শ্রীগোবিন্দের সিংহাসন নাড়াইয়া গোবিন্দকে নড়াইয়া, গোবিন্দকে ধরায় আনয়ন করুন, নতুবা ধর্ম্মের ভাণে জগৎ জ্বলিয়া যায়, নাড়া আবার এসে নারায়ণের সিংহাসন নড়াও, ভেদাভেদের লহরীতে জগৎ ডুবিয়া যায়, নাড়া আবার ভগবানের টনক নড়াও, আবার প্রভুপাদ গোস্বামী বিজয়হরি নামের বিজয় নিশান হস্তে জগৎকে উদ্ধার করুন, আবার রামকৃষ্ণের স্বরূপ রামকৃষ্ণ প্রকট হইয়া ভাঙ ধুতুরা পানকারি ভণ্ডগণের ভাণ ভাঙ্গাইয়া ধর্ম্মরূপ কল্পতরু মূলের পথ দেখাইয়া দিন, আবার নিত্য সনাতন নিত্যগোপালের নৃত্য নিত্য নিত্য ভক্তগণ চক্ষে দেখুন, আজকাল অনেকেই বৈষ্ণবগণকে নেড়ানেড়ির দল বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সেই নেড়ানেড়ীর দল হইতে নাড়া আবার জাগিয়া উঠ, তোমার প্রাণের ধন নারায়ণকে আবার জাগাও, তোমার ডাকে আবার ভক্তগণ শুনতে পান, যেন অভয় বাণীতে নারায়ণ— বলিতেছেন :—আমি যাইতেছি ভয় নাই "নাড়া"।

আদর্শ রমণী।

(গল্প নহে—প্রকৃত ঘটনা)

কলিকাতা মহানগরীতে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিষয় সম্পত্তি তেমন কিছু ছিল না। সামান্য গৃহস্থের বাসের উপযোগী একখানি বাড়ী ও অল্প বেতনের একটি চাকরী ছিল, তাহাতেই দিনপাত হইত। সংসারে

তাঁহার পত্নী ও একমাত্র পুত্র। কালের কঠোর নিয়মে ব্রাহ্মণ প্রৌঢ়ে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহিনী মিতব্যায়িতা গুণে ও সামান্য সঞ্চিত স্ত্রীধনে পুত্রটীকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। বালক বুদ্ধিমান পরিশ্রমী ও প্রিয়দর্শন। প্রতি বৎসরই সরকার প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যে বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসর বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। স্থানীয় এক অসীম ধনশালী তাঁহাকে স্বীয় কন্যাদান করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার আরও দুই তিনটী কন্যা ছিল, সকলকেই তিনি আপনার ন্যায় ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহলক্ষ্মী করিয়াছেন, কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে মত্ততা, অহঙ্কার ও অশিক্ষা প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, তিনি সে সকল দোষ বৰ্জ্জিত ছিলেন, সেই জন্য বৈবাহিত সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শিক্ষিত দরিদ্র যুবকের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, জামাতা ও কন্যার প্রতিপালনের সমুদয় ভার গ্রহণ করিবেন এবং কন্যাটীকে পুত্রদিগের ন্যায় স্বীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন। কুলিন দরিদ্র বালকটী বি-এ পাশ করিবামাত্র তিনি ঘটক দ্বারা তাহার পরিচয় লইয়া বালকের মাতার নিকট স্বয়ং গমন ও তাহার পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মাতা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ভাবিলেন, তাঁহার ন্যায় অতি দরিদ্র সহায় সামর্থ হীন ব্যক্তির এইরূপ নৃপতি বিশেষ ব্যক্তির সংস্রব স্বপ্নের অগোচর। ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়া কহিলেন, "আমার একটী অনুরোধ আছে তাহা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি মেয়েটীকে বিবাহের সময়, ও দ্বিরাগমনের সময়, কয়েকদিনের জন্য মাত্র আপনার বাটীতে পাঠাইব এবং আপনার পুত্রের ভরণপোষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিলে আপনার বধু আপনার গৃহে আসিয়া বাস করিবেন।" ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সে কালের গৃহিণী ছিলেন, সরল হৃদয়, স্বার্থ পরিত্যাগ কিরূপে করিতে হয়, উত্তমরূপে জানিতেন। ছলনা, শঠতা ও সন্দেহ হৃদয়ে স্থান পাইত না। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও পুত্র প্রভূত ধনের অধিকারী হইবে, ভাবিয়া তাঁহার কথায় স্বীকার করিলেন। বধূ লইয়া সুখে সংসার ধৰ্ম্ম করিবেন, এ আশায় উপস্থিত হতাশ হইলেও পুত্রের মুখ চাহিয়া দ্বিরুক্তি করিলেন না, আপনার কষ্টের দিকেও লক্ষ্য করিলেন না। যথা সময়ে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বধুটি পিতৃগৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। পরে দ্বিরাগমনের সময় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণপত্নী ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বৈবাহিকও নিজ অঙ্গীকার মত সুদিনে কন্যাটিকে

শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন। বলাবাহুল্য সঙ্গে দাস দাসী, দ্বারবান প্রভৃতি অনেকগুলি লোক আসিল। ব্রাহ্মণ গৃহিণী সেই সকল লোকের শুশ্রূষা প্রভৃতির জন্য পূর্ব্ব হইতেই যথাশক্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বধু বড় লোকের মেয়ে, তাঁহার প্রাতঃ হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ আহার বিলাস দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই জন্য অস্থায়ীরূপে দুই একটী দাসীও নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় অস্থায়ী দাস দাসীর দ্বারা যথা সময়ে কোন কাজই হয় না, সেই জন্য তাঁহাকেই অনেক কাজ করিতে হইত। তিনি রাত্রি প্রহরে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রভাতের প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত ও যথাস্থানে রাখিতেন। নববধু-বুদ্ধিমতী, সমুদয় বুঝিতে পারিলেন। শ্বশ্রূর দুঃখে দুঃখিত হইলেন, ভাবিলেন, যদি এই সংসারে থাকিয়া স্বামী ও শ্বশ্রূর সেবা না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ধারণ বৃথা। পিতৃগৃহের অতুল সম্পত্তি ভোগ করিয়া তিনি সুখী হইতে পারিবেন না। সমস্ত দিবস এরূপ চিন্তায় অতিবাহিত হইল, রাত্রেও সুনিদ্রা ভোগ করিতে পারিলেন না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে রন্ধনগৃহে মশলা পেশনের শব্দ শ্রুত হইল। তিনি শ্বশ্রূর শয়নগৃহে গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিলেন, তাঁহার মাতা এ গভীর রাত্রে স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। ধীরে ধীরে রন্ধনগৃহে গিয়া শ্বশ্রূর পাশে দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "মা আজ আমি স্বহস্তে এই সকল কর্ম্ম করিব, আপনাকে আর এ কষ্ট করিতে দিব না।" ব্রাহ্মণ পত্নী বধুকে সমাগত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না—না মা যাও, তুমি বালিকা, রাত্রি অনেক আছে, তুমি ঘুমাওগে, আমি এখনি কায সারিয়া যাইতেছি।" বধু আর বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সম্মুখস্থ মার্জ্জনী লইয়া গৃহ মার্জ্জনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বশ্রূ কহিলেন, "মা তুমি বড় লোকের মেয়ে এ কাজ করা তোমার অভ্যাস নাই; বিশেষতঃ তোমার পিতা শুনিলে আমার উপর রাগ করিবেন, অতএব আমার কথা রাখ, যাও শয়ন করগে।" বধু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না শশ্রূর সহিত গৃহকর্ম্মে রজনী প্রভাত করিলেন। প্রভাতে এক দাসীর হস্তে তাঁহার পিতার নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাঠাইলেন, "পিতা আপনি বিদ্বান, ধনবান হইলেও বিদ্যার কি মোহিনীশক্তি আছে, তাহা জানেন, আপনি আমাকে মুর্খ ধনবানের হস্তে না দিয়া গরীব বিদ্বানের করে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, আমি আসিয়া অবধি পরম সুখে আছি জানিবেন, আমার নিতান্ত ইচ্ছা আপনি আমাকে আমার শ্বশুরালয়ে থাকিবার

অনুমতি দেন, আমি মধ্যে মধ্যে আপনার ও পূজনীয়া মাতার চরণ দর্শন করিয়া আসিব। আমার এ সকল দাস দাসীর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আপনি ইহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিবেন।" ধনাঢ্য ব্যক্তি কন্যার পত্র পাইয়া ভাবিলেন, কন্যাটী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, মর্ম্মাহত হইয়া আক্ষেপের সহিত পত্র লিখিয়াছেন, এইরূপ সন্দিহান হইয়া তৎক্ষণাৎ জামাতা গৃহে আগমন করিয়া কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে নিজের বাসনা জ্ঞাত করিলেন। কন্যাটী পিতার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "আপনি আমায় আপনার বিষয়ের অধিকারিণী করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি আপনাকে তাহা করিতে দিব না, তাহাতে আমার ভ্রাতারা আমার উপর জাতক্রোধ হইবেন। বিশেষতঃ আপনার জামাতার তাহা অভিপ্রেত নহে, আমি তাঁহার মন জানিয়াছি। তাহাতে তিনি আন্তরিক কষ্ট পাইবেন। আপনার জামাতার অভিপ্রায় নিজে সংসারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা হইয়াছে। সম্প্রতি একটী কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে অসুখী করিয়া আমরা কেহই সুখী হইতে পারিব না। আপনি আমাকে অতি সৎপাত্রে দান করিয়াছেন আপনি জানিবেন, আপনার এই মেয়েটী আপনার সকল মেয়ে অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আমি আপনার চরণের কৃপায় এই সংসারে থাকিয়া যথার্থ স্বামীর পত্নী ও স্নেহময়ী শশ্রূর বধূ হইয়া পরমসুখে থাকিব জানিবেন।" ধনাঢ্য ব্যক্তি কন্যার আগ্রহাতিশয় প্রফুল্ল বদন. হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারিলেন ও কন্যার ভূয়োশি প্রশংসা করিলেন, আপনাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া দাসদাসীগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। রাজকন্যা সদৃশী এ রমণী স্বহস্তে সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিতেন, স্বামী ও শ্বশ্রূর সেবা করিতেন, গৃহস্থের সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া দিবা দ্বিতীয় প্রহরে প্রসন্নমনে যাহা থাকিত, তাহাই ভোজন করিতেন, স্বামীর নিকট বহু প্রত্যাশা একেবারে ত্যাগ করিয়া ছিলেন, সর্ব্বদা প্রিয়ভাষিণী ও চারুহাসিনী ছিলেন। ব্রাহ্মণকুমারও নিজের অধ্যবসায়গুণে উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। সাবিত্রী স্বরূপা জীবন সঙ্গিনীর মিতব্যয়িতাগুণে প্রভূত ধনসঞ্চয় ও দান ধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্ম্মে জীবনযাপন করিয়া ছিলেন।

"হাতীশালা, ঘোড়াশালা,
শালার গায়ে শাল দোশালা"

এইরূপ পতির প্রতি ভক্তিমতী হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু যে রমণী বাল্যকালে

পিতৃগৃহে অসীম ভোগসুখে লালিত পালিত হইয়া গরীব স্বামীর গৃহে আসিয়া পতিভক্তি দেখাইতে পারেন, সেই গৃহস্থ সংসারের উপযুক্ত হইতে পারেন। গৃহস্থ রমণীর সমুদয় গুণ দেখাইতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি আদর্শ রমণী।

বাল-বিধবা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ।

শৈশবে বিধবা বালা অতি কচি মেয়ে।
জানেনা, বুঝেনা তার কবে হলো বিয়ে,
নিশার শেফালি গেছে উষাগমে ঝরে,
কিশোর বিলাস এসে তারে নেছে ঘিরে।
পায় নাই ছুঁইতে অলি ধুলা মাখা কায়,
শিশির শিকর নেত্র মুক্তার আভায়,
শৈশবে যেমন ছিল—এখনো তেমন।
খেলা ধুলা করে—কিন্তু—বিষণ্ণ বদন।
হাসি পেলে হেসে ফেলে—মেঘ ঢাকা ছায়।
কান্না এলে কেন্দে ফেলে বুকে চাপা দায়।
বিগলিত কেশপাশ এলো মেল বেশ,
শিথিল কটির বান্ধ মুখে মাখা ক্লেশ।
সদাই উদ্ভ্রান্ত মন, কি যেন কি চায়,
নত মুখে পথে গিয়ে হাটে পায় পায়।
গঙ্গাতীরে একদিন তৃষিত নয়নে—
একটা নৌকার দিকে চায় ঘনে ঘনে।
অদূরে তরণী ভাসে বিচিমালা মাঝে—
তরুণ তরুণী কোন তাহাতে বিরাজে।
তাদের বিলাস দেখি, ভাবিছে কিশোরি—
কেমনে খেলিছে এরা বুঝিতে না পারি।

লাজের মাথাটি খেয়ে ঐ কালা মুখী—
মানুষের সাথে খেলে হইতেছে সুখি।
আমার মনের কাছে আছে যেই জন,
জানিনা চিনিনা তার মুরতি কেমন!
মাঝে মাঝে পাই শুধু রূপের আভাস,
শিহরে কিশোর মন—হয়না বিকাশ।
যেতে চাই তার পাশে ভালবাসা নিয়ে,
সেই লাজে মরে যাই—কেউ দেখে চেয়ে।
চেপে রাখি বুকে তার হাসি কান্না দিয়ে,
অজানা মানুষের সাথে যার হয় বিয়ে।
ভাবিতে ভাবিতে বালা অবশ হৃদয়—
দূরে গেল নৌকা খানা দেখা নাহি যায়—
শিহরে উঠিল পুনঃ বিশ্লথ অন্তর—
দুই ফোঁটা অশ্রুজল বুকের উপর।
গৃহ পানে ধীরে বালা করিল গমন,
অপূর্ণ কৈশোর হৃদি মুগ্ধ অনুক্ষণ—
নিকটে দাঁড়ায়ে কবি হেরে বালিকায়—
ভেবে নিল দুটি কথা মুগ্ধ কবিতায়।
বঙ্গের বিধবা নারি সরগ প্রতিমা,
চেয়ে দেখ ধরাবাসী বুঝহ গরিমা।
ভেঙ্গনা প্রতিমা এই রাখ ঘরে ছবি,
গলায় কাপড় দিয়ে কহিতেছে কবি।
বাঙ্গালির যদি কিছু পবিত্রতা থাকে,
তবে তাহা এই রঙ্গে ছাপাইয়া রাখে।
জানেনা বুঝেনা কেবা গৌরব ইহার,
কর সবে বিধবার মহিমা প্রচার।
নন্দনের পারিজাত অমৃতের খনি,
বঙ্গের বিধবা নারী লক্ষ্মী স্বরূপিনী।

সাবিত্রী।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

(১)

"অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্ দৃষ্ট পূর্ব্বাম বা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা॥" *

সাবিত্রী রমণীরত্ন। এ দেশের ললনাগণ মধ্যে প্রায় সকলেই সাবিত্রীর অমিয়-মধুর পুণ্যকথা—সতীত্ব বলে তাঁহার মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার অপূর্ব্ব গাঁথা—অবগত আছেন। বঙ্গীয় মহিলারা জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই শুভ মুহূর্ত্তে—যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে সাবিত্রী আপনার অলৌকিক পাতিব্রাত্য-মাহাত্ম্য বলে সত্যবানের মৃতদেহে জীবনদান করিয়াছিলেন—সেই পুণ্য তিথিতে, একটি কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ ব্রতের নাম, সাবিত্রী ব্রত; ব্রতানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য পতির দীর্ঘজীবন কামনা। ব্রত-ফলে এখন ঘরে ঘরে সতীর মৃতপতি পুনর্জ্জীবিত না হইলেও, উহা যে সাবিত্রীর পুণ্য-চরিত্রের পবিত্র-মধুর কাহিনী অনন্তকাল ঘোষণা করিবে, এবং বঙ্গের গৃহ-লক্ষ্মীদিগকে তাঁহারই প্রদর্শিত আদর্শ সতী-ধর্ম্মের রত্নময় পুণ্যপথ প্রদর্শন করিয়া সাবিত্রীর পুণ্যকীর্ত্তি জগতে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাবিত্রী আদর্শ সতী। সতী-কথা আলোচনায় নারী-চরিত্র সুগঠিত ও পুণ্যসঞ্চয় হয়; তাই আজ আমরা পতিব্রতা সাবিত্রীর চিরপবিত্র আলেখ্য উদ্ঘাটনে যত্ন করিব। উদ্যমের সফলতা শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন।

সাবিত্রীর জন্ম।

অতি প্রাচীনকালে—সত্যের সেই মধুময় সুবর্ণ যুগে এ দেশে মদ্রদেশ নামক একটি পরম সুন্দর মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজ্য ছিল। এক সময় মহাত্মা অশ্বপতি এই মদ্রদেশের রত্নময় সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক,

* সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের কথা বর্ণনকালে মহাভারতের কবি বলিয়াছেন, "ইনি দ্রুপদ দুহিতার অনুরূপ পতিব্রতা ও মহাভাগা; আপনি পূর্ব্বে আর কি এরূপ কোনও সীমন্তিনীকে দর্শন বা এরূপ কোনও সতীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন?"

জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও প্রজারঞ্জক রাজা বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজোচিত মহাসমৃদ্ধি, সুধাধবলিত সমুচ্চ রম্যহর্ম্যরাজি, অগণিত রথ-রথী এবং অসংখ্য দাস-দাসী প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। অনন্ত রাজ ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম প্রভুত্ব, অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত, সদা হাস্য-কোলাহল মুখরিত সুশোভিত রাজধানী, অভ্রভেদী সৌধমালা, মহামূল্য মণি-মাণিক্য সমূহ, প্রিয়দর্শনা মধুর-ভাষিণী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী, সদা অনুগত পৌরজন এবং রাজভক্ত প্রজাগণ, এ সমুদয়ে কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। কি জানি কি এক অজ্ঞাত প্রদেশের অপূর্ব্ব অমূল্য নিধির—কি এক স্বর্গীয় রত্নের অভাবে, কি এক-খানি অচেনা মুখের দর্শনলাভ পিপাসায় রাজা অতি বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতেন।

রাজা নিঃসন্তান। এই অপত্যহীনতাই তাঁহার সকল দুঃখের একমাত্র নিদান—অনন্ত বিষাদের একমাত্র কারণ। রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য—বিরাট রাজ্য, সন্তান না, থাকিলে তাহা ভোগ করিবে কে? রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তায়—বংশ-রক্ষার বিষম দুর্ভাবনায়—গভীর পরিতাপে তাঁহার মন সর্ব্বদাই বরক্লিষ্ট হইত। নৃপতি সন্তান কামনায় মিতাচার, মিতাহার, সংযম, শুদ্ধাচার ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কত ব্রত-নিয়ম, দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ ও দেব-দেবীর উপাসনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মন এই দুঃখে নিয়ত ম্রিয়মাণ থাকিত।

রাজার বিষাদ ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া পতিব্রতা রাজমহিষী মালবী দেবীর কুসুম-কোমল প্রাণ গভীর বেদনায় অবসন্ন হইয়া পড়িত, তথাপি তিনি স্বামীর প্রাণে এতটুকু শান্তির অমৃত-বারি সেচন করিবার জন্য নিয়ত প্রাণপণ যত্ন করিতেন। রাণী আপনার প্রাণের অনন্ত ব্যথা—পুঞ্জীভূত দুঃখের কথা, অন্তরের নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বামীর প্রাণে প্রীতি-প্রফুল্লতার অমৃত-নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া দিবার জন্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন, দাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যা এবং সখীর ন্যায় তাঁহার সহিত পরিহাস-রসিকতায় নিরত থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও শুদ্ধ-সংযত হৃদয়ে দান-ধ্যান, দেব দ্বিজ ও অতিথি-সেবা এবং ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া পরম শান্ত ও যারপর নাই সাত্বিকভাবে নিয়ত কালাতিপাত করিতেন। এবং তিনি সর্ব্বদা আন্তরিক ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবানের রাতুল পদে নীরবে তাঁহার মনের কথা ও হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া, একটি সন্তান প্রদানে

স্বামীর প্রাণে শান্তি সঞ্চার করিবার নিমিত্ত, ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় প্রার্থনা করিতেন।

পতির অনুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী, স্বামীসহ একরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়াই স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিনী। সাধ্বী সতী মালবী তাহা ভালরূপই জানিতেন, এবং ঐকান্তিক যত্নে সেরূপ অনুষ্ঠানে সদা ব্রতী থাকিতেন। ইহারই নাম সতী-ধর্ম্ম এবং কায়মনোবাক্যে পতির প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই পতিব্রতা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। পতি-পত্নীর আহারে—বিহারে, আচারে-ব্যবহারে ও ধর্ম্ম কর্ম্মে পার্থক্য থাকিলে তাঁহাদের একপ্রাণতা অসম্ভব। এই একপ্রাণতার অভাব থাকিলে প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম—পতি পত্নীর গভীর ভালবাসা জন্মিতে পারে না। রূপজমোহ বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্দাম লালসার চিত্তাকর্ষণ, প্রকৃত ভালবাসা বা পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম নহে; উহা রূপের হাটের নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার বাণিজ্য,—আসঙ্গলিপ্সা উহার ধ্রুব লক্ষ্য। উহা ধার্ম্মিকের বা সাত্ত্বিকের লক্ষণ নহে। রাজা অশ্বপতি এবং রাণী মালবী সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধার্ম্মিক দম্পতি; তাই তাঁহাদের উভয়ের একরূপ অনাবিল গভীর প্রেম এবং একবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান। পিতা মাতা সাত্ত্বিক ও ধর্ম্মবলে বলী না হইলে ধর্ম্মাত্মা গুণবান সন্তান লাভের আশা সুদূর পরাহত।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে রাজা প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেন। তথাপি তিনি সন্তান-মুখ দর্শনে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে রাজা, রাজ্যের নানা শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ চিন্তাশীল মুনি-ঋষিদের নিকট হইতে সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী দেবীর আরাধনার নিমিত্ত সাধকের দিব্য বেশে বন যাত্রা করিলেন। রাজার বনগমনে রাজপুরী ও রাজ্যের লোকেরা যারপর নাই বিষাদিত হইলেন। এবং রাজমহিষীও বিষাদ-ম্লান বদনে ভক্তিভরগত প্রাণে দেবতার আরাধনায় নিরত হইলেন। রাজার অনুপস্থিতি-কালে বিশ্বাসী প্রবীণ অমাত্যগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সত্যব্রত ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাধার্ম্মিক নৃপতি অশ্বপতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্তরিক গভীর ভক্তি বিশ্বাসের সহিত সাবিত্রী দেবীর কঠোর তপস্যায় ক্রমাগত আঠার বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন। এই সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী মহা সাধনায় তাঁহার একাগ্রতা ও সাত্ত্বিকতার অবধি ছিল না। তিনি বেদোক্ত সাবিত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এই সাবিত্রী দেবীর তপস্যা করিয়া—যজ্ঞের পর যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, পবিত্র যজ্ঞীয় ধূমে, আকাশপট সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা এই

অষ্টাদশ বৎসর প্রত্যহ দেবীর নামে যজ্ঞীয় হুতাশনে লক্ষাহুতি প্রদান করিতেন। অবশেষে রাজার কঠোর সাধনায় দেবী তুষ্ট হইলেন।

সাবিত্রীর জন্মকথা প্রসঙ্গে মহাভারতের বর্ণনাটুকু এইরূপ :—

"আসীন্মদ্রেষু ধর্ম্মাত্মা রাজা পরম ধার্ম্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পার্থিবোহশ্বপতির্নাম সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্॥
অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
হুত্বা শত সহস্রংস সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ॥"

ভাবানুবাদ।

মদ্রদেশ অধিপতি ধার্ম্মিক সুজন,
অশ্বপতি নামে রাজা ক্ষমা পরায়ণ।
সত্যব্রত ব্রহ্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় অতি,
যাগ-যজ্ঞে অনুরক্ত দাতা মহামতি।
পৌরজন প্রিয় সদা পৃথিবী ঈশ্বর,
সর্ব্বপ্রাণী হিতে রত ছিলা নিরন্তর।
বিগত যৌবন তবু সন্তান বিহীন,
অপুত্রক বলি রাজা বিষাদ-মলিন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি যত তীব্র আচরণ,
পুত্রলাভ তরে নৃপ করেন গ্রহণ।
যথাকালে স্বল্পাহার ইন্দ্রিয় দমন,
করেন যতনে নিত্য দেব আরাধন।
বেদোক্ত সাবিত্রীমন্ত্র যপি নিরন্তর,
লক্ষাহুতি হুতাশনে অর্পে নৃপবর।
হেনরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অবিরত,
করিলা কঠোর ব্রতে সময় অতীত।

অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার পর সাবিত্রী দেবী রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য সহসা সেই যজ্ঞীয় ধূমরাশি হইতে উত্থিত হইয়া যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। ধ্যানস্থ রাজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার নিত্যারাধ্যা মূর্ত্তিমতী সাবিত্রী দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। দেবী দর্শনে তপস্যাক্লিষ্ট রাজার ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তি তদ্গতচিত্তে দেবীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে যোড়-হস্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তখন দেবী কহিলেন, "বৎস, আমি আসিয়াছি; তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

রাজা বলিলেন, "মা, আমার অভাব-আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনার বিষয় ত তোমার অজ্ঞাত নাই; তবে আর অধম সন্তানকে এ প্রশ্ন কেন? একমাত্র সন্তান কামনা করিয়াই আমি দেবীর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছি; তুমি কৃপা করিয়া আমার সে বাসনা পূর্ণ কর,—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হই।"

দেবী কহিলেন, "তথাস্তু, তোমার বাসনা পূর্ণ হউক; আমার বর প্রভাবে তুমি শীঘ্রই একটি সর্ব্ব সুলক্ষণা মহা তেজস্বিনী পরমাসুন্দরী কন্যারত্ন লাভ করিবে। তুমি পুত্রপ্রার্থী হইয়া কন্যারত্ন পাইতেছ বলিয়া বিস্মিত বা দুঃখিত হইও না; যেহেতু, এই কন্যাসন্তান হইতেই তোমার মহাবলী কুলপাবক শত পুত্র লাভ হইবে। সুতরাং পুত্রলাভ হইল না বলিয়া অযথা দুঃখ না করিয়া তুমি ইহাতেই সুখী হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে গৃহে গমন কর। তোমার মঙ্গলের জন্যই চিরমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার এ বিধান। আমি তাঁহার অলঙ্ঘ্য আদেশেই তোমাকে এ বর প্রদান করিলাম।"

এই বলিয়া সাবিত্রী দেবী তথা হইতে সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। ইচ্ছা থাকিলেও নৃপতি দেবীকে আর একটি মাত্র কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না। দেবী-প্রদত্ত আশীর্ব্বাদের পবিত্র নির্ম্মাল্য কুসুমডালি মস্তকে ধারণ করিয়া—অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, রাজা অশ্বপতি প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে স্বভবনে গমন করিলেন।

রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দীর্ঘকাল অন্তে নৃপতির শুভা-গমনে—রাজা সন্তান বরলাভ করিয়া আসিয়াছেন শ্রবণে—নিরানন্দ রাজপুরী মহা উল্লাস-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। ভূপতি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া

রাজধানীতে ফিরিয়াছেন, এই পরম প্রীতিপ্রদ শুভবার্ত্তা শ্রবণে রাজ্যময় প্রকৃতি-পুঞ্জের ঘরে ঘরে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

অশ্বপতির সন্তান বর গ্রহণ সম্বন্ধীয় মহাভারতের বর্ণনাটুকু এইরূপ :—

"এতেন নিয়মেনাসীদ্বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু।
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিসভ্যগাৎ॥
রূপিণী তু তদা রাজন্ দর্শয়ামাস তং নৃপম্।
অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা॥
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ।
সর্ব্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব॥
বরং বৃণীষ্বাশ্বপতে মদ্ররাজ যদীপ্সিতম্।
ন প্রমাদশ্চ ধর্ম্মেষু কর্ত্তব্যস্তে কথঞ্চন॥

অশ্বপতিরুবাচ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়াময়া।
পুত্রা মে বহবো দেবি ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ॥
তুষ্টাসি যদি মে দেবি বরমেতং বৃনোম্যহম্।
সন্তানঃ পরমো ধর্ম্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া রাজন্নভি প্রায়মিমং তব।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈভগবাংস্তে পিতামহঃ॥
প্রসাদাচ্চৈব তস্মাত্তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ভুবি।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥
উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
পিতামহনিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ব্রবীমি তে॥

ভাবানুবাদ।

আঠার বৎসর কাল অতীত যখন,
হোমাগ্নি হইতে দেবী দিলা দরশন।

রাজারে সম্ভাষি দেবী, মধুর বচনে,
কহিলা, "হইনু তুষ্ট তব আচরণে।
প্রার্থনা করহ বর বাসনা যেমন,
যে বর চাহিবে বৎস! করিব অর্পণ।"
নৃপতি কহিলা, "আমি পুত্রের কারণ,
করেছি কঠোর ব্রত নিয়ম পালন।
বহু পুত্র হোক্ দেবি! প্রার্থনা আমার,
বংশধর হয় যেন পরে তারা আর।
মম প্রতি কৃপা যদি হ'য়েছে তোমার,
এই বর দানে প্রীত কর মা আমার।
পুত্র হ'তে ধর্ম্ম লাভ কহে বিপ্রগণ,
পুত্র বর মোরে দেবি! দাও এইক্ষণ।"
কহিলা সাবিত্রী দেবী, 'শুন নরমণি!
তোমার মানস আমি পূর্ব্ব হ'তে জানি।
সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মার গোচরে,
বলেছিনু আমি তব পুত্রলাভ তরে।
শুনহ একটি কন্যা তেজস্বিনী অতি,
ব্রহ্মার প্রসাদে ভূপ! পাইবে সংপ্রতি।
ইহাতে উত্তর আর না দিও রাজন্,
প্রীত হ'য়ে এবে আমি করিনু গমন।"
এই বলি বরদাত্রী করি বর দান,
অবিলম্বে অন্তরীক্ষে করিলা প্রয়াণ।

নিখিল জ্ঞান সম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ জন্ম সংস্কারকেই মানবজাতির প্রধানতম সংস্কার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুসন্তান জন্মগ্রহণ কঠোর সংযম ও ধর্ম্ম-সাধনা সাপেক্ষ। পতি সংযত মনে শুদ্ধান্তঃকরণে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সন্তান লাভের নিমিত্ত শ্রীভগবানের মধুররূপ ধ্যান ও তাঁহারই পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে সাত্ত্বিকভাবে, পতিগতপ্রাণা পবিত্র হৃদয়া সংযমশীলা শুদ্ধমতী ঈশ্বরচিন্তা নিরতা পুত্রার্থিনী পত্নীতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাকেই আর্য্যধর্ম্ম-গ্রন্থ এবং শরীর বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিধানমতে সুসন্তান বলে। জনক-জননীর মানসিক ভাব যেরূপ থাকে, সন্তানের মনের ভাবও

সেইরূপই হইয়া থাকে। তৎকালে দম্পতীর মনে আসুরিক ভাবের বিকাশ পাইলে—তাহারা সুরাপানাসক্ত ও আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া পশু-দম্পতীর ন্যায় সন্তানজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে—সন্তানের মন প্রাণও যে অধঃপতিত, নীচগামী এবং পশুভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বরং ঐরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। এরূপভাবে জাত সন্তানের শারীরিক তাড়িতপ্রবাহ অধোগামী হয়, এবং উহারা একরূপ তরুণ বয়সেই ঘোরতর বিলাসী, অমিতাচারী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া পড়ে। উহাদের পক্ষে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত প্রতিপালন অসম্ভব না হইলেও সুদূর পরাহত।

আর্য্যমহিলাগণ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের মূর্ত্তি দর্শন বা রূপচিন্তা করেন না। এ দেশে ঋতু স্নানান্তে দেব-মূর্ত্তি, আদর্শ মহাপুরুষগণের পবিত্র চিত্র অথবা সূর্য্য-দর্শন এবং তাঁহাদের ধ্যান (চিন্তা) করিবার একটি সুন্দর প্রাচীন প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। জননীর মন সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ থাকিলে সন্তানের মনও দেবভাব পূর্ণ হয়, এবং তৎকালে মাতার মনে আসুরিক ভাব বিদ্যমান থাকিলে, সন্তানের মনেও অসদ্ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অনেক সময় সন্তান যে বহুল পরিমাণে মাতার চিন্তাশক্তির অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধত্ব এবং পাণ্ডুরাজার পাণ্ডুত্ব প্রভৃতি পৌরাণিক সত্যও কি, এ কথারই সমর্থন করিতেছে না?

নিরন্তর ধর্ম্মশীলতা, মিতাচার, মিতাহার, সংযত, ব্রহ্মচর্য্য, দান ধ্যান, আরাধনা—উপাসনা বা তপস্যা কিংবা দেবতায় আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। সংযমী জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল না হইলে কেহ ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী সন্তান লাভে সমর্থ হইতে পারে না। অসংযমী, অধার্ম্মিক ও উৎশৃঙ্খল প্রকৃতির নরনারীর সন্তান লাভের তত সম্ভাবনা নাই। আর তাঁহাদের সন্তান জন্মিলেও সেরূপ পিতামাতার সন্তান ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ, মেধাবী, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভব কম। এ জন্যই ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসী হীনচরিত্র লোকে প্রায়ই নিঃসন্তান হইয়া থাকেন। এবং প্রায় অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের সন্তানগণও তেমন বলবান, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী, ধর্ম্মশীল ও দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায় না। উৎকৃষ্ট বীজ ও উর্ব্বরা ভূমি এবং অনুকূল জলবায়ু ব্যতীত উত্তম শস্যলাভের আশা করা যায় না। সুসন্তান সুপিতামাতার অঙ্গভূষণ।

জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিলে, ধার্ম্মিক, বলবান ও

দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মিবে কেমন করিয়া? ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ শুক্ররক্ষা। উৎকৃষ্ট বীজের ন্যায় উৎকৃষ্ট শুক্রই সুসন্তান লাভের একমাত্র নিদান। যোগ ও দেবারাধনা প্রভাবে মন নির্ম্মল সংযত, ধর্ম্মভাবপূর্ণ ও বিমল আনন্দযুক্ত হয়। মানুষের এ অবস্থাই সুসন্তান লাভের প্রকৃষ্ট অবস্থা। বহুতত্ত্ববিদ্ চিন্তাশীল আর্য্যঋষিরা এ সব তত্ত্ব ভালরূপই জানিতেন। এ জন্যই তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা রাজা অশ্বপতিকে যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্ম সাধনা ও সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এতদিনে মুনিঋষিদের সে উপদেশের শুভফল ফলিল। সংযম, শুদ্ধাচার, ব্রহ্মচর্য্য, যোগানুষ্ঠান, দেবারাধনা ও একাগ্রতা প্রভাবে এ বৃদ্ধাবস্থায় রাজার ক্ষীণদেহে পুনরায় যৌবনের বল ও যৌবনশ্রী ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন অন্তে রাজ্যের সকলেই শুনিল, এতদিন পরে অশ্বপতি মহিষী মালবী দেবী সন্তান সম্ভবা হইয়াছেন। এ শুভ সংবাদ শ্রবণে রাজ্যময় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণ কামনায় প্রত্যহ মন্দিরে মন্দিরে দেবার্চ্চনার মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনি হইতে লাগিল।

যথাকালে রাজমহিষী একটি পরমাসুন্দরী সর্ব্বসুলক্ষণা মহাতেজস্বিনী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। কন্যার অনন্যসাধারণ দেহশ্রী, সর্ব্বসুলক্ষণ ও অপূর্ব্ব দেহ-জ্যোতিঃ দর্শনে সকলে বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইল। নবজাত কন্যার রূপ-জ্যোতিতে সূতিকা-গৃহ যেন উজ্জ্বল আলোক প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মঙ্গল-বাদ্য, হুলুধ্বনি ও উৎসবানন্দ কোলাহলে রাজপুরী, রাজধানী ও বিশাল মদ্রদেশ মুহূর্ত্তে মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবালয়ের মঙ্গল-শঙ্খ সকল মুহুর্মুহু নিনাদিত হইতে লাগিল। রাজ্যময় উল্লাস আনন্দের অবধি থাকিল না। অর্থী প্রার্থীরা রাজার নিকট প্রার্থনাধিক দান ও মিষ্টান্ন লাভ করিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। রাজকুমারীকে দর্শন করিবার অভিলাষে কতস্থান হইতে কত লোক আসিল, কতজনে কত মহামূল্য যৌতুক প্রদানে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল, কত মহাতপা যোগী-ঋষি আশীর্ব্বাদ-পুষ্প ও দেবপূজার পবিত্র নির্ম্মাল্য লইয়া ক্ষুদ্র শিশুর মস্তকে বর্ষণ করিলেন, কত মঙ্গল-বাদ্য বাজিল, হুলুধ্বনি ও জয় জয় রবে গগণমার্গ পূর্ণ হইল।

নিঃসন্তান নিরানন্দ রাজা অশ্বপতির পুরীতে এতদিনে মহাআনন্দের হাট বসিল। রাজা ও রাজমহিষীর অপত্যহীনতা জনিত বিষাদ-ম্লান বদনে এতদিন পরে আবার নির্ম্মল-সুখের প্রাণারাম হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠিল। কন্যা-

রত্ন লাভ জনিত আনন্দ উল্লাসে তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ পবিত্র হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এতদিনে শুষ্ক মরুভূমে মহা আনন্দের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইল। সকলে নৃপতির কঠোর সাধনা সার্থক মনে করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দেবী সাবিত্রীর বরপ্রভাবে লব্ধ বলিয়া—বরদাত্রীর নামানুসারে যথাকালে রাজকুমারীর নাম রাখা হইল সাবিত্রী। তখন কে জানিত যে, এই শিশুকন্যা, কালে এমন বিশ্ববরণীয়া ও অনন্তকাল স্মরণীয়া বিশ্ববিশ্রুতা আদর্শসতী—আদর্শ মহিলা হইয়া তাঁহার জড়দেহ ধ্বংশের পরেও এমন অমরত্ব লাভে এ জগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিবে? ধন্য রাজা অশ্বপতির কঠোর সাধনা! ধন্য রাজ্ঞী মালবী দেবীর সংযম, ব্রত-নিয়মানুষ্ঠান ও দেবারাধনা!! ধন্য সাবিত্রী!!!

[ক্রমশঃ]

জনক।

তুমি দেব মহাদেব সৃষ্টির প্রধান,
বিশাল জগৎ মাঝে জন্মদাতা মোর—
পালিছ সযত্নে তব অধম সন্তান,
উপদেশি পুত্র তব দিবানিশি ভোর।
তুমি স্বর্গ, তুমি ধর্ম্ম, তুমি পরন্তপ,
বিশ্বের অপূর্ব্ব সৃষ্টি হৃদয় মহান্,
পুত্রের মঙ্গল হেতু সদা যত্নবান্,
সেই তরে করে সবে তব জপ তপ।
তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি গো সাকার।
অসীম ভুবন মাঝে দেবের আধার॥
তুঁহি তুষ্টে, ঈশ তুষ্টি বেদের কথন।
দাও মোরে প্রাণ ভরে পূজিতে চরণ॥

অদৃষ্ট।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(১)

অমাবস্যা রাত্রি ;—অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখিবার উপায় নাই। সেই ঘোরা রজনীতে গ্রামের কায়স্থদের ছেলে হরিধন একাকী লণ্ঠনহস্তে জন যাতায়াত শূন্য পল্লীপথ দিয়া দ্রুতগতি চলিয়াছে।

হরিধন মায়ের একমাত্র সন্তান—অতি দরিদ্র। মা পীড়িতা ; সংসারে দ্বিতীয় লোক নাই, সুতরাং পুত্র মাতাকে একাকিনী রাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়াছে।

গ্রামের ডাক্তার হরবল্লভ বাবু তখন নিদ্রিত। তিনি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন একটি রোগীর সহিত দরে বনিতেছে না। রোগী দশ টাকায় তাহার রোগ ফুরাইয়া দিতে চাহে, হরবল্লভ ত্রিশ টাকার কম ছাড়িবেন না। এমন সময় সদর দরজায় কে আঘাত করিল—"ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু জেগে আছেন।"

শব্দ শুনিয়া ডাক্তারের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ঘুমঘোরেই উত্তর করিলেন,—"কে গা।"

আগন্তুক ব'লল,—'আমি হরিধন ; আমার মায়ের বড় অসুখ, একবার দয়া ক'রে আমাদের বাড়ী যেতে হ'বে"।

"কলের" নাম শুনিয়াই হরবল্লভ ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিলেন। আজ সমস্ত দিন তাঁহার কিছুই উপার্জ্জন হয় নাই বলিলেই হয়। কেবল এক প্রতি-বেশনীর গাম্ বয়েল্ অপারেশন্ করিয়া গণ্ডা আষ্টেক পয়সা পাইয়াছিলেন মাত্র।

শয্যাপার্শ্বস্থ দীপশলাকার সাহায্যে আলোক জ্বালিয়া প্রাচীন চটিজুতা জোড়াটি পায়ে দিয়া প্রদীপ হস্তে চোক মুছিতে মুছিতে হরবল্লভ বাহিরে আসিলেন।

বিষণ্ণবদন হরিধন একে একে মায়ের সমস্ত অবস্থাই তাঁহাকে নিবেদন করিল।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"রোগ ব্রন্‌কাইটিস্, উহার সহিত একটু এজ্‌মার লক্ষণ থাকিতে পারে"।

হরিধনের আগ্রহাতিশয্যে হরবল্লভ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং আরশুলাকুলের শান্তি-নিকেতন তাঁহার সেই ঔষধের আলমারি হইতে কয়েকটি শিশি পকেটস্থ করিয়া রোগী দেখিবার জন্য হরিধনের সঙ্গে চলিলেন, পথিমধ্যে ভয়ে তাঁহার প্রাণটা এক একবার গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। এ ভয় ভূতপ্রেতের নহে। হরিধনের অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "ভিজিট্ দিবে কি না?"

যথাকালে ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিলেন। হরিধন উচ্চস্বরে ডাকিল,—"মা—মা—ডাক্তার বাবু এসেছেন।"

কিন্তু উত্তর দিবে কে? সেই ক্ষীণা, দীনা, মলিনবসনা রোগিনীর তখন কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে তাহার পঞ্জরাস্থি যেন ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। ডাক্তার হরবল্লভ বাবু তখনই কয়েকমাত্রা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা সমস্তই হরিধনকে বুঝাইয়া দিলেন।

এখন কথা উঠিল, ডাক্তার বাবুর সহিত যাইবে কে?

এই মুমূর্ষু রোগীকে একক রাখিয়া হরিধনের যাওয়া সঙ্গত নহে, বলিয়া ডাক্তার বাবুও মত প্রকাশ করিলেন।

হরিধনের বাড়ীর সন্নিকটে বসতি বড়ই বিরল। ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যে গ্রামের লোক উজাড় হইয়া গিয়াছে। বহু দূরে দূরে বাগানের মধ্যে এক এক গৃহস্থের বাস। কেবল অদূরে ধর্ম্মদাস বসু নামে হরিধনের এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ী।

কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ধর্ম্মদাস লোকের বিপদ শুনিলে ঘরের বাহির হইতেন না। গ্রামে কাহার বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণ, বিবাহোৎসব অথবা এমন কোন একটা ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে বসু মহাশয় অযাচিত ভাবেই সে বাড়ী গিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেন। কিন্তু যেমন শুনিতেন—"অমুকের ছেলেটির বড় অসুখ, ঔষধ আনিয়া দেয়, এমন লোক নাই—অমুক আজ প্রাতে মারা গিয়াছে, কিন্তু এই ছয়দণ্ড রাত্রি হইল, এখনও লোকাভাবে তাহার সৎকার হইল না,—অমুক বড়ই বিপন্ন, উত্তমর্ণ ডিক্রী করিয়া তাহার ভিটামাটী বিক্রয় করিয়া লইতেছে, অথচ গ্রামে এমন একটি লোক নাই যে, তাহার পক্ষে দুই কথা বলে—তিনি অমনই বলিতেন—কি জান, সবই অদৃষ্ট; পূর্ব্বজন্মে ভাল কর্ম্ম না কল্লে ভাল হবে কোথা থেকে।"

ধর্ম্মদাস নিজে ত ধর্ম্মের ধারও ধারিতেন না। তাঁহার ধার্ম্মিকা পত্নীও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—এই শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতেন। স্বামীই তাঁহার পক্ষে মহাজন; সুতরাং স্বামীর পদাঙ্কানুসরণ তাঁহাকে করিতেই হইবে।

বসু মহাশয় অথবা তাঁহার পত্নীকে ডাকা আর জনমানবশূন্য মাঠে পড়িয়া চিৎকার করা উভয়ই তুল্য বুঝিয়া হরিধন তাঁহাদের ডাকিল না। বসুগৃহে ভজহরি নামে একটি চাকর ছিল। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। ভজ নিজে দরিদ্র; সুতরাং দরিদ্রের কষ্ট বুঝিত। হরিধনকে সে সময় সময় কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করিত। অবশ্য এ সকল তাহার মনিব বা মনিব-পত্নীর অজ্ঞাতে। আজ বিপন্ন বালক তাহাকেই ডাকিল। ডাক শুনিয়া ভজহরি উঠিয়া আসিল। হরিধনের মায়ের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ভজহরি বুঝিল তাঁহার মৃত্যুর আর অধিককাল বিলম্ব নাই। অনাথের কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ভজহরি লণ্ঠন লইয়া হরবল্লভ বাবুকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে প্রস্তুত হইল।

ডাক্তার গমনোদ্যত হইলে হরিধন তাঁহার হস্তে দর্শনীর টাকাটি দিল। সে আজ একখানি তৈজস বিক্রয় করিয়া এক টাকা কয়েক আনা সংগ্রহ করিয়াছিল। খুচরা পয়সাগুলি মায়ের জন্য একটু দুগ্ধ ও এ'টি সে'টি খরিদ করিতেই খরচ হইয়া পুরা টাকাটি সঞ্চিত ছিল। ঐ টাকার বলেই সে এত রাত্রে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়াছিল।

সংজ্ঞা-বিরহিতা রোগিনীর আসন্ন মৃত্যু-চিন্তা করিয়া এবং কুটীর মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকট চিত্র দেখিয়া টাকাটি গ্রহণ করিতে হরবল্লভের প্রাণটা একবার কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই পত্নীর হিতোপদেশ স্মরণ করিয়া ঐ ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যকে তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ডাক্তার-গৃহিনী নির্ব্বোধ স্বামীকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন—"দয়া কল্লে ডাক্তারের কায চলে না; একজনকে দয়া দেখা'লে, পাঁচজনে অমনি ধরে বসে। অতএব অমন কুকায কদাচ কত্তে নাই"।

ভজহরি ফিরিয়া আসিয়া হরিধনের কাছেই বসিয়া রহিল; সেই রাত্রিতে সে আর বাড়ী যাইল না।

নিশা শেষে হরিধনের মাতার অবস্থা যেন একটু ভাল বোধ হইল। তিনি বিজড়িত কণ্ঠে একবার বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা হরি, একটু জল দে"

হরিধন মায়ের পার্শ্বে বসিয়া কেবলই কাঁদিতেছিল। সে যে সংসারে মা বই আর কাহাকেও জানে না। অতি শৈশবে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়; দুঃখিনী মা দুঃখ করিয়া আজ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল তাহাকে লালনপালন করিয়াছেন। একদিনও সে মায়ের কাল মুখ দেখে নাই। ভজহরি মধ্যে মধ্যে নানা সান্ত্বনাবাক্যে হরিধনকে আশ্বস্ত করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই হরিধনের মন প্রবোধ মানে না। সে এক একবার ভজর মুখপানে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া বলে,—"আমার দশা কি হবে ভজহরি?"

এইবার মায়ের কথা শুনিয়া পুত্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে নিশ্চয় মনে করিল ঔষধ ধরিয়াছে—তাহার মা বাঁচিয়া উঠিবে।

পাত্রে করিয়া জল লইয়া হরিধন মাতার মুখে অল্প অল্প ঢালিয়া দিল। জলপান করিয়া রোগিনীর যেন জ্ঞানের আর একটু সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার বুক-জুড়ান-ধন হরিধনকে বারেক আলিঙ্গন করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার ম্লানমুখে একটিবার কোমল চুম্বন করিলেন।

পরক্ষণেই প্রলাপ আসিয়া উপস্থিত হইল,—"বাবা! তুই কাঁদিস্ না—আমি যাই,—ঐ আস্‌চে"—আর বলিতে পারিলেন না। পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মাতা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। নিষ্ঠুর নিয়তি বালক হরিধনের মুখের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না।

দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া পড়িল,—চারিদিকে কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিল। তমসাচ্ছন্ন জগৎ আবার হাঁসিল, কিন্তু সেই মাতৃহীন বালক মাতার শবদেহের উপর পড়িয়া তখনও সমানভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ভজহরি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিল না। সেই হৃদয়-বিদারী কাতরধ্বনি—'মা গো, তুই কোথায় গেলি গো—আমার যে সংসারে আর কেউ নাই গো"—শুনিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

হরিধনের মাতার মৃত্যু সংবাদ শীঘ্রই গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হইল। তখন শবদেহ দেখিবার জন্য এবং কপট শোক দেখাইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বসু মহাশয়ও সস্ত্রীক একবার চক্ষুলজ্জানুরোধে তথায় আসিলেন।

শব তখনও শয্যায় পতিত রহিয়াছে—উঠানে বাহির করা হয় নাই। ভজহরি মনে করিয়াছিল, যখন গৃহমধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে, তখন প্রাতে জ্ঞাতি-কুটুম্ব আসিয়াই একেবারে বাহির করিবে।

বসু মহাশয় সম্পর্কে হরিধনের খুল্লতাত। তিনি হরিধনের ক্রন্দনে বিরক্ত হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়াই তাহাকে হিতোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন,—"ওরে হরে! আর কেঁদে কি হবে বল্ বাবা। মা ত কারু চিরদিন থাকে না; অদৃষ্টের লিখন কারু খণ্ডাবার যো নাই।"

বসু গৃহিণী দেখিলেন, সমাগত প্রতিবেশিনীর দল সকলেই অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে। সুতরাং তিনি যখন হরিধনের খুড়ী তখন একটু না কাঁদিলে ভাল দেখায় না—সেটা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দোষ হয়। কাজে কাজেই সাশ্রু-লোচনে আরম্ভ করিলেন—"ওগো দিদি গো—তুমি কোথায় গেলে গো—তুমি যে আমায় কত ভালবাস্তে গো—তোমার হরিকে কা'র কাছে রেখে গেলে গো—।"

স্ত্রীর ক্রন্দনে বসু মহাশয় অস্থির হইলেন। তিনি পত্নীর উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—"আহা কর কি, কর কি। যা হ'বার তা ত হয়ে গেছে; অমন করে কান্তে আছে—ছেলেপুলের অকল্যাণ হবে যে।" ক্রমে বেলা চারি দণ্ড হইল, কিন্তু মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন ব্যবস্থাই হইল না। গ্রামের প্রত্যেক লোক বলিল—"হরিধনের মার হাঁপের পীড়া ছিল—প্রায়শ্চিত্ত না করলে শব স্পর্শ করব না।"

বসু মহাশয় আর অধিককাল সে স্থানে দাঁড়াইলেন না। তাঁহার ভয় হইল, পাছে দশজনে তাঁহাকেই প্রায়শ্চিত্ত ও শবদাহের ব্যয়ভার বহন করিতে বলে। বাড়ী যাইবার সময় তিনি ভজর প্রতি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—"হাঁ রে ভজা! আজ সমস্তদিন কি এখানেই বসে থাক্তে হবে? হাটবাজার গরু বাছুরের কায এখন আমরাই করি, তুমি মাসে মাসে মাইনেটি নিও—কেমন?"

ভজ। "তা করবেন কেন বাবু; তবে হরিধনের এই বিপদে আপ-নারা দেখ্লেন না, গ্রামের লোক দেখ্ল না—আমি ছেড়ে যাই কেমন করে?"

"তবে মাইনেটাও হরের কাছ থেকে নিও"—ধর্ম্মদাস বসু এই কথা বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ভজহরি তাঁহার কথায় কিছুমাত্র ভীত হইল না। সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে বসিল। নিকটে হরিধনের কয়েক ঝাড় বাঁশ ছিল। ভজ তন্মধ্য হইতে কতকগুলি শুষ্ক বাঁশ ও কঞ্চি সংগ্রহ করিয়া কুঠারের সাহায্যে

শীঘ্রই সে গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। পরে হরিধনকে বলিল— "ভয় কি, চল আমি একাই সব করব।"

শয্যাবৃত শব একাই স্কন্ধে লইয়া ভজহরি গ্রামের প্রান্তভাগে বিলের ধারে চলিল;—পশ্চাতে হরিধন একটি কাষ্ঠের বোঝা লইয়া যাইতেছিল। শ্মশানে শব নামাইয়া সেই বিপন্নের বন্ধু ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি বহন করিতে লাগিল। পরে আর আর আবশ্যকীয় দ্রব্য সে নিজ অর্থেই দোকান হইতে খরিদ করিয়া আনিল।

শোক জর্জ্জরিত হরিধন এতক্ষণ সেই জন-বিরল শ্মশানক্ষেত্রে স্তব্ধভাবে বসিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিতেছিল। কোথা হইতে ভজহরি ঐ সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিল, সে যেন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

চিতা সজ্জিত হইল। হরিধন মায়ের "মুখাগ্নি" করিয়া বিরস-বদনে দূরে একপার্শ্বে গিয়া বসিল। তাহার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত—দেহ স্থাণুবৎ স্থির।

মুহূর্ত্ত মধ্যে শব-দেহ ধু-ধু জ্বলিয়া উঠিল। ভজহরি উদাস প্রাণে গাহিতে লাগিল,—

"সংসারের সাধ মিট্‌বে কবে আর,—
এখনও শেষ নাই আশার॥
হ'ল গলিত মাস, পলিত কেশ রে,
চখে দেখ্‌তেছিস্ রে ধোঁয়াকার॥
তোরে বল্‌তে বল্‌তে মুখ হ'ল তেত,
মায়াময় এ সংসার স্বপনের মত।
যাহা চোখে দেখিস্ কাণে শুনিস্ রে,
সে সমুদয় ফক্কিকার॥

[ক্রমশঃ

কর্ম্ম-অবসানে ।

লেখক—শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী ।

স্নিগ্ধ জোছনা-নিন্দিত তব
শীতল চরণ ছায়,
ত্যজি' গৃহকাজ —হৃদয় আমার
লুটায়ে পড়িতে চায় ।

সাধিলাম কত সারাটি জীবনে,
নয়নের জলে,—আকুল পরাণে—
তবুও করুণা হোলনা গো প্রভু,
রাখিলেনা মোরে পায় ?—
ত্যজি' গৃহকাজ হৃদয় আমার
লুটায়ে পড়িতে চায় ।

দীর্ঘ দিবস কাটাইব আমি
দীরঘ-শ্বাস ফেলিয়া,—
দুরস্থিত এক নিশীথের আশে
নয়নের জল মুছিয়া ।

সেই দূরাগত নিশীথ আগমে—
যাব আমি প্রভু তব দরশনে,
ধূলি-ধূসরিত—শ্রান্ত দেহ খানি
সঁপিতে তোমার পায় ;
ত্যজি' গৃহকাজ হৃদয় আমার
লুটায়ে পড়িতে চায় ।

তখনো গো প্রভু লবে নাকি মোরে—
তব বাহুপাশে ধরি'—
দিবে নাকি সখা—মুছায়ে আমার
তপ্ত নয়ন বারি ?—

তবে কেন ওগো হৃদয় দেবতা,
দিনের করমে কিসের মমতা ?
কি আশে চলিবে দীর্ঘযাত্রী—
ছায়া যদি নাহি পায় ?
ত্যজি' গৃহকাজ হৃদয় আমার
লুটায়ে পড়িতে চায় ।

সমালোচনা।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, এ, এফ, এস, এস, এফ, আর, ই, এস, বিরচিত। কলিকাতা ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকের ভূমিকার প্রথমেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বাঙ্গালা দেশে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম শুনেন নাই, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী আশা করি নাই। থাকিলে তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা। পূর্ব্বে বিজয়ীদিগের প্রতিষ্ঠাস্তম্ভে যেমন তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত, এ কালে মহাভারতের বঙ্গানুবাদে তেমনই কালীপ্রসন্নের কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু এই বিরাট কার্য্য কালীপ্রসন্নের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ হইলেও ইহাই তাঁহার গৌরবের একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে। তাঁহার গৌরবের প্রধান কারণ—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রতিভা-পুনঃপ্রদীপ্তির (Renaissance) যাঁহারা প্রবর্ত্তক, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের অন্যতম। বাঙ্গালার এই দ্বিতীয় মানসিক উদ্দীপ্তির রোশনাইয়ে যাঁহারা মশাল ধরিয়াছিলেন, অজ্ঞতার অন্ধকার অপনীত করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের একজন।"

বিস্তৃত ভূমিকায় লেখক হেমেন্দ্রবাবু যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ভূমিকায় গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পূর্ণপরিচয় পরিস্ফুট। স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলে ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিষ্টার মিডলটনের অধীনে মুরশিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ানী করিয়া অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সমাজে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া তিনি সকলের নিকটে সুপরিচিত ছিলেন।

শান্তিরাম সিংহের দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণ কলিকাতাস্থ হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের অন্যতম উদ্যোগী ও ডাইরেক্টর ছিলেন। জয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্র নন্দলাল সিংহ মহাশয়ই স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের জনক। অতি অল্প বয়সেই কালীপ্রসন্নের পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বাল্যকালে

কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা সুশিক্ষা করেন, সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রম-কালে সংস্কৃত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার পর 'হুতোম পেচার নক্সা" রচনা করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের স্রোত ফিরাইয়াছিলেন। দুই লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া মূল সংস্কৃত মহাভারত বিশুদ্ধ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বঙ্গানুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এক মহাভারত প্রকাশ করিয়া কালীপ্রসন্ন বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে এক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭০ সালে ২৯ বৎসর বয়সে ইনি অকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন। হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভাবের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে যে, কয়েকজন মহানুভবের আবির্ভাব হইয়াছিল, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। কালীপ্রসন্ন রূপবান, গুণবান, ধনবান, সমাজে যথেষ্ট সম্মান এ সমস্তই তিনি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে উত্তরাধিকার সূত্রে অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি কেবল বিলাস-বিভ্রমে জীবনাতিপাত করেন নাই; তিনি দেশের নানাসদনুষ্ঠানে অর্থ ও সামর্থ সমুদয় অকাতরে ব্যয় করিতেন। দেশের কোন মহানুভব লোকের বিয়োগ হইলে তৎসমসাময়িক ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, এখনও তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ হইবার সময় হয় নাই; এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই অব্যহতিলাভ করেন,—কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য সংসারে দেখা যায় স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যা, প্রভৃতি বিয়োগেও গ্রন্থ বিরচিত ও প্রকাশিত হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জীবনী এতদিন লিখিত অথবা প্রকাশিত হয় নাই; ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় এতদিন পরে অসীম অধ্যবসায় পরিশ্রম সহকারে স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কমোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; "সাহিত্য" সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই পুস্তকের ভাষাগত দোষ সকল সংশোধন করিয়া দিয়া পুস্তকের ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আশা করি এ পুস্তকের সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৩শ বর্ষ। | ১৩২২ সাল, চৈত্র। | ১২শ সংখ্যা।

উপসর্গ।

(দেবালয়ের অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক পঠিত)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যবৃন্দ! আমাদের অদ্যকার আলোচ্য "উপসর্গ," কিন্তু উপসর্গ শব্দটাই খারাপ, জানিনা কোন্ বিধাতা ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা যিনিই হউন, তিনি যে অতি চতুর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপসর্গের জ্বালা বড় কম নহে, মানুষ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তু হইতে ব্যাকরণের ধাতুগুলি পর্য্যন্ত উপসর্গের জ্বালায় অস্থির। উপশব্দের আভিধানিক অর্থ উপস্থিত, সর্গশব্দের অর্থ সৃষ্টি, সুতরাং উপসর্গ শব্দে উপস্থিত আপদ-বিপদ, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, ভূমিকম্পাদি উৎপাত উপদ্রব বুঝায়। ব্যাকরণে প্র, প্ররা, অপ প্রভৃতি বিংশতিটি অব্যয় শব্দের নাম উপসর্গ। উপ[illegible] সমীপ বা সহিত, সর্গশব্দে যে সৃষ্টি করে, অতএব ধাতুর

সমীপে গিয়া যে নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি করে, তাহার নাম উপসর্গ। উপসর্গের জ্বালায় ধাতুগুলি অস্থির, যেমন এক একটি গিয়া ধাতুর সমীপে বসে, অমনি তাহাদের ভাবার্থের পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। যেমন ধাতুর উপসর্গ প্র, পরা, অপ, তদ্রূপ মানুষেরও উপসর্গ আছে, বরং ধাতুর উপসর্গ বিংশতিটি, মানুষের উপসর্গ উনপঞ্চাশটি। যেখানে যাও, সেই খানেই উপসর্গ, উপসর্গবিহীন স্থান বা মানুষ নাই। উকীল মোক্তার, ডাক্তার কবিরাজ, ব্যারিষ্টার এটর্ণী, রাজা মহারাজ বা জমীদার যেথানে, যাহার কাছে যাও, সেইখানেই উপসর্গ। উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার এটর্ণীর উপসর্গ মুহুরী। সেখানে যাও, দেখিবে মুহুরী কেমন করিয়া মুনিবের ভাববিবর্ত্তন ঘটায়। ডাক্তারের উপসর্গ কম্পাউণ্ডার, কম্পাউণ্ডারই ডাক্তার খানার সর্ব্বে সর্ব্বা। কবিরাজের উপসর্গ ছাত্র, এক একটি ছাত্র এক একটি ধন্বন্তরি! রাজা মহারাজ ও জমীদারদের উপসর্গ মোসাহেব মোসাহেবের কথায় জল পর্য্যন্ত কাৎ হয়। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতের উপসর্গ চেলা, চেলার জ্বালা বড় কম নহে! মোহান্তের চেলা হইলে তো কথাই নাই, গদী লইয়া টানাটানি! আমাদের বিশ্বনাথ ভোলানাথের উপসর্গ একেবারে তিন প্রস্ত—১ম—ভূতপ্রেত, ২য়—ভাঙ্গ, ধুতুরা, গাঁজা, ৩য়—নন্দী ভৃঙ্গী। প্রথম উপসর্গের জ্বালায় ভোলানাথ অস্থির হইয়া ভাঙ্গ ধুতুরা গাঁজার অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তৃতীয় উপসর্গের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন! সৃষ্টি সংহারকর্ত্রী প্রকৃতির উপসর্গ পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এই ভূতের ভয়ে মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তু সদা ভীত। তাহাদের ভয় কোন্ সময়ে ভূমিকম্প বা ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করে। তাহাদের ভয় কোন্ সময়ে পাহাড়ের ধ্বস নামিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। তাহাদের ভয় জল উচ্ছলিত হইয়া কোন্ সময়ে দেশপ্লাবিত করে। আমাদের আচার্য্য শঙ্করের মতে নরের উপসর্গ নারী। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,— "দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী।" নারী নরকের একমাত্র দ্বার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মানুষের উপসর্গ উনপঞ্চাশটি, এবং সেই সকল উপসর্গের জ্বালায় মানুষ অস্থির। মশা, ছারপোকা, নানাপ্রকার ব্যাধি ইত্যাদি সেই সকল উপসর্গ। কিন্তু উপসর্গ মন্দও বটে, আবার ভালও বটে, সময় সময় উপসর্গ না হইলে চলে না, এবং তাহাদের দ্বারা কিছু কিছু কাজও হয়। মশা, ছারপোকায় যেমন দংশন করে, যন্ত্রণা দেয়, রক্তশোষণ করে,

তেমনি নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া দেয়,—বলে আর কত নিদ্রা যাও, এ সময়ে একটু সেই বিশ্বনিয়ন্তার নাম কর। এই গভীর নিশা মন একাগ্র করিবার ও তাঁহাকে একাগ্র মনে—একচিত্তে ডাকিবার উপযুক্ত সময়। তদ্রূপ কবিরাজের ছাত্রই হউক; ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারই হউক, সন্ন্যাসীর চেলাই হউক, আর উকীল মোক্তারের মুহুরী বা রাজা জমীদারদের মোসাহেবই হউক, তাদের দ্বারা কিছু কিছু কাজও হয়। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ যেমন মশা, ছারপোকা ভগবানের নামের সঙ্গে জীবের পরিচয় করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তাহারা তাহাদের মুনিবের সঙ্গে অপরিচিতকে পরিচিত করাইয়া দেয়। উপসর্গ না থাকিলে, কাহারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয় সম্ভবপরই হইত না। যেমন প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চভূত, ভোলানাথকে আশ্রয় করিয়া নন্দী-ভৃঙ্গী, ডাক্তার কবিরাজকে আশ্রয় করিয়া কম্পাউণ্ডার ও ছাত্র, সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া চেলা, রাজা মহারাজ ও জমীদারদের আশ্রয় করিয়া মোসাহেবের দল অবস্থিতি করে, তদ্রূপ মূল রোগকে আশ্রয় করিয়া উপসর্গ অবস্থিতি করে। আবার যেমন মানুষের উপসর্গ মানুষ নিজের মুনিব অপেক্ষা সময়ে সময়ে অধিক শক্তিশালী হয়, তদ্রূপ রোগের উপসর্গ সময় সময় অধিক শক্তিধর ও ভয়ঙ্কর হয়। এক রোগের জ্বালায় মানুষ অস্থির, তার উপর উপসর্গ, যেন গোদের উপর বিস্ফোটক! এমন কি সময় সময় উপসর্গ প্রবল হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করে।

জ্বর কেমন রোগ, তাহা না জানেন বা জীবনে দুই একবার জ্বর না হইয়াছে, এমন ভাগ্যহীন বোধ হয় কেহ নাই, কিন্তু সকলেই জানেন, জ্বরে যা না করে, তা করে উপসর্গে। জ্বরের তীব্র সন্তাপ সহ্য করা যায়, কিন্তু মাথা ধরা সহ্য করা যায় না। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ সহ্য করা যায়, কিন্তু উত্তপ্ত বালুকার তাপ সহ্য করা যায় না। জ্বরের তীব্র সন্তাপ সহ্য করা যায়, কিন্তু গা বাথা, মাথা ধরা, চক্ষু জ্বালা, গাত্রদাহ, পেট ব্যথা সহ্য করা যায় না। আর পোড়া উপসর্গের কেমন স্বভাব, সে "রস" থাকিতে কিছুতেই ছাড়ে না, ছাড়িতে চায় না, যেন ছিনে জোঁক, রক্তশোষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত উদর-পূর্ত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত আর ছাড়ে না বা ছাড়িতে চায় না। এই উপসর্গের জ্বালায় কত মানুষ যে রস রক্তহীন হইয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে, কত সোণার সংসার যে ছারখার হইয়া শ্মশানে পরিণত হয়, কত রাজা জমীদারের রাজত্ব জমিদারী ভিটামাটী যে উৎসন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা

নাই। উপসর্গের অতুল প্রভাব, অনির্ব্বচনীয় শক্তি, একবার যিনি উপসর্গের কবলে পড়িয়াছেন, তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার রক্ত-শোষণ বা সর্ব্বনাশ সাধন করিবেই। বাহিরে যেমন ভূতের উপসর্গ, দেহাভ্যন্তরেও তেমনি ভূতের উপসর্গ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটি পঞ্চমহাভূত। এই পঞ্চমহাভূতে জীবজগৎ রচিত। ভিতর বাহির সর্ব্বত্র এই ভূতের খেলা। রোগ বা তদুপসর্গও এই ভূত হইতেই জাত। বাহিরের ক্ষিতি ও অপের বিকার—শ্লেষ্মা, তেজের বিকার—পিত্ত, মরুতের পরিণাম—দেহের বায়ু। এই বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা দ্বারাই মানুষের দেহাবয়ব গঠিত হয়, আর রোগ সেই দেহকে তথা বায়ু, পিত্ত শ্লেষ্মাকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়। রোগের উপসর্গ, রোগ হইতে জাত। উপসর্গ লইয়া সময় সময় এমন বিব্রত হইতে হয় যে, তখন আর মূল রোগের কথা মনে থাকে না। জ্বর একটি মূল রোগ, জ্বরের উপসর্গ অনেক অরুচি, বমি, অতিসার, মাথাধরা, গা ব্যথা, কাস, উদরাধ্মান, প্রলাপ, দাহ, পিপাসা প্রভৃতি। জ্বর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ব্যাধি। জ্বরে সর্ব্বাঙ্গের তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে, দক্ষরাজ কর্তৃক অপমানিত ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের নিঃশ্বাস হইতে জ্বরের উৎপত্তি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত স্পন্দিত হইলে শরীর উষ্ণ হয়।

শরীরের স্বাভাবিক তাপ ৯৮ ডিগ্রী, তাপ ৯৮ ডিগ্রীর অধিক হইলে, তাহাকে জ্বর বলা হয়, সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে জ্বর শরীরের স্বাভাবিক তাপের বৃদ্ধি। তাপ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা থার্ম্মমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাপ যে পরিমাণে বাড়ে, থার্ম্ম-মিটারের পারদ সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়, এইরূপে পারদ ঊর্দ্ধগামী হওয়ার কারণও আছে, যে পিত্তের তাপ বা উষ্মা দ্বারা খাদ্য সুপরিপক্ক হয়, সেই উষ্মা বা তাপ ঘনীভূতাবস্থায় পাকস্থলী বা ষ্টমাকের নিম্নে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে থাকিয়া আহার পরিপাক করে, জলীয় গুণ বিশিষ্ট আহার বিহারে পাকস্থলীর জলীয়গুণ বা শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিম্নে পতিত হয় ও ঐ উভয় অন্ত্রের ঘনীভূত তাপ সেই শ্লেষ্মার চাপে ঊর্দ্ধগামী হইয়া সমস্ত দেহে প্রসারিত হয়। যেমন তপ্ত তৈলে জল নিক্ষেপ করিলে, তৈলের উত্তাপ বিক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, ইহাও তদ্রূপ, তজ্জন্যই তাপের, অগ্নিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও পারদ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। সুশ্রুতে বলা হইয়াছে,—"অগ্নিবায়ু হি লঘু লঘুত্বাত্তানূর্দ্ধ

মুত্তিষ্ঠন্তি।" অগ্নি ও বায়ু লঘু, লঘুত্বাবশতঃ তাহারা উর্দ্ধগামী হয়। অগ্ন্যাশয়ের অগ্নিগুণের উর্দ্ধগামিতা বশতই পারদও উর্দ্ধগামী হয়। আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের নিদানে বলা হইয়াছে—

"মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুঃ রসানুগাঃ॥"

অহিত বা অপকারী আহার বিহারে আমাশ্রয়াশ্রিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা অগ্ন্যাশয়স্থ পাচকাগ্নিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া উর্দ্ধগামী করিলে, তাহাকে জ্বর বলা যায়।

জ্বর একটি মূল রোগ। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্য বা হ্রাস বৃদ্ধি রোগোৎপত্তির কারণ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বাহিরের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের রূপান্তর। ক্ষিতি ও অপের রূপান্তর শ্লেষ্মা, তেজের রূপান্তর পিত্ত, মরুতের রূপান্তর বায়ু। বায়ু জীবের প্রাণ, পিত্ত—তাপ ও শ্লেষ্মা—জলীয় পদার্থ, রসরক্তাদি পদার্থ এই তিন পদার্থেরই বিকার বা রূপান্তর। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা যখন দেহে সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন রোগ থাকে না। জ্বর—তাপের বৃদ্ধি, তাপ পিত্তের স্বরূপ, কিন্তু তাহা হইলেও রোগ কখনও এক দোষজ হয় না, বায়ুর উর্দ্ধাধোগতি ব্যতীত তাপের বা তাপের স্থিরতা ব্যতীত শ্লেষ্মার অস্তিত্ব কোথায়? অতএব রোগ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিন দোষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। এই তিন পদার্থ দূষিত বা হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া দোষ নামে অভিহিত। এক একটি রোগের উপসর্গ কম নহে। উদরাধ্মান, অতীসার, বমন, প্রলাপ, দাহ, পিপাসা, কাস, সর্ব্বাঙ্গগত শূল, শিরঃশূল ও অরুচি এই সকল জ্বরের উপসর্গ। জ্বর স্বাভাবিক তাপের আধিক্য, সেই বর্দ্ধিত তাপ হইতে অগ্নির সমধর্ম্মী লক্ষণ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পিত্তবিকার বলা হয়। জ্বরে পিত্তের সন্তাপ হইতে যে দাহ ও বমন উপস্থিত হয়, এ উভয়ই পিত্তবিকৃতির ফল। আবার সেই তাপের অবলম্বনে বায়ুর বৃদ্ধি ও বায়ুর বৃদ্ধিতে কখনও উদরাধ্মান, কখনও সর্ব্বাঙ্গে শূল, কখনও শিরঃশূল প্রভৃতি বায়ুজনিত বিকার উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ সেই তাপের অবলম্বনে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি, শ্লেষ্মার বৃদ্ধিতে অতীসার, প্রলাপ, কাস ও অরুচি উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার যে সকল লক্ষণ, তাহা বাহিরের বায়ু, তাপ ও জলেরই বিবৃদ্ধির লক্ষণ। দেহে তাপের বৃদ্ধি, বাহিরের সূর্য্যোত্তাপেরই বৃদ্ধির লক্ষণ। সর্দ্দি, কাস ও উদরাময় বা পেটের পীড়া

বাহিরের জলেরই বৃদ্ধির লক্ষণ। সকল জীবদেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আর উদরাধ্মান ও শূলবেদনা প্রভৃতি বাহিরের বায়ু-বৃদ্ধির লক্ষণ। যেমন বাহিরের সূর্য্যোত্তাপ বা অগ্নির তাপে শরীর জ্বালা করে তদ্রূপ দেহে তাপ বৃদ্ধির ফলে গাত্র দাহ ও চক্ষুর প্রদাহ উপস্থিত হয়। উদরাময়ে দাস্ত বেশী হয়, এই লক্ষণটি বাহিরের বৃষ্টির লক্ষণ। বৃষ্টি যেমন আকাশ দেহ হইতে ধরায় নিপতিত হয়, তদ্রূপ দাস্ত-উর্দ্ধ দেহাকাশ হইতে ক্ষিতি-তত্ত্ব হইয়া নিম্নে ধরাতলে নিপতিত হয়। আর উদরাধ্মান, শূল বা বেদনা ঘনীভূত বায়ুর ক্রিয়া। ঘনীভূত বায়ুর চাপে ও ধাক্কায় বেদনা উপস্থিত হয়। সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, রোগের একটি উপসর্গ। ছুঁচ ফুটিলে যেরূপ বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বলে। পঞ্চ-ভূতের মধ্যে একমাত্র বায়ু গতিশীল, বায়ু বলপূর্ব্বক বস্তুর গাত্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সেই বায়ুগুণেই বস্তুবিদ্ধ হয়। আমরা যে কোন বস্তুকে খোঁচা মারি, তাহা বায়ুর ক্রিয়া। সেই খোঁচাতেই বস্তু বিদ্ধ হয়। আর যে গুণে বস্তু বিদ্ধ হয়, সেই গুণই ঘনীভূত হইলে তদ্দ্বারা বস্তু ছেদন বা কর্ত্তন করা যায়। অস্ত্রাদির উপাদান লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যে সেই বায়ুগুণ আছে বলিয়াই লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রদ্বারা ছেদন ও কর্ত্তন করা যায়। যেমন সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা রোগের একটী উপসর্গ, তদ্রূপ ছেদন ও কর্ত্তনবৎ বেদনাও রোগের উপসর্গ। উপসর্গ মূলরোগেরই শাখা প্রশাখা। যেমন প্রথমে বৃক্ষ ও পরে তাহা হইতে শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয়, রোগ এবং উপসর্গের উৎপত্তিও তদ্রূপ। জ্বরের একটি উপসর্গ দাহ। জ্বর—দেহের স্বাভাবিক তাপের বৃদ্ধি, সেই বর্দ্ধিত তাপ হইতে দাহ উৎপন্ন হয়। যে তাপ প্রদান বা সন্তাপিত করে, সেই পিত্ত, সুতরাং তাপবৃদ্ধি পিত্তোষ্মা বৃদ্ধিরই নামান্তর। জ্বর ও তাহার উপসর্গ দাহ এই উভয়ের দৃষ্টান্ত প্রজ্বলিত চুল্লীর অগ্নি ও তাহার তাপ। জগতে যেমন মানুষ মাত্রেই একজাতি ও একই মূলপ্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহাদের প্রত্যেকেরই আশ্রয়স্থান ও ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তদ্রূপ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু, আকাশাদি বস্তু একই মূলপ্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইলেও, তাহাদের প্রত্যেকের স্থান স্বতন্ত্র। রৌদ্র, বৃষ্টি, ও বায়ু প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। বায়ু সর্ব্বব্যাপী এবং অদৃশ্য হইলেও ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত ও দৃশ্যমান হয়, কিন্তু মেঘের স্থান আকাশ। জগতে একটিমাত্র সূর্য্য অতএব একসূর্য্য জগদ্ব্যাপী হইলেও তাহার অবস্থিতি স্থান আকাশ এবং আকাশ হইতেই সূর্য্য কিরণ নিপতিত হয়,

নিপতিত হইয়া নদনদী পুষ্করিণী প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আশ্রয় করে। এইরূপে আমরা এক আকাশ হইতেই বৃষ্টির জল, সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রভৃতি প্রাপ্ত হই, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের স্থান স্বতন্ত্র। আর আকাশ হইতে বৃষ্টি ও সূর্য্যালোক পৃথিবীতে পতিত না হইলে, আমাদিগের জীবন ধারণও অসম্ভব হইত। যেমন মেঘ-ঘনীভূত ও শীতল হইলেই জলে পরিণত হইয়া নদ-নদী সমুদ্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে ও ঘনীভূত অবস্থায় জলনামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ একই বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ঘনীভূত ও তরলীকৃত বা বিরলাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। এইরূপে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ একই পদার্থ ঘনীভূত ও তরলীকৃত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়ার জন্য ঘনীভূত ও বিরলীকৃত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবয়ব প্রাপ্ত হয়। একই বায়ু ঘনীভূত হইয়া পিত্তের সন্তাপে এবং পিত্তের তাপ ঘনীভূত ও শীতল হইয়া শ্লেষ্মারূপে পরিণত হইলেও প্রত্যেকের ক্রিয়া ও স্থান স্বতন্ত্র। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন পদার্থ দ্বারা সমস্ত দেহাবয়ব গঠিত হইলেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়ার জন্য তাহারা ঘনীভূতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আশ্রয় করে, এই আশ্রয় স্থানের নাম আমাশয়। দেহের পিত্তাশয় বা অগ্ন্যাশয় বাহিরের প্রজ্জলিত চুল্লী। দেহের পক্কাশয় বা ষ্টমাক্ বাহিরের জলতণ্ডুলপূর্ণ হাঁড়ী। বাহিরে যেমন জল তণ্ডুলপূর্ণ হাঁড়ী প্রজ্জলিত চুল্লীতে স্থাপন করা হয় ও তন্নিম্নস্থ অগ্নি সন্তাপে তণ্ডুল সিদ্ধ বা পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ আমাশয় বা ষ্টমাকস্থিত ভুক্তান্ন তন্নিম্নস্থ অগ্ন্যাশয় বা ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের পিত্তোষ্মা দ্বারা পরিপক্ক হয়। যেমন বাহিরের চুল্লীতে অন্নব্যঞ্জনাদি পাককালে প্রবহমান বায়ু উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই বায়ু প্রবাহের ধাক্কায় প্রজ্জলিত অগ্নির তাপ চুল্লীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং পাচক পাচিকার শরীরের যে, স্থানে সেই তাপ লাগে, সেই স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়, গাত্র দাহও তদ্রূপ, দেহের পিত্তোষ্মা বা তাপ বায়ুর বিক্ষেপণ গুণে পিত্তাশয় বা অগ্ন্যাশয় হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দেহের যে স্থানে লাগে, সেইস্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়। আর অন্ন ব্যঞ্জনের হাঁড়ীটি যদি দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেস্থানে রন্ধনকর্ত্তা উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহার যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা না বলিলেও চলে। জলতণ্ডুল পূর্ণ হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে তন্মধ্যস্থ জল ও তণ্ডুল নিম্নে পতিত হইয়া চুল্লী মধ্যস্থ অগ্নি সন্তাপকে ঊর্দ্ধগামী করে ও তাহার ফলে পাচক পাচিকার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। তখন এই দাহ উপসর্গই দাহরোগে পরিণত হইয়া প্রাণ নাশক হয়। এইরূপে

দাহ যে কোন কারণেই উপস্থিত হউক, তাহা সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইলেই মূলরোগ নামে অভিহিত হয় এবং তখন তাহা হইতে আবার উপসর্গ উপস্থিত হয়। অগ্নিদগ্ধ দাহে ধনুষ্টঙ্কার একটি মারাত্মক উপসর্গ। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির প্রায়ই মৃত্যুকালে এই লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব উপসর্গ মূল রোগেরই শাখা প্রশাখা। জ্বরে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহা পিত্তেরই তাপ, আর অগ্নিদাহে যে ধনুষ্টঙ্কার উপস্থিত হয়, তাহা অগ্নিগুণ বিবৃদ্ধি হেতু বায়ুগুণ বৃদ্ধির ফল। বাহিরের ন্যায় দেহেও অগ্নি বিদ্যমান, আর সেই অগ্নির ঘনীভূত অবয়ব ষ্টমাকের নিম্নে পিত্তাশয়ে অবস্থিত, ষ্টমাকে অধিক শ্লেষ্মা বা জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইলে, গুরুত্ব হেতু তাহা অধোগামী হইয়া নিম্নে অগ্ন্যাশয়ে পতিত হয় ও তাহার ফলে বাহিরের চুল্লী মধ্যে অন্নব্যঞ্জনের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে যেমন চুল্লীমধ্যস্থ অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া লঘুতা বশতঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তদ্রূপ অগ্ন্যাশয়ের অগ্নি সন্তাপ পক্বাশয়ের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হয়, ইহাই জ্বর নামে অভিহিত, জ্বরের উপসর্গ দাহ, উদরাধ্মান, শূলবেদনা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি এবং দাহরোগের উপসর্গ ধনুষ্টঙ্কার ও খিচুনী প্রভৃতি। এইরূপে মানুষ অসঙ্খ্য এবং তাহাদের উপসর্গও অসঙ্খ্য, তদ্রূপ রোগও অসঙ্খ্য এবং তাহাদের উপসর্গও অসঙ্খ্য।

গীত।

লেখক,—৺গিরিন্দ্রনাথ মিত্র।

আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

বাসনা করেছি মনে তোমার সঙ্গে থাকিব,
কে আছে আমার আর কার কাছে যাইব!
কত লোকের সুত আছে, মনের সাধে বেড়াতেছে,
ভাবি আমি একা বসে, জানিনা কি করিব,
সংসারের কোলাহলে দিন যে গেল চলে,
বিলম্ব আর হ'লে পরে দুকুল হারাব।
কত দুঃখ পাইলাম, কত আমি কাঁদিলাম,
এবার তোমার সঙ্গে থেকে চির-সুখী হইব।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রশ্ন মীমাংসার উপসংহার)

লেখক,—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ভূষণ।

সবিনয় নিবেদন,—

পঞ্জিকা সংস্কার-প্রসঙ্গে আমার সহিত কতিপয় সংস্কারপ্রিয় উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর কথপোকথন হইয়াছিল; তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে প্রথমতঃ নিরপেক্ষতার সহিত আলোচনা করিতে করিতে জানি না তাঁহারা কি বুঝিয়া, আমার অনুমান হয়, আমাকে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সমর্থনকারী বিবেচনায়, মনের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিলেন যে, প্রকৃত সংস্কার যখন বহুকষ্টসাধ্য এবং অনেক সময় সাপেক্ষ, এক রকম অসম্ভব, তখন এককালীন সংস্কৃত না হইলেও কথঞ্চিৎ সংস্কৃত বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকাখানি যদি চালাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না এবং সাধারণে তাহা বুঝিতেও পারিবে না, এমন কি আপনাদের মত হইলে আগামীবর্ষের যে সমস্ত প্রচলিত পঞ্জিকা ছাপা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার সঙ্গে ঐ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সরল সারাংশ সংযোজিত করিয়া দিয়া পরে ঐ পঞ্জিকাই বিশুদ্ধ বলিয়া একমাত্র বলবৎ রাখিলে জন সাধারণ ঐ পঞ্জিকার অনুসরণ করিবে এবং সকল বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যাইবে। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ধর্ম্মরক্ষার্থে পঞ্জিকা সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এতদূর স্বার্থের দাসত্ব বা ব্যবসার প্রসারতা আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই পরিতাপজনক বিষয়। এস্থলে আমার বক্তব্য, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইয়া তৎপ্রকৃতপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রচলন করাই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন উক্ত পঞ্জিকা সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেক কথা বলা হইলেও পুনরায় সামান্য দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি।

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা" এই গুরুতর বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। আর্য্যনিকেতন, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বিদ্বৎসমাজ বলিতে পুরাকালে ব্রাহ্মণ সমাজকেই বুঝাইত। সময়ের পরিবর্ত্তনে অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিলেও হিন্দুর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত উহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অপেক্ষা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী

ধর্ম্মপ্রাণতায়, সদাচারে ও সুশিক্ষায় কোন প্রকারে ন্যূন নহেন বরং নানাবিষয়ে অনুকরণীয়। সেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধিরূপে এই ব্রাহ্মণসভা সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিভূস্বরূপ। হিন্দু রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই সভার সুমীমাংসা সমগ্র হিন্দু সমাজের আদর্শ। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিধানসমূহ সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে সুপবিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকারে পুষ্টি ও পূর্ণবিকাশ সাধিত হয় ও যাহাতে কোন প্রকারে উহার অনিষ্ট না ঘটে,—তৎপ্রতি এই সভার তীক্ষ্নদৃষ্টি স্বাভাবিক। এই কারণে অদ্য তাঁহাদের সমক্ষে এই বিষয়টী পুনরুত্থাপিত করিতে সাহসী হইতেছি।

হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু সভা সমিতি হইয়াছে। বঙ্গদেশেও জনসাধারণের মধ্যে প্রায় ৩০ বর্ষ হইতে এই বিষয়টীর আন্দোলন চলিতেছে। শাস্ত্রানুসারে গণিত সূর্য্যগ্রহণাদির সহিত চাক্ষুষ ঘটনার কতক পার্থক্য অনুভব করতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পঞ্জিকা গণনা প্রণালীর তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সংস্কার প্রিয় কয়েকজন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই প্রকৃতপন্থা পরিত্যাগ করতঃ ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অভিনব প্রস্তাবনা করিয়া উহাই সমাজের প্রতিপালনীয় বলিয়া হিন্দু জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছেন। হিন্দু সমাজের নিকট উহা গ্রহণীয় হইবে কি না, ইহাই ব্রাহ্মণসভার অধিবেশনে সম্যক আলোচনার জন্য আমার বিনীত সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা।

আগামী বর্ষের বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার শেষভাগে প্রকাশিত "সিদ্ধান্ত" নামক প্রবন্ধে উক্ত পঞ্জিকা গণনা বিষয়ে গত বর্ষে ব্রাহ্মণ সভায় যে, আলোচনা হইয়াছিল, তাহার কতক বিকৃত করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তৎকালে শাস্ত্রীয় গণনা প্রণালী সমর্থনকারীগণের পক্ষ হইতে পাশ্চাত্য গণিতের ছায়া অবলম্বনে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ পঞ্জিকা ব্যবহারের যে, প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান আছে, তাহা প্রদর্শিত হইলে বস্তুতই তাঁহাদের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই এতদ্দেশে পাশ্চাত্য গণিত শাস্ত্রের একমাত্র স্বত্বাধিকারী নহেন। শাস্ত্রীয় পন্থা অবলম্বীগণের মধ্যেও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনকারীর সংখ্যা আজকাল বিরল নহে। অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে ঐ সকল আপত্তি অজ্ঞতা নিবন্ধন ও কল্পনাপ্রসূত প্রভৃতি কর্কশোক্তি করিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতেই মনে হয়, কলহে

পরাজিতা। রমণীসুলভ এবম্বিধ কটুক্তি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই। আমরা এই প্রবন্ধে ইহাই অতি সংক্ষেপে দেখাইব।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা সত্য স্বীকার করা সম্বন্ধে প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান আপত্তি এই যে, ইহার অয়নাংশ ভ্রমপূর্ণ এবং বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এই ভ্রমপূর্ণ অয়নাংশ দ্বারা পাশ্চাত্য প্রকৃত গণনা বিকৃত হওয়ায় উহাকে কখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিংশশতাব্দীর জ্ঞানালোকে মিথ্যাকে সমর্থন করিতে যাওয়া বিশুদ্ধ বিড়ম্বনা মাত্র। জানিনা কোন অনুরোধে পাশ্চাত্য গণনা উদ্ভূত প্রকৃত দৃক্‌তুল্য অঙ্ক পরিত্যাগ করতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তের নিরয়ণ বর্ষমানকে স্থির রাখিতে গিয়া আধুনিক জ্যোতিষের এইরূপ অবমাননা করিয়া ইতঃভ্রষ্ট ততঃনষ্টের অভিনয় করিয়াছেন। অজ্ঞলোককে নিরয়ণ মেষাদি বিন্দু দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বাভিমুখে সচল বিন্দুকে দেখাইয়া দেওয়া সহজ বটে. কিন্তু বিদ্বৎ সমাজে উহা কখনই আদৃত হইতে পারে না। পণ্ডিতবর বেঙ্কটেশকেতকার দেখাইয়াছেন যে, ইতিমধ্যেই ৪ চারি অংশের পার্থক্য হইয়াছে। তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডলস্থিত দৃক্‌তুল্য মেষরাশি হইতে এই কাল্পনিক নিরয়ণ মেষরাশি ৪ চারি অংশ অন্তরিত হইয়াছে। পূর্ব্বাভিগামী সচল বিন্দু হইতে পশ্চিমগামী সম্পাৎ বিন্দুর পার্থক্যকে আর যাহাই বলা হউক, উহাকে অয়ন গতি বলিতে হইলে সত্যের অপলাপ হইবে, যে হেতু অয়নগতি শব্দে খগোলস্থিত ধ্রুববিন্দু হইতে সম্পাৎ বিন্দুর পার্থক্যকেই বুঝায়। এইরূপ উৎকট ব্যাখ্যার ফলে পাশ্চাত্য দৃক্‌তুল্য অয়নগতি ৫০.২৫ বিকলা স্থলে মিথ্যা অয়নগতি ৫৮.৭ বিকলা ধরিয়া লইতে হইতেছে। অপরে কোন দায়ে ইহা অনুমোদন করিবে?

দ্বারকাক্ষেত্রের শ্রীল জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের সভাপতিত্বে বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ শোধন সভা যে আদিবিন্দু ও বর্ত্তমান ভবিষ্যতের বিচার্য্য বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক মহাশয় কেন যে, নিজ দায়িত্বে স্থির করিয়া অয়নাংশে এই বিষম বিভ্রাট ঘটাইলেন তাহা বুঝা গেলনা। ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনুমোদিত নহে, জানিয়াও কে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকে পাশ্চাত্যমতে দৃক্‌তুল্য বলিতে সাহসী হইবে?

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ব্যবহারের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, উহা পাশ্চাত্য গণনা প্রণালী অবলম্বনে গণিত হওয়ায় নানাপ্রকার সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ, এই সংস্কার হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত কিনা আগ্রেই নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক মতে দৃক্‌তুল্য করার জন্য চন্দ্রাদিগ্রহে বর্ত্তমান সময়ে অনেকগুলি নূতন সংস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।—হিন্দু জ্যোতিষে কেবলমাত্র মান্দ্য ও শৈঘ্র সংস্কার দেওয়া হয়। ইহাও একটী নিয়মানুসারে। অন্য কোন প্রকার সংস্কারের উল্লেখ হিন্দু জ্যোতিষে ইতিপূর্ব্বে কোন সময়েই দৃষ্ট হয় না। সংস্কার প্রয়াসীগণের মধ্যে ঋষিগণের সময়ে এই সকল অতিরিক্ত সংস্কার করার প্রয়োজন ছিলনা, এরূপ বলিতে কেহ সাহস করিবেন কিনা জানি না। তবে এই মাত্র বলিয়া থাকেন যে, হিন্দু ঋষিগণ উহা জানিতেন না। হিন্দুগণ এই ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারেন না কারণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণকে অজ্ঞশ্রেণী-ভুক্ত করিতে হিন্দুহৃদয় ব্যথিত হয়। আমাদের সহজ বোধ্য সামান্য অঙ্কে যে, ঋষিগণের প্রবেশ নাই, তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল্য কি? এই প্রশ্ন উদিত হইলে হিন্দুধর্ম্ম ভিত্তীহীন হইয়া পড়ে। কাজেই উহা আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মহাত্মার অর্থসুযোগ ও সময়ের অভাবে "দেবমন্দির অর্দ্ধনির্ম্মিত" থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রপ্রণেতা হিন্দু ঋষিগণের ক্ষমতার অতীত কিছু থাকা হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন না। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস লইয়াই তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার জন্য পঞ্জিকা দেখিতে যান, যে অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আমাদের কল্যাণের জন্য নিষ্কপটে এই সমস্ত প্রথাও ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার প্রতিকুলে হিন্দুগণকে বুঝাইতে যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথা। তাঁহাদের এই স্থির বিশ্বাস কল্পনা প্রসূত প্রতিপাদ্য করিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হইবে জানিয়াও যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অনেক বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ বিরল নহে। পূর্ণিমান্তে চন্দ্রের মধ্যগ্রহণ নির্ণয় করা ছায়া হইতে স্ফুটসাধন করা প্রভৃতি দ্বারা উহাই প্রতিভাত হয়। অতএব বর্ত্তমানে যে সকল সংস্কার করিয়া দৃক্‌তুল্য করার চেষ্টা হইতেছে, উহা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত ছিল, ইহা না দেখান পর্য্যন্ত স্বীকার করার যথেষ্ট হেতু হয় না। দুই একস্থলে সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃক্‌তুল্য শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াই উতলা হইবার কোন কারণ নাই। কল্পনার বিস্তারে সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ত্তমান যেরূপ আধুনিক মতে দৃক্‌তুল্যতা লাভকরে, সকল স্থলেই ঐরূপ কিম্বা ততোধিক সঙ্কুচিত করিয়া দৃক্‌তুল্য আখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলনা কে বলিল? বরং ইহাই অনুমিত হয়। হিন্দুগণ শাস্ত্রের ভাবগ্রাহী সংকীর্ণতা উপেক্ষা করিয়া সারগ্রাহী ব্যাখ্যাই অধিকতর আদর করেন। ঋষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মকর্ম্মের কাল নিরূপণের জন্য হইলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সংস্কারের জন্য স্বর্গমর্ত্ত পাতাল আলোড়ণ করার আবশ্যকতা হয় না ; "বানবৃদ্ধি রসক্ষয়" প্রভৃতি নিয়মাবলী অনুধাবন করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ততোধিক হ্রাসবৃদ্ধি উপেক্ষিত হইয়াছিল।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার দেশান্তর শোধন যে সূক্ষ্ম নহে, তাহা অতি সহজেই দেখান যাইতে পারে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বঙ্গীয় ১৩১৫ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গণকের নিবেদনে লিখিত আছে, "মহাবিষুব সংক্রান্তি উজ্জয়িনীর লওয়া প্রথা আছে এবং অদ্যাবধি তাহাই লওয়া হইতেছে, পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর ২।৩৪ পল, এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর ২।৮ পল। বিক্রমপুর হইতে নবদ্বীপের পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও দেশান্তর আর বদল হইল না। উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তরও সেই ২।৩৪ পল থাকিল। যখন সকল বিষয়ে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংশোধন করা হইয়াছে, তখন এই বিষয়ে কেন অশুদ্ধ থাকে, এই বিবেচনায় আমি গত দুই বৎসর হইতে উজ্জয়িনী মহাবিষুব সংক্রান্তি সময়ে কলিকাতার দেশান্তর ২।৮ পল যোগ দিয়া পঞ্জিকায় লিখিতেছি"।

বর্ত্তমান সময়ে এই সংশোধন আবার পরিত্যক্ত হইয়া কলিকাতাতেই কথিত বিক্রমপুরের দেশান্তর ব্যবহৃত হইয়া আগামী বর্ষের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মহাবিষুব সংক্রান্তি কলুষিত করিয়াছে। একই পঞ্জিকার যাহা ভুল বলিয়া একবার নির্ণীত হইয়া সংশোধন করা হইল, উহাই আবার বিশুদ্ধ উল্লেখে ব্যবহার করা কি অতীব বিস্ময় জনক নহে ?

গ্রহগণের স্ফুট, গণিতসম্মত বীজ শুদ্ধ হইলেও দৃকতুল্য হয় না। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় করিতে প্রকৃত গ্রহভেদ, হইলে আলোক বক্রতা বিম্বোৎক্ষীপ্তি প্রভৃতি কতিপয় সংস্কার করিয়া লইতে হয়। এতৎব্যতিত ভ্রমপূর্ণ নিরয়নকে প্রকৃত সংস্কার করিয়া গ্রহ সন্নিবেশের আবশ্যকতা হইবে। নতুবা ধ্রুব নক্ষত্রগণের নিরয়ণ সংস্থানকেও যদি বর্ষমানের অনুরোধে চালাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিড়ম্বনা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বেধ মিলাইতে হইলে যদি এই সকল সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে তাহাকে দৃকতুল্য বলা কি কতকটা কষ্টকল্পনা নহে ?

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা

গণনায় গোলযোগ হইবে না, বলিতে গেলে সত্যতার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না, মূলেই অয়নাংশে যখন বিষম গলদ রহিয়াছে,—তখন ভবিষ্যতে গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ সম্মত অয়নাংশ অপেক্ষা কল্পিত অয়নাংশ প্রতিবর্ষে ৮॥ কলা করিয়া যখন বিনা কারণে অন্যায়রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন রাশি ও নক্ষত্রের নামের সহিত প্রকৃত খগোলস্থিত অঙ্কনের মিল থাকিতে পারে না। এই গোলমাল নিতান্ত দায়গ্রস্থ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অনুমোদন করিবেন না। সায়ন মেষারম্ভবিন্দু সচল বলিয়া নিরয়ণ রাশিচক্রের আদি বিন্দুকে সচল কল্পনা করা জ্যোতিষের নিতান্ত বিরুদ্ধ। সোণায় পাথর বাটীর ন্যায় অদ্ভুত চলিষ্ণু নিরয়ন রাশিচক্র প্রকৃতই হাস্যাস্পদ। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই বর্ত্তমানে কখনই উহা সমর্থন করিবেন না।

উপরে যে সকল হেতুবাদ প্রদর্শিত হইল উহা অতিক্রম করিতে না পারিলে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা হিন্দুগণের ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অয়নাংশ প্রকৃত না হইলে বহুকষ্টে সাধিত দৈনিক নক্ষত্রস্থিতি ও যোগ-দণ্ডাদি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইতেছে। অয়নাংশের ভ্রম তিথিতে আক্রমণ করে না বটে, কিন্তু তিথি নক্ষত্রের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় কাল নির্ণয় ব্যাপারে ব্যবহারের অনেক স্থলেই অযোগ্য হইয়া পড়ে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে তিথির "বানবৃদ্ধি রসক্ষয়" সূচিত গণনার উপরেই যখন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তখন উহার বিপরীত ফল যে গণনায় উদ্ভূত হয় তাহা শাস্ত্রে সিদ্ধ বলিতে সাহস হয় না। অন্ধস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহিতার সহিত বিষয়টী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মকর্ম্মের কাল নির্ণয়ই হিন্দু জ্যোতিষের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাই আজিও অজাগলস্তনের ন্যায় আনিয়াও নিরয়ণ মেষ সংক্রমন দিবসে ঘটোৎসর্গাদি সম্পন্ন হইতেছে। ইহা প্রকৃত হইলে মান্দ্য ও শৈঘ্র ফলের অতিরিক্ত বিবিধ সংস্কার ব্যবহার করিলে যে, উদ্দেশ্য চ্যুত হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। উপরোক্ত উভয় কারণেই বর্ত্তমান সময়ে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা হিন্দু সমাজে প্রচলন করার অসুবিধা ঘটিতেছে এবং এই কারণেই হিন্দুগৃহস্থের ধর্ম্মকর্ম্মাদি দৃক্‌সিদ্ধ মতে হইতেছে না। ইহা বহুকালাগত প্রথা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বের স্তব্ধতা নহে, ইহাতে মানসিক দৌর্ব্বল্যের চিহ্নমাত্র নাই। সারগ্রাহী হিন্দুসমাজ আবশ্যক বিবেচনা করিলে পরিবর্ত্তনকে বিন্দুমাত্র ভয় করেন না, যে হেতু পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী মতের সামঞ্জস্যে বিশালহিন্দু সমাজের

তাহাদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র দুরূহ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। যাঁহাদের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রীয় জ্যোতিষের সহিত আধুনিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় তাঁহারাই স্বকপোল কল্পিত পন্থা অবলম্বনে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, যাঁহাদের উভয় বিষয়েই প্রবেশ আছে, তাহারা পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান না, যেটী যে প্রকারে ব্যবহার করা সঙ্গত তদ্রূপই করিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক মহাশয় জাতকাদি গণনায় অন্ত পঞ্জিকার ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াছেন, ইহা অতি আশাপ্রদ। পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায়িগণ নেপচুন ও ইউরেনাস গ্রহদ্বয় সহ সায়ন গণনা ও বিষুবৎস্থত গ্রহস্ফুট হইতে সর্ব্বদাই জাতকাদি মিলাইতে সমর্থ হইতেছেন বলিয়া কি সায়ন মতে হিন্দুর যাগযজ্ঞ হইতে পারিবে? ইহা হইতে পারিলে সকল বিবাদ নিঃশেষ হয়। তখন আর বলিতে হয় না যে, বিশুদ্ধ অয়ন গতি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের সময়ে ৫৪ বিকলাই ছিল, যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল হইতেই বলিতেছেন যে অয়ন গতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৫৪,২৪ হইয়াছে। নিরপেক্ষভাবে দেখিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা পন্থা পরিবর্ত্তনমাত্র। হিন্দুফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার যে গণনার উপর এতকাল ফল মিলাইতেন তাহা কি শাস্ত্রীয় গণনা ছিল না? তাহা হইলে এতগুলি নব্যসংস্কার ব্যতীত গ্রহস্ফুটের উপরে নির্ভর করিয়া কি ফললাভ করিতেন না বিশ্বাস করিতে হইবে। যাহা হউক বলিবার, লিখিবার, বুঝাইবার অনেক বিষয় থাকিলেও এ প্রবন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছা করি না, তবে এইমাত্র শেষ বলিতে পারি প্রকৃত দৃক্‌তুল্য পঞ্চাঙ্গ প্রচলন প্রয়াসী হইলে প্রাচীন ঋষি প্রণীত নিবন্ধ গুলিকে কোন প্রকারে ধ্বংশ করিয়া অগ্রে নূতন শাস্ত্র নিবন্ধ প্রনয়ন ও পরে পঞ্চাঙ্গ গণনার ব্যবস্থা করিতে হইবে নতুবা কিছুই হইবে না।

অবলাজাতির প্রতি উপদেশ।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

লজ্জা।—লজ্জা রমণীর চরিত্র-রক্ষার শ্রেষ্ঠ আবরণ—লজ্জা নারীর অপূর্ব্ব অমূল্য রত্নাভরণ। লজ্জাবতী সতী গৃহস্থ-গৃহের দেবী স্বরূপিনী। লজ্জা নারীর মান-সম্ভ্রম ও ধর্ম্মরক্ষার সুদৃঢ় বর্ম্ম বিশেষ। লজ্জাবতী সতীকে গৃহে কে না আদর-যত্ন করে? হিন্দু গৃহে লজ্জাহীনা সুন্দরী অপেক্ষা লজ্জাবতী কুৎসিতা নারীরই সমধিক গৌরব। লজ্জাবতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল; সংসারে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে। সদা যত্র-তত্র হাস্য-পরিহাস পরায়ণা লজ্জাহীনা চঞ্চলা নারীকে কে না ঘৃণা করে? লঘু প্রকৃতির লজ্জাহীনা অবলাকে কেহই সম্মান ও গ্রাহ্য করে না।

স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের নিকট লজ্জা প্রদর্শন, প্রকৃত লজ্জাশীলতার পরিচায়ক নহে; উহা গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা বিশেষ ভাব বিকাশ মাত্র। সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথন বা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করা নির্লজ্জতা নহে। অপরিচিত বা দূর-সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণের নিকট যে সঙ্কোচভাব তাহাই প্রকৃত লজ্জা। যাঁহারা পিতৃসম শ্বশুর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য ভাশুর এবং প্রাণদেবতা পতির দর্শনে সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করেন, অথচ অপরিচিত অজ্ঞাত কুল-শীল পাচক ও ভৃত্যাদির সহিত অসঙ্কোচ আলাপ করেন, বস্তুতই ইহা কু-প্রথা বলিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

লোকের নিকট নির্লজ্জা বলিয়া পরিচিতা হওয়া বংশের নিন্দাজনক ও আত্মসম্ভ্রম বিনাশক। সদা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার আলাপ সদ্বংশ বা সুরুচির পরিচায়ক নহে; উহাতে লজ্জাশীলতা ও মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়। অনেক অল্পবুদ্ধি নারী স্বামী-ভবনের ক্ষুদ্র বালকটি দেখিয়া সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করেন, আর পিতৃ-ভবন-সংশ্লিষ্ট অজ্ঞাত অপরিচিত আত্মীয় ও ভৃত্যাদির সহিত অনায়াসে আলাপ করিয়া থাকেন! জানি না, ইহা কিরূপ লজ্জাশীলতা। লজ্জা অভিনয়ের বস্তু নহে; লজ্জা নারীর মান-সম্ভ্রম ও চরিত্র-রক্ষার শ্রেষ্ঠ আবরণ—লজ্জা রমণীর প্রকৃতি দত্ত অমূল্য ভূষণ।

প্রাচীন শিক্ষার দোষে লজ্জা এদেশ হইতে দ্রুত পলায়ন করিতেছে।

নব্য আদর্শে লজ্জাশীলা বধূ এখন বিরি হইতেছেন। যাঁহারা ঘোম্‌টা ছাড়িয়া গাউন পরিয়া বিবি সাজিয়া গার্ডেনে যোগদান করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। শিকলকাটা পাখীকে স্বাধীনভাবে উড়িতে দেওয়াই ভাল! আমাদের যত ভাবনা ঐ গৃহকোণ প্রতিষ্ঠিতা দেবীদের জন্য।

যাঁহারা এখনও প্রাচীন ছাঁচে গঠিতা ও প্রাচীন আদর্শে প্রতিপালিতা অনেক সময় বুঝিবার দোষে তাঁহারাও এই সুন্দর ভাবটুকুকে বড় মলিন করিয়া ফেলেন। বাটীতে আগন্তুক কেহ আসিয়াছেন, অবগুণ্ঠনে বদন আবরিয়া ধীর পদবিক্ষেপে সকল কাজ করিলে ক্ষতি কি? গন্তব্য পথে অপরিচিত বা গুরুজন কেহ চলিয়া যাইতেছেন, উপযুক্ত অবগুণ্ঠন-আচ্ছাদনে অঙ্গ আবরিয়া পথ ছাড়িয়া একপার্শ্বে একটুকু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলেই ত হয়, তা পশ্চাৎ চাহিয়া তাঁহাকে মুখ-চোক্ দেখাইয়া—পরে এক হাত ঘোম্‌টা টানিয়া পড়িতে পড়িতে দৌড়িলে ফল কি? আবার কেহ কেহ বা অতিরিক্ত লজ্জায় জড়-সড় হইয়া দাক্ষণে যাইতে বামে পদ-বিক্ষেপ করেন, পরিবেশন করিতে থালে কি মাটীতে দিবেন সে জ্ঞান থাকে না। ভদ্র মহিলার পক্ষে এ সামান্য বিড়ম্বনার বিষয় নহে।

বিবাহাদি উৎসবে—বিশেষতঃ গর্ভাধান বিবাহোৎসবে কুরুচিপূর্ণ উচ্চ সঙ্গীতধ্বনি করা, নব জামাতা ও বৈবাহিক প্রভৃতির সহিত রুচি বিগর্হিত রসালাপ ও একত্র ভোজন এবং বাসর জাগরণ প্রভৃতি অবশ্যই কুলাঙ্গনা-গণের পক্ষে সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচায়ক নহে। অনেক সময় এরূপ আমোদ প্রমোদে পবিত্ররমণী চরিত্র কলুষিত হইতেও দেখা যায়। ফলতঃ হিন্দু সিমন্তিনীগণের পক্ষে পতি, পিতা, পুত্র ও সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি কতিপয় ঘনিষ্ট আত্মীয় ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত আলাপ না করাই শ্রেয়ঃ।

শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে অধুনা রমণীর অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে পশ্চাৎ দিকে সরিয়া পড়িতেছে। শাশুড়ী যেখানে যাইতে বা যাহার সহিত আলাপ করিতে সরমে মরিয়া যান, পুত্র-বধূ অনায়াসে তথায় যাইতে বা তাহার সহিত আলাপ করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিতা নহেন। জানি না, ইহা উন্নতি না অবনতি? এদেশ হইতে এ সব কুপ্রথার পরিহার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রার্থনা হিন্দুগৃহ আবার প্রাচীন আদর্শে সুগঠিত হউক।

বেশ-ভূষা।—সদা অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, অলক্তক রাগে রঞ্জিতা, সুপরি-

চ্ছদে সজ্জিতা ও সুরঞ্জিত সুরভি তৈলে চর্চ্চিতা হইলেই রমণীর সৌন্দর্য্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় না। নারীর সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় গুণে-জ্ঞানে ও নিরভিমানে; সৌন্দর্য্য বাড়ে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গুণে। সদা সদাচার পরায়ণা প্রিয়-ভাষিণী, মধুর-হাসিনী নিরভিমানিনী লজ্জাবতী সতী রূপবতী না হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আদরণীয়া হইয়া থাকেন। সুপুচ্ছধারিণী ময়ূরী অপেক্ষা সুকণ্ঠী কোকিলার আদর কম নহে। সুরুচি পরায়ণা সুশীলা মহিলা ভূষণবিহীনা হইলেও শুধু চরিত্র প্রভাবেই নির্ম্মাল্য-পুষ্পের ন্যায় সদা সুশোভিতা। যাঁহার অন্তঃকরণ সুন্দর, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও স্বভাবগুণে তাঁহার দেহ-জ্যোতিঃ আপনি ফুটিয়া উঠে। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই একমাত্র সৌন্দর্য্য নহে; উহা লালসাকলুষ সম্পন্ন নরনারীর চিত্তাকর্ষণের নিকৃষ্ট উপাদান মাত্র। মানুষের আভ্যন্তরিত গুণাবলীই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকাশক। বাহ্যিক বেশ-ভূষা অপেক্ষা আন্তরিক ধর্ম্মভাব ও সদিচ্ছা প্রভৃতিই লোকদিগকে সমধিক সুন্দর ও সমাদৃত করিয়া থাকে। বিনয়-নম্রতা, গাম্ভীর্য্য উদারতা, সৌজন্য-সরলতা, স্নেহ-মমতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সতীত্ব প্রভৃতিই রমণীর অমূল্য রত্নাভরণ। রমণী এ সব ভূষণ প্রভাবেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন।

রসিকতা।—রসিকতা জিনিসটা মন্দ নহে; কিন্তু রসিকতার নামে অশ্লীলতা বা বাচালতার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রসিকতা করিতে পার ভাল; কিন্তু যত্র-তত্র যা—তা বলিয়া রসিকতার নামে তরলতার পরি-চয় প্রদান করিয়া হাস্যাস্পদ হইও না। স্বভাব-চঞ্চলা নারীকে কেহ ভক্ত-ভক্তি ও সম্মান করে না; ধীরা, স্থিরা ও গম্ভীরা রমণী সকলেরই নিকট প্রীতি-ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। একটুকু ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্ট ভাবে কথা বলাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সময় ও প্রয়োজন বোধে একটুকু রসাল করিয়া বাক্য-বিন্যাস—শীলতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রসিকতা করিতে পারিলে উত্তম; কিন্তু সাবধান, তাহা কুরুচি বা অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট না হয়। রসিকতা সামাজিক প্রীতি ও সম্ভ্রম বৰ্দ্ধক; কিন্তু বাচালতা মানুষের নিত্য সম্ভ্রম বিনাশক। সম্ভ্রান্ত সমাজ, হীনরুচি সম্পন্ন লঘু চরিত্রের নর-নারীদিগকে তৃণবৎ উপেক্ষা করেন।

সন্তোষ।—সন্তোষ পরম ধন। অল্পে তুষ্ট থাকা অতি উত্তম। যাহার যত আকাঙ্ক্ষা, তাহার অভাব ও দুঃখ তত বেশী। হিংসা, দ্বেষ, কলহ, পরশ্রীকাতরতা, অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, শ্রমহীনতা ও বিলাসিতা প্রভৃতি নিত্য

প্রফুল্লতা বিনাশক। দরিদ্রতা প্রফুল্লতার পরম শত্রু। দরিদ্র স্বামীর অভাব অনাটন দর্শনে ক্ষুণ্ণ হওয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। আদর্শ-সতী সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও দীন-দরিদ্র পতি-সেবায় পরম সুখী হইয়াছিলেন। সতী নিস্থলা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কাঙ্গাল পতির সেবা করিয়াই আত্মপ্রীতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুখ বাহিরে নহে; সুখ মনে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, এ বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার দত্ত প্রতি পদার্থেই তৃপ্তিলাভ করা যায়। অতএব এ নশ্বর সংসারের ক্ষুদ্র অভাব-অশান্তিতে মনের সন্তোষ নাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিনয়।—বিনয় মানবজাতির শ্রেষ্ঠভূষণ—বিনয় রমণীর লজ্জার ন্যায় আর একটি রত্নাভরণ। বিনীত ব্যক্তিকে কেনা ভাববাসে? বিনয়ে হৃদয় ও দেহ সুকোমল এবং সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়। লজ্জা-বিনয় ভূষিতা প্রফুল্লা নারী রমণীরত্ন। উদ্ধতা উগ্রচণ্ডা রমণী মূর্ত্তিকে লোকে ভয় করিতে পারে, কিন্তু ভক্তি করে না। ঔদ্ধত্যদ্বারা যাহা না হয়, কোমলতা দ্বারা অনায়াসে সে কাজ সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু বিনয়ের নামে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন করা অকর্ত্তব্য। এ জগৎ আত্মসম্ভ্রমশীল বিনীত ব্যক্তির চির-বশীভূত।

সৌজন্য।—শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের নামই সৌজন্য। উহা বিনয়েরই অবস্থান্তর মাত্র। লজ্জা, বিনয়, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ-মমতা প্রভৃতি গুণাবলীর ন্যায় রমণীর সৌজন্য-ভূষণেরও বিশেষ প্রয়োজন। যেমন সিন্দূর বিন্দুবিহীনা সধবানারী সালঙ্কৃতা হইলেও অশোভনা, সেইরূপ সৌজন্যগুণ বিরহিতা নারী ভদ্রবর্ণিতা হইলেও সর্ব্বত্র অনাদৃতা। সৌজন্যশালিনী, মধুর-হাসিনী, প্রিয়ভাষিণী মহিলাগণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন।

কর্ত্তব্যবোধ।—কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা সকলেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য লোক এ সংসারে পদে পদে লাঞ্ছিত গঞ্জিত ও বিপদগ্রস্ত হয়। শত অনুরোধ-উপরোধেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত। কর্ত্তব্যজ্ঞান মানুষকে নরকের কুপথ হইতে স্বর্গের সুবর্ণ সোপানে টানিয়া লইয়া যায়। শত স্বার্থের ব্যাঘাত—অনন্ত অভাব-অসুবিধা উপস্থিত হইলেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অকর্ত্তব্য।

গর্ব্ব।—গর্ব্ব মানুষেব অনন্ত গুণরাশি ম্লান করে। গোচনা বিন্দু পতিত দুগ্ধের ন্যায় গুণগ্রাম সম্পন্ন গর্ব্বিত নরনারী সর্ব্বত্র উপেক্ষার পাত্র। অহঙ্কার মানবের পতনের মূল, সুযশঃ ও সুনামের বিনাশক এবং জীবনের উন্নতি-পথের বিষম-কণ্টক স্বরূপ গর্ব্বিত ব্যক্তি বহু গুণশালী হইলেও কেহ তাহাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না। প্রায় সকলেই তাহার নিকট হইতে দূরে

অবস্থান করিতে ভালবাসে। নারীর দর্প আরও অসহনীয় ও অশোভন। দর্পিতা রমণীর সঙ্গ কেহই ভালবাসে না। পরন্তু সকলেই তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। গর্ব্বিত নরনারীর দুঃখ অভাব ও অবনতিতে কাহারও প্রাণে বড় একটা ব্যথানুভব হয় না; বরং দর্পিতার পতনে অনেকে আন্তরিক প্রীতিলাভই করিয়া থাকে। নিতান্ত আত্মীয়-স্বজনেরাও অহঙ্কারীর প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। নিরভিমানিনী গুণবতী মহিলা ধন-সম্পদে বা আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিতা না হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃতা হইয়া থাকেন। বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ-যৌবন, কুল-শীল কি ধন-জনের অহঙ্কারে অযথা স্ফীত হওয়া রমণী মাত্রেরই নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ক্রোধ।—ক্রোধ মানব জাতির পরম শত্রু। একমাত্র ক্রোধের বশীভূত হইয়া মানব এ সংসারে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানই করিতে পারে। ক্রোধ-কালে হিতাহিত ও লঘু-গুরু জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রোধ মানুষের পরম অশান্তির মূল এবং পারিবারিক প্রীতি বিনাশক। রাগান্ধ ব্যক্তির প্রাণে কিছুমাত্র সুখশান্তি থাকে না। ক্রোধীকে এ সংসারে কে না ঘৃণা করে? ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যগণ কোন্ পাপের অনুষ্ঠান না করিতে পারে? ক্রোধ নরকের প্রীতিভাজন সহোদর ভ্রাতা। কোপনস্বভাব নর-নারী সকলেরই অশ্রদ্ধার পাত্র। নিতান্ত আত্মীয়েরাও তাহার সহবাস ভাল-বাসে না। অতএব নরনারী মাত্রেরই যত্নপূর্ব্বক ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত। কবি বলেন,—

"ক্রোধ সম মহাপাপ, নাহি কিছু আর।
ক্রোধের বিষাক্ত বায়,
যশঃ রসাতলে যায়,
ক্রোধি জনে ঘৃণে সদা নিখিল সংসার॥"

কলহ।—কলহ বিষম অনর্থের মূল। অনেক সময় পারিবারিক কলহ হইতে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতাই কলহ সৃষ্টির কারণ। সঙ্কীর্ণতা স্থলে উদারতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে এবং একটুকু সহিষ্ণুতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ঝগড়া-কলহ হইতে বহুল পরিমাণে মুক্ত থাকা যায়। যে সকল কলহপ্রিয়া মহিলা মনে করেন যে,—

"দুর্লভ রমণী জন্ম লভিয়া, ঝগড়া যদি
না করিল, জীবন বিফল!"

তাঁহারা নারী-জীবনে কখনও শান্তিলাভে সমর্থ হন্ না। শান্তিই অমৃত; কলহ সে অমৃত কুম্ভ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে; শান্তির মঙ্গলগৃহে অমঙ্গল অসুরকে ডাকিয়া আনে। সর্ব্ব জীবহিত—সর্ব্ব প্রাণীতে সমদর্শন জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হইলে, মনুষ্য-হৃদয়ে স্বার্থপরতার কলহ আর তিষ্ঠিতে পারে না।

দয়া। দয়া মানবের—বিশেষতঃ অবলাজাতির একটি শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। পর-দুঃখে যাঁহার হৃদয় দ্রব—অশ্রু প্রবাহিত না হয়, সে নারীরূপিনী রাক্ষসী না হইলেও মাতৃ-জাতির কলঙ্ক। রমণী মায়ের জাতি;—রমণী-প্রাণ অনন্ত দয়ার শান্তিপ্রস্রবণ; তাই মা শব্দ এত মধুর—মাতৃ-স্নেহ এত সুখ-শান্তি ও প্রীতিপ্রদ। ঐ দেখ, কবি বলিতেছেন,—

"রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজিলেন সেইরূপ দিদি! রোগ, শোক, দুখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক;
আছে আর কিবা সুখ হায়! এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী-জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়।
আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ত্ব তাহার?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,
যে হয় সে পুণ্য-পারাবার।"

কুরুক্ষেত্র।

সর্ব্বজীব-হিত-চিন্তা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"বুঝিবে মানবগণ,—সর্ব্বজীবে নারায়ণ,
　　সর্ব্বজীব-হিত মহাধর্ম্ম নিরমল।
এই নব ধর্ম্মে, ভগ্নি! হবে ক্রমে পরিণত,
　　মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল।"

অতিথি-সেবা।—অতিথি-সেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম; অতিথি-পূজা নারীর

অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতিথি নারায়ণ স্বরূপ; ভক্তিপূর্ণ মনে তাঁহার সেবা করা উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

"শত্রু যদি গৃহে আসে অতিথি হইয়া,
করিবে তাহার পূজা আহারাদি দিয়া।
নীচেও অতিথি হ'লে মহতের ঘরে,
করিবে তাহার পূজা অতি সমাদরে।"

ভক্তি।—ভক্তিই মুক্তির উপায়। শ্রীভগবান নর-নারী দেহে সদা বিরাজমান। গুরুজন, অতিথি, দেব, দ্বিজ ও পতিভক্তিতে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তিমতী নারীর জন্ম স্বর্গের দ্বার সদা উন্মুক্ত। কবি বলিয়াছেন,—

"ভক্তি-উচ্ছ্বসিত রমণী-হৃদয়,
যে স্বর্গে লইয়া যায়,
কত সাধনায়, ধর্ম্মশাস্ত্র তার
ছায়া মাত্র দেখে, হায়!"
জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত,
যেথানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেথানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"

সত্য।—সত্য অমৃত এবং মিথ্যা বিষ তুল্য। এ সংসারে সদা সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে—এ বিশ্বের নরনারী সকলে সত্যনিষ্ঠ হইলে, মানবজাতির সুখ-সুবিধার—অনাবিল শান্তির অবধি থাকিত না। সত্যই জ্ঞানময় ব্রহ্ম। সত্যের ন্যায় বল—সত্যের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। একমাত্র সত্যেই জয় ও ধর্ম্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত। অতএব সকলের মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যে,—

"মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন।"

যতিপঞ্চকম্।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র দ্বারা অনুবাদিত।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা ॥ ১ ॥

অতি শান্তিময় এই নিবৃত্তি মনের—
মণিকর্ণিকার মত—তীর্থের স্বরূপ ;
আদিগঙ্গা—উৎসারিত জ্ঞানের প্রবাহ,
আমি, সেই কাশী তীর্থ—নিজ বোধরূপ ॥ ১ ॥

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা জগদাত্মরূপা
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা ॥ ২ ॥

এ মনোবিলাস—এই চারু চরাচর ;
হতেছে কল্পিত যাহে ইন্দ্রজাল রূপে ;
চিদানন্দময়ী আর সর্ব্বআত্মরূপা,
আমি, সেই কাশী—মোর নিজ বোধরূপে ॥ ২ ॥

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা ॥ ৩ ॥

হৃদয়ের পঞ্চকোষে বিরাজে ভবানী—
প্রতিদেহে অধিষ্ঠিতা, তিনি বুদ্ধিরূপা ;
জগতের সাক্ষী, শিব—আত্মা সকলের,
আমি, সেই কাশী—মোর নিজ বোধরূপা ॥ ৩ ॥

---

* আচার্য্য শঙ্করের যতিপঞ্চকের পদ্যানুবাদ।

কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী
কাশী সর্ব্ব প্রকাশ্যতে।
সা কাশী বিদিতা যেন
তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪ ॥

কার্য্যপ্রকাশিকা কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা,
মনোমাঝে মহাতীর্থ সর্ব্ব-তীর্থ-সার ;
যে জন জানে এ কাশী তিনি অতি ধীর,
কাশী লাভে মনে তাঁর আনন্দ অপার ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং
ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং
নিজগুরু চরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ
সকল জনমনঃ সাক্ষীভূতান্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং
যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫ ॥

শরীর(ই) এ কাশীক্ষেত্র ; সকল ব্যাপিনী,
বিশ্বমাতা জ্ঞানগঙ্গা সদা প্রবাহিত।
হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা—পূত গয়াধাম,
গুরুর চরণাধ্যান, প্রয়াগের মত ॥
এই যে আনন্দ প্রাণে—ইনি বিশ্বেশ্বর,
সকল মনের সাক্ষী আত্মা সবাকার।
দেহে মোর রহিয়াছে সব বিদ্যমান—
অন্য তীর্থে প্রয়োজন কি আছে আমার ॥ ৫ ॥

কৃপণ ও ভগবান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়।

কোন স্থানে এক অতি কৃপণ বাস করিতেন। তিনি প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভগবান একদিন তাঁহার কৃপণতার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দীন ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুইটী পয়সা ভিক্ষা করিলেন। কৃপণ একটু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "ঠাকুর পয়সা রোজগার অনেক কষ্টে হয়, তোমাদের কি? চাহিয়া নিশ্চিন্ত, পয়সা কোথা হইতে আসে, খপর রাখ কি? যে সময় উপস্থিত, দান খয়রাদ করিব কি, নিজের খাওয়া পরা চালানই দুর্ঘট; যাও, এখন যাও, মাসখানেক পরে এস।" ব্রাহ্মণরূপী ভগবান কহিলেন, "বারা আপনার দয়া, আচ্ছা তাই আস্‌বো। একমাস অতীত হইবামাত্র পুনর্ব্বার ভগবান সেইভাবে কৃপণ সমীপে আসিয়া তাহার প্রতিশ্রুত দুইটী পয়সা প্রার্থনা করিলেন। কৃপণ একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর আপনি বেশ লোক দেখ্‌ছি, আপনার কি সময় অসময় নাই। এমাসে হবে না, যা কিছু পেয়েছিলাম, সব খরচ হয়ে গেছে, মাস চার পরে এস।" ব্রাহ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কৃপণ ভাবিলেন, চার মাস পরে কি ব্রাহ্মণের দুইটী পয়সার কথা মনে থাকিবে, লম্বা মিয়াদ দেওয়া গেল। কিন্তু ভগবান ভুলিবার নহেন, ঠিক চার মাস পরে ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কৃপণ গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "বাবু বাটীতে আছেন কি? সেই ব্রাহ্মণ আপনার দ্বারস্থ, আপনার প্রতিশ্রুত দুইটী পয়সা ভিক্ষা করিতেছে।" কৃপণ ভাবিলেন, সেই ব্রাহ্মণ বুঝি, কি আশ্চর্য্য! এ যে, নাছোড় বান্দা দেখ্‌ছি। পার্শ্ববর্ত্তিনী গৃহিণীকে কহিলেন, "দেখ, তুমি এক কাজ কর, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কর, এই বলিয়া কাঁদ, যে বাবু সর্পাঘাতে এইমাত্র মারা গেলেন, ঐ ছুরী লইয়া আমার অঙ্গুলিতে একটু রক্ত বাহির করিয়া দাও।" কৃপণ পত্নী রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন, "সে কি? জীয়ন্ত মানুষ মারা গেল বলিয়া কাঁদিব কি, তা পার্ব্বোনা, ছি ছি বল কি!" কৃপণ কহিলেন, "দেখ্‌ছো না, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কিছু থাক্‌বে না, যা বল্‌ছি কর, না কর, এ সংসারে তোমার দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না।" গৃহিণী স্বামীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার আরম্ভ করিলেন, কৃপণও ছুরীদ্বারা পদের অঙ্গুলি ক্ষত ও রক্তপাত করিয়া মৃতবৎ শয্যায় পতিত

রহিলেন। অন্তর্যামী ভগবান রোরুদ্যমানা কৃপণ পত্নীকে কহিলেন, "মা! আমার নিকট সঞ্জীবনী ঔষধ আছে, যদি অনুমতি করেন অন্তঃপুরে গিয়া আপনার স্বামীকে বাঁচাইতে পারি।" কৃপণের নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই কৃপণ পত্নী ভগবানকে অন্তঃপুর মধ্যে যাইতে আদেশ করিলেন। ছদ্মবেশী ভগবান গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কৃপণ মৃতবৎ পতিত। মনে মনে হাস্য ও বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া কৃপণ ভার্য্যাকে কহিলেন, "মা, আমার কুটীর এই নগরের প্রান্তভাগে। তথায় গমন করিয়া ঔষধ আনিয়া দিবার সময় নাই, অতএব আপনার স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া সত্বর কুটীরে চলিলাম। আমার ঔষধ অমোঘ, নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনার ভর্ত্তা সুস্থ শরীরে শীঘ্রই প্রত্যাগত হইবেন, যদি বাঁচাইতে না পারি, প্রতিশ্রুত থাকিলাম, এই মৃতদেহ সত্বর আপনার নিকটে প্রত্যর্পণ করিব। আপনার দাস দাসী না থাকিতে পারে কিন্তু দেখিতেছি, আত্মীয় স্বজনও আপনার দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কৃপণ গৃহিণী ভর্ত্তাকে নিরুত্তর ও তিনি মৃত নহেন জানিয়া ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না। ভগবান কৃপণ-দেহ স্কন্ধে করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কৃপণ ভাবিলেন, কি উৎপাত। কোথায় নিয়ে যাবে কি জানি, যদি আর বাঁচি, পয়সা দেওয়া হবে না, ইঁহাকে আজ দু পয়সা দিলে কাল আর একজন এসে চার পয়সা চাইবে, পরশু এই হয়ত এসে চার আনা চাইবে, ক্রমেই দাতব্য বাড়তে থাকবে, যেরূপ দেখ্‌ছি, তা হলে ত আমাকে দাতাকর্ণ হয়ে বস্‌তে হয়। এদিকে ভগবান কৃপণকে বনমধ্যে আনিয়া কতকগুলি শুষ্কপত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তদুপরি কৃপণকে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলেন। অনল জ্বালা দেহ স্পর্শ করিল, কৃপণ তথাপি নীরব ও নিশ্চল। ভগবান কহিলেন, "যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, এখনও দুই পয়সা দাও।" কৃপণ কোন উত্তর করিলেন না, ভাবিলেন, প্রাণ থাকিতে অর্থের অপব্যয় করিতে পারিব না। ভগবান কৃপণের অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও কার্পণ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন, দগ্ধস্থান স্পর্শপূর্ব্বক অঙ্গের জ্বালা নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আমি ভগবান, তোমার সহিষ্ণুতাগুণে তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি বর প্রার্থনা কর।" তচ্ছ্রবণে কৃপণ করযোড়ে কহিলেন, "আপনি ভগবানই হন, আর ব্রাহ্মণ হন, অন্যবর প্রার্থনা করি না, তবে এইমাত্র প্রার্থনা, এবার আমাকে ঐ দুইটী পয়সা হইতে রেহাই দেন।" ভগবান হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমাকে দুইটী পয়সা হইতে রেহাই দিলাম। অদ্য

বর প্রার্থনা কর।" কৃপণ কহিলেন, "যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই বর দেন, যেন আমি লক্ষ্মীছাড়া না হই।" ভগবান কহিলেন, "তথাস্তু" তুমি লক্ষ্মীর পেঁচা হইয়া চিরকাল অন্ধকারে কৃপণের গৃহে অবস্থান করিবে। এ জীবনে কখনও কোন সৎকার্য্য কর নাই, পরন্ত অর্থের অযথা ব্যবহার করিয়াছ, আমার জন্ত তোমার জন্ম মৃত্যু রহিত হইল, কিন্তু সংসারের ও স্বর্গের অসীম সুখভোগে অনন্ত কালের জন্য বঞ্চিত হইলে. যাও তীর্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হও, ইহা বলিয়া ভগবান অন্তর্ধ্যান হইলেন। কৃপণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পত্নীর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন এবং দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তীর্য্যগ্‌ যোনি প্রাপ্ত হইলেন।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি মানেচ কৌরবাঃ
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং ॥

চুট্‌কী।

"কেউ কিছুতে"

গঙ্গার ঘাটে একটি ব্রাহ্মণ স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া শিব পূজা করিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ "নমঃ শিবায়" বলিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতেছেন। পার্শ্বে দুইটি যুবক গাত্র মার্জ্জন ও হাস্যমুখে কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "দেখ ? এ ব্রাহ্মণ কি করিতেছে ? অন্য যুবকটী উত্তর করিলেন, ছেড়ে দাও, ও পাগল।" কথাটী ব্রাহ্মণের কাণে গেল, তখন কোন উত্তর করিলেন না। স্নানান্তে যুবকদ্বয় ঘাটে উঠিলে ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে যুবকটীর নিকটে আসিয়া কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিতেছিলে ? "পাগল" হাঁ বাবা তাই। পাগল সব্বাই, তবে কি জান কেউ কিছুতে," "কেউ কিছুতে" "কেউ কিছুতে"।

বাস্তবিক এ সংসারে সকলেই পাগল। যেই পাগলামীর নাম আসক্তি ও অনুরাগ। পাঠক ভাবিয়া দেখিলেন, এ সংসারে মনুষ্যকৃত যাহা দেখিতেছেন, ও দেখিবেন, তাহা সেই পাগলামী বা অনুরাগ প্রসূত।

হাসি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রাণধন চক্রবর্ত্তী।

(১)

হাসি, বড় তোরে ভালবাসি—
তাই, যতনেতে সদা পুষি,
হৃদয় আঁধার নিবারে,
আশার প্রদীপ জ্বালায়ে,
সদা তোরে আমি তুষি,
তুই স্বরগের সুধা রাশি,
হাসি বড় তোরে ভালবাসি।

(২)

ঝরণার ঝারা যেন সদা ঝরে—
প্রবাহের ধারা কে রোধিতে পারে?
হাসি ধারা উঠি লহরে লহরে—
(যবে) দ্বারে কাড়া দেয় আসি,
সকল বেদনা নাশি,
(আমি) সুধার সাগরে ভাসি,
হাসি, বড় তোরে ভালবাসি।

(৩)

স্বরগের মাঝে হয় তোর বাস,
সবে এ মরতে করে তোর আশ,
যেই জন পূজে যায় তার ত্রাস,
সদাই আননে হাসি,
চির শান্তি নগর বাসি,
হাসি, বড় তোরে ভালবাসি।

শিবচতুর্দ্দশী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ধন্য ধন্য তুমি ওহে ব্যাধের নন্দন!
তোমা হ'তে প্রচারিত শিবরাত্রি ব্রত।
ফাল্গুণী অসিত পক্ষ চতুর্দ্দশী যোগে,
প্রভাতে পশিয়াছিলে গহন কাননে—
মৃগয়ায়; অনাহারে ধনুর্ব্বাণ করে।
সারাদিন বনে বনে করিয়ে ভ্রমণ,
বধিলে হরিণ এক হৃষ্ট-পুষ্টকায়।
প্রদোষে উঠিল ঝড়; আঁধারিয়া দিশি,
মুশলের ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল;
দিশে হারা হয়ে তুমি, মৃগ লয়ে কোলে,
নিকটের বিল্ববৃক্ষে কৈলে আরোহণ।
অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টি সমস্ত রজনী,
ছিলে তুমি তরু পরে করি জাগরণ;
প্রভাতে আসিলে নামি মৃগধনু হাতে,
নেহারিলে বিল্বমূলে পার্ব্বতী শঙ্কর,
তাহাতেই হয়ে ছিল তব ভাগ্যোদয়।
বিল্বমূলে বিরাজেন মহেশ পার্ব্বতী,
জানিত না সে বারতা অজ্ঞান আকুটী;
শিহরিল কলেবর, নোয়াইয়া শির—
প্রণমিল হরগৌরী চরণ কমলে।
বিধির নির্ব্বন্ধ লীলা অতি চমৎকার,
কার ভাগ্যে কিবা ফলে, কে বলিতে পারে?
দৈব যোগে বৃক্ষতলে চক্ষু পালটিতে—
কাল সর্পাঘাতে তার হইল মরণ,
উপস্থিত যমদূত, লইতে তাহায়,
দর্পভরে নিবারিল আসি শিবদূত।
যমদূত কহে, "আমি ধর্ম্মের কিঙ্কর,

লইতে এসেছি এই দুরাচার ব্যাধে,
তুমি কে, কিসের বলে কর নিবারণ?"
কহিলেন শিব দূত, "শিবদূত আমি,
ছুঁইতে এ দেহ তুমি না পাইবে কভু।
দুরাচার বলিতেছ কোন্ অহঙ্কারে?
মহাপুণ্যবান এই ব্যাধের কুমার।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী খেয়ে প্রাক্তনের ফলে,
দিবারাত্রি জাগিয়াছে উপবাস করি,
কিসে যে কি ঘটিয়াছে, নাহি জানে কিছু,
ফলিয়াছে শুভ ফল, ভাগ্যে লেখাছিল।
বৃষ্টিজলে বিল্বদলে বিনা ভক্তিযোগে,
করিয়াছে শিব পূজা, যদিও অজ্ঞান,
যমের কি সাধ্য আছে পর্শিতে ইহারে?"
    শিবদূত বাণী শুনি যমের কিঙ্কর—
চক্ষু ঘুরাইয়া চাহে বিল্ববৃক্ষ মূলে;
পাপ চক্ষে নেহারিল শিবদুর্গা রূপ;
আর কি সেখানে থাকে? করে পলায়ন।
পবিত্র ব্যাধের আত্মা শিবব্রত ফলে—
পুণ্যময় শিবলোকে করিল প্রয়াণ।

সমালোচনা।

কয়েকটী কবিতা।—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা বি, এ, বিরচিত, মূল্য ছয় আনা মাত্র; ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। কবিতাপুস্তক, প্রাচীন ও আধুনিক ছন্দে মোট ৩৭টি খণ্ড কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি হৃদয়গ্রাহী; নবীন কবির "কয়েকটি কবিতা" পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, গ্রন্থকারের বাণী আরাধনা সফল হউক।

ধর্ম্মপাল।—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স দ্বারা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট; মূল্য আট আনা মাত্র।

"ধর্ম্মপাল"—একখানি অভিনব ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড়েশ্বর মহাত্মা ধর্ম্মপাল কি উপায় অবলম্বন করিয়া, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইয়া পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং গৌড়বাসী প্রজাবৃন্দ কিরূপে স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের দ্বারা উন্নত হইয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বৃত্তান্তগুলি লেখক প্রাঞ্জলভাষায় উপন্যাসের আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস গ্রন্থ, উপন্যাসের সরলতা ঐতিহাসিক কঠোরতাকে সুমধুর করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থকারের রচনানৈপুণ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিণী" রমেশ চন্দ্রের "জীবন প্রভাত," ''জীবনসন্ধ্যার'' পর বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে এরূপ উপাদেয় ঐতিহাসিক উপন্যাস আমরা দীর্ঘকাল পাঠ করি নাই। সাহিত্য সাধনায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়, গ্রন্থকার সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যকর্ম্ম ও পূজা-পদ্ধতি।—শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার সঙ্কলিত; শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক পোষ্ট ঠাকুরিয়া, জেলা ২৪ পরগণা, হইতে প্রকাশিত, মূল্য তিন আনা মাত্র।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ভক্তগণের নিত্য-কৃত্য উপযোগী একখানি পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া, ভক্তগণের সেই অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে এই ''নিত্যকর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতি" প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ভক্ত সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। পুস্তকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা স্তব ও স্তোত্রগুলি এরূপ সুললিত পয়ারাদি সরলছন্দে লিখিত যে, পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। আমরা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ নিত্যারাধ্য পুস্তক খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাণের কথা।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত। কলিকাতা ৬১নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ছয় আনা মাত্র।

গ্রন্থকার সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, তিনি প্রাণের আবেগে এই পুস্তকখানি জন-সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন,—ভূমিকায় গ্রন্থকার প্রকৃত প্রাণের কথাই খুলিয়া বলিয়াছেন,

"এই গ্রন্থ পড়ে কেহ যেন ভুল ধারণা মনে পুষে না রাখেন যে গ্রন্থকার ভগবানকে পেয়েছেন, জীবন্মুক্ত হয়েছেন। গ্রন্থকার এইটুকু বল্‌তে সাহস করেন যে কি উপায় অবলম্বন করলে ভগবানকে পেতে পারা যায়, তার ইঙ্গিতমাত্র ভগবান তাঁকে দিয়েছেন। সে ইঙ্গিতটুকু এই যে, ভগবানকে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে ডাকৃতে হবে। ষোল আনা সংসার করব, আর মধ্যে মধ্যে হাইতোলার সঙ্গে এক আধবার তাঁকে ডাক্‌ব—সে রকম করলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। সংসারে আমি ভাল লোক হতে পারি, সুখে থাকতে পারি; ধার্ম্মিক বলে লোকে আমায় পূজা করতে পারে; এ সকলই হতে পারে, কিন্তু এতে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পেতে গেলে তাঁর প্রেমে পাগল হতে হবে, অনন্ত জীবন তাঁর জন্য পণ করতে হবে—তাঁকে পাবার জন্য সত্যি সত্যি উন্মাদ হতে হবে—তবে তাঁকে পাবে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এই ইঙ্গিতটুকু পেয়েছি—যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করবেন, যাঁর ইচ্ছা হয় পাগলের উক্তি বলে অগ্রাহ্য করবেন। আমি কিন্তু এই সত্য জানি যে, ঈশ্বর যাঁকে এই ইঙ্গিত গ্রহণ করাবেন, তিনি ইহা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। ঈশ্বর যাঁকে ইহা গ্রহণ করাবেন না, আমার কাছেও তাঁকে ইহা গ্রহণ করাবার প্রয়োজন নাই।"

বেদ উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধু মহাপুরুষগণের উপদেশাদি অবলম্বন করিয়া ভগবল্লীলাপ্রসঙ্গে প্রাণের উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইয়াছে। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যলীলা বিশ্লেষণে প্রাণের কথায় যে, কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী; পরন্তু পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে মানব হৃদয়ে ভগবৎ প্রীতি প্রেম ও ভক্তি ভাব জাগাইয়া তুলে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বস্তুতই মুগ্ধ হইয়াছি।